বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ই-বুক নোটঃ

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ***একই দিনে রোজা এবং ঈদ*** বিষয়ে উস্তাযুল আসাতিযা মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহুর ২৫টি প্রবন্ধ একত্রিত করা হয়েছে। যা প্রথমতঃ আগস্ট-২০১৩ (শাওয়াল ১৪৩৪) থেকে ডিসেম্বর-২০১৫ (সফর ১৪৩৭) পর্যন্ত ধারাবাহিক ২২টি পর্বে মাসিক আল-কাউসারে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর রয়েছে ২০১৭ সনের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত দুটি সম্পূরক প্রবন্ধ। সব মিলিয়ে ৫৬০ পৃষ্ঠা। তবে সবার প্রথমে রয়েছে মে-২০১৭ তে প্রকাশিত প্রবন্ধটি। যা ৪৭ পৃষ্ঠা। পুরো সাড়ে পাঁচশত পৃষ্ঠা পড়ার ধৈর্য যাদের নেই, তাঁরা ‘মোটামুটি’ হিসেবে প্রথম লেখাটি পড়লেই চলবে ইনশাআল্লাহ। তবে বিস্তারিত জানতে আর এবিষয়ে প্রকাশিত বিভ্রান্তিকর বইগুলোর পর্যালোচনা দেখতে আমাদেরকে পুরোটাই পড়তে হবে। ব্যাপারটা কিছুটা কিফায়াতুল মুনতাহি এবং হিদায়াহ এর মত।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, হালাতের তাকাযায় ই-বুকটি সংকলন করা হয়েছে এবং এজন্য ইজাযত নেয়া হয়নি। আমরা অবশ্যই এব্যাপারে সার্বিক বিশ্লেষনধর্মী পূর্ণাঙ্গ একটি পুস্তকের প্রত্যাশী। আশা করি উলামা হযরতরা আমাদের এই চাহিদা পূরণ করবেন। আল্লাহ যেন তাওফিক দেয়...

পরিশেষে আমরা সবাই দু'আ করবো, মুহতারাম মুসান্নিফ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহুকে আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করুন, তাঁর বারাকাতকে আমাদের ওপর দীর্ঘায়িত করুন, আর আমাদেরকে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি হবার তাওফিক দান করুন। আমীন!

ওয়াসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লহ!

ই-বুক প্রথম প্রকাশঃ ২৫-জুন-২০১৭

talimtube.blogspot.com

ফিডব্যাক জানাতেঃ facebook.com/thealmahmud

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

মে-জুন ২০১৭, মে-জুন ২০১৭

সমগ্র বিশ্বে একই দিনে চান্দ্রমাসের সূচনা : একই দিনে রোযা ও ঈদ

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

প্রথমত : ভৌগোলিক ও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় বাস্তবতার আলোকে

সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করা, রমযান মাস শেষ হলে একই দিনে ঈদ করা এবং একই দিনে ঈদুল আযহা করা− ভৌগোলিক ও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় বাস্তবতার দিক থেকে এগুলো মূলত সম্ভবই নয়। কার্যত যা সম্ভব নয়, শরীয়ত নাযিলের সময় সে বিষয়ের ধারণা থাকলেও, শরীয়ত এর হুকুম দেয় না। আর একে তো অসম্ভব, আবার সে সময় এর ধারণাও ছিল না, এমন বিষয়ের হুকুম শরীয়ত কীভাবে দেবে?

কথা এমনিতেই খুব পরিষ্কার; তা সত্ত্বেও আরো স্পষ্ট করার জন্য প্রথমে আমরা বাস্তবতার আলোকে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখব তারপর শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সম্ভাব্যতা যাচাই

রোযা ও ঈদের ঐক্যের ডাক বেশি আগের নয়, আবার বেশি নতুনও নয়, ষাট বছরেরও কিছু বেশি এর বয়স। প্রথমে যারা এই আওয়াজ তুলেছেন

তারা শুধু মুসলিম বিশ্বব্যাপী ঐক্যের প্রস্তাব পেশ করেছেন। পরবর্তীরা বিশ্বব্যাপী এক করার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

আমরা উভয় দাবির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে চাই। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করুন :

এক. আমাদের কি বিশ্বব্যাপী কোনো সর্বজনীন নেতৃত্ব আছে?

একই দিনে বিশ্বব্যাপী রোযা ও ঈদ করা, অন্তত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা, এক্ষেত্রে জানা কথা যে, আমাদের সম্মিলিত কোনো খেলাফত বা নেতৃত্ব অথবা সম্মিলিত কোনো রাষ্ট্র কিছুই নেই। বিশ্বব্যাপী তো নেইই; মুসলিম বিশ্বব্যাপীও নেই। অথচ হিলালের বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য কোনো না কোনো বিশ্বব্যাপী শক্তি ও নেতৃত্বের প্রয়োজন, যেই নেতৃত্ব সবাই মেনে নেবে। এমন কিছু তো বিলকুল নেই! ওআইসি, এটা তো কোনো বিশ্বজনীন সংস্থা নয়। এর নামই তো হল ‘অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন’। আর ওআইসির ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্তও ওআইসি সমর্থিত হওয়া জরুরি নয়। তাই ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্ত ওআইসির কাছে কোনো আইনী মর্যাদা রাখে না। ফিকহ একাডেমী ১৯৮৬ ঈ. সনে এই সুপারিশ পাশ করে যে, কোনো এক শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সকল মুসলমানের উপরই ঐ চাঁদ দেখা মোতাবেক আমল ওয়াজিব হয়ে যাবে। এই সুপারিশের পর এখন ২০১৬ ঈ. শেষ হয়ে গেল। মোট ত্রিশ বছর পার হয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত সেই সুপারিশের উপর আমলের কী পদ্ধতি হবে সে বিষয়ের কোনো খসড়াও তারা পেশ করতে পারেনি এবং ওআইসির মন্ত্রীসভাও একে কার্যকর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি।

এই প্রস্তাব অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে বা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা, একে বাস্তবায়ন করার জন্য অন্তত চাঁদ দেখার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একটি সম্মিলিত বিশ্বজনীন সংগঠনের প্রয়োজন, যার প্রতি সবার ঐকমত্য থাকবে। এর সিদ্ধান্তের প্রতি সমস্ত মুসলমানের আস্থা থাকবে। অন্তত চাঁদ দেখার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই সংগঠনের ফায়সালা অবশ্য-গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে। আজও পর্যন্ত কি এরকম কোনো সম্মিলিত

সংগঠন অস্তিত্বে এসেছে?

ডক্টর এ কে এম মাহবুবুর রহমান, ডক্টর আব্দুল্লাহ মারূফ প্রমুখের গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত পুস্তিকা 'পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীয়াহ কী বলে? এর শেষ কথায় তারা যা লিখেছেন, তা হল-

আসুন আমরা হকের পক্ষে কথা বলি :

'আলেম সমাজ ও আম জনতাকে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন আমরা সকল অসত্যের জাল ছিন্ন করে বেড়িয়ে আসি, সঠিক দ্বীনি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসকল সমস্যার সমাধান করি। আজকের মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষের তৈরি সীমানা উপড়ে ফেলে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার[1], যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করবে এবং ইসলাম অনুযায়ী সমাধান প্রদান করবে, সকল মুসলমানকে একই তারিখে রোযা রাখা এবং ঈদ উদযাপন করার ঘোষণা প্রদান করবে এবং সকল উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করবে। মূলতঃ একমাত্র ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রের পক্ষেই তা সম্ভব। আমীন। (পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীয়াহ কী বলে?, পৃ. ৪৮)

এই কথাটাই হল আসল কথা, রোযা ও ঈদের ক্ষেত্রে ঐক্যের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য প্রথমে এটাই করা উচিত। এটা না হোক অন্তত এটুকু তো অবশ্যই হওয়া উচিত, যা উপরে বলা হয়েছে- অন্ততঃ চাঁদ দেখার প্রসঙ্গে সর্বমান্য, সর্বসম্মত, বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্য চাঁদের সিদ্ধান্ত দানকারী কোনো সংগঠন হওয়া উচিত। কিন্তু কোথায় সেরকম সংগঠন? তাছাড়া যদি এমন কোনো সম্মিলিত সংগঠন অস্তিত্বে এসেও যায় তারপরেও কার্যত একই দিনে বা একই তারিখে সমগ্র বিশ্বে তো দূরের কথা গোটা ইসলামী বিশ্বেও সময়ের ব্যবধানের কারণে ঐক্য সম্ভব হবে না।

দুই. ঐক্যের ভিত্তি কী হবে?

দ্বিতীয় কথা হল, চান্দ্রমাসের সূচনার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আমরা যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি, সেই ঐক্য কীসের ভিত্তিতে হবে? শরয়ী পদ্ধতিতে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে, না জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে? দুই পদ্ধতির যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক বাস্তব ক্ষেত্রে ঐক্য অসম্ভব।

(ক)

শরয়ী পদ্ধতিতে চাঁদ দেখার বিধান ছেড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের পদ্ধতি যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে প্রথম কথা তো হল, কোনো রাষ্ট্রেই আহলে হক উলামা এবং তাদের অনুসারীগণ এই পদ্ধতির সাথে একমত হবেন না এবং একমত হতে পারেন না! সেক্ষেত্রে ঐক্যের চিন্তা করাটাই ভুল। তারপরও কথার কথা, কেউ যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান তাহলে কি তিনি চাঁদের সম্মিলন বা সংযোগ (কনজাঙ্কশান) এর হিসাব গ্রহণ করবেন নাকি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার পদ্ধতি গ্রহণ করবেন? যদি চাঁদের কনজাঙ্কশানের হিসাব গ্রহণ করতে চান, তাহলে কনজাঙ্কশান তো দিন-রাতের যে কোনোও সময়ে, যে কোনো জায়গায় হতে পারে। এখন ধরুন, কনজাঙ্কশানের সময় কোনো এলাকায় সাহরীর সময় চলছে, তারা তো রোযা রাখতে পারবে, ঠিক আছে, কিন্তু যেসব এলাকায় ঐ সময় ফজরের নামায হয়ে গিয়েছে /সূর্য ঢলে পড়েছে সেখানকার অধিবাসীরা কি সেদিন রোযা রাখবে, না পরের দিন? যদি সেদিনই রোযা রাখে তবে তো সেটা অযৌক্তিক; বাস্তবতার নিরিখেও এবং শরীয়তের বিধান হিসেবেও। আর যদি পরের দিন রাখে তবে আর ঐক্য হল কোথায়?

(খ)

যদি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার হিসাব গ্রহণ করা হয়, তাহলেও প্রথম কথা হল, চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার ভিত্তি খোদ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছেই ভিন্ন ভিন্ন। এ জন্যই চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার নীতি অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত লুনার ক্যালেন্ডারে পরস্পর অনেক বৈপরিত্য ও ভিন্নতা পাওয়া যায়। সুতরাং চাঁদ দেখার সম্ভাব্য সময়ই যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু এর ভিত্তিতে ঐক্য কীভাবে হবে? এত লুনার ক্যালেন্ডার দিয়ে রোযা ও ঈদ একসাথে কীভাবে করা যাবে?

আরেকটি কথা চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে জুমার নামাযই IDL (ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইন)-এর এ পাশে আর ও পাশে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে হচ্ছে! তাহলে এরপরও ঈদ কি একই দিনে হয়?!

(গ)

এখন বাকি থাকল শরয়ী ভিত্তি 'হিলাল দেখা'। আর এটাই একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা, যার ভিত্তিতে ইসলামী মাসসমূহের শরয়ী সূচনা হবে, রোযা শুরু হবে, ঈদ হবে...। হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করলে অন্তত একদিনের ব্যবধান অবশ্যই হবে। হিলাল দেখার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করা, একই দিনে ঈদ করা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবই নয়। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখে আমল করে তাহলে ঐক্য সম্ভব না হওয়া তো খুবই স্পষ্ট! সাড়ে চৌদ্দশ বছরের এটাই বাস্তবতা! আর যদি কোনো এক অঞ্চলের হিলাল দেখাকে ভিত্তি বানানো হয়, তবে সেটা কোন অঞ্চল? শরীয়তের কোন্ দলীলের মাধ্যমে সেটা নির্ধারিত হবে? কীসের ভিত্তিতে সেটা অগ্রাধিকার পাবে?

(ঘ)

কেউ যদি কোনো দলীল ছাড়াই শুধু আবেগের বশে সৌদিআরব অথবা মধ্য প্রাচ্যের কোনো অঞ্চলের হিলাল দেখাকে ভিত্তি বানায় তাহলে বিষয়টি বোঝার জন্য নিম্নোক্ত উদাহরণ লক্ষ্য করুন, যা ডক্টর মাহবুবুর রহমান তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন-

'প্রতি চান্দ্র মাসের নতুন চাঁদ সকল সময়ই মধ্য প্রাচ্যের কোনো দেশে সর্ব প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। তাই মধ্য প্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের সবচেয়ে দূরতম অগ্রগামী সময়ের দেশ হচ্ছে জাপান। তার সাথে সময়ের পার্থক্য ৭-৩০ ঘণ্টা। ধরা যাক যদি, মধ্য প্রাচ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় নতুন চাঁদ দেখে। ঐ সময় পৃথিবীর সর্বপূর্ব স্থান জাপানে রাত ১টা ৩০ মিনিট। তখন জাপানে সাহরী খাওয়ার সর্বনিম্ন সময় হলো ৩টা ৪৩ মিনিট। তাহলে জাপানবাসী চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাওয়ার পরেও রোযা রাখতে সাহরী খাওয়ার জন্য সময় পাচ্ছেন। উপরন্ত ঐ সময়ের মধ্যে তারাবীর নামায আদায় করাও সম্ভব এবং শুক্রবার রোযা পালন করা সম্ভব।

মধ্যপ্রাচ্যের পূর্বে অবস্থিত অন্যান্য দেশের সাথে সময়ের পার্থক্য আরো কম ফলে তারা রোযা রাখার জন্য আরো বেশি সময় পাবেন।' (পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীআহ কী বলে?, পৃ. ৩৯-৪০)

তিনি এটা খেয়াল করেননি যে, এরা তো রাত দেড়টায় গভীর ঘুমে থাকবে। সে সময় চাঁদের খবর তারা কীভাবে পাবে। আর এখানে যা সময় বলা হয়েছে, তা হল জাপানের একটি শহরের হিসেবে। আরো পূর্বের শহরগুলোতে রাতের আরো কম সময় বাকি থাকবে। তাছাড়া উদাহরণটি একটি ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে পেশ করা হয়েছে। তা হল, 'প্রতি চান্দ্র মাসের নতুন চাঁদ সকল সময়ই মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে সর্ব প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়।' অথচ এটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তব্য এবং বাস্তবতার পরিপন্থী। নতুন চাঁদ সাধারণত পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তেই দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি তা কোনো কোনো মাসে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া পশ্চিম প্রান্তের সাথে জাপান নয় ইন্দোনেশিয়ার সময় ধরুন। মৌরতানিয়ায় যখন হিলাল দেখা যাবে তখন ইন্দোনেশিয়ায় দিনের কোন সময়? একটু চিন্তা করুন!

ডক্টর মাহবুবুর রহমান সামনে আরো লিখেছেন-

'এবার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১০৫ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশসমূহ মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্রের আলবুকয়ার্ক, ডেনভার, সিয়েন, মাইলস্ সিটিতে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায়। এমনিভাবে সর্বশেষ ১৮০ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে সেখানের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোর ৪ টায়। অতএব মধ্যপ্রাচ্য বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে তারা শুক্রবার ১ রমযানের রোযা পালন করবে। অর্থাৎ সারা পৃথিবীব্যাপি একই দিন রোযা পালন করা সম্ভব।' (পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীআহ কী বলে?, পৃ. ৪০)

এটা তিনি আজব কথা লিখেছেন, কারণ কথা যদি এটাই হয় যে, সমগ্র বিশ্বে একই হিলালের উপর আমল করতে হবে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে যে হিলাল দেখা যাবে, সেই হিলালের উপর তো হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ-বাসীদের তৎক্ষণাৎ আমল করা উচিত। তাদের তো বৃহস্পতিবার থেকেই রোযা

রাখা উচিত। সৌদি আরব অথবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে হিলাল দেখার পর যে এলাকায় সাহরীর সময় পাওয়া যাবে, অন্তত রোযার নিয়ত করার সময় পাওয়া যাবে তাদের তো জুমার দিন পর্যন্ত রোযা বিলম্ব করার পরামর্শ দেওয়া ভুল। আপনি যেহেতু সমগ্র বিশ্বে একই হিলালের উপর আমল করার কথা বলেন, তো আপনি কীভাবে তাদেরকে এই পরামর্শ দিতে পারেন? তো তারা যদি বৃহস্পতিবার রোযা রাখে তাহলে তারা মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের চেয়ে একদিন আগে রোযা রাখল। আর যদি শুক্রবার রাখে তাহলে তো এরা বৃহস্পতিবার (দিবাগত) সন্ধ্যায় নিজেরাই হিলাল দেখবে। তাদের রোযা তাদের হিলাল দেখা মোতাবেকই হবে। মধ্যপ্রাচ্যের হিলাল দেখা মোতাবেক নয়। বৃহস্পতিবারের হিলালই তাদের জন্য হিলাল। যদিও আপনারা জবরদস্তি করে এটাকে পুরোনো চাঁদ বলতে চান। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় চাঁদ এখনও পর্যন্ত উদিত হয়ইনি।

এই সকল সম্মানিত ব্যক্তি যদি এই উদাহরণ নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করেন, তাহলে তারা ইসলামী চান্দ্রমাসের ক্ষেত্রে একের অধিক হিলালের বিষয়টিও বুঝতে পারবেন। তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞান; যার দোহাই দিয়ে এত লড়াই-ঝগড়া, উলামায়ে কেরামকে এত জাহেল বলা, সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানও তো একের অধিক হিলালের ধারণাই দেয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানও তো উদয়স্থলের ভিন্নতাকে মেনে নিচ্ছে। এরকম প্রত্যক্ষ ও বাস্তব বিষয়কে জ্যোতির্বিজ্ঞান কখনোই অস্বীকার করে না।

যাই হোক, এখন আমরা যা বলতে চাচ্ছি তা হল, মধ্যপ্রাচ্যের হিলালকে যদি প্রথম এবং একমাত্র হিলাল ধরা হয় এরপর একে সমগ্র বিশ্বে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বাস্তব ময়দানে কত জটিলতা সামনে আসবে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

চিন্তা করুন, যে সন্ধ্যায় হিলাল দেখা যায়, রোযা এর পরের দিন হয়। এ ক্ষেত্রে হাওয়াইবাসীরা তো 'বিশ্বব্যাপী প্রথম হেলাল দিয়ে রোযা রাখা'র নীতি অনুযায়ী বৃহস্পতিবারে রোযা রাখবে, তারা তো হিলালের আগের দিন রোযা রাখছে! আপনার কাছে এর কী ব্যাখ্যা?

আরো শুনুন, এরা যখন বৃহস্পতিবারে রোযা রাখল তখন তো শুক্রবার রাত (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) তাদের জন্য দ্বিতীয় তারিখ। কারণ

ইসলামী চান্দ্র ক্যালেন্ডারে দিন ও তারিখ সূর্যাস্তের পর থেকেই শুরু হয়ে যায়। এখন যাদের নতুন চাঁদ দেখে হাওয়াইবাসীরা বৃহস্পতিবার রোযা রেখেছে অর্থাৎ (মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের চাঁদ) তারা তো রোযা রাখবে শুক্রবারে, যা হাওয়াইবাসীদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই দ্বিতীয় তারিখ। এটাকে যদি হাওয়াইবাসীদের জন্য প্রথম তারিখ বলা হয়, তবে কি তারা শা'বানে রোযা রেখেছে? যেহেতু এটা মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম তারিখ আর হাওয়াইয়ে দ্বিতীয় তারিখ আর হাওয়াইবাসীদের রোযা হয়েছে বৃহস্পতিবার, মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের রোযা হয়েছে শুক্রবার তবে তো এখানে দিন তারিখ সবই ভিন্ন ভিন্ন হল! আর এটাও কত অবাক কা- যে, যাদের হিলাল দেখে রোযা রাখা হচ্ছে, তারা রোযা রাখছে পরে, আর অন্যরা রোযা রাখছে আগে।

এটা অবশ্য ভিন্ন এক বিষয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন হিলাল উঠার সম্ভাব্য সন্ধ্যা যখন, তখন তো হাওয়াইবাসীরা রাত যাপন করছে। তো বেচারাদেরকে শেষ রাতে ঘুমের অবস্থায় চাঁদ দেখার সংবাদ/সাক্ষ্য কীভাবে পৌঁছানো হবে?

আপনি যদি বলেন, হাওয়াইবাসীরা মধ্যপ্রাচ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দৃষ্টিগোচর হওয়া হিলালের ভিত্তিতে (যার সংবাদ তারা বৃহস্পতিবার সুবহে সাদিকের কিছু আগে বা সুবহে সাদিকের পর পেয়েছে) শুক্রবার রোযা রাখবে। তাহলে প্রথম প্রশ্ন হল– আপনাদের কথা মত যদি সর্বপ্রথম হিলাল দেখার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বে হিলাল উদিত হয়ে রমযান শুরু হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তারা পূর্ণ একদিন রোযা ছাড়া কীভাবে কাটাবে? আপনারা যেভাবে কাফফারার ভয় দেখান, তাদের উপর এক রোযার পরিবর্তে ষাট রোযার কাফফারা আসবে না তো?!

(ঙ)

এ কথা আগেও বলা হয়েছে যে, এই ধারণা ভুল যে, নতুন চাঁদ প্রথমে মক্কায়, অথবা সৌদি রাষ্ট্রের সীমানায় অথবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো রাষ্ট্রে দেখা যায়। আমরা বেশ কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে এই বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। তারা বলেছেন, নতুন চাঁদ সর্বপ্রথম দেখা যাবে এমন নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। এটাও নির্দিষ্ট নেই যে, প্রতি মাসে

নতুন চাঁদ একই জায়গায় প্রথমবার দেখা যাবে। বরং কখনো এক জায়গায় দেখা যায়, কখনো অন্য জায়গায়। তবে অধিকাংশ সময় পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তেই সর্বপ্রথম নতুন চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের পত্রগুলো আমাদের কাছে আছে। এ বিষয়ের কিতাবে ইনশাআল্লাহ সেগুলো প্রকাশ করা হবে।

এই বিষয়টি জানার জন্য ইন্টারনেটে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেওয়া মুন সাইটিংয়ের চান্দ্রগোলকের বিভিন্ন ছবি দেখা যেতে পারে। সেখানে দেখবেন যে, বছরের অনেক মাসে বরং কোনো কোনো বছরের অধিকাংশ মাসে প্রথম দর্শনযোগ্য চাঁদের 'দৃষ্ট-রেখা'র বৃত্তে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ নেই। বৃত্তের ভেতরে আছে কখনো প্রশান্ত মহাসাগর বা আটলান্টিক মহাসাগর, কখনো হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, কখনো পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের অন্যান্য দেশ।

যেহেতু এটাই বাস্তবতা যে, সবসময় হিলাল প্রথমবার সৌদিআরব বা মধ্যপ্রাচ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না; বরং অধিকাংশ সময় পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্টিগোচর হয় সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে রোযা ও ঈদের ঐক্য সম্ভব কি না তা যাচাই করার জন্য পশ্চিম প্রান্তের এলাকাগুলোর সাথে পূর্ব প্রান্তের এলাকাগুলোর সময় মিলিয়ে দেখতে হবে। এ জন্য নিম্নোক্ত উদাহরণটি লক্ষ্য করুন−

ধরে নিন, ৫ই জুন সন্ধ্যা ২৯ শা'বানের সন্ধ্যা। কিন্তু প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের কোনো দেশেই চাঁদ দেখা যায়নি। আবাদি স্থানগুলোর মধ্যে শুধু হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে হিলাল দেখা গেছে সন্ধ্যা ছয়টায়। ধরে নিন যে, কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে এর সাক্ষ্য বা সংবাদ প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এসে পৌঁছল। কিন্তু বিষয় হল, হাওয়াইতে ৫ই জুন সন্ধ্যায় হিলাল দেখা গেছে, তখন বাংলাদেশে ৬ই জুন সকাল দশটা এবং মালয়েশিয়ায় সকাল আটটা। এখন এখানকার লোকেরা যে রোযা রাখবে কীভাবে রাখবে? আর যদি না রাখে তাহলে সাতই জুন হবে তাদের প্রথম রোযা অথচ সেদিন হাওয়াই-র অধিবাসীদের ২য় রোযা চলছে। তাহলে একই দিনে সবার রোযা হল কোথায়? কীভাবেই বা হতে পারে? আর যদি বলেন, হোক না হোক, প্রাচ্যের অধিবাসীদের ৬ই জুনই রোযা রাখতে হবে, তাহলে তারাবীহ ছাড়া, সাহরী ছাড়া, রাতে নিয়ত করা ছাড়া কোন্

দলীলের ভিত্তিতে এদের উপর রোযা ফরয করে দেওয়া হবে?[2] এর চেয়ে বড় কথা হল, রোযার নির্ধারিত সময় তো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অথচ এক্ষেত্রে প্রাচ্যের বাসিন্দাদের দিনের বিভিন্ন সময়ে রোযা শুরু করতে হচ্ছে?!

এর চেয়েও বড় কথা হল, হিলাল দেখার আগে তো রোযার সময় শুরুই হয় না; প্রাচ্যের বাসিন্দাদের কাছে যদি দিনের কোনো অংশে হাওয়াইয়ের হিলাল দেখা প্রমাণিত হয়ে যায়, আর ততক্ষণ পর্যন্ত এরা কিছু না খেয়েও থাকে তাহলেও তো তাদের রোযা সুবহে সাদিক থেকে হয়েছে গণ্য হবে না। কারণ তাদের সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়ার কোথাও নতুন চাঁদ দেখাই যায়নি। এ জন্য ঐটা রোযার সময় ছিল না।

আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, প্রাচ্যের বাসিন্দারা ৬ই জুনই রোযা রাখবে তাহলে প্রশ্ন হল, পরবর্তীতে যদি হাওয়াইয়ের বাসিন্দারা তাদের হিসাব মতো ২৯ শাবান সন্ধ্যায় হিলাল না দেখে তাহলে তো তাদের পূর্ণ ত্রিশ দিন রোযা রাখতে হবে। তখন প্রাচ্যের বাসিন্দাদের মোট রোযা হয়ে যাচ্ছে একত্রিশটি!

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, প্রাচ্যের বাসিন্দাদের এই অসম্পূর্ণ রোযা রমযানের ফরয রোযা হিসাবেই ধর্তব্য হবে নাকি এর কাযা আদায় করা তাদের জন্য আবশ্যক? যদি কাযা করতে হয়, তাহলে ঐক্যের আর অর্থ কী? আর যদি কাযা না করতে হয় তাহলে অসম্পূর্ণ রোযা দিয়ে ফরয কীভাবে আদায় হবে?

আজ ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬ ঈ. জুমাবার দিবাগত রাত এখানে সন্ধ্যা সাতটা বিশ মিনিটে কানাডার রিরহরঢ়বম শহরে অবস্থানরত এক বন্ধুর কাছে কিছু তথ্যের বিষয়ে ফোন করা হয়েছিল। তিনি বললেন, ‘আমাদের এখানে আজকে জুমাবার সকাল সাতটা বিশ মিনিট’। অর্থাৎ পূর্ণ বার ঘণ্টার ব্যবধান। আর আমাদের তো শনিবার শুরু হয়ে গেছে, অথচ তারা এখনও জুমার নামাযই পড়েননি। ধরে নিন কানাডাতে যদি হিলাল প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, যেদিন সন্ধ্যায় সেখানে হিলাল দেখা যাবে, সেসময় আমাদের এখানে হবে পরের দিন সকাল। আমরা যদি ঐ দিনই রোযা রাখি, তবে সে রোযা হবে অসম্পূর্ণ, আর যদি পরের দিন রোযা রাখি,

তাহলে দিন ও তারিখ ভিন্ন হয়ে যাবে।

এমনিভাবে প্রথম হিলাল যদি আলাস্কায় হয় তাহলে তো কোরিয়ার মুসলমানেরা যখন এর সংবাদ পাবে তখন তারা সকাল ৯/১০টা পার করছে। তাদের জন্য তো নিয়মমত রোযা রাখা সম্ভবই নয়। আবার এই হিলালের সংবাদ নিউজিল্যান্ডে এমন সময় পৌঁছবে যখন তাদের দিন-তারিখ সব পরিবর্তন হয়ে গেছে। কারণ হল, এক দেশ 'ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইনের' এক পাশে আরেক দেশ অপর পাশে। নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীরা যদি আলাস্কার অধিবাসীদের সাথে একই ভোরে রোযা শুরু করে তাহলেও তাদের দিন ও তারিখ ভিন্ন হবে।

মোটকথা, প্রথমত বিশ্বজনীন কোনো নেতৃত্ব নেই। দ্বিতীয়ত সময়ের ব্যবধান অনেক। এসব কারণে বাস্তবতার আলোকে একই দিনে রোযা শুরু করা, একই দিনে ঈদ করা না বিশ্বব্যাপী সম্ভব না মুসলিম বিশ্বে সম্ভব।

এবার আমরা দেখব যে, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর অবস্থান কী? এ ধরনের প্রয়াস-প্রচেষ্টা কি শরীয়তে কোনো জরুরি বিষয়? বা অন্তত মুস্তাহাব পর্যায়ের কোনো সওয়াবের কাজ?

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে

বিশ্বব্যাপী একই দিনে বা একই তারিখে রোযা ও ঈদ করাকে ফরয/জরুরি সাব্যস্ত করার শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে :

১. যে বিষয় গোড়া থেকেই সম্ভব নয় বা যে বিষয় পালনে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়, শরীয়ত কখনো এমন বিষয়ের আদেশ করে না। এজন্য যে কোনো সমঝদার ব্যক্তির কাছে প্রথম ধাপেই এই ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা শরীয়তের নির্দেশ হতেই পারে না। অসম্ভব অথবা প্রায় অসম্ভব কোনো কাজের আদেশ শরীয়ত করতে পারে না।

২. শরীয়ত নাযিলের সময় যে বিষয়ের কোনোও ধারণা-কল্পনাও ছিল না, এরকম বিষয় শরীয়তের নির্দেশ হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। সুতরাং এখানে তো একথা পরিষ্কার যে, এই কাজ শরীয়তের নির্দেশ হতে পারে না।

৩. নব উদ্ভাবিত কোনো কাজকে ফরয-ওয়াজিব তো দূরের কথা; সুন্নতের মর্তবাও যদি দেওয়া হয় তাহলেও এটা বিদআত হয়ে যায়। আর বিদআত তো গোমরাহী আর ভ্রষ্টতা।

৪. যে কাজের বিশেষ কোনো সওয়াব বা ফযীলত কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়নি আবার এই কাজ করতে গেলে অনেক কষ্ট ও অসুবিধা দেখা দেয় এরকম কাজ তো নিঃসন্দেহে 'তাকাল্লুফ' তথা লৌকিকতা ও নিরর্থক আয়োজন ছাড়া কিছু নয়। আর এ উম্মতকে এসব তাকাল্লুফ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে– نهينا عن التكلف আমাদেরকে তাকাল্লুফ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

৫. বিশ্বব্যাপী এই ঐক্যের শরয়ী কোনো মানদ- নেই। এটা যদি শরীয়তে নির্দেশিত হতই তাহলে শরীয়তে এর কোনো মানদ-ও থাকত। এই প্রসঙ্গে যে তিনটি মানদ- বলা হয়, এর একটাও আমলযোগ্য নয়!

ক. জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত লুনার ক্যালেন্ডার

এতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ না-জায়েয। শরীয়ত-নির্ধারিত ভিত্তি 'হিলাল দেখা' পরিবর্তন করার ইখতিয়ার কারো নেই। কেউ যদি পরিবর্তন করে দেয়ও তাহলেও আহলে হক মুসলমানরা একে গ্রহণ করবে না। তাহলে ঐক্য কীভাবে হবে।

খ. প্রথম হিলাল দেখা

এটা এ জন্য মানদ- হতে পারে না যে, প্রথমবার কোথায় হিলাল

দৃষ্টিগোচর হয়, তা অনুসন্ধান করার হুকুম শরীয়ত দেয়নি। আর বাস্তবে দূর-দূরান্তের অঞ্চলের জন্য প্রথম হিলাল কোথায় কখন দেখা গিয়েছে তা অনুসন্ধান করা অনেক জটিল বিষয়। তারপরও যদি হিলাল সাব্যস্ত হয়েও যায়, তাহলেও সেটাকে বিশ্বব্যাপী কার্যকর করতে গেলে অনেক জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এজন্য এই পদ্ধতিও আমলযোগ্য নয়।

গ. সৌদি আরবের হিলাল দেখাকে ভিত্তি বানানো

সৌদিআরবের চাঁদ দেখার ভিত্তিতেও বিশ্বব্যাপী আমল করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোনো এক জায়গার হিলালকে সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া, শুধু এতটুকু নয় যে, তা দলীলবিহীন, বরং এটা দলীলবিরোধী। সুতরাং এই পদ্ধতিই আসলে গ্রহণ করা উচিত যে, প্রত্যেক অঞ্চলের বাসিন্দারা নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখা অনুসারে আমল করবে।

সুতরাং যেহেতু বিশ্বব্যাপী ঐক্যের শরয়ী কোনো মানদ- নেই তাহলে এটা শরীয়তে ফরয /ওয়াজিব বা সুন্নত তো দূরের কথা; অন্তত শরীয়তের কাম্যও হয় কীভাবে?

৬. শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতা হল এ-ই। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিপন্থী কিছু লোক বিষয়টাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন এবং এর জন্য এমন এমন দলীল বের করেন, যেন কুরআন-হাদীসে সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা শুরু করা এবং একই দিনে ঈদ করার কথা বলা হয়েছে। তারা এটাও বলেন যে, 'যেহেতু আগের যামানায় প্রচারমাধ্যম এত উন্নত ছিল না; যা এখন হয়েছে, সেজন্য আগের লোকেরা শরীয়তের ঐ ওয়াজিব বিধান বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তাদের যদি সুযোগ হত তাহলে তারা অবশ্যই এটা বাস্তবায়ন করতেন।

এখন তো প্রচারমাধ্যম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত হয়েছে যে, পুরো বিশ্ব যেন একটি গ্রাম। এখন আমাদের কুরআন-হাদীসের সেই বিধান বাস্তবায়ন করতে বাধা কোথায়?'

সামনে আমরা সেই ভাইদের পেশকৃত দলীলের (বাস্তবে যেগুলো দলীল নয়) উপর পর্যালোচনা করতে চাই। যেন এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এরা কোনো দলীল ছাড়াই একটি নব উদ্ভাবিত বিষয়কে শরীয়তের আবশ্যকীয় বিধান সাব্যস্ত করতে লেগেছেন।

৭. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অভিমত আর একই দিনে রোযা ও ঈদ জরুরি হওয়ার মতকে এক মনে করা।

তাদের বড় এক দুর্বলতা হল, তারা ফিকহ-ফতোয়ার কিছু কিতাবে দেখেছেন যে, হানাফী মাযহাবে, (বরং এক অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে শাফেয়ী মাযহাব ছাড়া অন্য তিন মাযহাবেও এবং এক বক্তব্য অনুযায়ী শাফেয়ী মাযহাবেও) উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। সুতরাং যদি অন্য কোনো এলাকা থেকে 'তরীকে মুজিব' অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও শরয়ী নিয়ম-সমর্থিত পদ্ধতিতে খবর পাওয়া যায় তাহলে সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি। এখান থেকে তাঁরা এটা বুঝে নিয়েছেন যে, দেখ! সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করার কথা তো ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমও বলে গিয়েছেন!!

এটা তাদের অসম্পূর্ণ বুঝের পরিণাম ছাড়া কিছুই নয়। প্রথম কথা তো হল, لاعبرة لاختلاف المطالع 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়' এমন ব্যাপক ও নিঃশর্ত কথা তো কোনো ইমামই বলেননি। ফিকহের কিতাবের পরবর্তী মুসান্নিফগণের অনেকে এ ধরনের নিঃশর্ত কথা যদিও লিখেছেন, কিন্তু ইমামদের কেউই এরকম নিঃশর্ত কথা বলেননি। ইমাম আহমদ ছাড়া অন্য তিন ইমামের মাযহাবেই অগ্রগণ্য বক্তব্য, যার উপর অধিকাংশ ফকীহ ফতোয়া দিয়েছেন তা এই যে, 'কাছাকাছি অঞ্চলের ক্ষেত্রে তো এক জায়গার হিলাল দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় হবে, কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে এক জায়গার হিলাল দেখা অন্য জায়গার জন্য প্রযোজ্য নয়'। হানাফী মাযহাবেরই অনেক বড় বড় ফকীহ এটা বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এর বিপরীতে একটি শব্দও বর্ণিত হয়নি। 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়' জাতীয় বাক্য ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে পাওয়া যায়নি। আর হানাফী মাযহাবে জাহিরুর রিওয়ায়াহ মানে হল ঐসব মাসআলা, যা ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরেদ ইমাম

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছয় কিতাবে উল্লেখ আছে। আলহামদু লিল্লাহ ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সব কিতাব এখন ছাপা আছে। এসব কিতাবের কোথাও لاعبرة لاختلاف المطالع 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়' জাতীয় কোনো বাক্য পাওয়া যায়নি।

অবশ্য এই বাক্য কানযুদ দাকায়েকসহ ফিকহে হানাফীর কিছু কিতাবে অবশ্যই এসেছে। কিন্তু এর যে অর্থ এখন উদ্ভাবন করা হয়েছে যে, পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা ফরয, এরকম কথা সেই মুসান্নিফদের কল্পনার আশেপাশেও আসেনি। এখানে সম্পূর্ণ নব উদ্ভাবিত একটি বিষয়কে এই বাক্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বলা যে, নিজ অঞ্চলের বাইরে থেকেও হিলাল সাব্যস্ত হওয়ার শরয়ী সাক্ষ্য যদি 'তরীকে মুজিব' এর মাধ্যমে এসে যায়, তবে সে অনুযায়ী আমল করা জরুরী। কিন্তু তাদের কেউ এ কথা বলেননি যে, ২৯ শা'বান সন্ধ্যায় মুসলমানদের দায়িত্ব শুধু এটুকু নয় যে, নিজ নিজ এলাকায় হিলাল তালাশ করবে বরং তাদের উপর এটাও ফরয যে, সারা বিশ্বের কোনো এলাকায় আজ হিলাল দেখা গিয়েছে কি না তা সন্ধান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই করতে হবে, হিলাল দেখা প্রমাণিত হলে তা সারা বিশ্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ কথা যদি কোনো একজন ফকীহও কোথাও লিখতেন, তাহলেও বলা যেত যে, যাক! একজন ফকীহ তো অন্তত এ কথা বলেছেন! কিন্তু চার মাযহাবের ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবের বিশাল ভাণ্ডারে কোনো নির্ভরযোগ্য ফকীহের কিতাব থেকে এরকম কথা ইনশাআল্লাহ দেখানো যাবে না! বরং এর বিপরীতে যে সকল আলিম لاعبرة لاختلاف المطالع বক্তব্যকে হানাফী মাযহাবের বা অন্য মাযহাবের অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত মনে করেছেন তাদেরকেই যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, সারা বিশ্বে নয়, বরং বড় কোনো অঞ্চল জুড়ে প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদের আয়োজন করার শরয়ী বিধান কী, তখন তারা সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, এটা ওয়াজিব তো কখনোই নয় বরং শরীয়তে এটা কাম্য বিষয়ও নয়। (এমদাদুল ফাতাওয়া খ. ২, পৃ. ১২৯)

তো আমরা বলছিলাম, তাদের বড় দুর্বলতা এই যে, তারা কয়েক বছর আগের উদ্ভাবিত একটি প্রস্তাবকে কয়েকশ বছর আগের ফিকহ-ফতোয়ার

কিতাবের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এই ভুল ধারণার ভিত্তিতে যে لاعبرة لاختلاف المطالع বাক্যে একথাই বলা হয়েছে, অথচ বিষয়টি এমন নয়।

৯. কুরআন ও হাদীসে কি একই দিনে রোযা ও ঈদ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে?

তাদের এরচেয়েও বড় দুর্বলতা হল, তারা নবউদ্ভাবিত একটি প্রস্তাব, যার সূচনাই হয়েছে বেশি দিন হয়নি, তারা একে সরাসরি কুরআন-হাদীসের হুকুম সাব্যস্ত করছেন।৩[3] তারা বলছেন, কুরআন কারীমের আয়াত ২ : ১৮৫ -এ এবং صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته- শীর্ষক হাদীসে এই হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা শুরু করতে হবে, একই দিনে রোযা শেষ করে ঈদ করতে হবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জানি না, তারা সাধারণ বুদ্ধিকে কেন একটু কাজে লাগান না। যদি কোনো হুকুম কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে এসে থাকে তাহলে সেটা আর নতুন কথা হবে কীভাবে? এটা তো তাহলে আয়াত যখন নাযিল হয়েছে, হাদীস যখন ইরশাদ হয়েছে তখন থেকে মানুষের মাঝে একটা জানাশোনা বিষয় হত। অনেক পুরোনো বিষয় হত। তাফসীরের কিতাবে, হাদীসের ব্যাখ্যার কিতাবে, ফিকহের কিতাবে এর আলোচনা হত। প্রত্যেক যুগের আলিম ও ফকীহগণের মুখে এর চর্চা হত। এমন কেন হল যে, পনেরো শতকে এসে এটা আবিষ্কার করতে হল আর দলীল-প্রমাণের খোঁজে নামা হল।

যাই হোক, এখানে মনে হচ্ছে উক্ত আয়াত এবং উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বাপরসহ উল্লেখ করে দিই। যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই আয়াত এবং এই হাদীসকে আলোচ্য বিষয়বস্তুতে টেনে আনা আয়াত ও হাদীসের উপর কত বড় জুলুম।

২ : ১৮৫ আয়াতের মর্ম

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন−

شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ، يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

“রমযান মাস– যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা মানুষের জন্য আদ্যোপান্ত হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এই মাস পাবে সে যেন এই সময় অবশ্যই রোযা রাখে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে তবে অন্য সময় সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ, সেটাই করতে চান। তোমাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না। যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদের যে পথ দেখিয়েছেন সে জন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”

আয়াতে কারিমায় فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অংশটির এক অর্থ তো এটাই, যা উক্ত তরজমা থেকে বুঝে আসছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই এই মাস পাবে, অন্য কথায় যে ব্যক্তিই এই মাসে উপনীত হবে সে যেন অবশ্যই এই মাসের রোযা রাখে।

এর আরেক অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি এই সময় ‘মুকীম’ অবস্থায় থাকবে সে যেন অবশ্যই এই মাসের রোযা রাখে। (যে সফরে থাকবে তার জন্য ঐ সময় রোযা ফরয নয়, তার জন্য পরবর্তীতে কাযা করে নেওয়ার অনুমতি আছে।) যে অর্থই গ্রহণ করা হোক, এখানে তো দূর থেকেও এ কথা বের করা যায় না যে, বিশ্বব্যাপী একই হিলাল এবং প্রথম হিলালের ভিত্তিতে রোযা রাখা ফরয। বিশ্বব্যাপী একই তারিখে রোযা শুরু করা এবং একই তারিখে ঈদ করা ফরয। এই প্রসঙ্গ আয়াতের কোন্ শব্দ থেকে বুঝে আসে? আয়াতে তো রমযান শুরু হলে শরীয়ত পালনে আদিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ফরয– এটুকুই বলা হয়েছে। রমযান কীভাবে শুরু হবে সে বিষয়ে এ আয়াত নীরব। তাহলে এ আয়াতের ঐ অর্থ কীভাবে বানানো হচ্ছে? তাদের কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতে من শব্দটি ব্যাপকতা বুঝাচ্ছে। কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করে

যে, من শব্দটি ব্যাপকতা বুঝাচ্ছে! من শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সে কারণেই তো সকল মুসলিম নর-নারীর উপর রোযা ফরয! হ্যাঁ, ওযরের কারণে শরীয়ত যাদেরকে অনুমতি দিয়েছে তাদের কথা ভিন্ন। এই আয়াতে সকল মুসলমানকেই রোযা রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ থেকে এটা কীভাবে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক এলাকার মুসলমানদের উপর একই দিনে রোযা শুরু করা ফরয। এটা তো ভিন্ন এক প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে আয়াত নীরব।

যদি আয়াতের ইশারাই ধরা হয়, তাহলে তো শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আলউছাইমীনের কথা মতো এ আয়াতে এদিকে ইশারা আছে যে, যে অঞ্চলে লোকেরা এখনও রমযান পায়নি তাদের রোযা এখন শুরু হবে না। যখন তারা নিজেরা চাঁদ দেখার মাধ্যমে তাদের ওখানে রমযান শুরু হবে আর তারা রমযান পাবে তখনই তাদের উপর রোযা শুরু করা ফরয হবে। লক্ষ্য করুন যদি কারো রমযান না পাওয়ার বিষয়ই এখানে না থাকে তাহলে এভাবে বলার কী অর্থ যে, তোমাদের মধ্যে যারা রমযান পাবে!

যাইহোক, এটা তো একটা সূক্ষ্ম ইশারা। এ আয়াতে এর সম্ভাবনা আছে বটে! কিন্তু এই আয়াতের সুস্পষ্ট যে অর্থ, তা হল, রমযান শুরু হলে শরীয়ত পালনে আদিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রোযা ফরয। উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য কি ধর্তব্য নয় এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো হুকুম না এই আয়াতে আছে, না অন্য কোনো আয়াতে! এটা তো এক মুজতাহাদ ফীহ (ইজতিহাদ নির্ভর) মাসআলা। ফকীহগণ এই বিষয়ে ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করেছেন এবং তাতে তাদের মাঝে মতভিন্নতাও হয়েছে। এই আয়াতের উদ্দিষ্ট মর্মের মধ্যে উদয়স্থলের বিভিন্নতার মাসআলা সরাসরি দাখিল করা ভুল। আর এই দাবি করা তো অনেক দূরের কথা যে, এই আয়াতে একই হিলাল ও প্রথম হিলালের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহিল আযীম।

রমযান কীভাবে শুরু করতে হবে সে আলোচনা তো ২ : ১৮৯ আয়াতে এসেছে।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ

অর্থাৎ মানুষ আপনাকে হিলালসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন সেগুলো মানুষের জন্য (অর্থাৎ তাদের ইবাদত ও লেনদেনের জন্য, বিশেষ করে) হজ্বের জন্য সময় নিরূপণের মাধ্যম।

তো রমযান কীভাবে শুরু হবে তার বিবরণ এই আয়াতে এবং হাদীস শরীফে এসেছে। লক্ষ্য করুন! এ আয়াত এবং যেসব হাদীসকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলা হয়েছে, কোথাও এ কথা নেই যে, ইসলামী মাসসমূহের শরয়ী সূচনা সমগ্র বিশ্বে একই সাথে করা জরুরি এবং একই হিলালের দেখার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা জরুরি! হিলালের মাধ্যমে সময় নির্ধারণের ফায়দা সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানুষ লাভ করে আসছে। ইসলামে রোযা ফরয হওয়ার সময় থেকেই মানুষ হিলালের মাধ্যমেই রোযার সময়, রমযানের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করে আসছে। কখনোই তো তাদের কল্পনায়ও এ কথা আসেনি যে, এই আয়াতে বিশ্বব্যাপী এবং প্রথম দেখা হিলালের ভিত্তিতেই সময় নির্ধারণ করা এবং এক হিলাল ও প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা শুরু করা এবং ঈদ করা ফরয করা হয়েছে। বড় আশ্চর্যের কথা যে, আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে এতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ আয়াতের উপর যেভাবে আমল করে এসেছে তা আয়াতের মর্ম নয়। আর যে কথা কালকের সৃষ্ট আর তাও আবার নিছক চিন্তা ও দর্শনের আকারেই রয়ে গেছে, সেটাই নাকি আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ!!

কুরআনের তাফসীরের কোনো এক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেও কি এই নব উদ্ভাবিত ব্যাখ্যার একটি উদ্ধৃতি পেশ করা সম্ভব? সালাফে সালেহীনের নির্ভরযোগ্য কোনো এক কিতাবেও কি এই নব উদ্ভাবিত ব্যাখ্যার একটিও উদ্ধৃতি পেশ করা সম্ভব? কোনো সন্দেহ নেই যে, তা কোনোদিনই সম্ভব নয়!

এবার হাদীস শরীফের ভাষ্যটি লক্ষ্য করুন :

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إن الله تبارك و تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا له ثلاثين يوما.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হিলালকে মানুষের জন্য মীকাত (সময় নিরূপণের মাধ্যম) বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়। যদি হিলাল দেখা না যায় তাহলে (চলতি মাসের) ত্রিশ দিন গণনা কর! -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক বিন হাম্মাম (১২৬-২১১ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৫৬, হাদীস ৭৩০৬; আসসুনানুল কুবরা বাইহাকী, খ. ৪, পৃ. ২০৫; আলমুসতাদরাক, হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, খ. ১, পৃ. ৪২২, হাদীস ১৫৭৯; আস সহীহ, ইমাম ইবনে খুযাইমা (২২২-৩১১হি.) খ. ৩, পৃ. ২০১, হাদীস ১৯০৬)

উক্ত হাদীসে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, হিলাল দেখে রমযান মাস শুরু হবে। পরবর্তী হিলাল দেখে রমযান মাস শেষ হবে। এই জন্য হিলাল দেখে রোযা শুরু করতে হবে। হিলাল দেখে রোযা শেষ করতে হবে। যদি হিলাল দেখা না যায় তাহলে চলতি মাস ত্রিশ দিন গণনা করতে হবে। এই হল, হাদীসের মর্ম। তো এখানে কোথায় আছে যে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের এক হিলাল এবং প্রথম হিলাল দেখে একই দিনে রোযা শুরু করতে হবে। একই দিনে ঈদ করতে হবে? আবার বলা হচ্ছে, 'তা শুধু সওয়াবের কাজ তাই নয়, বরং এটা করা ফরয। অন্যথায় ফরয রোযা ছেড়ে দেওয়ার কবীরা গুনাহ এবং ঈদের দিনে রোযা রাখার গুনাহ তাদের উপর আসবে'। এতসব কথা উক্ত হাদীসের কোন্ শব্দ আর কোন্ বাক্য থেকে বের হল? আসলে তা নব উদ্ভাবিত বিষয়কে হাদীসের উপর চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী?৪[4]

তারা বলেন, صوموا لرؤيته-এর মধ্যে صوموا (তোমরা রোযা রাখ) হচ্ছে আদেশসূচক সম্বোধন এবং বহুবচনের শব্দ। এতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে হুকুম করেছেন যে, তারা যেন হিলাল দেখে রোযা রাখে! এই কথা শত ভাগ সঠিক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্যই সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানদের উপর রোযা ফরয। কোনো অঞ্চলের মুসলমানরাই এই হুকুমের বাইরে নয়। সবার উপরই রোযা ফরয। আর হিলাল দেখার পরই রোযা ফরয । কারও জন্য এটা জায়েয নেই যে, হিলাল দেখা ছাড়া শুধু হিলালের সম্ভাবনার ভিত্তিতে মাস শুরু করবে এবং এটা জায়েয নেই যে, হিলাল দেখা বাদ দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে মাস শুরু করবে। রোযা সব অঞ্চলের সব মুসলমানের উপর ফরয। আর হিলাল

দেখার পরই রোযা ফরয, এর আগে নয়।

এ হল হাদীসের সরল অর্থ। এখানে এ কথা কোত্থেকে এল যে, বিশ্বব্যাপী সমস্ত মুসলমানকে একই হিলাল এবং প্রথম হিলালের অথবা বিশেষ কোনো অঞ্চলের হিলালের ভিত্তিতে একই তারিখে রোযা শুরু ফরয? বহুবচনের শব্দ দিয়ে সবাইকে রোযা রাখতে বলা হয়েছে। সেখান থেকে এটা কীভাবে সাব্যস্ত হল যে, সবার রোযার সূচনা একই তারিখে হওয়া জরুরি। আচ্ছা أقيموا الصلاة (তোমরা নামায আদায় কর) এ কথার অর্থ কি এই যে, সবাই একই সময়ে নামায আদায় কর? অথবা آتوا الزكاة (তোমরা যাকাত আদায় কর) এর অর্থ কি এই যে, সবাই একই তারিখে যাকাত আদায় কর? أقيموا ও آتوا শব্দদ্বয় সম্বোধনসূচক বহুবচন। উভয় শব্দের সম্বোধনই ব্যাপক। বিশ্বের সকলকে সম্বোধন করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে কি এ অর্থ হতে পারে যে, সবাই একই সময়ে নামায আদায় কর, সবাই একই তারিখে যাকাত আদায় কর? ওখানে যদি এ অর্থ হয় যে, সবাই নিজ নিজ সময়ে নামায আদায় কর এবং সবাই নিজ নিজ নেসাবের বছর পূর্ণ হলে যাকাত আদায় কর, তাহলে صوموا لرؤيته -এর ক্ষেত্রে কেন এই অর্থ হবে না যে, সকল মানুষ নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখে রোযা শুরু করবে।

সুতরাং এ কথা বলা যে, 'صوموا' বলে সব অঞ্চলের সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর সে জন্য বিশ্বব্যাপী এক হিলাল এবং প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে সমস্ত মুসলমানের উপর রোযা শুরু করা ফরয'– সম্পূর্ণ ভুল। সম্বোধন সবাইকে করা হয়েছে এ কথা তো ঠিক আছে, কিন্তু শুধু 'হিলাল দেখা' এতটুকু বিধানের সাথে তারা যে এক হিলাল দেখা এবং প্রথম হিলাল দেখা অথবা সৌদিআরবের হিলাল দেখার কথা বলছেন তা তো হাদীসে নেই। এসব তো তাঁদের সংযোজন। শরীয়তের কোনো দলীলের আলোকে তাঁরা হাদীসের মর্মের মধ্যে এসব কথা যুক্ত করছেন? জানা কথা যে, এসব তাঁদের নিজেদের থেকে সংযোজন। এসব না কোনো আয়াতে আছে, না কোনো হাদীসে!

হিলাল দেখার সাক্ষ্যের হাদীসসমূহ থেকে কি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা ফরয?

তারা এটাও দাবি করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এলাকা থেকে আগত হিলালের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করেছেন। তাহলে বুঝা গেল, যে কোনো এলাকাতে হিলাল দেখা গেলে সব এলাকায় রোযা ও ঈদ করা উচিত।

পর্যালোচনা : হিলাল দেখার সাক্ষ্য কবুল করার হাদীসসমূহের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। শা'বানের ২৯ তারিখ, রমযানের ২৯ তারিখ, অথবা যিলকদের ২৯ তারিখ এসব তারিখে কখনো কি এমন হয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল দেখার জন্য অথবা হিলালের সংবাদ বা সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য এক দিন দূরত্ব নয়; পাঁচ-দশ মাইল দূরত্বের কোনো এলাকায়ও কোনো লোক পাঠিয়েছেন? হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এর একটিও কি দৃষ্টান্ত আছে? উত্তর না-বাচক ছাড়া আর কী? খুব ভালো করে চিন্তা করা দরকার, এক হল সাক্ষ্য এসে গেলে সাক্ষ্য কবুল করা, আরেক হল সাক্ষ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা, দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। একই হিলাল এবং প্রথম হিলালের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করা যদি কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য অঞ্চল থেকে নতুন চাঁদের সংবাদ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করাও তো ফরয হবে। কিন্তু নবী-যুগে এর উপর আমল হল না কেন? এসে যাওয়া সাক্ষ্য গ্রহণেই কেন ক্ষ্যান্ত থাকা হল?

সুতরাং মদীনা মুনাওয়ারার আশেপাশেও কাউকে না পাঠানো এবং মদীনায় হিলাল দেখা গেলেই রোযা শুরু করা /ঈদ করা এবং মদীনায় হিলাল দেখা না গেলে রোযা শুরু না করা এবং শাওয়ালের হিলাল দেখা না গেলে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করা, এগুলোই তো দলীল যে, নিজ নিজ এলাকার হিলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করলেই মানুষ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

ভূমিকাস্বরূপ এই প্রয়োজনীয় কথাগুলো মনে রেখে এবার চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের হাদীসগুলো নিয়ে চিন্তা করুন–

ক. এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর সাক্ষ্যের

ভিত্তিতে রোযা রাখার ঘটনা এসেছে। স্পষ্টই যে, এখানে খোদ মদীনার অধিবাসীদেরই এক ব্যক্তির সাক্ষ্য অনুযায়ী রোযা রাখা হয়েছে।

খ. আরেক হাদীসে এসেছে যে, এক বেদুঈন হাররা থেকে এসে রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। হাররা আজকাল তো মদীনা মুনাওয়ারারই অংশ। মাসজিদে নববী থেকে হাররা মাত্র ৪-৫ কিলোমিটার দূরত্বে।

গ. আরেক হাদীসে দুই বেদুঈনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদ করার ঘটনা এসেছে। এতে একথার উল্লেখ নেই যে, এই দুই বেদুঈন কোথা হতে এসেছে। কিন্তু বেদুঈনদের বসতি মদীনার আশপাশেই ছিল। এবং এরা সকাল সকাল এসে সাক্ষ্য দিয়েছিল। এটাও তো তাহলে মদীনা থেকে একেবারে কাছের এলাকারই সাক্ষ্য হল।

ঘ. মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে ইবনে মাজাহ-এ একটি ঘটনা এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার ঊনত্রিশে রমযান সন্ধ্যায় হিলাল দেখা গেল না, তাই সবাই ত্রিশ রমযানের রোযা রাখলেন। দিনের শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক কাফেলা এল। তারা সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা হিলাল দেখেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ভেঙ্গে ফেলার এবং পরের দিন ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার আদেশ করলেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৫৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৫৩)

তো এই কাফেলা কতই বা দূর থেকে আসবে যে, ২৯ শে রমযান সন্ধ্যায় হিলাল দেখে পরের দিন (আসরের সময়ই ধরুন) মদীনায় পৌঁছে যাবে? সেদিন হিলাল দেখার পর থেকে তারা যদি বিরামহীন লাগাতার উটের পিঠে সফর করে থাকে, তাহলে বেশির চেয়ে বেশি পঁচিশ মাইল, আরো বাড়ালে ত্রিশ মাইল দূর থেকেই হয়তো এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

হাদীসের কিতাবসমূহে একটু দূরবর্তী এলাকা থেকে আগত সাক্ষ্য গ্রহণ করার এই একটি ঘটনাই আছে যাকে মূলত দূর বলা যায় না। ফিকহের ভাষায় এটা 'বিলাদে মুতাকারিবা'র সংজ্ঞায় পড়ে। অপরদিকে সহীহ মুসলিমে এবং সহীহ ইবনে খুযায়মাসহ হাদীসের অন্যান্য অনেক কিতাবে

সহীহ সনদে কুরাইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনাকৃত প্রসিদ্ধ হাদীসটি আছে। এই হাদীসে এসেছে যে, দামেস্কে, যা তখন দারুল খিলাফাহ ছিল, সেখানে স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একদিন আগে রমযান শুরু হওয়ার সংবাদ আসলেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু সেদিকে দৃষ্টিপাত করেননি। তিনি বলেছেন, আমরা তো শনিবার সন্ধ্যায় হিলাল দেখেছি। এইজন্য আমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করব। তবে নিজেরা যদি হিলাল দেখি সেটা ভিন্ন কথা। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, মুআবিয়া রাযিআল্লাহু আনহুর হিলাল দেখা এবং রোযা রাখা কি আপনি যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না, আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই আদেশ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা গেল, অনেক দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে হিলাল দেখার সংবাদ আসলে সেটা ভিন্ন মাসআলা। হিলাল দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করার প্রসঙ্গে এক হাদীসের বর্ণনাকারী স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু। এরপরও তিনি এ কথা বলছেন, তাহলে বুঝা গেল ভিন্ন এলাকার হিলালের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করা বিষয়ে দূর ও নিকটের পার্থক্য আছে।[5]

দূর ও নিকটের পার্থক্য যদিও কতিপয় ফকীহ গ্রাহ্য করেননি, কিন্তু কোনো ফকীহ, মুজতাহিদ এই ফতোয়া দেননি যে, দূর-দূরান্তের অঞ্চল থেকে হিলাল দেখার সাক্ষ্য সংগ্রহ করে সব এলাকার জন্য সেই হিলালের বিধান বাস্তবায়ন করা জরুরি। হিলাল দেখার সাক্ষ্য গ্রহণের সমস্ত হাদীসের মর্ম ও আবেদনও এ কথার সমর্থন করে না। কেননা এসব হাদীসের প্রেক্ষাপট হল, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হিলাল দেখার জন্য অথবা হিলাল দেখার সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য কোনো প্রতিনিধি দলকে এদিক সেদিক পাঠানো হয়নি। যদি রোযা ও ঈদের তারিখের ক্ষেত্রে ঐক্য সৃষ্টি করা জরুরি হত তাহলে অবশ্যই এটা করা হত।

ঐ যামানায় কি প্রচার-ব্যবস্থা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিলকুল ছিল না?

এর জবাবে এই কথা যেন না বলা হয় যে, ঐ যামানায় তো যোগাযোগের

উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। এই সীমাবদ্ধতার কারণে বাধ্য হয়ে তারা নিজ নিজ এলাকার হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করত। নয়তো তাদেরও জানা ছিল যে, কুরআন-হাদীসে এক হিলাল এবং প্রথম হিলালের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা এবং একই সাথে অন্যান্য চান্দ্রমাস শুরু করার হুকুম দেওয়া হয়েছে!

এ কথা এ জন্য যথাযথ হবে না যে, প্রচারব্যবস্থা ইসলামের শুরুর যুগ থেকে সব যুগে কমবেশি ছিল। প্রত্যেক যুগেই তার পূর্ববর্তী যুগ থেকে উন্নত থেকে উন্নততর ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রশ্ন হল, প্রত্যেক যুগের দায়িত্বশীল ও আলিমগণ এবং পীর ও মাশায়েখ কি নিজ নিজ সময়ের প্রচারব্যবস্থাকে সম্ভাব্য পর্যায় পর্যন্ত এই কাজে লাগিয়েছেন? উত্তর যদি না-বাচক হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা করুন- আপনাদের দৃষ্টিতে তো এটা কুরআন-হাদীসের বিধান। আর ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের কথা মতে এটা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান, তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকগণ, যারা নবীগণের ওয়ারিস তারা কীভাবে অবহেলা-উদাসীনতা প্রদর্শন করতে পারেন?

ঐ যামানায় প্রচলিত প্রচারমাধ্যম এবং যোগাযোগমাধ্যমগুলোর মধ্যে আমরা শুধু নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা করতে চাই :

১. দূত পাঠানো

২. হাতে হাতে চিঠি পাঠানো

এখানে এই আপত্তির সুযোগ নেই যে, ২৯ শে শাবান সন্ধ্যায় হিলাল দেখে পরের দিন সকালে রোযা রাখার সংবাদ এবং ২৯ শে রমযান সন্ধ্যায় হিলাল দেখে পরের দিন ঈদ করার সংবাদ দূত মাধ্যমে বা হাতে হাতে চিঠির মাধ্যমে কত দূর আর পৌঁছানো সম্ভব?

চতুর্র্দিকে দশ মাইল পর্যন্তও যদি পৌঁছানো যায় তবু সেটা কম কীসে? এইটুকু অঞ্চলের বাসিন্দারা অন্তত প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করা থেকে মাহরূম থাকতো না। এরপরে বিষয় তো শুধু হিলাল দেখার সংবাদ রাতের মধ্যেই পৌঁছানো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। যদি পহেলা

শাওয়াল আছর পর্যন্তও সংবাদ পৌঁছে যায়, তবুও তো সবাই ঈদের দিন রোযা রাখার গুনাহ থেকে বেঁচে যেত। আর পরের দিন ঈদের নামায পড়ে নিত। এমনিভাবে দূর-দূরান্তে ২৭ শে রমযান পর্যন্তও যদি খবর পৌঁছে যায় তাহলে তো সবাই সঠিক ২৯ তারিখ নির্ধারণ করতে পারবে। একটি রোযা কাযা করতে হবে, তা জানতে পারবে। পঁচিশ রমযানে খবর পৌঁছলে তো সঠিক ২৭-এর রাতও নির্ধারণ করতে পারবে। আর ঈদুল আযহা, কুরবানী, তাকবীরে তাশরীক ও শবে বরাত এসব তারিখের ক্ষেত্রে তো দূত এবং চিঠির ব্যবস্থা শত শত মাইল পর্যন্ত কাজে আসতে পারতো।

৩. ডাকযোগে পাঠানো

ডাকের ব্যবস্থা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহুর যামানায়ও ছিল। পরবর্তীতে এই ব্যবস্থা অনেক উন্নতি করেছে। খেলাফতে বনু উমাইয়া এবং খেলাফতে আব্বাসিয়ার সময়ে তো এই ব্যবস্থা অনেক অনেক উন্নতি করেছে। আরবে 'ঘোড়ার ডাক' অনেক প্রাচীন। ডাকপিয়ন সাধারণ মুসাফিরদের মত সফর করতো না যে, দিনে চলত আর রাতে বিশ্রাম নিত। বরং ডাকপিয়নের রাতদিন লাগাতার সফর করতে হত। কয়েক মাইল পর পর তাজাদম ঘোড়া প্রস্তুত থাকত। যেন ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ডাক পৌঁছতে বিলম্ব না হয়ে যায়। এভাবে অনেক দীর্ঘ পথও ডাকপিয়ন সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করে ফেলতো। ডাকের কথা সহীহ বুখারীতেও এসেছে। কুফার ডাকঘরে আবু মূসা আশআরী রাহ.-এর নামায আদায় করার বিবরণ সহীহ বুখারীতে (ফাতহুল বারীর নুসখা, খ. ১, পৃ. ৪০০, কিতাবুল উযু, অধ্যায় ৬৬ أبواب الإبل و الدواب و الغنم و مرابضها) এসেছে। আবু মূসা আশআরী রাযিআল্লাহু আনহু খেলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগে কুফার গভর্নর ছিলেন। (ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ৪০১)

আরবে ডাকব্যবস্থা প্রাচীনকালে কত উন্নত ছিল সে বিষয়ের আলোচনা الطائر الغريد في وصف البريد নামক কিতাবে দেখা যেতে পারে। নুমান আফেন্দীর ডাকের ইতিহাসের উপর লিখিত এই চমৎকার ও অনবদ্য গ্রন্থটি মিসরের المقتطف প্রেস থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে আগের কালে প্রচলিত 'আকাশ-ডাকে'র এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকার 'পায়রার ডাক'সহ অন্যান্য প্রকারের বিষয়েও আলোচনা আছে।

আরো দেখুন ‘আততারাতীবুল ইদারিয়্যা’, আব্দুল হাই কাত্তানী রাহ. (খ. ১ পৃ. ১৯১-১৯৪)

এরপর যখন চীন পারস্য এবং সিন্ধু ও হিন্দুস্তানসহ অন্যান্য অগ্রসর দেশসমূহও ইসলামের বিজিত অঞ্চলের অধীনে এসে গেছে তখন তো সেখানকার যোগাযোগ মাধ্যমও মুসলিম উম্মাহর ব্যবহারে চলে এসেছে।

দু’টি নমুনা

ঐতিহাসিক তাকীউদ্দীন মাকরিযী রাহ. (৮৪৫হি.)-এর ‘আলমাওয়ায়েজ ওয়াল ই‘তিবার’ খ. ১, পৃ. ৩২২) কিতাবে ইতিহাসের সেই সোনালি অধ্যায়টিরও উল্লেখ আছে যে, ২৬১ হিজরীতে আফ্রিকায় যে সময় ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আলআগলাবের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল তখন তিনি সমুদ্রতীরে ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাইল পর পর দূর্গ ও চৌকি স্থাপন করেন। তার কালে পথ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। ঐ সময় দূর্গে দূর্গে আগুন প্রজ্বলিত করার মাধ্যমে সাবতা থেকে ইস্কান্দরিয়া পর্যন্ত এক রাতেই সংবাদ পৌঁছে যেত। অথচ সাবতা আর ইস্কান্দারিয়ার মাঝে চার হাজার দুইশ ঊনআশি কিলোমিটারের দূরত্ব। বর্তমানে বাসেই ঊনসত্তর ঘণ্টার পথ।

এমনিভাবে ইস্কান্দরিয়া থেকে তারাবলুসে রাতে কয়েক ঘণ্টায় খবর পৌঁছে যেত। উভয় শহরের মাঝে দূরত্ব মোট আঠার শত বিরাশী কিলোমিটার। এটা হল মুরাবিতীনের শাসন আমলের ঘটনা। দেখুন আবু মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ বিন আলী আততামীমী আলমারাকেশী (৫৮১-৬৪৭)-এর কিতাব ‘আলমুজিব ফি তালখীসী আখবারিল মাগারিব’, পৃ. ২৫০

প্রশ্ন হল, আমাদের পূর্বসূরীদের যুগে, বিশেষত সোনালী তিন যুগে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় আদান-প্রদানের জন্য কোনো মাধ্যম কি ব্যবহার করা হয়েছিল? উত্তর যদি না-বাচক হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ কী? দ্বীনের বিষয়ে তারা শিথিলতা করতেন বলে কেউ যদি অপবাদ দেয়, সে তো নিজেই নিজের ঈমান বরবাদ করবে, আখেরাত নষ্ট করবে। তাহলে এটা মেনে নেওয়া ছাড়া কি কোনো উপায়

আছে যে, আসলে ইসলাম যেহেতু মানব-স্বভাবের অনুকূল ধর্ম, এতে সবক্ষেত্রে সব যুগের এবং সব এলাকার মানুষের সহজতার দিক লক্ষ্য করা হয়েছে। তাই ইসলামী শরীয়তে এই হুকুম দেওয়াই হয়নি যে, হোক না হোক বিশ্বব্যাপী সমস্ত মানুষ যেন তাদের চান্দ্রমাস একই দিনে শুরু করে! একই দিনে রোযা ও ঈদ করে! সেই জন্যই তো ইসলামের সাড়ে চৌদ্দশত বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর একটাও নযীর পাওয়া যায় না। এর নযীর তো পাওয়া যায়ই না, যা পাওয়া যায় তা হল, খেলাফতে রাশেদার যুগে খেলাফতের অধীন সমস্ত এলাকায় এটা লিখে পাঠানো হয়েছে যে, তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ। হিলাল দেখেই রোযা শেষ কর। এই প্রসঙ্গে হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানদের নিকট যে পত্র লিখতেন তা খতীব বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উদ্ধৃতিতে ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি 'শরহুল মুহাযযাব' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (খ. ৭ পৃ. ৬৪৯-৬৫০) আরেকটি ফরমান মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতেও আছে। এই প্রসঙ্গে শা'বানের শেষে সালাফের খুতবা ও বক্তৃতা দেখা যেতে পারে। কেউ মদীনায় বলছেন صوموا لرؤيته, কেউ দামেশকে বলছেন صوموا لرؤيته। প্রতিটি খুতবাতে একই কথা যে, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ। হিলাল দেখে রোযা ছাড়। এসবের নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী অর্থ কি এই নয় যে, তারা এবং তাদের শ্রোতারা এই হাদীস থেকে নিজ নিজ এলাকার হিলাল দেখার অর্থই বুঝেছেন!

নব উদ্ভাবিত এই প্রস্তাব সামনে আসার পর আলিমগণ কী বলেছেন?

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে চলে আসা এখনও পর্যন্ত বহাল ও বলবৎ এই সুন্নতে মুতাওয়ারাসার বিপরীতে যখন কতিপয় যুক্তিবাদী লোকের পক্ষ থেকে তথাকথিত ঐক্যের আওয়াজ উঠল তখন আহলে হক আলিমগণ যথাসময়ে এর প্রতিবাদ করেছেন এবং তাদের উত্থাপিত যুক্তিসমূহের বাস্তবতা উন্মোচন করে দিয়েছেন।

১. ইবনে আব্দুর রাযযাক রাহ.

هل يمكن اتحاد الشمال الأفريقي مواسم وأعيادا

(গোটা উত্তর আফ্রিকায় একই দিনে ঈদ করা কি সম্ভব?) এবং

هل يمكن توحيد الأعياد الدينية في الأقطار الإسلامية

(গোটা মুসলিম বিশ্বে দ্বীনী পর্বসমূহের তারিখের ক্ষেত্রে ঐক্য সৃষ্টি করা কি সম্ভব?) প্রথম শিরোনামে যখন আলমাগরিব পত্রিকায় ৫ম সংখ্যা ১০ মুহাররম ১৩৬৩ হি. মোতাবেক ৭ জানুয়ারি ১৯৪৪ ঈ.-এ এবং দ্বিতীয় শিরোনামে আলইলম পত্রিকায় ৫২তম সংখ্যা ১৫ই যিলহজ্ব ১৩৫৫ হি. মোতাবেক ১০ নভেম্বর ১৯৪৬ ঈ. দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল তখন এর বিস্তারিত খণ্ডন লিখেছেন মরক্কোর বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুর রাযযাক (১৯০৬-২০১১ঈ.)। যা তার কিতাব العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال -এ যুক্ত আছে। (পৃষ্ঠা : ১৭৪-২০৭) এই কিতাব কাতারের ধর্মমন্ত্রণালয় থেকে বড় বড় দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮৩৪, রচনাকাল : মুহাররম ১৩৬৭ হি. মুতাবেক ডিসেম্বর ১৯৪৭ঈ.

العذب الزلال -এর উপর অনেক বড় বড় মণীষী আলিমগণের অভিমত আছে। যা কিতাবের শেষে ছাপা হয়েছে।

২. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, হারামুল মাক্কীর সাবেক ইমাম

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ রাহ.-ও এ মতবাদকে তার কিতাব <تبيان الأدلة في إثبات الأهلة> -এ প্রমাণিক খ-ন করেছেন। শায়েখের এ কিতাবের উর্দূ তরজমা ‘আলফুরকান’ পত্রিকায় –যা মাসলাকে দেওবন্দের মূখপত্র– প্রকাশিত হয়েছে। এমনিভাবে উলামায়ে আহলে হাদীসও পাকিস্তানে এ কিতাবের উর্দূ তরজমা প্রকাশ করেছেন।

৩. রাবেতার ফিকহ একাডেমী

পরে যখন কিছু লোকের পক্ষ থেকে আবার একই তাকাযা পেশ করা হয়, তখন রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (ফিকহ একাডেমী, মক্কা মুকাররমা) এর খ-ন করে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে :

لا حاجة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاة في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم.

মুসলিম জাহানে হিলাল ও ঈদ এক করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তা মুসলিমদের ঐক্য নিশ্চিত করবে না যেমনটা হিলাল ও ঈদ এক করার অনেক প্রস্তাবকের ধারণা। হিলাল প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি ইসলামী দেশগুলোর কাযা ও ফতোয়া বিভাগগুলোর উপর ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। কারণ এটিই ইসলামের সাধারণ কল্যাণ বিবেচনায় অধিকতর উত্তম ও উপযোগী।

আর যে বিষয়টি উম্মাহর ঐক্য নিশ্চিত করবে তা হচ্ছে, সকল বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার বিষয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া।'' (কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, পৃষ্ঠা : ৮৭-৮৯)

রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর 'আলমাজমাউল ফিকহী'-এর ঐ অধিবেশনে, যাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পুরো বিশ্বের এবং সকল মাযহাবের বড় বড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্তে স্বাক্ষরকারীদের নাম আমরা আলকাউসার শাওয়াল ১৪৩৪ হি. (আগস্ট ২০১৩ঈ.) সংখ্যায় পড়েছি।

৪. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৩১১-১৩৮৯ হি.) যিনি শায়খ বিন বায রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আগে সৌদিআরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রবিউল আউয়াল ১৩৭৭ হিজরীতে জামিয়াতুদ দুয়ালিল আরাবিয়্যার পক্ষ থেকে তার সামনে 'তাওহীদুল আহিল্লার' (হিলাল এক করা) বিষয়ে সেমিনারের প্রস্তাব পেশ করা হয়, তখন তিনি এতে সম্মত হননি।

তাঁর উত্তরের সারকথা হল, এটি এমন কোনো বিষয় নয়, যার জন্য সেমিনার ডাকা কাম্য। এটা তো একটা শাখাগত মাসআলা। صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته শীর্ষক হাদীসের মধ্যেই এর ফায়সালা আছে। এই হাদীসের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য হয়েছে (এক অঞ্চলের হিলাল দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যগ্রহণীয় কি না) সেটা অন্যান্য শাখাগত মতপার্থক্যের মতই। এই মতপার্থক্যে কোনো ক্ষতি নেই।

আসল কথা তো হল, গোটা উম্মত তাওহীদে উলূহিয়্যাত এবং তাওহীদে রুবূবিয়্যাতের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে একমাত্র সিদ্ধান্তদানকারী হিসেবে গ্রহণে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। মজলিস তো এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য হওয়া উচিত।

সুতরাং রোযা ও ঈদের হিলালের বিষয়ে (তাওহীদুল আহিল্লাহর প্রস্তাব) উক্ত মজলিসের সাথে একমত নই। আমার দৃষ্টিতে এ জন্য মজলিসের প্রয়োজন নেই, মুসলিম উম্মাহ সুদীর্ঘ চৌদ্দ শতাব্দী অতিবাহিত করল, রোযা ও ঈদের মধ্যে তারিখের পার্থক্য ছিল, কিন্তু তারা একে ক্ষতিকর মনে করেননি। আর না তারা এর জন্য সেমিনার আহ্বান করার প্রয়োজন বোধ করেছেন! (ফতোয়া ওয়া রাসাইলি সামাহাতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শায়খ, খ. ৪, পৃ. ১৫৫-১৫৮, ফতোয়া নাম্বার : ১০৯৬)

এই বিষয়ে রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহ একাডেমীর বিবৃতি একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সৌদি আরবের হাইয়াতু কিবারিল উলামার সুপারিশ আমরা আলকাউসার শাওয়াল ১৪৩৪ হি. (আগস্ট ২০১৩ঈ.) সংখ্যায় পড়েছি।

৫. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ.

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. এই বিষয়ে যে সারৎসার ও অনবদ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা তাঁর পুস্তিকা ‘রুইয়াতে হিলালে’র পৃষ্ঠা : ১১-১২, ৩২-৩৭ -এ বিদ্যমান আছে। যার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসূফ বিন্নুরী রাহ.

হযরত রাহ.-এর তিরমিযীর শরাহ ‘মাআরেফুস সুনান’ দেখা যেতে পারে। তিনি সেখানে ‘তাওহীদুল আহিল্লা’র মতকে শরীয়তের মেযাজের খেলাফ বলেছেন।

৭. মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী রাহ.

মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী রাহ. মাওলানা ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ ব্যক্তিত্ব। যে বন্ধুরা সবসময় বুদ্ধির কথা বলেন, তাদের তো তাঁর কথার প্রতি মান্যতা থাকা চাই। বিশ্বব্যাপী নয়, শুধু ভারতব্যাপী একই তারিখে রোযা ও ঈদের জবরদস্তি করার উপর তিনি কী রকম সমালোচনা করেছেন তা তার তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৩৮-৩৪০ আয়াত (২ :) ১৮৫ এ দেখা যেতে পারে। এই কিতাবের উর্দূ ও ইংরেজী উভয় সংস্করণই হাতের নাগালে পাওয়া যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এর বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

৮. মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী রাহ.

আহলে হাদীস ঘরানার বড় আলেম, মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী রাহ. (১৯২৩-১৯৯৫ঈ.) তার কিতাব الشمس والقمر بحسبان (اسلام کا نظام

(فلكيات -এর পঞ্চম অধ্যায়ে (উদয়স্থলের বিভিন্নতা এবং ইসলামী পর্ব-উৎসবে ঐক্যের প্রচেষ্টা) শিরোনামে তিনি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি লেখেন–

'...হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহুর মত চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব, যিনি জনসাধারণের সহজতার জন্য অসংখ্য নীতি ও ব্যবস্থার উদ্ভাবক বলে স্বীকৃত। তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুন্দর ও সঠিকভাবে শাসন করেছেন। তিনি যদি ভালো মনে করতেন তাহলে কি মুসলমানদের এই ঐক্যের জন্য ব্যবস্থা না নিয়ে পারতেন? তিনি তো কথায় কথায় মজলিসে শূরা ডেকে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত জারী করতেন কিন্তু কখনোই ঈদ বা রমযানের ঐক্যের মাসআলা তাঁর আলোচনায় আসেনি! ঐ স্বর্ণযুগে যদি এর কোনো নযীর না পাওয়া যায়, তাহলে এখন অনেক বছর পরে এসে এ বিষয়ে কেন এত চাপাচাপি?

ইসলামের দুই ঈদ, ইবাদত এবং শোকরের নামায আদায়। ইসলামে ঈদ উৎসব পালনের জন্য নয়। তাই ঈদের ক্ষেত্রে ঈদের নামায (ফিতরা ও কুরবানী) ছাড়া আর কোনো বিধান ইসলামে দেওয়া হয়নি।

মুসলিম ঐক্যের জন্য ইসলাম যে বিষয়গুলোর তাকীদ করেছে সেগুলোর মধ্যে হল, দলীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেঁচে থাকা। ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করা, যাকাত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, হজ্বের সম্মিলন ইত্যাদিসহ আরো বিষয়। এসব বিষয়ে তো মুসলমানদের কোনো মনোযোগ নেই। শুধু অন্যান্য ধর্মের দেখাদেখি ধর্মীয় আবেগের সর্বোচ্চ সীমা কেবল উৎসব উদযাপন– ঈদ ও অন্যান্য পর্বের তারিখ এক করার আওয়াজ তোলা। বস্তুত ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতার প্রকাশ যে, মানুষ জরুরি বিষয়গুলোর দিকে নযর দেয় না। নিজের সমস্ত শক্তি অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক কাজে ব্যয় করে। (ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত, মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পৃষ্ঠা: ৭৯)

৯. হাফেজ সালাহুদ্দীন ইউসুফ

আহলে হাদীস ঘরানার আরেকজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব হাফেজ সালাহুদ্দীন ইউসুফ তাঁর কিতাব مسألۂ رؤیت ہلال اور بارہ اسلامی مہینے -এর মধ্যে বিশদ আলোচনা শেষে সারসংক্ষেপে লেখেন– ‘মুসলিম বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালন করা, রমযান ও অন্যান্য মাস একই দিনে সূচনার যে মতবাদ, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও দলীলবিহীন। সৌদিআরবের হিলাল দেখাকেও এক্ষেত্রে ভিত্তি বানানো যাবে না।’ (পৃষ্ঠা: ১৫৩, দারুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল)

১০. পীর করম শাহ আজহারী

তিনি তার তাফসীরগ্রন্থ ‘যিয়াউল কুরআন’ খ. ১ পৃ. ১২৫-এ লেখেন–

কারণ, উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি স্বীকৃত বিষয়। এ কারণে ফকীহগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যদি দূর-দূরান্তের অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায় তাহলে তা ধর্তব্য হবে না।

إن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره. (قرطبي)

(প্রকাশক যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, গঞ্জ বখশ রোড লাহোর, মুদ্রণকাল: ১৯৯৫ ঈ.)

১১. ড. ইউসূফ আলকারযাভী

আল্লামা ড. ইউসুফ কারযাভী রাহ. প্রথমে যা কিছুই লিখে থাকুন সম্প্রতি ২০১৬ ঈ. ইস্তাম্বুলে হিজরী ক্যালেন্ডারের উপর যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই যে, গোটা দুনিয়ায় একই দিনে রোযা ও ঈদ করতে হবে।

সেমিনারের পর সাক্ষাৎকারে আরো বলেছেন, মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার

স্থানগত ও সময়গত এত দূরত্ব থাকা অবস্থায় চাঁদসমূহ এক করার চিন্তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। দেখুন:

http://www.huffpostarabi.com/2016/05/30/story_n_10203036.html

মোটকথা, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করার মতবাদ একটি নতুন বিষয়। চার মাযহাবেরই অধিকাংশ আলেম এবং এই উপমহাদেশের দেওবন্দী, বেরলভী ও আহলে হাদীস, সকল ঘরানার অধিকাংশ আলেম একে এক অপ্রয়োজনীয় বরং ভিত্তিহীন প্রচেষ্টা গণ্য করেছেন। আর এ প্রয়াসকে বিশেষ কোনো সওয়াবের কাজ মনে করা হলে তা বিদআত হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বীনের ইলম এবং শরীয়তের রুচি-প্রকৃতি সম্পর্কে বেখবর থাকার কারণে যারা একে ফরয বা ওয়াজিব বলতে চান, তারা তো বুঝে অথবা না বুঝে শরীয়তের বিকৃতিতে লিপ্ত।

প্রকাশ থাকে যে, যারা একই দিনে রোযা ও ঈদকে ফরয বা ওয়াজিব বলার প্রবক্তা, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর (জিদ্দা ফিকহ একাডেমী) সুপারিশে তাদের এই মতের পক্ষে কোনো দলীল নেই।

জ্যোতির্বিদগণ কী বলেন?

তাদের উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে আপত্তি হল, 'আলিমরা বিজ্ঞান জানে না, জ্যোতির্বিজ্ঞান বুঝে না। এজন্যই মুসলিম জাতি আজ অধঃপতনের শিকার। আলিমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান না জানার কারণেই রোযা ও ঈদের ঐক্যের বিরোধী'! কিন্তু তাদের এই আপত্তির বাস্তবতা আজও আমাদের বুঝে আসে না! ধরে নিন, একজন মৌলবী সাহেবও জ্যোতির্বিজ্ঞান জানে না, কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা তো জানেন। (যদিও আফসোসের কথা হল, একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের দেশে এস্ট্রোনমির গবেষণার কাজ ইঞ্জিনিয়ারদেরকেই করতে হচ্ছে। দেশে আমাদের জানা মতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই এস্ট্রোনমি বিভাগ নেই।) কিন্তু এরা জ্যোতির্বিজ্ঞান জানা সত্ত্বেও কেন বলেন যে,

১. 'চান্দ্রমাস হয়তো ঊনত্রিশ দিন হবে, নয়তো ত্রিশ দিন' অথচ

জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে চান্দ্রমাসের সময়ের মধ্যে ভাংতি আছে।

২. কেন তারা বলেন, 'বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা উচিত', অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে বিশ্বের সব জায়গায় একই দিনে নতুন চাঁদ দেখা অসম্ভব। এ জন্যই জ্যোতির্বিজ্ঞান উদয়স্থলের বিভিন্নতা স্বীকার করে। কারণ এটা একটা বাস্তবতা।

৩. কেন তারা বলেন, 'চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে লুনার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সেই মোতাবেক রোযা ও ঈদ করা উচিত'। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞান এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন থেকে চান্দ্রমাস হিসাব করে। এদিকে ইসলামের শিক্ষা হল, চান্দ্রমাস হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্য সময় থেকে নয়, দেখার মাধ্যমে শুরু হবে। এই জন্য হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত লুনার ক্যালেন্ডার মোতাবেক আমল করলে না ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা মোতাবেক আমল হবে, না জ্যোতির্বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসারে আমল হবে।

মেহেরবানী করে একটু বলুন দেখি, শরীয়ত তো চান্দ্রমাসের হিসাবকে চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের নিকট জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের কোনো ই'তিবার নেই। তাহলে বাস্তবেই যদি আলিমগণ জ্যোতির্বিজ্ঞান না জানেন, এতে এমন কী অন্যায় হয়ে গেল যে, এর কারণে তাঁরা হিলালের সাথে সম্পৃক্ত শরীয়তের বিধান বুঝবেন না?!

যাই হোক এখন আমরা বলতে চাচ্ছি, তারা তো জ্যোতির্বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আলিমগণের সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হচ্ছেন। অথচ আমরা দেখি যে, হিলাল দেখার মাসআলায়ও এবং একই তারিখে রোযা ও ঈদ করার ইস্যুতেও বড় বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলিমগণের সাথেই আছেন।

দ্বীনী বিষয় বিশেষত রোযা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, হজ্ব ও কুরবানী ইত্যাদির ক্ষেত্রে হিলাল দেখার ভিত্তিতেই চান্দ্রমাসের হিসাব হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে নয়।

এখানে আমরা শুধু দরসে নেযামীর পাঠ্যভুক্ত একটি কিতাবের পাঠ উল্লেখ করছি। 'দরসে নেযামী' আমাদের উপমহাদেশের সমস্ত মাদরাসার নেসাবের ভিত্তি। কিতাবটির নাম হল 'শরহে চিগমিনী'। এটি মূসা পাশা বিন মুহাম্মাদ (৮৯৯হি.)-এর রচনা। যা মাহমূদ বিন উমর চিগমিনী রাহ. (৬১৮হি.)-এর কিতাব 'আলমুলাখখাসের' ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এতে আছে–

وأوضح الأوضاع هوالهلال، لكن رؤية الهلال تختلف باختلاف المساكن، كما أشرنا إليه، فلم يلتفت إليها عند أهل الحساب إلا في الأمور الشرعية امتثالا لأمر الشرع.

চাঁদের কলাসমূহের সবচেয়ে সুস্পষ্ট কলা হল, হিলাল। কিন্তু স্থানভেদে হিলাল দেখা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিলালের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। কিন্তু দ্বীনী বিষয়াদিতে শরীয়তের হুকুম তামিল করার জন্য হিলালকে গ্রহণ করেছেন। (শরহু চিগমিনী, পৃষ্ঠা: ১২৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া দেওবন্দ থেকে ১৩৮৭ হি.-এ মুদ্রিত)

তো বুঝা গেল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিজস্ব শাস্ত্রীয় পরিম-লে যদিও এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন থেকে চাঁদের হিসাব শুরু করেন কিন্তু দ্বীনী বিষয়ে যেহেতু শরীয়তের হুকুম মান্য করতে হবে আর শরীয়ত যেহেতু দ্বীনী বিষয়ে হিলাল দেখার উপর ভিত্তি রেখেছে সেহেতু তারা দ্বীনী বিষয়ের ক্ষেত্রে হিলাল দেখারই অনুসরণ করে। নিজস্ব শাস্ত্রের মর্যাদা ও ব্যবহারের ক্ষেত্র শাস্ত্রজ্ঞরা বেশি বুঝেন নাকি ভিন্ন শাস্ত্রের লোকেরা?

এখন বলছিলাম যে, 'আলিমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান বুঝে না'– একে বাহানা বানিয়ে তারা বিশ্বব্যাপী একই তারিখে রোযা ও ঈদ করার প্রচারণা চালাচ্ছেন, তাদের তো খবর নিয়ে দেখা উচিত যে, এই বিষয়ে স্বয়ং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তব্য কী? আমরা এখানে আগের ও পরের এবং বর্তমান সময়ের দু'চারজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতি পেশ করছি :

১. আলবেরুনী (৪৪০হি.=১০৪৮ঈ.)

আলবেরুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিসাব-নির্ভর লুনার ক্যালেন্ডারের

ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালনকারী বাতিল ফিরকা বাতেনী শীয়াদের খ-ন করতে গিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তার সামান্য একটি অংশ এই–

فإذن لا يمكن ما ذكروه من تمام شهر رمضان أبدا ووقوع أوله وآخره في جميع المعمور من الأرض متفقا كما يخرجه الجدول الذي يستعملونه.

অর্থ : এটা সম্ভব নয় যে, রমযান মাস সবসময় ত্রিশ দিনেই হবে এবং এটাও সম্ভব নয় যে, মাসের শুরু ও শেষ সমগ্র বিশ্বে একই তারিখে হবে। যেমনটা তাদের ক্যালেন্ডারে দেওয়া থাকে। ‘আলআসারুল বাকিয়া আনিল কুরূনিল খালিয়া, পৃষ্ঠা : ৬৬

২. ইবনে রুশদ (৫২০-৫৯৫ হি.)

তিনি একইসাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন এবং অনেক বড় ফকীহও ছিলেন। তিনি ইলমুল ফিকহ বিষয়ে তাঁর কিতাব বিদায়াতুল মুজতাহিদ (খ. ১, পৃ. ৩৫৮)-এ লিখেছেন, দূর-দূরান্তের অঞ্চলের ক্ষেত্রে এক এলাকার হিলাল দেখা অন্য এলাকার জন্য ই‘তেবার করা হবে না। তার আরবী বক্তব্য এই–

>وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز<.

তিনি আরো লিখেছেন– ‘দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের এক অঞ্চলের হিলাল দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য ধর্তব্য হওয়া না হওয়ার পার্থক্য করা আকলেরও দাবি।’

তার আরবী পাঠ হল–

والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا.

৩. ডক্টর হুসাইন কামালুদ্দীন (১৩৩২ হি.=১৯১৩ ইং–১৪০৭ হি.=১৯৮৭ ঈ.)

প্রকৌশল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার অবদান অনেক। মিশর ও সৌদিআরবের বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে তিনি এ বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি دورتا الشمس والقمر وتعيين أوائل الشهور العربية باستعمال الحساب নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, তিনি তার এই কিতাবে (পৃষ্ঠা: ২৮-এ) প্রথমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে হিলালের উদয়স্থলের বিভিন্নতার বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি লিখেছেন

>وهكذا بنى الشارع على اختلاف المطالع كثيرا من الأحكام ومن أظهرها مواقيت الصلاة، ولا يجوز توحيد الصوم والأعياد لجميع أهل الأرض<.

‘শরীয়ত উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অনেক আহকামের ভিত্তি বানিয়েছে। তন্মধ্যে সুস্পষ্ট আহকাম হল নামাযের সময়। আর সারা পৃথিবীতে রোযা ও ঈদের ঐক্য জায়েয নয়।

৪. মূসা রূহানী (১৪১৯হি.= ১৯৯৮ঈ.)

শায়খুল হাদীস ও শায়খুত তাফসীর হওয়ার সাথে সাথে প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বড় পারদর্শী ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর চল্লিশের কাছাকাছি ছোট-বড় কিতাব রচনা করেছেন। তিনি তার ‘সায়রুল কামার ওয়া ঈদুল ফিতর’ কিতাবে নিজ নিজ এলাকার হিলাল দেখার বিধানকেই সমর্থন করেছেন আর পরিষ্কার লিখে দিয়েছেন যে, শরীয়তের বিধানের ভিত্তি শরয়ী দলীল, বিজ্ঞানের গবেষণা নয়। তিনি এটাও সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, সৌদিআরবের ঈদ থেকে উপমহাদেশের ঈদ পরে হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও নয়।

৫. ডক্টর ইউসুফ মুরওয়া

Jackson university of Mississippi থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে

ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা ছাড়াও বৃটেন, জার্মানি ও আমেরিকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সসহ সাইন্সের আরো কিছু বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রি অর্জনকারী এবং বিজ্ঞানের জগতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী প্রতিষ্ঠানالجمعية اللبنانية للأبحاث العلمية- এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ড. ইউসুফ মুরওয়া একই দিনে রোযা ও ঈদের মতবাদের পর্যালোচনা ঐ সময়ের আকাবির ওলামা মাশায়েখের খেদমতে পেশ করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন–

‘যেহেতু মুসলিম বিশ্ব মাশাআল্লাহ বেশ বড় সীমানা জুড়ে বিস্তৃত। ইন্দোনেশিয়া থেকে পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত, ১৪২ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ১৮ ডিগ্রি পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই ভৌগোলিকভাবে ইসলামী বিশ্বকে তিনটি জোনে ভাগ করা চাই।

১. ৩০ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ২০ ডিগ্রি পশ্চিম পর্যন্ত যেসব রাষ্ট্র রয়েছে যথা লিবিয়া তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো, মৌরতানিয়া, মালী, চাঁদ, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, বেনীন, ঘানা ইত্যাদি।

২. ৩০ ডিগ্রি পূর্ব এবং ৮০ ডিগ্রি পূর্বের মধ্যবর্তী রাষ্ট্রগুলো। যথা মিশর, সুদান, সোমালিয়া, সৌদিআরব, ইয়েমেন, জর্দান, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত ইরান, তুরস্ক পশ্চিম আফগানিস্তান, পাকিস্তান...।

৩. ৮০ ডিগ্রি পূর্ব এবং ১৪০ ডিগ্রি পূর্বের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহ। যথা বাংলাদেশ, বার্মা, থাইল্যান্ড, চীন মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া।

তিনি লিখেছেন, এই হল তিনটি জোন। এবার কোনো এক জোনে নতুন চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অবশ্যই অবশ্যই অন্য দুই জোনেও তা দর্শনযোগ্য হয়েছে।

তার এই লেখা মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা : ২, খ- : ২, পৃষ্ঠা : ৮৮৭-৮৯০-এ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনাটি তার কিতাব ‘আলউলূমুত তাবয়িয়্যাহ ফীল কুরআনে’ও যুক্ত আছে। (পৃ. ১১-১২)

৬. জামালুদ্দীন আব্দুর রাযযাক

الجمعية المغربية لعلم الفلك-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জামালুদ্দীন আব্দুর রাযযাকের কিতাব التقويم القمري الإسلامي الموحد (একক ইসলামী চান্দ্র ক্যালেন্ডার) ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর রাবাত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি পরিষ্কার লিখেছেন–

لا سبيل إلى التوحيد إذا اعتمدنا رؤية الهلال، حتى مع إقرار الموقف الثالث.

لا سبيل إلى التوحيد إذا اشترطنا أن ساعة الدخول في الشهر، في بلد ما، تأتي بعد إثبات إمكان الرؤية، في مكان ما من العالم، حتى مع إقرار الحساب وإقرار الموقف الثالث. هذه النقطة من الأهمية بمكان>.

যদি হিলাল দেখাকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে (রোযা ও ঈদের তারিখের ক্ষেত্রে) ঐক্য সম্ভব নয়। এমনকি যদি এক্ষেত্রে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতটিকেই অগ্রগণ্য ধরা হয় তবুও সম্ভব নয়; বরং কোনো শহরে মাস শুরু হওয়ার জন্য যদি এই শর্ত যুক্ত করা হয় যে, পুরো বিশ্বের কোথাও না কোথাও হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতা সৃষ্টি হতে হবে। (অন্যথায় মাস শুরু করা যাবে না) তাহলেও ঐক্য সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবকে ভিত্তি বা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতকে গ্রহণ করা হলেও ঐক্য সম্ভব নয়।' (আততাকবীমুল কামারিল ইসলামিয়্যিল মুওয়াহহিদ', জামালুদ্দীন আব্দুর রাযযাক, পৃ. ৫)

এই সুস্পষ্ট বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েও তিনি একক ইসলামিক হিজরী ক্যালেন্ডারের নমুনা পেশ করেছেন। কিন্তু জানা কথা যে, শরীয়তের মানসূস আলাইহি এবং মুজমা আলাইহি বিধান হিলাল দেখার বিধান বাদ দিয়ে এটা গ্রহণ করবে তার বক্তব্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, স্বয়ং বড় বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই শরীয়ত নির্ধারিত ভিত্তি (হিলাল দেখা) বহাল রেখে এবং উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয় মত গ্রহণ করেও বিশ্বব্যাপী ঐক্য অসম্ভব বলেছেন।

৭. ডক্টর মুহাম্মাদ শওকত ঊদাহ

International Astronomical Center ICOP -এর প্রধান, জর্দান আলজামইয়্যাতুল ফালাকিয়্যার হিলাল পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রধান, ও 'আলইত্তিহাদুল আরাবী লিউলূমিল ফিযায়ি ওয়াল ফালাক'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ডক্টর মুহাম্মাদ শওকত ঊদাহ প্রথমে পুরো পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য আলাদা আলাদা লুনার ক্যালেন্ডার তৈরী করেছেন। এটা ২০০১ সনের কথা। পরে তিনি পুরো পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করে একেক অংশের জন্য আলাদা আলাদা ক্যালেন্ডার তৈরী করেন। পরবর্তীতে তিনি আরো চিন্তা গবেষণার পর চূড়ান্তভাবে আরেকটি লুনার ক্যালেন্ডার তৈরী করেছেন। তাতে পুরো পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক অংশের জন্য একটি করে ক্যালেন্ডার তৈরী করেন। এক অংশে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। দ্বিতীয় অংশে অন্য সব মহাদেশ। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে যদি লুনার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি লুনার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমল করা কখনোই সম্ভব হবে না। বিশ্বকে অন্তত দুই ভাগে ভাগ করা জরুরি, তিনি দালীলিক আলোচনা করে তার সিদ্ধান্ত এই ভাষায় পেশ করেছেন–

>ومن هنا برزت الحاجة الضرورية لتقسيم العالم إلى قسمين على الأقل<. (تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لإعداد تقويم هجري عالمي، دكتور محمد شوكت عودة، ص ৮-৯)

উভয় ক্যালেন্ডারে কোনো মাসে তারিখ অভিন্ন আবার কোনো মাসে ভিন্ন। যাই হোক, শওকত ঊদাহ এই ক্যালেন্ডার কোনো মাসআলা হিসেবে পেশ করেননি। তিনি শুধু একটি প্রস্তাব উলামায়ে কেরামের কাছে রেখেছেন।

তার কাছে আমরা একই দিনে রোযা ও ঈদের প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিলাম যে, কিছু লোক এই মতবাদের দাওয়াত দিচ্ছে, এ বিষয়ে আপনারা কী মনে করেন, তিনি উত্তরে লিখেছেন–

>مسألة هل يصوم الناس معا أو لا يصوموا معا فهي مسألة فقهية يجيب عليها الفقهاء وليس نحن الفلكيون، بالنسبة لنا فنحن مجرد حاسبون، نطوع حساباتنا لما

يطلبه ويقره الفقهاء<.

‘সমস্ত মানুষ একই তারিখে রোযা রাখবে, না আলাদা আলাদা রাখবে এটা তো ফিকহী মাসআলা। এর জওয়াব তো উলামায়ে কেরাম দেবেন। আমরা তো হিসাব জানি, ব্যস, ফকীহগণ যেভাবে বলবেন, আমরা সেভাবেই হিসাবের খেদমত পেশ করে দেব।’ এটা তিনি আমাদেরকে ১৫ ই অক্টোবর, ২০১৪ ঈ.-এর চিঠিতে লেখেন।

১৩ই মে ২০১৩ ঈ.-এর পত্রে তিনি এটাও লিখেছেন–

>من الناحية العملية والعلمية لا يمكن توحيد جميع البلاد الإسلامية بناء على رؤية الهلال، فلا يمكن الطلب من سكان أندونسيا وماليزيا والدول الشرقية الانتظار لمعرفة نتيجة تحري الهلال في موريتانيا، ففي هذه الحالة ستشرق الشمس في أندونسيا والناس لا تعرف بعد هل هذا اليوم هو عيد أم لا مثلاً!

فغاية ما يمكن فعله هو توحيد الدول الإسلامية بناء على تقويم هجري مبني على الحسابات الفلكية، أما التوحيد المبني على الرؤية الفعلية فهذا وهم، ولا يمكن تحقيقه<.

‘বাস্তবতার আলোকে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোভাবেই হিলাল দেখার ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বব্যাপী তারিখ এক করা সম্ভব নয়। এটা কীভাবে হতে পারে যে, আমরা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য প্রাচ্যের দেশগুলোর উপর বিধান চাপিয়ে দেব যে, তারা যেন মৌরতানিয়ার চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করে। এমন করতে গেলে তো ইন্দোনেশিয়ায় সূর্যোদয় হয়ে যাবে তখনও তারা জানতে পারবে না যে, আজ ঈদ হবে না, রোযাই রাখতে হবে।

হাঁ, সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা হল, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে প্রণীত একটি হিজরী ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে কেবল মুসলিম বিশ্বে ঐক্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু হিলাল দেখার ভিত্তিতে ঐক্য বাস্তবে অসম্ভব। এটা নিছক কল্পনা। একে বাস্তবের রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।’

তো শরীয়ত যখন হিলাল দেখাকেই ভিত্তি বানিয়েছে, আর পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থাই এরকম যে, হিলাল দেখার ভিত্তিতে অন্তত ইসলামী

বিশ্বেও একই দিনে রোযা ও ঈদ সম্ভব নয়। হাঁ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবকে ভিত্তি বানালে শুধু বর্তমান মুসলিম বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করার কথা ভাবা যায়। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা কখনো সম্ভব নয়। তাহলে কোনো মুসলমান এমন আছে যে, শরয়ী ভিত্তি বাদ দিয়ে একই তারিখে রোযা ও ঈদ করতে যাবে? আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত অনুসরণ উদ্দেশ্য নাকি দিলের খাহেশ পুরা করা?

ডক্টর মুহাম্মদ শওকত ঊদাহ এই বিষয়টি তার প্রবন্ধ 'আলহিলাল বাইনাল হিসাবাতিল ফালাকিয়্যাতি ওয়ার রুইয়াতি'তেও লিখেছেন। তিনি বলেছেন কোনো স্থানের হিলাল দেখা গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য ধর্তব্য হবে কি না এর ফায়সালা উলামায়ে কেরাম করবেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ নয়।

তিনি আরো লিখেন, হিজরী মাসের সূচনা কীভাবে হবে এটা শরীয়তের মাসআলা। এর ফায়সালা করবেন ফকীহগণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ নয়। আর জানা কথা যে, এই বিষয়ে ফকীহগণের ইজমা আছে যে, এই বিষয়ে চাঁদ দেখাই ভিত্তি। অন্য কিছু নয়। দেখুন, তার প্রবন্ধ 'আলহিলাল বাইনাল হিসাবাতিল ফালাকিয়্যাতি ওয়ার রুইয়াতি', পৃ. ৭, ১১ ও ১৩

মুহাম্মদ শওকত ঊদাহ একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কোনো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার নন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাই তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন যে, কোন্ মাসআলা শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত আর কোনটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর এই বাস্তবতার বিষয়ে সুস্পষ্ট জবানবন্দীর পর আপনি ঐ ভাইদের কথার হাকীকত বুঝতে পারবেন, যারা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে যান যে, আলিমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান জানে না। তাই তারা লুনার ক্যালেন্ডারের বিরোধিতা করেন। এই জন্যই তারা একই দিনে বিশ্বব্যাপী রোযা ও ঈদ করার বিপক্ষে। নাউযুবিল্লাহিল আযীম।

এ সকল ভাইয়ের খেদমতে আমরা বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. ইলিয়াসের একটি কথা পেশ করতে পারি যা তিনি Washington Islamic centre কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেটের উপরে মন্তব্য করে বলেছেন। লিফলেটের বক্তব্য ছিল–

".... Many good Muslim leaders call for the unification of Muslim dates on the basis of astronomical findings, especially now that science has advanced so much as to put man on the face of the moon. "

এর উপর মন্তব্য করে ড. ইলিয়াস বলেন,

"... Statements of this nature are common in private discussions that take place every year especially at the time of *Ramadan.* also the mass media, especially newspapers, are full of such comments, mostly from those lacking any appropriate background in astronomy and /or in the Islamic aspects concerned...." (*Astronomy of Islamic Calendar, by: Mohammad Ilyas, page- 60, Published by: A.S. NOORDEEN, Kuala Lumpur, Malaysia, First Published in 1997)*

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ বাস্তবতা উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন এবং সকল প্রকার প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত রাখুন- আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

---

[1] জানি না এ সীমানা নির্ধারণের সূত্র কী? অমুসলিম দেশগুলো তো আল্লাহর জমীনেরই অংশ। এগুলোর উপর তাদের দখলদারিত্ব পুরোটাই জোরপূবর্ক। এগুলোকে কেন বাদ দেওয়া হচ্ছে? তাছাড়া মরক্কোকে কেন মুসলিমদেশগুলোর শেষ সীমানা ধরা হল মৌরতানিয়াও তো মুসলিম দেশ। (আবদুল মালেক)

[2] হানাফী মাযহাবে রমযানের রোযার জন্য সুবহে সাদিকের আগেই নিয়ত করে নেওয়া মুস্তাহাব। আর অন্যান্য মাযহাবে তো এটা রোযা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। সাহরী করা সুন্নত। রমযানের তারাবী প্রথম রাত্রেও সুন্নাতে মুআক্কাদা। অথচ একই দিনে রোযার এই উদ্ভাবিত

পদ্ধতির কারণে এসব আমল হ-য-ব-র-ল হয়ে যায়।

[3] ৩. ১৫ই জ্বিলহজ্ব ১৩৬৫ হি. মোতাবেক ১০ নভেম্বর ১৯৪৬ খৃ., 'আলইলম' পত্রিকার ৫২তম সংখ্যায় এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়-هل يمكن توحيد الأعياد الدينية في الأقطار الإسلامية (মুসলিম বিশ্বে দ্বীনী পর্বসমূহের তারিখের ক্ষেত্রে ঐক্য সৃষ্টি করা সম্ভব?)। তখন শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুর রাযযাক (১৯০৬-২০১১ঈ.) যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং দ্বীনী ইলম, উভয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তার কিতাব العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال (খ. ১, পৃ. ১৮৯-২০৭)-এ উক্ত প্রবন্ধের বিস্তারিত খ-ন লিখেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, যুগ যুগ ধরে অনুসৃত কর্মপন্থাই সঠিক। এ থেকে সরে আসার কোনো অর্থই হয় না।

আমাদের জানা নেই, ১৯৪৬ -এর আগেও কেউ এই ধরনের দাবি করেছেন কি না, কিন্তু আফসোস হল, সময় যতই যাচ্ছে আবেগ-প্রবণ লোকদের বাড়াবাড়ি বেড়ে চলেছে। প্রথমে বলা হয়েছিল, শুধু মুসলিম বিশ্বে একই তারিখে রোযা ও ঈদ কর। এখন বলা হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বেই একই তারিখে কর! আসলে এটাও অসম্ভব ওটাও অসম্ভব!

[4] বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করার থিওরিকে এই হাদীসের উদ্দিষ্ট অর্থ বলে সাব্যস্ত করা হাদীসের সুস্পষ্ট বিকৃতি। উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়ে এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা যেমন কয়েকজন ফকীহ করেছেন- সেটা একটা সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়। হাদীসের পূর্বাপরের সাথে তা পুরোপুরি মিলে না। এটা হাদীসের স্বাভাবিক মর্মের বাইরের একটি বিষয়। এটাকে হাদীসের সরাসরি উদ্দিষ্ট মর্ম সাব্যস্ত করা আপত্তিজনক। সৌদিআরবের সাবেক সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীমও এই হাদীস থেকে উক্ত বিষয়ে দলীল প্রদানের উত্তর দিয়েছেন। দেখুন, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলি সামাহাতিশ শায়েখ

মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, খ. ৪, পৃ. ১৫৫, ফতোয়া : ১০৯৫।

[5] কুরাইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণিত হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ। মুহাদ্দিসগণ একে সহীহ বলেছেন এবং এর মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন এবং বড় বড় ফকীহগণও এই হাদীস দিয়ে দলীল দিয়েছেন। এর উপর মাসআলার ভিত্তি রেখেছেন।

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

আগস্ট ২০১৩ , শাওয়াল ১৪৩৪

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

ভূমিকা

সম্প্রতি আমাদের দেশে কিছু বন্ধুকে দেখা যাচ্ছে, একদিকে তারা সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু এবং একই দিনে ঈদ ও কুরবানীর বিষয়ে সোচ্চার-তারা একে মনে করেন শরীয়তের ফরজ এবং উম্মাহর একতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ- অন্যদিকে তারাই নিজেদের রোযা শুরু করেন স্বদেশবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ঈদও পালন করেন বিচ্ছিন্ন হয়েই। যেন কল্পিত ঐক্যের নামে বাস্তব অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা!

তাদের কেউ কেউ তো এতই সোচ্চার যে, যথানিয়মে 'আলিম' না হয়েও এ বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রস্ত্তত করে ফেলেছেন, তাদের কেউ মেজর, কেউ কেউ ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার আর কেউ হাফেয ইত্যাদি পদবীর অধিকারী।

দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্ধুরা আমার কাছে ঐসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

পাঠাতে থাকেন এবং সেগুলোর পর্যালোচনারও অনুরোধ করেন। মাসিক আলকাউসারের প্রকাশনা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে আলকাউসারে এ বিষয়ে লেখার অব্যাহত অনুরোধ রয়েছে। এরপরও বিভিন্ন কারণে বিষয়টি স্থগিত রেখেছিলাম। প্রায় এক বছর আগে আমার এক মুরব্বি আমাকে এ বিষয়ে লিখতে বলেছেন, যাঁর আদেশ পালন আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। এদিকে গত বছর, ১৪৩৩ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে, 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী' মক্কা মুকাররমা এ বিষয়ে 'আলমাজমাউল ফিকহী'-এর একটি অধিবেশন আহবান করেছিল, যাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা পাঠকের সামনে উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। এসব কারণে আল্লাহর উপর ভরসা করে এ প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা একে উপকারী বানান এবং কবুল ও মকবুল করুন। আমীন।

এরা আসলে কী বলেন

একই দিনে রোযা শুরু করা এবং একই দিনে ঈদ করার বিষয়টি আমি বলি না, শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব বা না-জায়েয। বরং পুরা বিশ্বজুড়ে না হলেও বাস্তবতার নিরিখে যতটুকু এলাকা নিয়ে একই তারিখে রোযা শুরু করা ও ঈদ করা যায়- যদি তা শরীয়তের বিধানগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে কিছুসংখ্যক আহলে ইলমের মতে তা জায়েয। তবে এ ধরনের পদক্ষেপ কতটা যুক্তিযুক্ত এবং কতটুকু উপকারী হবে আর তা কতখানি বিশৃঙ্খলামুক্ত হবে সেটি একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু আমাদের ঐ গবেষক বন্ধুদের বক্তব্য অন্য কিছু। তারা বলতে চান, সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করা এবং একই দিনে ঈদ করা ফরয। অন্যথায়-তাদের মতে- এক দুটি ফরয রোযা ছুটে যাবে, যার কারণে ষাটটি করে রোযা কাফফারা হিসেবে আসবে। কিংবা ঈদের দিন রোযা রাখা হবে, যা হারাম। তদ্রূপ আশুরার রোযা,

আরাফার রোযা, কুরবানী সব ভুল হবে। শবে কদর, শবে বরাত ইত্যাদি সব কিছু ভেস্তে যাবে। সবশেষে এ কারণে উম্মাহর ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হবে। তাদের মতে একইদিনে ঈদ করা ছাড়া উম্মাহর ঐক্যের কোনো উপায় নেই।

তাদের দাবি এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদা আলাদা হেলাল কমিটি হওয়া এবং প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসী নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসারে রমযান ও ঈদের ফয়সালা করা জায়েয নয়। মুসলিম জাহানে যেখানেই এটা হচ্ছে ভুল ও নাজায়েয হচ্ছে। তাই এই গবেষক বন্ধুরা নিজ দেশে আলিম-ওলামা ও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরবের চাঁদ দেখার ফয়সালা অনুসারে বা নিজেদের হিসাব অনুযায়ী তারিখ নির্ধারণ করে রোযা শুরু করেন ও ঈদ করেন। এরপর কোথায় এরা নিজেদের এই বিচ্ছিন্নতার জন্য সংকুচিত হবেন, উল্টো উলামা-মাশায়েখ ও তাঁদের অনুসারীদের উপরই হারামে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন!

এরা যা বলতে চান, আমার জানা মতে, দুনিয়ার কোনো দায়িত্বশীল বিজ্ঞ আলিম তা বলেননি। আর না শরীয়তের নীতি ও বিধানের বিষয়ে অবগত কেউ তা বলতে পারেন।

একই দিনে ঈদ ঐক্যের জন্য?

ঐ বন্ধুরা আরো বলেন, ঈদ একই দিনে না হওয়ার কারণে ঈদ ও রোযার বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে ইখতিলাফ দেখা দেয়; একই দিন কেউ রোযাদার, কেউ ঈদ উদযাপনরত; বরং অমুসলিম দেশগুলোতে কখনো কখনো একই শহরের মুসলমানদের মাঝে ঈদ উদযাপনে তিন দিনের পার্থক্যও হয়ে যায়। রোযা ও ঈদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে এ ধরনের ইখতিলাফ কোনো অবস্থাতেই বরদাশত করা যায় না। একই দিনে রোযা ও এসকসাথে ঈদ ছাড়া এই ইখতিলাফ দূর হওয়া অসম্ভব।

তারা আরও বলেন, এই ইখতিলাফ এজন্যও দূর করা প্রয়োজন যে,

এর দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়, পরস্পর ঝগড়া-বিবাদের দরজা খোলে। কখনো কখনো একদল অন্যদলের নিন্দা-সমালোচনায় লিপ্ত হয়, কটাক্ষ-কটূক্তি পর্যন্ত করতে থাকে। এসব বিষয় দ্বারা মুসলমানদের ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় রোযা ও ঈদ একই দিনে করা।

ঐ সকল বন্ধু (বা তাদের অনেকেই) এ কথাও জোরেশোরে বলেন যে, অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেরা সারা বিশ্বে নিজেদের উৎসব একই দিনে উদযাপন করেন। কাজেই আমাদেরও কর্তব্য সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ করা।

যারা গোটা দুনিয়ায় একই দিন ঈদ পালনকে ফরয মনে করেন তাদের কেউ কেউ 'ইখতিলাফুল মাতালি' (উদয়স্থলের বিভিন্নতা) বিবেচ্য হওয়া, না হওয়ার মুখতালাফ ফীহ্ (মতভেদপূর্ণ) মাসআলাটি সঠিকভাবে না বোঝার কারণে এমনটা বলেন, তবে তাদের অধিকাংশের নিকটে একই দিনে রোযা ও ঈদ করার সবচেয়ে বড় 'দলীল' দুটি :

১. ঈদ উদযাপনে ইখতিলাফ ও পরস্পর বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা যাতে দূর হয়।

২. মুসলমানের ঈদ অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উৎসবের মতো হয়।

ইসলামী ঈদ তথাকথিত 'উৎসব' নয়

প্রথমে তাদের দ্বিতীয় দলীল সম্পর্কে চিন্তা করুন। ইলমে ওহীর আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জানা আছে যে, ইসলামী ঈদ তার স্বরূপ ও মর্যাদা এবং প্রকৃতি ও পদ্ধতি সকল বিষয়ে অন্যান্য জাতির পর্ব-উৎসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের সংস্কৃতি হলো আসসুন্নাতুন নববিয়া, আর তাদের সংস্কৃতি তাদের নিজেদের বা তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্ভাবিত। দুই সংস্কৃতি মূলেই আলাদা। আমাদেরকে তো দুই ঈদ দেয়াই হয়েছে অন্যদের থেকে আলাদা করার জন্য।

হাদীসে আছে-

عن أنس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال : ما هذان اليومان؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلكم خيرا منهما : يوم الأضحى ويوم الفطر.

অর্থ : আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এলেন। সে সময় মদীনার অধিবাসীর দুটি (উৎসবের) দিন ছিল, যাতে তারা আনন্দ-ফূর্তি করত। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'টি দিবস কীসের? তারা বললেন, জাহেলি যুগে আমরা এ দুটি দিনে আনন্দ-ফূর্তি করতাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা এ দুটি দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। সে দিন দুটি হল : 'ইয়াওমুল আযহা' ও 'ইয়াওমুল ফিতর' (অর্থাৎ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দুই দিন)।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১১৩৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২০০৬)

সুতরাং আমাদের ঈদ শুধু ব্যবস্থাপনাগত কোনো বিষয় নয়, যাকে শুধু যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগক্ষেত্র বানিয়ে ফেলা যায়। আর না অন্যান্য জাতির উৎসবের মতো মনগড়া কোনো সংস্কৃতির অংশ, যাতে আনুষ্ঠানিকতা ও বাহ্যিক সাজ-সজ্জাই মূল; বরং এটি একটি খালিস দ্বীনী আমল, যা ইসলামী ইবাদতের অংশ।

এ কারণে একই দিনে ঈদ উদযাপনের বিষয়টিকেও অন্য সকল বিষয়ের মতো শরীয়তের সূত্র ও দলীলের ভিত্তিতেই সমাধান করতে হবে। দেখতে হবে, পূর্বসূরীদের কর্মপন্থায় কী নির্দেশনা পাওয়া যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসওয়ায়ে হাসানা এর উপর কী আলোকপাত করে। এখানে অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ তোলাই প্রমাণ করে, ঐ ব্যক্তি না দ্বীনের রুচি-প্রকৃতি গ্রহণ করেছে। আর না সে এ সম্পর্কে অবগত। আসলে অনেক বন্ধুরই-দ্বীনের বিষয়ে প্রজ্ঞাহীনতা ও দ্বীনী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার কারণে-ইসলামের

শিক্ষা ও বিধানে সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি অনেক কম। এ কারণে তারা হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে যান এবং নিজেদের মূল্য ও মর্যাদা অন্যান্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণের মাঝেই নিহিত মনে করেন। এটি ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে উপলব্ধিহীনতার অনিবার্য ফল।

মোটকথা, শরীয়তের নীতিমালা ও উসওয়ায়ে হাসানার আলোকে একই দিনে ঈদের যে অবস্থান নির্ধারিত হয়, সেটাই তার প্রকৃত অবস্থান, যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সামনে আসছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ মোটেই বিবেচ্য নয়।

বিবাদ ও বিভেদ থেকে দূরে থাকাই একতা

এবার প্রথম দলীল সম্পর্কে চিন্তা করুন। এতে দুটি কথা বলা হয়েছে :

ক. ইখতিলাফ দূর করার জন্য একই দিনে ঈদ হতে হবে এবং একই দিনে রোযা শুরু হতে হবে।

খ. রোযা ও ঈদের বিষয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ দূর করার জন্যই এমনটা করতে হবে।

এই বন্ধুরা মূলত ইখতিলাফ (বিভিন্নতা) ও ইফতিরাক (বিভেদ) কে এক করে ফেলেছেন। অথচ ইফতিরাক বা বিভেদ সম্পূর্ণ নিন্দিত, যা পরিহার করা ফরয। কিন্তু এর জন্য শরীয়ত-অনুমোদিত ইখতিলাফ বা বিভিন্নতা বিলুপ্ত করার প্রয়োজন নেই, আর না ইখতিলাফ বা বিভিন্নতা দূর হলেই ইফতিরাক বা বিভেদ দূর হয়। বিভেদের কারণ তো অসংখ্য। শরীয়ত অনুমোদিত ইখতিলাফ তো বিভেদের কারণই নয়। হ্যাঁ, এ ইখতিলাফকে বরদাশত করতে পারার যোগ্যতা না থাকা অবশ্যই ইফতিরাক ও বিভেদের অনেক বড় কারণ। এর চিকিৎসা তো শরীয়তসম্মত ইখতিলাফ নির্মূলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয়; বরং শরীয়তসম্মত ইখতিলাফের ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্দেশিত কর্মপন্থায় চর্চা, অনুশীলন ও বিস্তারের মাধ্যমেই হতে পারে।

শরীয়তসম্মত ইখতিলাফের ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত কর্মপন্থা কী- এ বিষয়ে পাঠকগণ আলকাউসারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ''উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা'' শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠ করেছেন এবং সম্প্রতি যা গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। যার সারকথা এই যে, যে সকল মাসআলায় ফিকহ- ফতোয়ার ইমামগণের মাঝে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে ইখতিলাফ হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের কর্তব্য, নিজেদের আলিমদের শরণাপন্ন হওয়া। অতপর আলিমগণ ঐ মতভেদপূর্ণ মাসআলায় যে মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেবেন সে অনুযায়ী আমল করা। এ অবস্থায় অন্য মত অনুসারে আমলকারীদের এদের উপর আপত্তি বা সমালোচনা কিংবা এ কথা বলার অধিকার থাকবে না যে, তোমাদের আমল ও ইবাদত বাতিল বা ভুল। বরং প্রত্যেক দল ধৈর্য্য ও সহনশলীতার পরিচয় দেবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ আলিমের ফতোয়া অনুসারে আমল করলেও অন্যদের আমল সম্পর্কে কটূক্তি বা সমালোচনা করবে না ।

যদি প্রত্যেক দলের আলিমগণ মানুষকে শরীয়তসম্মত ইখতিলাফের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শরয়ী কর্মপন্থা অনুসরণে-যা অনুসরণ প্রত্যেকের জন্য ফরয- উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রত্যেক দ্বীনদার সমঝদার মানুষ এই কর্মপন্থা নিজেও অনুসরণ করেন এবং অন্যদেরও প্রস্ত্তত করেন তাহলে কোনো মতভেদপূর্ণ মাসআলায় মতভেদের কারণে ইনশাআল্লাহ বিভেদ-বিশৃঙ্খলা হবে না। যদি হয় অন্য কোনো কারণে হবে।

মোটকথা, নিন্দিত ইখতিলাফ তো নিঃসন্দেহে ও বিনা ব্যাখ্যায় বিবাদ-বিসংবাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শরীয়তসম্মত ইখতিলাফ বিবাদ-বিসংবাদ নয়, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাও নয়। হ্যাঁ, যারা শরীয়তসম্মত ইখতিলাফের ক্ষেত্রগুলোতে পারস্পরিক আচরণ-উচ্চারণে শরীয়তসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণ করেন না তারা শরীয়তসম্মত ইখতিলাফকেও বিবাদ ও বিভেদের কারণ বানিয়ে ফেলেন। এদের উপর ফরয হলো নিজেদের কর্মপন্থা সংশোধন করা।

আমরা যদি আমাদের কর্মপন্থা সংশোধনের পরিবর্তে শরীয়তসম্মত ইখতিলাফকেই গর্হিত ইখতিলাফে পরিণত করি এবং প্রত্যেক 'মুখতালাফ ফীহ' (মতভেদপূর্ণ) বিষয়কে 'মুজমা আলাইহি' (সর্বসম্মত ইজমাবিশিষ্ট) এবং 'মুজতাহাদ ফীহ' (ইজতিহাদী) বিষয়কে 'মানসূস' (কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত) বিষয়ের মর্যাদা দেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হই তাহলে একেতো শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধই নয়, দ্বিতীয় এটা হবে এক ব্যর্থ চেষ্টা, যার কারণে বিশৃঙ্খলা ও ভেদাভেদ আরো বাড়বে। যেমনটা আমরা দেখি, যারা 'তাওহীদুল মাযাহিব'-এর (সকল মাযহাবকে এক মাযহাবে পরিণত করার) চেষ্টা করেন তারা কেবল নতুন নতুন অযৌক্তিক মাযহাবই সৃষ্টি করেন।

তদ্রূপ যারা নামাযের পদ্ধতিগত বিষয়ে যুগ যুগ ধরে চলে আসা 'ইখতিলাফে তানাওউ' ও 'তাআদ্দুদে সুন্নাহ' তথা_ সুন্নাহর বিভিন্নতাকে বাতিল ও অকার্যকর সাব্যস্ত করাকে ভালো কাজ মনে করেন তারা কেবল সমাজে অস্থিরতাই ছড়াচ্ছেন। এ ছাড়া আর কোনো সেবা দানে তারা অক্ষম।

সারকথা এই যে, রমযান ও দুই ঈদের তারিখের বিষয়ে ইখতিলাফের কারণে যে বিবাদ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তার জন্য মূলত ইখতিলাফ দায়ী নয়; বরং ইখতিলাফী (মতভেদপূর্ণ) বিষয়াদিতে শরীয়ত নির্দেশিত আদব ও আচরণবিধি অনুসরণ না করাই দায়ী। এজন্য এ আদব ও আচরণবিধির শিক্ষা ও প্রচার ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করাই আসল কাজ। এটা যদি না করা হয় তাহলে শুধু রোযা ও ঈদের তারিখ অভিন্ন হওয়ার দ্বারা অস্থিরতা ও বিবাদ-বিসংবাদ দূর হবে না।

যেমন যদি মুসল্লীদের মাঝে শরীয়তসম্মত ইখতিলাফের ক্ষেত্রে সবর ও সহনশীলতার মেজাজ তৈরি না হয় তাহলে তারা ঈদ তো করবে-ধরুন-একই দিনে, কিন্তু ঈদের নামাযের তাকবীর-সংখ্যা নিয়ে (ছয় না বারো) ঝগড়া-বিবাদ করতেই থাকবে। তদ্রূপ সদকায়ে ফিতর টাকা দ্বারা আদায় করা যাবে কি না, গম দ্বারা আদায় করলে আধা সা

না এক সা-এসব বিষয়ে বিবাদ করতেই থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ঈদ ও সিয়ামের ক্ষেত্রে 'ঐক্যে'র যে স্থান এই বন্ধুরা দেখছেন তা বাস্তবে যতদূর সম্ভব ততটা কার্যকর করাও জনগণের মাঝে শরীয়তসম্মত মতভেদের ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়, নতুবা এই স্বপ্ন সম্ভাব্য পর্যায় পর্যন্তও বাস্তবরূপ লাভ করতে পারবে না। আগামী আলোচনা থেকে তা পরিষ্কার হবে ইনশআল্লাহ।

এ কারণে আমাদের বড়রা অন্যান্য মতভেদপূর্ণ ও ইজতিহাদী বিষয়ের মতো রোযার ও ঈদের তারিখ সংক্রান্ত মতভেদের ক্ষেত্রেও শরীয়তসম্মত ইখতিলাফ বরদাশত করে নেওয়ার এবং এর কারণে পরস্পরের একতা ও ভ্রাতৃত্বে ফাটল সৃষ্টি হতে না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

এ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন বক্তব্য ও কর্মপন্থা সামনে কোথাও উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

প্রকৃত ঐক্য কী?

সুতরাং প্রকৃত ঐক্য এই নয় যে, মুসলমানদের রোযা ও ঈদ একই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল; বরং প্রকৃত ঐক্য হচ্ছে :

১. গোটা উম্মত খালিস তাওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

২. গোটা উম্মত আল্লাহর বিধানসমূহ পালন করতে থাকা।

৩. গোটা উম্মত সুন্নতে নববীর অনুসরণ ও উসওয়ায়ে হাসানা মোতাবেক জীবন গঠনে সচেষ্ট হওয়া।

৪. গোট উম্মত ইজমায়ী বিষয়সমূহে ইজমার উপর অটল অবিচল থাকা এবং ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী বিষয়ে নিজের ইমাম, মুফতী বা মুরশিদের নির্দেশিত পন্থায় আমল করা এবং অন্যদের পথ ও

পন্থার উপর আপত্তি ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকা।

মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদীর ভাষায় :

اپنے مسلك كو چھوڑے نہیں اور دوسرے كے مسلك كو چھیڑے نہیں.

নিজের পথ ছাড়বে না, অন্যের পথকে 'ছুঁড়বে না'।

৫. গোটা উম্মতের মাঝে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হওয়া এবং ভালো কাজে সহযোগিতা আর জুলুম ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা পরিহারের প্রেরণা জাগ্রত হওয়া।

এই উম্মতের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাওহীদ ও ঈমান এবং ঈমানী ভ্রাতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী-এর 'আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' (রাবেতার ফিকহী বোর্ড)-এর ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ ঈ.-এ গৃহীত সিদ্ধান্তের বাক্যগুলো এই :

لا حاجة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاة في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم.

মুসলিম জাহানে চাঁদ ও ঈদ এক করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তা মুসলিমদের ঐক্য নিশ্চিত করবে না যেমনটা চাঁদ ও ঈদ এক করার অনেক প্রস্তাবকের ধারণা। চাঁদ প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি ইসলামী দেশগুলোর কাযা ও ফতোয়া বিভাগগুলোর উপর ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। কারণ এটিই ইসলামের, সাধারণ কল্যাণ বিবেচনায় অধিকতর উত্তম ও উপযোগী।

আর যে বিষয়টি উম্মাহর ঐক্য নিশ্চিত করবে তা হচ্ছে, সকল বিষয়ে আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার বিষয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়া।'' (কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, পৃষ্ঠা : ৮৭-৮৯)

রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর 'আলমাজমাউল ফিকহী''-এর ঐ অধিবেশনে, যাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পুরো বিশ্বের এবং সকল মাযহাবের বড় বড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্তে যাঁদের সাক্ষর রয়েছে তাঁদের নাম এই :

১. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ বিন বায)

২. محمد علي الحركان (نائب رئيس)

(মুহাম্মাদ আলী আলহারকান (উপপ্রধান)

৩. عبد الله بن محمد بن حميد (رئيس)

(আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ (প্রধান)

৪. مصطفى الزرقاء

(মুস্তফা আযযারকা)

৫. محمد محمود الصواف

(মুহাম্মাদ মাহমুদ আসসাওয়াফ)

৬. محمد بن عبد الله بن سبيل

(মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইয়িল)

৭. صالح بن عثيمين

(সালেহ ইবনে উছাইমিন)

৮. مبروك العوادي

(মাবরুক আলআওয়াদী)

৯. محمد الشاذلي النيفر

(মুহাম্মাদ আশশাযেলী আননাইফার)

১০. عبد القدوس الهاشمي

(আবদুল কুদ্দুস হাশেমী)

১১. محمد رشيدي

(মুহাম্মাদ রশীদী)

১২. أبو الحسن علي الندوي

(আবুল হাসান আলী নদবী (দস্তখতের সময় উপস্থিত ছিলেন না।)

১৩. أبو بكر محمد جومي

(আবু বকর মুহাম্মাদ জুমী)

১৪. حسنين محمد مخلوف

(হাসানাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ)

১৫. محمد رشيد قباني

(মুহাম্মাদ রশীদ কববানী)।

তো একই দিন রোযা ও ঈদ করার উপর উম্মতের ঐক্য নির্ভরশীল মনে করা বা এ ধারণা করা যে, এছাড়া উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি অর্জিত হতেই পারে না-একটি অপরিণত চিন্তা। না এর কোনো দালীলিক ভিত্তি আছে, না সালাফের জীবনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে। এ তো খুব সহজেই বোধগম্য যে, বিষয়টি যদি শরীয়তের মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে সালাফে সালেহীন নিজ নিজ যুগের প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। কিন্তু নবী-যুগের পর শত শত বছর পর্যন্ত এর কোনো দৃষ্টান্ত ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

দারুল খিলাফায় (রাজধানীতে) চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার পর এর সংবাদ দূত মারফত মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে পৌঁছানো যেত। ঈদুল আযহা, আশূরা, লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তো খুব সহজেই তা সম্ভব হত; ঈদুল ফিতরেও সময়ের পরে হলেও রাজধানীর ঈদ সম্পর্কে অবগত করা যেত, যাতে অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও প্রকৃত ২৯ রমযান ও প্রকৃত ১ লা শাওয়াল সম্পর্কে অবগত হয় এবং এক দুইটি রোযা কাযা করতে হলে তা তারা জানতে পারেন। কিন্তু খাইরুল কুরূনে বা পরবর্তী কোনো যুগেও কি মুসলিম আমীরগণ বা উলামা ও ইমামগণ এরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? এ প্রসঙ্গে নির্ভরোযগ্য একটি উদাহরণও কি পেশ করা যাবে?

ঐ যুগে কেন তাঁরা শুধু নিজ এলাকায় চাঁদ খুঁজতেন। ২৯ শাবান সকালে কি চারদিকে দূত পাঠানো যেত না? যারা চাঁদ দেখত, (চাঁদের শাহাদাত নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হত, কেউ হয়তো ইশার পর, কেউবা সুবহে সাদিকের আগে এসে পৌঁছত। কিন্তু সম্ভাব্য পর্যায় পর্যন্ত অন্যান্য অঞ্চলের চাঁদের সংবাদ তো মিলে যেত। এর কোনো দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যায় নবী-যুগে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে?

কিংবা খাইরুল কুরূন বা তারপরে ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে?

তদ্রূপ ২৯ রমযানেও চারদিকে দূত পাঠানো সম্ভব ছিল কিন্তু তা-ও করা হয়নি। হাদীস-সীরাতে যে দৃষ্টান্ত আছে তা হচ্ছে, ৩০ রমযান সন্ধ্যায় ঘটনাক্রমে একটি কাফেলা সফর থেকে ফিরল এবং চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। তখন রোযা ভাঙ্গার এবং পরের দিন ঈদ কাযা করার আদেশ এল কিন্তু কখনো কি এমন চিন্তা করা হয়েছে যে, কাফেলা এসে কেন আমাদের সংবাদ দিবে, আমরাই কেন আগে চারদিকে দূত পাঠাই না কিংবা আগে থেকেই পত্র লিখে অন্যান্য অঞ্চলের দায়িত্বশীল ও গভর্ণরদের জানিয়ে দেই না যে, যেখানেই চাঁদ দেখা যাবে অবশ্যই যেন চারদিকে দূত পাঠিয়ে এ সংবাদ পৌঁছে দেয়া হয়?

আপনি হয়তো বলবেন, এটা কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু শুধু কষ্টের কারণে কি সাহাবা-তাবেয়ীন শরীয়তের কোনো কাম্য বিষয় ত্যাগ করতে পারেন? তারা তো সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন। অতপর অসীয়ত করে যেতেন যে, তোমাদের পক্ষে আরো বেশি করা সম্ভব হলে তাতেও কোনো ত্রুটি করবে না। প্রশ্ন এই যে, সালাফের সীরাতে এই 'পূণ্যকর্মের' কোনো দৃষ্টান্ত (ঐ যুগে যতদূর সম্ভব ছিল) কেন পাওয়া যায় না?

ইতিহাসে নবী-যুগ ও খিলাফত আমলের রাজনৈতিক ফরমানসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। সেগুলো এক এক করে পাঠ করা হোক এবং একটি ফরমানই বের করে আনা হোক, যাতে দারুল খিলাফা বা হরমে মক্কা বা হরমে মদীনার চাঁদ সাব্যস্ত হওয়ার সংবাদ অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য লেখা হয়েছে। যাতে তারা ঐ চাঁদের ভিত্তিতে যথাসময়ে বা সময়ের পরে তাদের করণীয় সম্পন্ন করতে পারেন।

আমাদের জানামতে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও নেই। এর বিপরীতে

এমন ফরমান পাওয়া যাবে, যাতে খলীফাতুল মুসলিমীন অন্য এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস লিখে পাঠিয়েছেন : 'মাস (কখনো) ঊনত্রিশে হয় তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা ছাড়বে না। তবে যদি চাঁদ ঢাকা পড়ে যায় তাহলে তা (ত্রিশটি) হিসাব করে নাও'।- সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩১৫; সুনানে বায়হাকী ৪/২০৪)

এর অর্থ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবেন।

এ কারণে এই মত ও চিন্তা অবশ্যই বর্জণীয় যে, 'তাওহীদুল আহিল্লাহ' তথা এক চাঁদভিত্তিক রোযা ও ঈদ করা শরীয়তের মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত কিংবা উম্মাহর ঐক্য এ ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকবে। দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনের পর রোযা ও ঈদ একই দিনে করার বিষয়ে নিছক জযবা ও আবেগের পরিবর্তে দলীল ও বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষেই এর গুরুত্ব কতটুকু আর তা বাস্তবায়নই বা কত দূর সম্ভব?

মূল বিভ্রান্তি : ইখতিলাফুল মাতালি' প্রসঙ্গ

যারা গোটা দুনিয়ায় একই সাথে রোযা শুরু ও একই দিনে ঈদ করাকে শরীয়তের হুকুম এবং ফরয দরজার হুকুম মনে করেন তাদের অনেকেরই 'ইখতিলাফে মাতালি' বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

'ইখতিলাফুল মাতালি' একটি প্রসিদ্ধ শিরোণাম, যার সারকথা এই যে, এটা তো এক অকাট্য ও চোখে দেখা বাস্তবতা যে, গোটা পৃথিবীর জন্য চাঁদের মাতলা (উদয়স্থল) অভিন্ন নয়, বিভিন্ন। অর্থাৎ চাঁদ যখন 'হেলাল' আকারে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় তখন সম্ভব নয় যে, একই রাতে তা গোটা পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিগোচর হবে। বরং উদাহরণস্বরূপ, কোথাও ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় দৃষ্টিগোচর হবে, কোথাও ৩০ তারিখ সন্ধ্যায়। তাহলে 'হিলালে'র (নতুন চাঁদের) ' মাতলা' (উদয়স্থল)

বা 'তুলূ' (উদয়) এক নয়, বিভিন্ন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, রোযা শুরু করার ও ঈদ করার ক্ষেত্রে এই বিভিন্নতা বিবেচনা করা হবে কি না। বিবেচনা করার অর্থ হবে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখার উপর আমল করবে। ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ একে لكل أهل بلد رؤيتهم শিরোনামে উল্লেখ করেন অর্থাৎ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। দূর দরাজের কোনো এলাকা থেকে চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তা গ্রহণ করা জরুরি নয় বা গ্রহণ করা দুরস্ত নয়।

আর উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে বিবেচনা না করার অর্থ এই যে, দূর দূরান্তের কোনো অঞ্চল থেকেও যদি চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণ করা যায়, বা গ্রহণ করা জরুরি। একে পরবর্তী ফিকহের কিতাবগুলোতে لا عبرة لاختلاف المطالع শিরোনামে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ বিধানের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা বাস্তবে উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অস্বীকার করেন। তাদের উদ্দেশ্য, বিধানের ক্ষেত্রে একে বিবেচেনা করা হয় না।

ফিকহ ও হাদীসের কিতাবে এ বিষয়টির প্রাচীন শিরোণাম হচ্ছে, 'এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য দলীল কি না'। পরবর্তীগণ একে 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা বিবেচ্য হওয়া, না হওয়া' শব্দে উল্লেখ করেছেন। বিষয়ের স্বরূপ ও তাতে মতভেদের ধরন হিসেবে পুরানো শিরোনামটিই অধিক সূক্ষ্ম। যদিও এখন দ্বিতীয় শিরোনাম অধিক প্রসিদ্ধ।

তো এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের লোকদের জন্য বিবেচ্য কি না এটা তো মতভেদপূর্ণ ও ইজতিহাদ-নির্ভর বিষয়। কোন দিকে রায় বেশি এবং কোন মতটি দলীলের বিচারে অধিক শক্তিশালী এর বাস্তবজ্ঞান তো কম মানুষেরই আছে, তবে এ কথাটি মুখে মুখে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, শাফেয়ী মাযহাব ছাড়া অন্য সকল মাযহাবের সিদ্ধান্ত, কোনো এক স্থানে চাঁদ দেখা গেলে যেখানে যেখানে এর

প্রমাণ পৌঁছবে সেখানে ঐ চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করা ফরয হয়ে যাবে।

তো অনেকে এই কথাটি নিয়েই ছুটলেন এবং ফতোয়া দিতে লাগলেন যে, সৌদীতে চাঁদ দেখার খবর রেডিও-টিভিতে প্রচারিত হলে সকল অঞ্চলের মুসলমানের নিজ উদ্যোগেই সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি। তাদের দেশে নির্ভরযোগ্য ও সরকারী কোনো হেলাল কমিটি থাকলেও। এভাবে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চল থেকে চাঁদ দেখার কোনো সংবাদ প্রচারিত হলে সকল অঞ্চলে সে অনুসারে আমল করা জরুরি। অথচ যে ফকীহগণ বলেছিলেন, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্যও প্রযোজ্য তাদের কথার অর্থ এই ছিল যে, এলাকার ভিন্নতা চাঁদ দেখার সাক্ষ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না। বাকি এক এলাকারর চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় আমলযোগ্য হওয়ার জন্য কী কী শর্ত আছে, এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী-এটা আলাদা প্রসঙ্গ, যা ফিকহের কিতাবে আলাদা শিরোনামে আলোচিত হয়ে থাকে। যার সারকথা হল, 'তরীকে মূজিব' দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হতে হবে। (অর্থাৎ এমন পদ্ধতিতে খবর বা সাক্ষ্যগুলো আসতে হবে যেভাবে এলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য এবং সে অনুযায়ী আমল অপরিহার্য হয়। এরপর তা সংশ্লিষ্ট অথরিটি (শাসক বা তার প্রতিনিধি)-এর পক্ষ হতে কার্যকর হতে হবে। অন্যথায় তা 'ওয়াজিবুল আমল' (অবশ্য অনুসরণীয়) হয় না। এটা ঐ আলিমদের নিকটেও, যারা উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করেন।

'তরীকে মূজিব'-এর অনুসন্ধান ছেড়ে এবং সংশ্লিষ্ট অথরিটির পক্ষ হতে কার্যকর হওয়ার অপেক্ষা না করেই 'কোথাও চাঁদ দেখার সংবাদ যে কোনোভাবে প্রচারিত হলেই সে অনুসারে আমল করা ফরয হবে' এটা ঐ ভাইদের অপরিণত চিন্তা, যার সাথে ঐ সকল ইমাম বা আলিমগণের চিন্তার দূরতম সম্পর্কও নেই; যারা বলেছিলেন, এক এলাকায় চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্যও গ্রহণযোগ্য। তাদের উদ্দেশ্য শুধু এটুকু ছিল যে, অঞ্চলের বিভিন্নতা চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ নয়। তবে সে চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় কখন

কীভাবে আমলযোগ্য হবে তা এক আলাদা প্রসঙ্গ। এ তো সুস্পষ্ট যে, সেটা শরীয়তসম্মত পন্থায় হতে হবে। এর কোনো নীতি ও বিধান নেই, তা ঐ ইমামরা বলেননি। তো আমরা যদি ঐ ইমামদের মাযহাব অনুসরণ করতে চাই এবং এক এলাকার চাঁদ দেখা অনুসারে অন্য এলাকায় আমল করতে চাই তাহলে আমাদের এ সংক্রান্ত বিধিবিধান এবং সংশ্লিষ্ট নীতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। (সামনে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।)

দ্বিতীয় কথা এই যে, ঐ ইমামগণ যদিও বলেছেন, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে 'তরীকে মূজিব' অনুযায়ী প্রমাণিত হলে সে অনুসারে (যথানিয়মে) আমল করা জরুরি হয়ে পড়ে, কিন্তু তাদের একজনও কি বলেছেন, এক এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ অন্য এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং প্রাপ্ত খবর ও সাক্ষ্যগুলো যাচাই করে আন্তর্জাতিকভাবে তা কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া ফরয? বলাবাহুল্য, এমন কথা না কোনো ইমাম বলেছেন, না কোনো আলিম; আর না কারো এমন কথা বলার অধিকার আছে। কারণ এ ধরনের ব্যবস্থা ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নত হওয়ার বিষয়ে শরীয়তের কোনো দলীল নেই, প্রথম থেকে ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ চলে আসছে তা এই যে, যদি অন্য এলাকা থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ 'তরীকে মুজিবে'র সূত্রে পাওয়া যায় তবে তা গ্রহণ করা হবে কি না, কিন্তু এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত যে, অন্য এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ সংগ্রহ করা কখনো জরুরি নয়। আর শরীয়তের কোনো আদেশ ছাড়া তা জরুরিই বা হয় কীভাবে? হাদীসে এটা তো আছে যে, মদীনার বাইরে থেকে কেউ চাঁদের শাহাদাত দিলে শর্ত পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের জানামতে, এটা তো কোনো হাদীসেই নেই যে, ২৯ শাবানের সন্ধ্যায় বা পরদিন সকালে, তদ্রূপ ২৯ রমযানের সন্ধ্যায় বা পরদিন সকালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর পরে কোনো খলীফায়ে রাশিদ মদীনার বাইরে দশ/বিশ মাইল দূরেও কাউকে চাঁদ দেখার জন্য বা চাঁদের শাহাদত সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়েছেন। তো যখন বাইরে থেকে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য তলব করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরি

নয় তাহলে কীভাবে বলা যায়, সকল অঞ্চলে অবশ্যই এক চাঁদ দেখা অনুসারে আমল হওয়া শরীয়তের অভিপ্রায়?

যাই হোক, আমি আরজ করছিলাম, এই যে ভেবে নেয়া হয়েছে, যে ইমামগণ উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে গ্রাহ্য করেন না তারা সবাই একথাও বলেন যে, 'অন্য জায়গার সংবাদ কোনো বিধিবিধান বা কোনো নীতি ব্যবস্থা ছাড়াই গ্রহণ করা হবে' কিংবা তাঁরা এ কথার প্রবক্তা যে, 'সর্বত্র একই দিনে রোযা-ঈদ হওয়া জরুরি' সম্পূর্ণ ভুল। জ্ঞান ও গবেষণার সাথে এসব চিন্তার দূরতম সম্পর্কও নেই।

এই প্রয়োজনীয় ভূমিকার পর এখন আমরা দেখব, বাস্তবেই কি অধিকাংশ ফকীহের সিদ্ধান্ত এই যে, একই চাঁদ দেখা সকল জায়গার জন্য 'ওয়াজিবুল আমল' অবশ্য অনুসরণীয়, না বিষয়টি এর বিপরীত।

নিজ নিজ এলাকার চাঁদ

না সকল এলাকার জন্য এক চাঁদ

প্রথমে জানা জরুরি যে, শরীয়তের মাসাইল দুই প্রকারের : ১. মানসূস আলাইহি ২. মুজতাহাদ ফীহ।

"মানসূস আলাইহি" বলা হয়, যাতে কুরআন কারীম বা সুন্নতে নববিয়াহ্র কোনো অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন 'নস' বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের মাসাইল 'কতয়ী' (অকাট্য ও সংশয়হীন) হয়ে থাকে এবং অবশ্যই তা 'মুজমা আলাইহি" (সর্বসম্মত)ও হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কোনো ইমাম, ফকীহ, বা আলিমের কোনো মতভেদ থাকে না। যদি কেউ জেনে শুনে দ্বিমত করে তবে তিনি আলিমই গণ্য হবেন না; বরং তার সাথে 'ফাসিক' বিশেষণ যুক্ত হবে।

আর "মুজতাহাদ ফীহ" বলা হয়, যাতে হয়তো কোনো নস নেই বা থাকলেও তা হয়তো এমন স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নয়, যাতে একাধিক

মর্মের সম্ভাবনা নেই, কিংবা তা প্রামাণিকতার দিক থেকে এমন অকাট্য ও শক্তিশালী নয়, যার ছূবূত ও প্রামাণিকতা হাদীস-বিচারকগণের কাছে সর্বসম্মত। এ ধরনের বিষয়ে ফিকহ-ফতোয়ার ইমামগণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন। এই ফয়সালায় তারা সবাই একমত থাকলে বিষয়টি 'মুজতাহাদ ফীহ' (ইজতিহাদী) হওয়া সত্ত্বেও 'মুজমা আলাইহি' গণ্য হবে। আর তাদের মাঝে মতানৈক্য হলে বিষয়টি হবে 'মুজতাহাদ ফীহ'' এবং 'মুখতালাফ ফীহ''।

''কোথাও চাঁদ দৃষ্টিগোচর হলে যতদূরের অঞ্চলে তা 'তরীকে মূজিবে'র দ্বারা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হবে সংশ্লিষ্ট অথরিটির জন্য এই 'চাঁদ দেখা' গ্রহণ করা এবং সে অনুসারে ফয়সালা করা জরুরি কি না'' এ বিষয়টি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তা দেখতে হবে।

কেউ কেউ এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, বিষয়টি 'মানসূস আলাইহি' এবং মোটামুটি 'মুজমা আলাইহি'। এক ভাই তো এ পর্যন্ত লিখে দিয়েছেন যে, শাফেয়ী মাযহাবের একজন আলিম ছাড়া এতে কারো দ্বিমত নেই। সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তা সব জায়গার জন্য 'ওয়াজিবুল আমল' তথা অবশ্য অনুসরণীয়।

অথচ বাস্তবতা এই যে, এ বিষয়টি ''মুজতাহাদ ফীহ'' হওয়ার পাশাপাশি মুখতালাফ ফীহ-ও বটে। আর এক এলাকার চাঁদ দেখা দূর দূরান্তের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় না হওয়াই ফকীহগণের অনেক বড় জামাআতের সিদ্ধান্ত। হানাফী মাযহাবেরও বড় বড় অনেক ফকীহ এই নীতি গ্রহণ করেছেন। আর শাফেয়ী মাযহাবে তো এটিই 'মুফতা বিহী'' (ফতোয়া)। তো প্রসঙ্গটি একটু বিস্তারিত বর্ণনা করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

এ বিষয়টি 'মুজতাহাদ ফীহ'

আলোচিত বিষয়টি যে, ''মুজতাহাদ ফীহ'' তা ইলমে উসূলে ফিকহে

পারদর্শী ব্যক্তিদের কাছে স্পষ্ট, এরপরও আরো স্পষ্ট করার জন্য সৌদী আরবের 'হাইআতু কিবারিল উলামা'র (সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ) একটি সিদ্ধান্ত বর্ণনা করছি। ১৩ শাবান ১৩৯২ হিজরীর অধিবেশনে দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ও আলোচনা-পর্যালোচনার পর 'হাইআতু কিবারিল উলামা' যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তার ভূমিকা তাদেরই ভাষায় নিম্নরূপ :

أولا : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حِسّاً وعقلا، ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه.

ثانيا : مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق بأدلته من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه

وبقوله صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به.

(ফয়সালার ভূমিকা)

১. নতুন চাঁদের উদয়স্থল বিভিন্ন হওয়া এমন একটি বিষয়, যা সাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা প্রমাণিত। এতে কারো দ্বিমত নেই। মুসলিম আলিমদের মাঝে যে মতভেদ তা এ বিষয়ে যে, উদয়স্থলের এই বিভিন্নতা (আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে) ধর্তব্য কি না।

২. উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য কি না, তা ঐ সকল নযরী বিষয়ের

অন্তর্ভুক্ত, যাতে ইজতিহাদের দখল আছে। ইলম ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে উচ্চ মাকামের অধিকারী ব্যক্তিত্বদের মাঝে এ ধরনের বিষয়ে মতভেদ হয়ে থাকে। আর তা শরীয়তসম্মত মতভেদ, যাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীতের জন্য রয়েছে দুই পুরস্কার : ইজতিহাদের পুরস্কার ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পুরস্কার। আর যিনি বাস্তবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি তার জন্য রয়েছে ইজতিহাদের পুরস্কার।

আলোচিত বিষয়ে আহলে ইলমের মাঝে দুই মত রয়েছে : কারো মত এই যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য, আর কারো মতে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। প্রত্যেকে দল (প্রত্যেক মতের অধিকারীরা) কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করেন; বরং কখনো তো উভয় মতের অনুসারীরা একই 'নস' দ্বারা দলীল দিয়েছেন। যেমন উভয় পক্ষ আল্লাহ তাআলার বাণী -

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

দ্বারা দলীল দিয়েছেন।

কারণ এই বাণীগুলোর মর্ম অনুধাবন ও দাবী-প্রমাণের পন্থায় তাঁদের মাঝে মতভেদ হয়েছে।''

এই ভূমিকার পর হাইআতু কিবারিল উলামা তাদের ফয়সালা নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন :

وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة، ونظر الاعتبارات قدرتها الهيئة، ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرنا لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية

واحدة، فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.

''অর্থাৎ হাইআ'র অধিবেশনে (দলীল-প্রমাণের) পর্যালোচনার পর বিভিন্ন দিক সামনে রেখে এবং এই বিবেচনাতেও যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া না হওয়ার বিষয়ে (ইমামগণের মাঝে সৃষ্ট) মতভেদ এমন নয়, যাতে কোনো অশুভ পরিণামের আশঙ্কা আছে। এই দ্বীন প্রকাশিত হওয়ার পর চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমাদের জানা নেই, এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে কখনো গোটা মুসলিম উম্মাহকে এক চাঁদে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে।

এই সকল বিষয় সামনে রেখে 'হাইআ'র সকল সদস্যের ফয়সালা এই যে, এ বিষয়টি আলোচনায় আনা হবে না; বরং একে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক ইসলামী ভূ-খন্ডের এই অধিকার থাকবে যে, উপরোক্ত দুই মতের যে কোনোটি ইচ্ছা গ্রহণ করবে, নিজ নিজ আলিমের মাধ্যমে। কারণ উভয় মতেরই নিজ নিজ দলীল ও সনদ রয়েছে।''

(মাজাল্লাতুল বুহূছিল ইসলামিয়্যাহ, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, রিয়াদ, সংখ্যা : ২৮, পৃষ্ঠা : ৩২০)

এই ফয়সালায় শায়খ ইবনে বায রাহ., শায়খ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ, শায়খ মুহাম্মাদ আমীন আশশানকীতী ও শায়খ আবদুর রাযযাক আফীফীসহ 'হাইআতু কিবারিল উলামা'র ঐ সময়ের অন্যান্য সদস্যের দস্তখত বিদ্যমান আছে।

আপাতত এই সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য, এই দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়টি ''মুজতাহাদ ফীহ'', এতে এমন কোনো 'নস' নেই যা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন, যার ভিত্তিতে ফকীহগণের মাঝে ইজমা

(ঐকমত্য) সম্পন্ন হতে পারে। এ কারণে এ বিষয়ে যে ভূ-খন্ড নিজের আলিমগণের পরামর্শক্রমে এ পন্থা গ্রহণ করবে যে, তারা অন্য কোনো ভূ-খন্ডের চাঁদ দেখার ফয়সালা গ্রহণ করে নিজ দেশে চাঁদ দেখার বিধান কার্যকর করবে তাদেরকেও ভৎর্সনার পাত্র বানানো যায় না। তদ্রূপ যে ভূ-খন্ড নিজেদের আলিমগণের পরামর্শে এ পদ্ধতি গ্রহণ করবে যে, নিজ দেশের সীমানায় চাঁদ দেখার পর চাঁদ দেখার ফয়সালা কার্যকর করবে তাদেরও তিরস্কার করা যায় না। কারণ দু পক্ষের কোনো পক্ষই কুরআন, হাদীস বা ইজমার বিরোধিতা করেননি, আর না নিজের ইচ্ছার অনুসরণ করেছেন; বরং প্রত্যেকে এমন একটি মাযহাবের উপর আমল করেছেন, যার পক্ষে দলীল আছে এবং যা বড় বড় ফকীহ ইমামগণের মাযহাব।

তিরস্কারযোগ্য তারা, যারা নিজেদের স্বদেশবাসী মুসলিম ভাইদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রোযা ও ঈদ করতে চান এবং ঐক্যের নামে প্রকাশ্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। এটা আমার নিজের কথা নয়, ঐ আলিমদের কথা, যারা এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য মনে করেন। তাদের বক্তব্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত উলুল আমরের (দায়িত্বশীল) পক্ষ থেকে এর ব্যবস্থা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো দেশের নাগরিকের জন্য স্বদেশবাসী মুসলিম ভাইদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ নয়। সামনের আলোচনায় তাঁদের এই ফতোয়া তাঁদেরই ভাষায় দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

সেপ্টেম্বর ২০১৩, যিলক্বদ ১৪৩৪

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন : একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-২

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ মাসআলা মুখতালাফ ফীহ

ইতিপূর্বে আরজ করেছি যে, এ বিষয়টি যেমন 'মুজতাহাদ ফীহ' (ইজতিহাদী) তেমনি 'মুখতালাফ ফীহ' (ইখতিলাফী)ও বটে। এমনকি চার মাযহাবের প্রত্যেকটির ফকীহগণের মাঝেও এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। প্রত্যেক মাযহাবেই উভয় মতের ফকীহ রয়েছেন। ইমাম ও ফকীহগণের মাযহাবের বিবরণ দেওয়ার আগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার।

এক. আলোচ্য বিষয়ে ইমামগণের ইখতিলাফ মূলত দূর দূরান্তের অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে। কাছাকাছি দুই স্থান বা শহরের মধ্যে এক জায়গার চাঁদ দেখা যদি অন্য জায়গায় 'তরীকে মুজিবে'র মাধ্যমে

পৌঁছে তাহলে তা 'ওয়াজিবুল আমল' (অবশ্যগ্রহণীয়) হওয়ার বিষয়ে ইমামগণ একমত। যদিও কোনো কোনো কিতাবের বর্ণনাভঙ্গি ও বর্ণনার শাব্দিক ব্যাপকতার কারণে অনেকে মনে করেছেন, কোনো কোনো ইমামের মতে প্রত্যেক শহরে তা যতই কাছাকাছি হোক না কেন, নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। নিকটবর্তী অন্য কোনো শহরের চাঁদ দেখাও তাদের জন্য অবশ্যগ্রহণীয় নয়। এটা ভুল ধারণা। ইমামগণের মূল ইখতিলাফ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে। কাছাকাছি দুই স্থান বা শহরের ক্ষেত্রে নয়।

একাধিক গবেষক আলিম তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আমি শুধু একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

আল্লামা আবুল হাসানাত আবদুল হাই লাখনোবী রাহ. (১২৬৪ হি.-১৩০৪ হি.)

তিনি তাঁর 'মাজমূআতুল ফাতাওয়া'য় খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৮ (খুলাসাতুল ফাতাওয়ার সাথে মুদ্রিত) এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ফার্সী ভাষায় কৃত তাঁর আলোচনার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

وایں کہ در عوام مشہور است "لکل أهل بلد رويتهم" ازیں ایں مراد نیست کہ مطلقا رویت یکجا در مقام دیگر معتبر نباشد ورنہ لازم خواہد آمد کہ اگر دريك شہر رویت شود ودر دیگر شہر کہ ازاں صرف یکدو منزل یا دو چار میل دور باشد رویت نشود پس آں رویت در حق مردمان دیگر شہر معتبر بناشد وایں امر ہیچ عاقل کہ اور اورا از کتب حدیث ممارست وبفن ہیئت مناسبت است تجویز نخواہد کرد، بل لا يقول به إلا جاهل غبي أو غوي ...

.

তো কাছাকাছি দুই শহর বা একটি বড় শহর যদি এমন হয় যে, ইলমুল ফালাকের বর্ণনা অনুসারে এখানে চাঁদের উদয়স্থল কখনো কখনো আলাদাও হয়ে যায় তাহলেও সবাই একমত যে, এক্ষেত্রে

উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। বরং এক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য (তরীকে মুজিবের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে) অবশ্যগ্রহণীয়।

কাছাকাছি এলাকার ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখার সাক্ষ্য অন্য জায়গার জন্য কবুল করা মারফূ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত, উম্মাহর আমলে মুতাওয়ারাছ (প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা ব্যাপক কর্মধারা) দ্বারাও প্রমাণিত। বাস্তবে এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই। শুধু কিছু বাক্যের শাব্দিক ব্যাপকতা থেকে ইখতিলাফ ধারণা করা হয়েছে।

আনাস রা.-এর পুত্র আবু উমাইর বলেন, আমাকে আমার আনসারী চাচাগণ, যারা সাহাবী ছিলেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন যে-

قالوا : أغمي علينا هلالُ شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناسَ أن يُفْطِروا ويَخْرُجُوا إلى عيدهم من الغد.

একবার মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হল না। ফলে পরদিন আমাদের সকাল হল (রমযানের ত্রিশতম) রোযা অবস্থায়। দিনের শেষে এক কাফেলা এল এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গত রাতে চাঁদ দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের আদেশ করলেন, এখন রোযা ভেঙ্গে ফেল আর আগামীকাল ঈদের জন্য বের হও। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৫৫৪; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৩৩৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৫৩; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী খ. ৩, পৃ. ৩১৬; খ. ৪, পৃষ্ঠা ২৪৯)

ইমাম বায়হাকী রাহ. প্রথম জায়গায় এ হাদীসের সনদকে সহীহ আর দ্বিতীয় জায়গায় 'হাসান' বলেছেন। সর্বাবস্থায় তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। শব্দের কিছু পার্থক্যের সাথে এ হাদীস সুনানে আবু

দাউদ (১১৫০), সুনানে নাসায়ী (১৭৫৬), মুসনাদে আহমদ খ. ৫, পৃ. ৫৭, ৫৮) ও সহীহ ইবনে হিববানেও (৩৪৫৬) আছে।

এ হাদীস থেকে সাধারণভাবে এটাই বোঝা যায় যে, এই কাফেলা মদীনা থেকে অন্তত এক দিনের দূরত্বে থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখেছে। তারা যদি রাতেও সফররত থেকে থাকেন তাহলে অন্তত দেড় দিনের দূরবর্তী স্থান থেকে মদীনায় পৌঁছেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সম্ভবত পঁচিশ-ছাবিবশ মাইল দূরের এলাকায় চাঁদ দেখে থাকবেন। বোঝা গেল, কাছাকাছি এলাকাসমূহে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যগ্রহণীয়। প্রতি যুগে উম্মাহর সম্মিলিত কর্মও এরূপই ছিল। ইমামগণের মাঝে যে ইখতিলাফ হয়েছে তা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রেই হয়েছে।

তবে যদি দুই অঞ্চলের মাঝের দূরত্ব এতো বেশি হয় যে, উভয় জায়গার মাঝে সময়ের ব্যবধানও খুব বেশি। যার ফলে সহজ-স্বাভাবিকভাবে এক জায়গার চাঁদ দেখা অনুযায়ী অন্য জায়গায় আমল করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ক্ষেত্রেও কি এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়টি ইখতিলাফী? কেউ কেউ এমনটি ধারণা করে থাকলেও একাধিক গবেষক আলিমের মতে, এক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যগ্রহণীয় না হওয়া ইজমায়ী ও সর্বসম্মত। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

দুই. মাযহাবসমূহের বিবরণে যাওয়ার আগে যে দুই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি তার দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, যে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের মাঝে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য ধর্তব্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে ইখতিলাফ আছে এ ধরনের একাধিক অঞ্চল যদি একই প্রশাসক বা বিচারক (কিংবা স্বীকৃত হেলাল কমিটির) অধীনে থাকে এবং সেখানে কোনো এক জায়গায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার ভিত্তিতে গোটা অঞ্চলের জন্য চাঁদের ফয়সালা করে দেওয়া হয় তাহলে আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই

যে, ঐ অঞ্চলগুলোর সকল অধিবাসীর জন্য ঐ চাঁদ দেখা অনুসরণ করা জরুরি।

এ সিদ্ধান্ত ঐ আলিমগণেরও, যারা দূরবর্তী শহরনগরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফুল মাতালি (চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা) গ্রাহ্য করেন এবং মনে করেন এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য নয়।

আল্লাহ তাআলার তাওফীক হলে এ দিকটি নিয়েও বিস্তারিত ও দালীলিক আলোচনার ইচ্ছা আছে। এখানে শুধু ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য, যাতে সামনে বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা না হয়।

মাযহাবসমূহের বিবরণ

মাযহাবের বিবরণ সাহাবা-যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা সঙ্গত মনে হচ্ছে।

সাহাবা-যুগ

শতবর্ষব্যাপী সাহাবা-যুগ, যাতে খিলাফতে রাশিদার ত্রিশ বছরের সোনালী আমলও অন্তর্ভুক্ত, (যাকে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ্র আমল বলে) তাতে এ রীতিই অনুসৃত ছিল যে, প্রত্যেক এলাকার অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসরণ করতেন। কাছাকাছি জায়গা থেকে কোনো নির্ভরযোগ্য শাহাদত (সাক্ষ্য) এসে গেলে তা-ও গ্রহণ করা হত, কিন্তু অন্য জায়গা থেকে শাহাদত সংগ্রহ করা কিংবা অন্যান্য জায়গায় শাহাদত পাঠানো বা শাহাদতের ভিত্তিতে দারুল খিলাফায় (রাজধানীতে) যে ফয়সালা হয়েছে তা অন্য অঞ্চলে পাঠানোর কোনো আয়োজন করা হত না। হাদীস-সীরাত ও তারীখের কিতাবে এর একটি নজিরও আমাদের চোখে পড়েনি। কেউ যদি কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে নবী-যুগ বা খিলাফতে রাশিদা-যুগের এমন কোনো নজির দেখিয়ে দেন

তাহলে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

ঐ যুগের সাধারণ অবস্থা অনুসারে দূর-দূরান্তের অঞ্চল থেকে চাঁদের খবর পাওয়ার কথা চিন্তাই করা যেত না। কিন্তু কুদরতের কারিশমা, সাহাবা-যুগে ঘটনাচক্রে সংঘটিত এমন একটি ঘটনা হাদীসের কিতাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদসহ হাদীসের অনেক কিতাবে তা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, শামে চাঁদ দেখার সংবাদ মদীনাবাসী জানতে পেরেছেন। শাম (দামেশক) মদীনা থেকে স্থলপথে ১৯২৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর দামেশক ৩৩° উত্তর অক্ষাংশে, ৩৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং মদীনা ২৪° উত্তর অক্ষাংশে, ৩৯° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

ঘটনাটি এই যে, তাবেয়ী কুরাইব ইবনে আবী মুসলিম (৯৮ হি.)-কে উম্মুল ফযল বিনতুল হারিছ কোনো কাজে মুয়াবিয়া রা.-এর কাছে শামে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাজ সমাপ্ত করলেন। ইতিমধ্যে শামে রমযানের চাঁদ দেখা গেল এবং জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখা গেল এবং জুমাবার থেকে রোযা শুরু হল। কুরাইব মাসের শেষের দিকে মদীনায় পৌঁছলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা., যিনি ছিলেন কুরাইবের মাওলা, কথাপ্রসঙ্গে কুরাইবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ?’ কুরাইব বললেন, ‘জুমা-রাতে।’ ইবনে আববাস রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি নিজে দেখেছ?’ তিনি বললেন, ‘হাঁ, আমিও দেখেছি, অন্যরাও দেখেছেন। সবাই রোযা রেখেছেন। মুয়াবিয়া রা.-ও (ঐ সময়ের আমীরুল মুমিনীন) রোযা রেখেছেন।’ আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বললেন,

لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه

‘কিন্তু আমরা তো শনিবার রাতে (শুক্রবার দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা আমাদের হিসাবমত ত্রিশ রোযা পুরা করব,

তবে যদি (২৯ তারিখ দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখি সেটা আলাদা কথা।'

কুরাইব জিজ্ঞাসা করলেন-

أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه

'আপনি কি মুয়াবিয়া রা.-এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে করবেন না?'

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বললেন-

لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

'না, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ আদেশই করেছেন।'

(সহীহ মুসলিম ১০৮৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৭৮৯; জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৩৩২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৬৯৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২১১১)

এ ঘটনা সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কুরাইব একজন তাবেয়ী ও ছিকা (বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য) ব্যক্তি এবং আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর অতি ঘনিষ্ট। আর আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর কাছে রমযান সম্পর্কে এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট। তিনি নিজেই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের চাঁদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনের (আ'রাবীর) সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন (বায়হাকী খ. ৩, পৃ. ২১১-২১২)।

আর কুরাইব শুধু নিজের চাঁদ দেখার সংবাদ দেননি, আমীরুল মুমিনীনের নিকট চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া ও তা কার্যকর হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন।

যাই হোক, এ সংবাদের উপর নির্ভর করে এই ফয়সালা করা যে, রমযান মূলত জুমাবারেই শুরু হয়েছে। আমরা চাঁদ দেখিনি এবং যথাসময়ে অন্য জায়গার চাঁদ দেখার সংবাদও পাইনি। এ কারণে আমাদের একটি রোযা কাযা হয়ে গেছে। কুরাইবের সংবাদের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিল না। ইবনে আববাস রা.কে যদি দূরবর্তী অঞ্চলের এই চাঁদ দেখা গ্রহণ করতে হত তাহলে মাসআলার দিক থেকে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি; বরং বলেছেন-

هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনই আদেশ করেছেন।

এখন এটা আলাদা বিষয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর কাছে এ বিষয়ে (দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হওয়া না হওয়া) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ ও নির্দেশনা ছিল, না তিনি এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ বাণীর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, যা তাঁর মতো আরো অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যে বাণীতে (তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়) এর নির্দেশ রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন-

إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثلاثين.

ঐ সকল লোকের উপর আমার আশ্চর্য হয়, যারা রমযান আসার আগেই রোযা রাখতে শুরু করে। আল্লাহর রাসূল সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন

রোযা রাখবে এবং যখন (দ্বিতীয়) চাঁদ দেখবে তখন রোযা ছাড়বে। চাঁদ যদি আড়ালে থাকে তাহলে ত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করবে। (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ৪/২০৭)

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. এ-ও বর্ণনা করেছেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين.

তোমরা একটি বা দুটি রোযার দ্বারা (রমযান) মাসের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না। তবে যদি তোমাদের কারো (অভ্যাসগত নফল) রোযার দিবস হয়, যা সে আগে থেকে রেখে আসছে তাহলে আলাদা কথা। আর তোমরা চাঁদ দেখার আগে রোযা রাখবে না এবং (দ্বিতীয়) চাঁদ দেখা পর্যন্তই রোযা রাখবে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে ত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করবে। (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ৪/২০৭)

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর কাছে যদি এ বিষয়ে (দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় না হওয়ার বিষয়ে) কোনো সুস্পষ্ট বাণী না-ও থেকে থাকে এবং তিনি 'রাসূলের আদেশ' বলে উপরোক্ত হাদীসের প্রতিই ইঙ্গিত করে থাকেন, তবুও তো এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

(তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ চাঁদ দেখে রোযা ছাড়।) শীর্ষক হাদীসের এই অর্থই বুঝেছেন যে, এ হাদীসে নিজ এলাকা ও নিকটবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা উদ্দেশ্য। দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা উদ্দেশ্য নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এ অনুধাবনের সাথে কোনো

মুজতাহিদ ইমামের যদি দ্বিমত থাকে তবে থাকতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা দুটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে :

এক. صوموا لرؤيته শীর্ষক হাদীসের এ ব্যাখ্যাই নির্ধারিত নয় যে, 'যেখানেই চাঁদ দেখা যাক তোমরা রোযা শুরু কর, দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখাও তোমাদের জন্য অবশ্যগ্রহণীয়।' কারণ আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. একজন ফকীহ সাহাবী এবং তিনি নিজে ঐ হাদীস আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, কিন্তু তিনি এর ঐ অর্থ বোঝেননি।

দুই. আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব এই ছিল যে, দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় নয়; নিজ এলাকার চাঁদ দেখাই আমলযোগ্য।

এখন তো আমি মাযহাবই বর্ণনা করছি। তো সাহাবা-যুগে আমরা সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এই মাযহাব পেলাম যে, তিনি দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা ধর্তব্য মনে করেননি। আর এ বিষয়ে অন্য কোনো সাহাবী তাঁর সাথে দ্বিমত করেছেন এমন তথ্য আমাদের জানামতে হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়নি।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৩৬৮-৪৬৩ হি.) মুয়াত্তা মালিকের ভাষ্যগ্রন্থ ''আততামহীদ'' কিতাবে এ বিষয়ে ইমামগণের মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম মত এই উল্লেখ করেছেন যে, অন্য এলাকার চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় নয়। তিনি লেখেন, এটাই আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (সাহাবী) (৬৮ হি.), ইকরিমা (১০৭ হি.), কাসিম বিন মুহাম্মাদ (১০৭ হি.) ও সালিম বিন আবদুল্লাহ (১০৬ হি.) (এই তিনজন তাবেয়ী)-এর মাযহাব। এবং ইসহাক ইবনে রাহূয়াহও (২৩৮ হি.) এ কথাই বলেছেন। এরপর ইবনে আবদুল বার দ্বিতীয় মাযহাব বর্ণনার পর স্পষ্ট ভাষায় লেখেন,

إلى القول الأول أذهب، لأن فيه أثرا مرفوعا، وهو حديث حسن تلزم به الحجة

আমি প্রথম মতই গ্রহণ করি। কারণ এর সমর্থনে একটি মারফূ হাদীস আছে, যা সনদের বিচারে দলীলযোগ্য। আর তা এক বড় সাহাবীর মাযহাব। সাহাবীদের মধ্যে কেউ এ বিষয়ে তার বিরোধিতা করেননি। পাশাপাশি এটি ফকীহ-তাবেয়ীগণের একটি জামাতেরওসিদ্ধান্ত। (আততামহীদ খ. ১৪, পৃ. ৩৫৬-৩৫৮, নাফে-এর সূত্রে বর্ণিত চল্লিশতম হাদীসের আলোচনায়)

সারকথা এই যে, সাহাবা-যুগে দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা 'অবশ্যগ্রহণীয়' না হওয়ার বিষয়ে এক বড় ফকীহ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব পাওয়া গেল। এর বিপরীতে অন্য কোনো সাহাবীর কোনো কথা পাওয়া যায়নি।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

[আগামী সংখ্যায় পড়ুন : ''তাবেয়ী-যুগ'' ও ''চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমাম ও অন্যান্য ফকীহগণের সিদ্ধান্ত''।]

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

অক্টোবর ২০১৩, যিলহজ্ব ১৪৩৪

একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-৩

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাবেয়ী-যুগ

কিছু আগে ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর বরাতে বলা হয়েছে, তাবেয়ীদের মাঝে ইকরিমা, কাসিম ও সালিম রাহ.-এর মাযহাব তা-ই ছিল, যা ছিল সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব। 'আততামহীদ' ছাড়া মুয়াত্তার দ্বিতীয় শরহ (ভাষ্যগ্রন্থ) 'আলইসতিযকারে'ও তিনি ঐ তাবেয়ীগণের মাযহাব উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের আরবী পাঠ এই-

وبه قال عكرمة، والقاسم بن محمد، وسا لم بن عبد الله، وإليه ذهب ابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وطائفة.

"এটিই ইকরিমা, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও সালিম ইবনে

আবদুল্লাহর বক্তব্য। ইবনুল মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহূয়াহসহ একটি জামাতের মাযহাবও এটিই।'' (আলইসতিযকার ১০/২৯)

ইকরিমা (২৫-১০৫ হি.) তো আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর খাস শাগরিদ, বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ।

কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (৩৭-১০৭ হি.) আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর পৌত্র। আর সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (১০৬ হি.) ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর পৌত্র। কাসিম ও সালিম এই দুইজন তাবেয়ী-যুগের ঐ সরতাজ সাত ফকীহগণের অন্যতম, যাদের ''আলফুকাহাউস সাবআ'' বলে স্মরণ করা হয়।

কাসিম রাহ. যে 'সাত ফকীহ'র একজন এ বিষয়ে তো সবাই একমত। আর সালিম রাহ.ও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ইবনুল মুবারক রাহ.-এর মতে। ফিকহ-ফতোয়ায় ''সাত ফকীহ''র মতামতের যে বিশেষ মর্যাদা ও বিশেষত্ব সে সম্পর্কে উসূলে ফিকহ ও তারীখে ফিকহের পারদর্শী ব্যক্তিগণ অবগত।

তো এই দুই মনীষীর মাযহাবও এটাই ছিল যে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবে, দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা তাদের জন্য আবশ্যকীয় নয়। এঁদের সাথে তৃতীয় তাবেয়ী ইকরিমা রাহ.-এরও মাযহাব এটাই ছিল।

এই তিন তাবেয়ীর মাযহাব সম্পর্কে একথা আরো অনেক আগে বলেছেন ইবনুল মুনযির রাহ. (৩১৮ হি.) ''ইশরাফ'' গ্রন্থে (৩/১১২) এবং খাত্তাবী (৩৮৮ হি.) ও বাগাভী (৫১৬ হি.) সহ অন্যান্য গ্রন্থকারগণ।

(দ্র. মাআলিমুস সুনান ২/৮৪, শরহুস সুন্নাহ ৪/১৪৫, আরো দেখা যেতে পারে : আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শাইবা ৬/২৮০ আছার : ৯৬৫৮

(في القوم يرون الإهلال ولا يرونه الآخرون)

আমাদের জানা মতে তাবেয়ী-যুগের এই তিন বিশিষ্ট মনীষীর বিপরীতে অন্য কোনো তাবেয়ীর ফতোয়া বিদ্যমান নেই। শুধু হাসান বসরী (২১ হি.-১১০ হি.) রাহ. থেকে এমন একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যা এই মাযহাবের বিপরীত ধারণা করা হতে পারে। সুনানে আবু দাউদের কোনো কোনো নুসখায় (আবুল হাসান ইবনুল আবদ ও ইবনে দাছার বর্ণনাকৃত মাখতূতায়) আছরটি আছে-

عن الحسن، في رجل كان بمصر من الأمصار، فصام يوم الإثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلالَ ليلة الأحد، فقال : لا يقضي ذلك اليومَ الرجل ولا أهلُ مصره، إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضوه.

হাসান বসরী রাহ. থেকে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তি কোনো শহরে ছিল এবং (সেই শহরবাসীদের সাথে) সোমবার রোযা শুরু করল। এরপর দুই ব্যক্তি এসে সাক্ষ্য দিল যে, তারা দুজন রবিবার রাতে (শনিবার দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখেছে। (সুতরাং রবিবার থেকেই রোযা শুরু হওয়া উচিত ছিল) এ ক্ষেত্রে হাসান রাহ. বলেছেন, শুধু এটুকুর ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তি ও শহরবাসী একটি রোযা কাযা করবে না। তবে তারা যদি জানতে পারে যে, কোনো মুসলিম শহরের অধিবাসীগণ বাস্তবেই রবিবার রোযা রেখেছে তাহলে তারা ঐ দিনের রোযা কাযা করবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩৩৩; তুহফাতুল আশরাফ, হাদীস : ১৮৪৯২)

শব্দের ব্যাপকতা থেকে হাসান বসরী রাহ.-এর ফতোয়ার যদি এ অর্থ করা হয় যে, দূর-দূরান্তের কোনো শহরের অধিবাসীদের বিষয়েও তারা একদিন আগে রোযা রেখেছিল বলে প্রমাণিত হলে এ শহরের অধিবাসীগণকে এক দিনের রোযা কাযা করতে হবে, তাহলে বলা যায়, হাসান বসরী রাহ.-এর মাযহাব ছিল, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য (যদি প্রমাণিত হয়) অবশ্যগ্রহণীয়।

সারসংক্ষেপ

এ পর্যন্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ এই যে, দূর-দূরান্তের অঞ্চলের চাঁদ দেখা ওয়াজিবুল আমল (অবশ্যগ্রহণীয়) না হওয়ার বিষয়ে সাহাবা-যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব পাওয়া গেল, এর বিপরীত কিছু কারো থেকে পাওয়া যায়নি। তাবেয়ী-যুগে তিন বড় মনীষী ইকরিমা রাহ., কাসিম রাহ. ও সালিম রাহ. থেকেও এই মাযহাবই পাওয়া গেল। এর বিপরীত বিবরণ শুধু এক হাসান বসরী রাহ. থেকে পাওয়া যায় যদি তাঁর ফতোয়াকে শব্দের ব্যাপকতার উপর রাখা হয়। নতুবা শক্তিশালী সম্ভাবনা আছে, তাঁর উদ্দেশ্য, নিকটবর্তী কোনো শহরে চাঁদ দেখা ও রোযা রাখা প্রমাণিত হলে কাযা আসবে, অন্যথায় নয়।

চার মাযহাবের মুজতাহিদ ও অন্যান্য ফকীহগণের সিদ্ধান্ত

ইমাম তিরমিযী রাহ. (২৭৯ হি.) তার 'জামি' গ্রন্থে কিতাবুস সিয়াম (সিয়াম-অধ্যায়)-এর নবম বাব (পরিচ্ছেদের) শিরোনাম দিয়েছেন-

باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم

(প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসরণীয় সংক্রান্ত হাদীস) এই শিরোনামের অধীনে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা 'সাহাবা-যুগ' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। এই হাদীস বর্ণনার পর ইমাম তিরমিযী রাহ. লেখেন-

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن لكل أهل بلد رؤيتهم.

ইবনে আববাস রা.-এর উপরোক্ত হাদীস 'সহীহ'। (ইমাম তিরমিযীর বিশেষ পরিভাষায় ''হাসানুন সহীহুন গরীবুন'') এবং আহলে ইলমের (ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের) আমলও এটাই যে, প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য নিজেদের দেখাই গ্রহণযোগ্য। (জামে তিরমিযী ২/২৩২, হাদীস : ৭০২-এর অধীনে)।

ইমাম তিরমিযী রাহ. বিধান সংক্রান্ত হাদীসের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীসের ইমাম ও মুজতাহিদ ফকীহগণের মাযহাব বর্ণনা করে থাকেন। সাহাবা, তাবেয়ীনের মাযহাবের সাথে চার ইমাম, সুফিয়ান ছাওরী ও ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ রাহ.-এর মাযহাব বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। অথচ আলোচ্য বিষয়ে তিনি কোনো ইখতিলাফই বর্ণনা করেননি। সাধারণভাবে 'আহলে ইলমে'র মাযহাব বর্ণনা করেছেন যে, 'প্রত্যেকে নিজ অঞ্চলের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবে।' (অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় নয়) বোঝা গেল, ইমাম তিরমিযী রাহ.-এর দৃষ্টিতে অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মাসলাক সেটাই, যা তিনি উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করেননি।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. সাহাবা-তাবেয়ীনের মাযহাব বর্ণনার পর পরবর্তী ফকীহগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) ও ইমাম ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ রহা. (১৬১-২৩৮ হি.) এর নাম উচ্চারণ করে বলেছেন যে, এঁদেরও মাসলাক এটাই ছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখাই ধর্তব্য) (আলইসতিযকার ১০/২৯)

ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ রাহ.-এর মাসলাক সম্পর্কে আরো দেখুন : আলইশরাফ, ইবনুল মুনযির ৩/১১২; মাআলিমুস সুনান, খাত্তাবী ২/৮৪; শরহুস সুন্নাহ, বাগাভী ৪/১৪৫

এবার চার মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের অনুসারী ফকীহগণের মাযহাব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হানাফী মাযহাব

হানাফী মাযহাব সম্পর্কে মশহূর হয়েছে যে, এই মাযহাবের ''জাহিরুর রিওয়ায়াহ'' হল, 'ইখতিলাফুল মাতালি' (চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা) ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ যেকোনো জায়গার চাঁদ

দেখা সব জায়গার জন্য ‘ওয়াজিবুল আমল’ অবশ্যপ্রযোজ্য। এমনকি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলেও পূবের লোকদের জন্য তা অবশ্যগ্রহণীয়।

‘‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’’ শব্দবন্ধ থেকে মনে করা হয়েছে, এ মাসআলা সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রা. থেকে বর্ণিত। অতপর এ ধারণাও করা হয়েছে যে, এটি যখন ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ তখন এর বিপরীতে মাযহাবের অন্যান্য ফকীহ ও মাশাইখের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ তো সব কিছুর উপরে!!

পর্যালোচনা :

এ কথা স্বীকৃত যে, হানাফী মাযহাবের একাধিক কিতাবে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়াকেই মুফতা বিহী বলা হয়েছে। কেউ কেউ আরো বলেছেন যে, এটিই মাযহাবের অধিকাংশ মাশাইখের মাসলাক। কিন্তু ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ কথাটির বিষয়ে বিনীত নিবেদন এই যে, হানাফী মাযহাবে ঐ সিদ্ধান্ত ‘জাহিরুর রিওয়াহ’ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয় এবং এ কথাও ঠিক নয় যে, এ মাসআলা (উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয় এবং পশ্চিমের চাঁদ পূবের জন্যও অবশ্যগ্রহণীয়) ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে সরাসরি বর্ণিত। তদ্রূপ এ ধারণাও ঠিক নয় যে, হানাফী মাযহাবে যায়লায়ী বা আলাউদ্দীন কাসানী ছাড়া এ সিদ্ধান্তের বিরোধী কেউ নেই। বরং হানাফী মাযহাবের অনেক ফকীহ, যারা মাযহাবের মনীষী ব্যক্তিত্ব এবং ফিকহ ও হাদীসে যাঁদের মাকাম যথেষ্ট উঁচু তাঁরা যায়লায়ী ও কাসানীর আগেই ঐ সিদ্ধান্তের বিপরীতে ফতোয়া দিয়েছেন।

আর বাস্তবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের আমলও তাঁদেরই ফতোয়ার উপর, ঐ প্রসিদ্ধ মাসলাকের উপর নয়, যাকে ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ মনে করা হয়েছে।

কেন এটি ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ নয়

ফিকহ-ফতোয়ার সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখে এমন তালিবে ইলমেরও জানা আছে যে, কোনো মাসআলাকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলার অর্থ হয়, মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ.-এর ছয় কিতাবের এক কিতাবে আছে। কিতাবুল আসল (যার আরেক নাম 'আলমাবসূত) আলজামিউস সগীর, আলজামিউল কাবীর, আসসিয়ারুস সগীর, আসসিয়ারুল কাবীর ও আযযিয়াদাত-এই ছয় কিতাবের কোনো কিতাবে আছে। যেহেতু এই কিতাবগুলো ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে 'শুহরাত' ও 'ইস্তিফাযা' সূত্রে বর্ণিত এবং মাযহাবের সকল ফকীহ্র কাছে 'মুতালাক্কা বিলকবুল' এবং সাদরে বরণীয় তাই এই কিতাবের মাসআলাসমূহের নাম 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'। অর্থাৎ এই সকল মাসআলা যে বর্ণনা-ধারায় এসেছে, তা শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত এবং ইমাম মুহাম্মাদ (হানাফী মাযহাবের মাসাইলের সংকলক ও আবু হানীফা -আবু ইউসুফের শাগরিদ) থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

পক্ষান্তরে নাদির রেওয়ায়েত (বহুবচন : নাওয়াদির) বলা হয়, যে মাসআলাগুলো এক দুই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেই সূত্রগুলো বর্ণনাকারীর বিচারে সহীহ হলেও তা মাশহুরের পর্যায়ে পৌঁছেনি এবং জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র মতো 'মুতালাক্কা বিল কবুল'ও হয়নি। এ ধরনের মাসআলাগুলো সাধারণত ''নাওয়াদির'' এবং ''আমালী'' শিরোণামের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

যাই হোক এখন আমাদের দেখার বিষয় এই যে, আলোচিত মাসআলা (চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়, পশ্চিমের চাঁদ পূবের লোকদের নিকট প্রমাণিত হলে তা অবশ্যগ্রহণীয়) উপরোক্ত ছয় কিতাবে আছে কি না।

আলহামদুলিল্লাহ 'কিতাবুল আসল' তো এখন বারো খন্ডে ছাপা হয়েছে। 'আলজামিউস সগীর' ও 'আলজামিউল কাবীর' আগে থেকেই ছাপা আছে। 'আসসিয়ারুল কাবীর', যা জিহাদের মাসাইল বিষয়ে, আলাদাভাবে আমাদের সামনে নেই, তবে ইমাম সারাখসী

রাহ.-এর শরহের মধ্যে একীভূত হয়ে ‘শরহুস সিয়ালি কাবীর’ নামে মুদ্রিত হয়েছে। তেমনি আযযিয়াদাত’ কাযী খানের শরহের মধ্যে একীভূত হয়ে ‘শরহু যিয়াদাত’ নামে ছেপেছে। থাকল ‘আসসিয়ারুস সগীর’ (জিহাদের মাসাইলের উপর ছোট কিতাবটি) তো এ কিতাবের মাসাইল ‘কিতাবুল আসল’ ইমাম মুহাম্মাদ রাহ., ও ‘আররাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ী’, ইমাম আবু ইউসুফ এ বিদ্যমান আছে। সুতরাং এখন যে কোনো আলিম এ মাসআলা উপরোক্ত কিতাবসমূহে তালাশ করতে পারেন। আমরা সবগুলোতেই তালাশ করেছি, কোনো কিতাবে এমন কেনো মাসআলা পাইনি। কোনো ভাই যদি ঐ কিতাবসমূহ থেকে এ মাসআলা বের করে দেন তবে আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

শুধু এই নয় যে, ঐ সকল কিতাবে এ মাসআলা আমরা পাইনি। শুধু এটুকু হলে নিশ্চিতভাবে বলতাম না যে, এ মাসআলা ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ নয়। কারণ হতে পারে, উপরোক্ত কিতাবসমূহের কোনো মাখতূতা (হস্তলিখিত পান্ডুলিপিতে) এ মাসআলা আছে, যা মুদ্রিত নুসখাসমূহে আসেনি। হতে পারে সেই নির্ভরযোগ্য মাখতূতার ভিত্তিতেই আমাদের পরবর্তী কোনো কোনো ফকীহ এ মাসআলাকে ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ বলেছেন।

এই সম্ভাবনার উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। এ কারণে এ মাসআলা ফিকহে হানাফীর প্রাচীন সূত্রগুলোতে তালাশ করা হয়েছে, বিশেষভাবে ঐ কিতাবগুলো বারবার মুতালাআ করা হয়েছে, যা জাহিরুর রিওয়ায়াহর মাসাইল গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে কিংবা মূলত যা ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’-এর মাসাইল সংকলনের জন্য লেখা হয়েছে। কিন্তু ঐ সকল কিতাবেও এ মাসআলা পাওয়া যায়নি। এবং আবু হানীফা রাহ. আবু ইউসুফ রাহ. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. কারো যবানীতেই এমন কোনো কথা আমরা পাইনি যে

لا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়)।

আর না তাঁদের কারো উদ্ধৃতিতে এ কথা পেয়েছি যে-

لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل المشرق

(পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলে পুবের লোকদের উপরও রোযা ফরয হয়ে যাবে।) এ ধরনের কোনো কিছুই এসব কিতাবে মাযহাবের মূল ইমামদের বা পূর্ববর্তী কোনো ফকীহর উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়নি।

উদাহরণস্বরূপ : 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসাইলের জন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হাকিম শহীদ রাহ. (৩৩৪ হি.)-এর 'মুখতাসারুল কাফী' যার ভাষ্য লিখেছেন ইমাম সারাখসী রাহ. 'আলমাবসূতে' যা ত্রিশ খন্ডে প্রকাশিত। আমরা এ মাসআলা সারাখসীর আলমাবসূতেও পাইনি।

'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র মাসাইলের এক নির্ভরযোগ্য সংকলন ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বিন সদরুস শরীয়া (৫৫১-৬১৬ হি.)-এর 'আলমুহীতুল বুরহানী''। যা কয়েক বছর আগে বৈরুত থেকে ইদারাতুল কুরআন করাচীর পক্ষ থেকে ২৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ কিতাবের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে লেখক প্রথমে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসাইল উল্লেখ করেছেন, এরপর 'নাদির রিওয়ায়াত' ও 'ফাতাওয়া মাশাইখ' উল্লেখ করেছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন-

وجمعت مسائل المبسوط، والجامعين والسير، والزيادات، وألحقت مسائل النوادر والفتاوى والواقعات ... .

আমি এতে মাবসূত (কিতাবুল আসল) দুই জামি (অর্থৎ আলজামিউল কাবীর আলজামিউস সগীর), সিয়ার ও যিয়াদাতের মাসআলাসমূহ একত্র করেছি। এরপর এর সাথে নাওয়াদির, ফাতাওয়া ও ওয়াকিয়াত (ঐ সময়ের নতুন মাসাইল) শ্রেনীর মাসাইল

যোগ করেছি ...।' (আলমুহীতুল বুরহানী ১/১৫৯)

তো এ কিতাবেও 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র বরাতে এ মাসআলা উল্লেখিত হয়নি; বরং এ কিতাবের তৃতীয় খন্ডে (পৃষ্ঠা : ৩৪১) এ বিষয়ের আলোচনাই শুরু হয়েছে এভাবে-

أهل بلدة إذا رأوا الهلال هل يلزم ذلك في حق أهل بلدة أخرى؟ اختلف المشايخ فيه.

কোনো শহরের অধিবাসীরা যখন চাঁদ দেখবে তখন কি তাদের চাঁদ দেখা অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্যও অবশ্যগ্রহণীয় হবে? এ বিষয়ে মাশাইখের ইখতিলাফ আছে ...।' তো কথা শুরুই হচ্ছে মাশাইখের বরাতে। এরপর তিনি ইখতিলাফ উল্লেখ করেন, যা সামনে তাঁরই ভাষায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এখন শুধু এটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, এ কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদের ছয় কিতাবের বরাতে বা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' শিরোণামে ঐ মাসআলার নাম-নিশানাও নেই, যা হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলে মশহূর হয়ে গেছে।

মুখতাসারুত তহাবী (৩২১ হি.), মুখতাসারুল কারখী (৩৪০ হি.) মুখতাসারুল কুদুরী (৪২৮ হি.), বিদায়াতুল মুবতাদী (৫৯৩ হি.) (হেদায়া যার শরহ-ভাষ্যগ্রন্থ), তুহফাতুল ফুকাহা, আলাউদ্দীন সমরকন্দী (৫০৮ হি.)-এ কিতাবগুলোও জাহিরুর রিওয়ায়াহর মাসাইলের বিশেষ সূত্র হিসেবে গণ্য। কিন্তু এসব কিতাবেও এ মাসআলা আমরা পাইনি।

আলমুহীতুল বুরহানীর মতো জাহির রেওয়ায়েতের মাসআলার জন্য রযীউদ্দীন সারাখসী রাহ. (৫৪৪ হি.)-এর কিতাব 'আলমুহীতুর রাযাভী' এবং ইউসুফ ইবনে আলী আল জুরজানী রাহ.-এর কিতাব 'খিযানাতুল আকমাল'ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জানামতে, এই দুই কিতাব এখনো ছাপেনি। তবে আল্লাহর শোকর, এগুলোর মাখতূতা থেকে এই মাসআলা তাহকীক করার তাওফীক আল্লাহ

তাআলা দিয়েছেন। তাহকীক দ্বারা জানা গেছে যে, এগুলোতেও এই মাসআলা জাহির রেওয়ায়েতের শিরোণামে বা ইমাম মুহাম্মাদের ঐ ছয় কিতাবের বরাতে নেই।

‘খিযানাতুল আকমাল’ ফিকহে হানাফীর মাসাইলের গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। এর ‘মাখতূতা’ (হস্তলিখিত পান্ডুলিপি) ইস্তাম্বুলের ‘মাকতাবায়ে ফয়যুল্লাহ’য় সংরক্ষিত আছে। ফটোকপি আছে জামেয়া উম্মুল কুরা মক্কা মুকাররমার কুতুবখানায়। আমাকে এ নুসখা সম্পর্কে জানিয়েছেন আমার শাগরিদ মাওলানা তাহমীদুল মাওলা। এরপর আমি শায়খ ত্বহা হোসাইন ইবনে দানিশকে (মুকীম, মক্কা মুকাররমা) অনুরোধ করি, তিনি যেন এ নুসখা থেকে অন্তত কিতাবুস সওমের অংশ কপি করে পাঠান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, তিনি তা পাঠিয়েছেন।

খিযানাতুল আকমালের ভূমিকায় লেখক নিজে এর ধারাবাহিক বিন্যাস উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে তিনি মুখতাসারুল হাকিম শহীদ এর মাসাইল (যা মূলত ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর ‘কিতাবুল আসলে’র মাসাইলের সংকলন) উল্লেখ করবেন। অতপর ‘আলজামিউল কাবীর’ ও ‘আল জামিউস সগীর’-এর মাসাইল উল্লেখ করবেন। এরপর হাসান বিন যিয়াদ এর ‘আল মুজাররাদ’, ‘আল মুনতাকা’, ‘আল কারখী’ ‘শরহুত তহাবী’, উয়ূনুল মাসাইল, আবুল লাইছের ‘মুখতালিফ’ আল খাস্সাফের ‘আদাবুল কাযী’ আন নাতিফির ‘আল আজনাস’, ‘আররওযা’ ও ‘আল ফাতাওয়া’, ফাতাওয়াল বাক্কালী, ফাতাওয়া আবিল লাইছ ও ফাতাওয়াল কাযী সায়িদ-এর মাসাইল উল্লেখ করবেন।

ভূমিকার শেষে এ-ও লিখেছেন যে, এ কিতাব লেখা শুরু হয়েছে ৫২২ হি. ঈদুল আযহার দিন।

এই সমৃদ্ধ ও বরকতপূর্ণ কিতাব থেকে সাওমের অংশ পাঠ করলাম কিন্তু এতে ঐ দুটি কথা (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় বা পশ্চিমের

চাঁদ দেখা পূর্বের অধিবাসীদের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়) না জাহিরুর রিওয়ায়াহর কোনো কিতাবের উদ্ধৃতিতে, না নাদির রেওয়ায়েতের কোনো কিতাবের উদ্ধৃতিতে আছে, না উল্লেখিত অন্য কোনো কিতাবের বরাতে।

এই বাস্তবতা সামনে রেখে চিন্তা করলে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়' বা 'পশ্চিমের চাঁদ দেখা পূর্বের অধিবাসীদের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়' এই দুই কথার কোনোটি না জাহির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহে আছে, না নাদির রেওয়ায়েতের কিতবাসমূহে,আর না খিযানাতুল আকমালের ভূমিকায় উল্লেখিত বুনিয়াদী কিতাবসমূহে। তদ্রূপ না তা আছে তহাবীর আলমুখতাসার' বা তার শরাহ-গ্রন্থে,আর না কারখীর কিতাবে।

''খিযানাতুল আকমলে'র একটি নুসখা হিন্দুস্তানের মাকতাবায়ে রেযা রামপুরেও আছে। দারুল উলূম দেওবন্দের তালিবে ইলম মাওলানা মোশতাক আহমাদ আমার অনুরোধে রামপুর সফর করে এ মাখতূতা দেখেছেন এবং সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো আমার জন্য সংগ্রহ করেছেন। তাতেও এ ধরণের কোনো কথা নেই।

এবার 'আলমুহীতুর রাযাভী'র কথা শুনুন। এ কিতাবের আরেক নাম 'মুহীতুস সারাখসী'। এর একটি মাখতূতা করাচীর প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা আহসানুল উলূম গুলশান ইকাবলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হযরত মাওলানা যারওয়ালী খান ছাহেবের কুতুবখানায় আছে। জামেয়াতুর রশীদ করাচীর উস্তাজ মাওলানা জহীরুদ্দীন বাবর ছাহেব আমার অনুরোধে এ মাখতূতার সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোর নকল আমার জন্য পাঠিয়েছেন। এতেও একই অবস্থা। 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া' বা পশ্চিমের চাঁদ পূবের লোকদের জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয় হওয়া' কোনো কথাই না জাহিরুর রিওয়ায়াহর বরাতে আছে, না নাদির রেওয়ায়েতের বরাতে।

সারকথা দাড়াচ্ছে, জাহির রেওয়ায়েতের ছয় কিতাবে বা পরের যে

সকল কিতাবে জাহির রেওয়ায়েতের মাসাইল সংকলন হয়েছে, তার কোনোটিতেই আমার জানা মতে 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়', বা পশ্চিমের চাঁদের কারণে পূবের লোকদের উপর রোযা ওয়াজিব হবে, এ ধরণের কোনো কথা নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ কথাগুলোকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসআলা কে বলেছেন, কীভাবে বলেছেন -এ বিষয়টিই আগামী শিরোণামগুলোর বিষয়বস্ত্ত।

'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' প্রসঙ্গ কীভাবে এল

অনুসন্ধানে যদ্দূর জানা গেছে, এ কথা সর্বপ্রথম (আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন) আল্লামা তাহির ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ আলবুখারী রাহ.-এর কিতাব 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' থেকে শুরু হয়েছে। ওখান থেকে আল্লামা হাসান বিন মানসূর কাযী খান রাহ. তাঁর 'ফাতাওয়া'য় নিয়েছেন (যা খানিয়া নামে প্রসিদ্ধ)। এরপর এ দুজনের উপর নির্ভর করে পরের অনেক মুসান্নিফ এ কথা লিখেছেন। কেউ তাদের বরাত দিয়েছেন, কেউ দেননি। এভাবেই কথাটি মশহূর হয়ে গেছে।

তাহির বিন আহমদ বিন আবদুর রশীদ রাহ.-এর জন্ম ও মৃত্যুসন 'আততাবাকাতুছ ছানিয়্যা' এবং এর বরাতে 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহর' (২/২৭৬) হাশিয়ায় উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর জন্ম ৪৮১ বা ৪৮২ হিজরীতে আর মৃত্যু ৫৪২ হিজরীতে। কাশফুয যুনূনে (খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭০৩) তাঁর কিতাব 'খিযানাতুল ওয়াকিয়াত'' এর আলোচনায় তাঁর মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরীই লেখা হয়েছে।

কাযী খান রাহ. ছিলেন ছাহিবে হিদায়ার সমসাময়িক। ছাহিবে হিদায়ার জন্ম ৫১১ হিজরীতে, মৃত্যু ৫৯৩ হিজরীতে। কাযী খান রা.-এর মৃত্যুসন তো ঐতিহাসিকগণ ৫৯২ হিজরী লিখেছেন, কিন্তু জন্মসন উল্লেখ করেননি। অনুমান করা যায়, তার জন্মও ৫১০ হি. থেকে ৫২০ হিজরীর মধ্যেই হবে।

আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যা (পৃষ্ঠা : ৮৪) অনুযায়ী কাফাভী রাহ. 'কাতাইবু আলামিল আখবার'' গ্রন্থে লিখেছেন যে, তাহির ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ রাহ. কাযী খান থেকে ইলম হাসিল করেছেন। এটা অসম্ভব নয়। বড় ছোটর থেকে, সমবয়সী সমবয়সী থেকেও ইলম গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু উপরোক্ত সন-তারিখ সামনে রাখলে এই ধারণা সমর্থন করা কঠিন হয় যে, কাযী খান 'খুলাসা' লেখকের উস্তাজ! 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' ও ফাতাওয়া কাযী খান মিলিয়ে পড়লে অনুমিত হয়, কাযী খানের সামনে 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' ছিল এবং তিনি ঐ কিতাবের বিন্যাস ও উপস্থাপনা থেকেও ফায়দা হাসিল করেছেন। যাই হোক, তাঁদের মধ্যে যেই-যার থেকে গ্রহণ করে থাকুন, ইখতিলাফে মাতালি (উদয়স্থলের বিভিন্নতা) ধর্তব্য না হওয়াকে যে হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলা হয়েছে সেটা একজন অপরজনের উপর নির্ভর করেই লিখেছেন। আর পরের অনেক লেখক এই দুজনের উপর বা তাদের কোনো একজনের উপর নির্ভর করে লিখেছেন। উপরের কিতাবসমূহ খুলে এবং সরাসরি 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র ছয় কিতাব দেখে বরাত পরীক্ষা করার সুযোগ হয়নি বা তার প্রয়োজন বোধ করেননি। মোটকথা, এ এক 'তাসামুহ' (ভ্রম)। প্রকৃত অবস্থা জানার পর একে বুনিয়াদ বানানো মুনাসিব নয়।

'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'র আরবী পাঠ এই-

ولو صام أهل بلدة ثلثين يوما للرؤية، وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعليهم قضاء يوم، ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وعليه فتوى الفقيه أبي الليث، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني، قال : لو رأى أهل المغرب هلالَ رمضان يجب الصوم على أهل المشرق، وفي التجريد : اعتبر اختلاف المطالع.

কোনো শহরের অধিবাসীগণ যদি চাঁদ দেখে ত্রিশদিন রোযা রাখে আর অপর শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখে উনত্রিশ রোযা রাখে তাহলে তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে, আর চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়, জাহিরুর রিওয়ায়াহ অনুসারে। এরই

উপর ফকীহ আবুল লাইছের ফতোয়া। আর এরই ফতোয়া দিতেন শামসুল আইম্মা হালওয়ানী। তিনি বলেন, পশ্চিমের অধিবাসীগণ যদি রমযানের চাঁদ দেখে তাহলে পূবের অধিবাসীদের উপর রোযা ওয়াজিব হয়। আর তাজরীদে আছে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৪৯)

আর খানিয়ায় এভাবে লেখা

ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بدلة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعلم من صام تسعة وعشرين يوما فعليهم قضاء يوم، ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى.

(আলখানিয়া ১/১৯৮, ফাতাওয়া আলমগীরীর সাথে মুদ্রিত নুসখা)

উভয় ইবারতে ভালোভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে:

ক. খুলাসা, খানিয়া দুই কিতাবেই কথা শুরু হয়েছে এই মাসআলা থেকে যে, যে শহরের অধিবাসীরা ২৯ রোযা রেখেছেন তাদের কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে, অন্য শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ৩০ রোযা রেখেছেন তাহলে ২৯ রোযাওয়ালাদের উপর এক রোযা কাযা করা জরুরি হবে। যারা ইবারতের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ত্বরা করেন তারা খুলাসা-খানিয়ার ইবারত থেকে এ ধারণাও করতে পারেন যে, লেখকদ্বয় এ মাসআলাকেও ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ -এর মাসআলা বলেছেন। অথচ তা নয়। ঐ ইবারতে في ظاهر الرواية কথাটিকে এ মাসআলার সাথে যুক্ত মনে করা ভিত্তিহীন। আর বাস্তবতাও এই যে, মাসআলাটি ‘নাওয়াদির’ (নাদির রেওয়ায়েত)-এর, ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ -এর নয়। বিষয়টি সামনে বরাতসহ আসছে।

খ. নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলায় এ কথার উল্লেখ নেই যে, দূরে দূরের দুই শহরের ক্ষেত্রে এই বিধান, না কাছাকাছি দুই শহরের ক্ষেত্রে। ফিকহে হানাফীর একাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাবে ও বড় বড়

অনেক ফকীহের বক্তব্যে একথার উল্লেখ আছে যে, এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে, দূরে দূরের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়। সামনে পাঠক তাদের ঐ উদ্ধৃতিগুলো দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

গ. ولا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়)-এ বাক্য নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলায়ও নেই। এটি খুলাসা-খানিয়ার লেখকদ্বয়ের নিজস্ব বাক্য যা তাঁরা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' -এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। তারা যেন বলতে চাচ্ছেন, এ বাক্য ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. -এর ছয় কিতাবের কোনো কিতাবে আছে। অথচ বাস্তবতা এই যে, এ বাক্যের সম্বন্ধ 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর দিকে করা একান্তই 'তাসামুহ' (ভ্রম)। ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এর ছয় কিতাবের কোনো কিতাবেই এর খোঁজ পাওয়া যায় না। আর এই মূলনীতি শ্রেণীর বাক্য

ولا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) তো দূরের কথা, উপরের মাসআলাটিই (২৯ রোযাওয়ালাদের উপর ৩০ রোযাওয়ালাদের কারণে এক রোযা কাযা করার বিধান) 'নাওয়াদির' শ্রেণীর। 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'য় এরো কোনো অস্তিত্ব নেই।

ঘ. খুলাসায় যে বলা হল-

وعليه فتوى الفقيه ابي الليث

এ বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ, ত্রিশ ওয়ালাদের কারণে উনত্রিশ ওয়ালাদের এক রোযা কাযা করার ফতোয়া ফকীহ আবুল লাইছও দিয়েছেন। খুলাসা লেখক আবুল লাইছ রাহ.-এর দিকে এ ফতোয়ার সন্বন্ধ হয়ত এই জন্য করেছেন যে, তিনি ''উয়ূনুল মাসায়িল'' কিতাবে নাদির রেওয়ায়েতের ঐ মাসআলা নকল করে মৌনতা

অবলম্বন করেছেন, কোনো বিপরীত মন্তব্য করেননি। ''উয়ুনুল মাসাইলে'' আছে

وقال أبو يوسف في الأمالي : لو أن أهل بلدة صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوما، وأهل بلد ثلاثين يوما للرؤية، فعلى من صام تسعة وعشرين يوما قضاء يوم.

আবু ইউসুফ রাহ. 'আল-আমালী' গ্রন্থে বলেছেন, কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ২৯ রোযা রাখে, আর অন্য শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখেই ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে ২৯ ওয়ালাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে। (উয়ূনুল মাসাইল পৃ.৩৮)

'আল-আমালী' কিতাবটি নাদির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহের মধ্যে গণ্য। আবুল লাইছ রহ. নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেনমাত্র। তার আরো দুইটি কিতাব 'খিযানাতুর রিওয়ায়াহ' ও 'মুখতালিফুর রিওয়ায়াহ' ও মুদ্রিত। সেগুলোতে তো এ মাসালাটিও নেই, (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়)-শীর্ষক বাক্য তো দূরের কথা।

ঙ. শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (৪৪৮ হি.) -এর ফতোয়ার প্রকৃত পাঠ সম্ভবত সেটাই যা 'আলমুহীতুল বুরহানী'র বরাতে সামনে আসছে। তাঁর উদ্ধৃতিতে ''খুলাসায়'' আলোচ্যস্থানে একথাও আছে যে, 'পশ্চিমের লোক রমযানের চাঁদ দেখলে পূবের লোকদের উপর রোযা ওয়াজিব হয়ে যাবে।' খুলাসার এ বর্ণনা দ্বারা জানা গেলো, এই বাক্য শামসুল আইম্মা হালওয়ানী-এর নিজের। এটি না জাহির রেওয়ায়েতের, না নাদির রেওয়ায়েতের আর না তাঁর আগের কোনো হানাফী আলিমের বরাতে তিনি একথা বলেছেন। সুতরাং ফাতহুল কাদীরে (২/২৪৩) যে একথাকেই 'জাহিরুল মাযহাব' (হানাফী মাযহাবের জাহির রেওয়ায়েত) লেখা হয়েছে তা 'তাসামুহ'।

চ. খানিয়ার ইবারত

وكذا ذكر شمس الائمة الحلواني

(শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রাহ. এমনটাই বলেছেন) এর অর্থ তিনি এক শহরের চাঁদ দেখাকে অন্য শহরের লোকদের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় বলেছেন। তাঁর বিস্তারিত ইবারতের উদ্ধৃতি 'আলমুহীতুল বুরহানী'র বরাতে সামনে আসছে। খানিয়ার উপরে উদ্ধৃত অংশটুকুর অর্থ কখনো এই নয় যে, শামসুল আইম্মা হালওয়ানীও 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়' বক্তব্যকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলেছেন। যিনি আরবী ইবারত সঠিকভাবে বোঝেন তিনি কখনো এমনটা বলবেন না। তথাপি যেন ত্বরাপ্রিয় কোনো পাঠকেরও বিভ্রান্তি না হয় এ জন্য বিষয়টি পরিষ্কার করলাম যে, এ না খানিয়ার এবারতের মর্ম, আর না বাস্তবের সাথে এর মিল আছে। যা বাস্তব তা 'আলমুহীতুল বুরহানী'র বরাতে স্বয়ং শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর জবানীতে আসছে।

এ পর্যন্ত যে কথাগুলো আরজ করা হল তার সারসংক্ষেপ এই:

ক. 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়' বা পশ্চিমের চাঁদ দেখা পূর্বের অধিবাসীদের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়' এ কথাগুলো ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. কারো থেকেই বর্ণিত নয়।

খ. এ কথাগুলো না জাহির রেওয়ায়েত-এর কিতাবসমূহে আছে, না নাদির রেওয়ায়েত-এর কিতাবসমূহে।

গ. নাদির রেওয়ায়েতে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে যে শহরের অধিবাসীরা উনত্রিশ রোযা রেখেছেন তারা একটি রোযা কাযা করবেন।

এ মাসআলা সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) থেকে বর্ণিত। ইমাম আবু হানিফা থেকে নয়। এবং সাহেবাইন থেকেও 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'য় না 'নাদিরুর রিওয়ায়াহ'তে বর্ণিত। এ মাসআলাটিই ঐ

ফকীহগণের বক্তব্যের ভিত্তি, যারা বলেছেন, হানাফী মাযহাবে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। অথচ হানাফী মুতাকাদ্দিমীন (পূর্বসূরী) ফকীহগণ এ মাসআলার এ অর্থ বুঝেছেন যে, এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে, দূরে দূরের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়। দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরনীয় নয়। এ বিষয়টির আরো বিশদ আলোচনা আগামী শিরোনামগুলোর অধীনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

হানাফী ইমামগণ থেকে বর্ণিত মাসআলা কী

আলহামদুলিল্লাহ, এটুকু তো প্রমাণিত হল যে, 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়' শীর্ষক মাসআলা ফিকহে হানাফীর 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' নয় এমনকি নাদির রেওয়ায়েতও নয়। এখন দেখার বিষয় এই যে, হানাফী ইমামদের থেকে বর্ণিত মাসআলা কী, যা থেকে পরবর্তীরা এই মাসআলা বের করেছেন যে, 'উদয়স্থলের ভিন্নতার কোনো ইতিবার নেই।' তো ঐ মাসআলা সেটিই যা খানিয়া, খুলাসা উভয় কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাসআলাটি আমরা এখানে হাওয়ালাসহ উল্লেখ করছি।

মাসআলাটি হাকিম শহীদ রাহ. (৩৩৪ হি.)-এর ''আলমুনতাকা'' এর বরাতে 'আলমুহীতুল বুরহানী' তে বর্ণিত হয়েছে। 'আলমুনতাকা'র বিষয়বস্তু হচ্ছে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর বাইরের মাসাইল, যা তিনি নাওয়াদির ও আমালী থেকে জমা করেছেন। (কাশফুয যুনূন ২/১৮৫১-১৮৫২)

আর জাহিরুর রিওয়ায়া-এর মাসাইল তিনি সংকলন করেছেন 'আলমুখতাসারুল কাফী' তে।

আলমুহীতুল বুরহানীর ইবারত এই-

أهل بلدة إذا رأوا الهلالَ هل يلزم ذلك في حق أهل بلدة أخرى؟ اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا : لا يلزم ذلك به، وإنما المعتبر في حق كل بلدة رؤيتهم، وبنحوه ورد الأثر عن ابن عباس

رضي الله عنهما.

وفي المنتقى : بشر عن أبي يوسف، وإبراهيم عن محمد : إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية، وصام أهل بلدة تسعة وعشرين للرؤية فعليهم قضاء يوم.

وفي القدوري : إذا كان بين البلدتين تفاوت لا تختلف المطالع، لزم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى، فأما إذا كان تفاوت تختلف المطالع فيه لم يلزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى.

وذكر شمس الأئمة الحلواني : أن الصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله : أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم أهل هذه البلدة.

অর্থ : কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখল। এ দেখা কি অন্য শহরের অধীবাসীদের জন্যও আবশ্যঅনুসরণীয়? এ বিষয়ে মাশাইখের ইখতিলাফ আছে। কেউ বলেন, অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য শুধু তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. এর আছর বর্ণিত হয়েছে। আলমুনতাকায় আছে: বিশ্র আবু ইউসুফ রাহ. থেকে এবং ইবরাহীম মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কোনো শহরের অধিবাসী চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে আর অন্য শহরের লোকেরা চাঁদ দেখে ২৯ রোযা রাখে তাহলে এদের একদিনের রোযা কাযা করা জরুরি।

কুদুরীতে আছে: যখন দুই শহরের মাঝে দূরত্ব এ পরিমাণ না হয় যদ্বারা তাদের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায় তখন এক শহরের বিধান অন্য শহরের জন্যও প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে দূরত্ব যদি এমন হয় যে, দুই শহরের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায় তাহলে একের বিধান অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রাহ. উল্লেখ করেছেন, আমাদের আসহাবের (ফকীহগণের) মাযহাবে সঠিক কথা এই যে, (এক শহরের সংবাদ) যদি ‘মুস্তাফীয’ (চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে আসা) হয়ে যায় এবং অন্য শহরের অধিবাসীদের কাছে তা প্রমাণিত হয়

তখন তাদের জন্য ঐ শহরের বিধান প্রযোজ্য হবে। (আলমুহীতুল বুরহানী খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৪১-৩৪২, ইদারাতুল কুরআন করাচী কর্তৃক মুদ্রিত ১৪২৪ হি:)

আলমুহীতুল বুরহানীর এ আলোচনার উপর চিন্তা করুন:

১. এতে 'জাহির রিওয়ায়াহ' বা 'নাদির রিওয়ায়াহ'-এর বরাতে لا عبرة لاختلاف المطالع বাক্য উল্লেখিত হয়নি।

২. এতে খানিয়া ও খুলাসায় বর্ণিত মাসআলা (২৯ রোযা আদায়কারীদের **১** রোযা কাযা করার বিধান) হাকিম শহীদ রাহ. এর (৩৩৪ হি.) আলমুনতাকা-এর বরাতে এসেছে। ''খিযানাতুল আকমালে''ও এ মাসআলা ''আলমুনতাকা'' এর বরাতে আছে (পৃষ্ঠা : **১১৬**, মাখতূতা, জামেয়া উম্মুল কুরা)। ''আলমুনতাকা''র বিষয়বস্তু হচ্ছে নাদির রেওয়ায়েতের মাসাইল সংকলন করা। খোদ হাকীম শহীদ রাহ. ''আলমুনতাকা''র ভূমিকায় একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। ''কাশফুয যুনূনে'' (খ. ২ পৃ.১৮৫১-১৮৫২) হাজী-খলীফা তাঁর ইবারতও তুলে দিয়েছেন। ''আলমুনতাকা''য় মাসআলার সনদও উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ থেকে এ মাসআলার বর্ণনাকারী হচ্ছেন বিশ্র (অর্থাৎ বিশ্র ইবনুল ওয়ালিদ) আর ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. থেকে এর বর্ণনাকারী, ইবরাহীম (অর্থাৎ ইবরাহীম ইবনে রুস্তম)। দুজনই নাদির রেওয়ায়েতের রাবী, জাহির রেওয়ায়েতের নয়। জাহির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহের রাবী তো আবু হাফস কাবীর রাহ. (ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাজ) এবং আবু সুলায়মান মুসা ইবনে সুলায়মান আল জুযাযানী রহ.। (আলমাবসূত সারাখসী খ.৩০ পৃ ২৪৪)

অতপর এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন আবুল লাইছ সমরকন্দী রহ. ''উয়ূনুল মাসাইল'' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা : ৩৮) ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর ''আলআমালী'' থেকে। আর এ তো জানা কথা যে, ''আলআমালী'' নাদির রেওয়ায়েতেরই সূত্র। (রদ্দুল মুহতার খ. : ১, পৃ. : ৬৯)

এবং আল মুহীতুর রাযাভীতে (পৃ ১৯১-১৯২ আহসানুল উলূম করাচীর মাখতুতা) এ মাসআলা আছে ذکر هشام فی نوادره عن محمد رحمه الله শিরোণামে। অর্থাৎ হিশাম ইবনে উবায়দুল্লাহ রাযী একে নাওয়াদিরে (নাদির এর বহু বচন) ইমাম মুহাম্মাদ-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ মাসআলা নাদির রেওয়ায়েতের, জাহির রেওয়ায়েতের নয়।

৩. নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার সারকথা হচ্ছে, কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করেছে এবং ত্রিশ রোযা পুরা করার পর শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে পক্ষান্তরে অন্য কোনো শহরের অধিবাসীরা রমযানের চাঁদ দেখে উনত্রিশ রোযা রেখেছে এরপর শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে তাহলে এদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে।

৪. এ মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করার বিষয় এই যে, এ বিধান কি এত ব্যাপক যে, পৃথিবীর যে কোনো শহরে চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখা হলে পৃথিবীর অন্য যে কোনো শহরে যারা চাঁদ দেখে উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে এক রোযা কাযা করতে হবে? না এ বিধান শুধু কাছাকাছি শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়?

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যাঁদের থেকে (নাদির রেওয়ায়েতে) এ মাসআলা বর্ণিত, তাঁদের ও তাঁদের শাগরিদ ইমামদের তরফ থেকে এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমাদের জানা মতে নেই। পরের হানাফী ফকীহদের মাঝে এ বিষয়ে দুটি মত সৃষ্টি হয়েছে। একটি সাহেবে হেদায়া ও তাঁর পূর্বের অনেক ফকীহদের মত। তাঁরা এ বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। দ্বিতীয় মত 'খুলাসা' ও 'খানিয়া' লেখকদ্বয়ের। তাঁরা বাহ্যত একে আম ও ব্যাপক মনে করেন। তাঁদের মতে, এ বিধান

দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আলমুহীতুল বুরহানীর লেখক ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমূদ (৬১৬ হি.) এর কাছে সম্ভবত প্রথম মতই অগ্রগণ্য। এ কারণে তিনি এ মাসআলা উল্লেখ করার পরই কুদুরী রহ. (৪২৮ হি.)-এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, যা এ মতকে সমর্থন করে। 'পশ্চিমে চাঁদ দেখা গেলে পূবের লোকদের জন্যও তা প্রযোজ্য হওয়ার কথা, যা খুলাসা-লেখক উল্লেখ করেছেন সেটি বা তার কাছাকাছি কোনো কথা তিনি বর্ণনা করেন নি। যা দ্বারা দ্বিতীয় মতের সমর্থন হতে পারত।

৫. এ মাসআলার ইবারত (আরবী পাঠ) থেকে কারো এ ধারণা হতে পারত যে, অন্য শহরে চাঁদ দেখার যে কোনো প্রকার সংবাদ এলেই তা অবশ্যঅনুসরণীয়। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। একারণে এ ধারণার সংশোধনের জন্য তিনি শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, যাতে এ কথার উল্লেখ আছে যে, শুধু সংবাদ পৌঁছা যথেষ্ট নয়। তা মুস্তাফীয (চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে আসা) ও মুতাহাক্কিক (প্রমাণিত) হওয়া জরুরী। আর তখনই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ এর ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবেন।

নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার ব্যাখ্যা

হানাফী ফকীহগণের সিদ্ধান্ত

যেমনটা ইতিপূর্বে বলেছি অনেক ফকীহ নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার অর্থ এই বুঝেছেন যে, এই বিধান কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে। এখানে তাঁদের ইবারত নকল করা হচ্ছে:

১. ইমাম আবুল হুসাইন আলকুদুরী রাহ. (৪২৮ হি.)

তিনি শরহু মুখতাসারিল কারখীতে নাদির রেওয়ায়েতের মাসআলাটি উল্লেখ করার পর বলেন-

وهذا إذا كان بين البلدتين تفاوت لا تختلف فيه مطلع الهلال، فأما إذا بعد أهل البلدين من الآخر بعدا كثيرا لم يلزم أهل أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد تختلف.

যার সারকথা হল, দুই শহরের মাঝে দূরত্ব বেশি হলে অপর শহরের অধিবাসীদের জন্য এক রোযা কাযা করার বিধান প্রযোজ্য নয়।

(শরহু মুখতাসারিল কারখী, সওম অধ্যায়ে, বাবুল ইতিকাফের দুই পৃষ্ঠা আগে। মাখতূতা, জামেয়া উম্মুল কুরা-এটির কপিও সংগ্রহ করেছেন শায়েখ ত্বহা হুসাইন দানিশ, জাযাহুল্লাহ খাইরান।)

২. ইমাম হুসামুদ্দীন শহীদ রাহ. (৫৩৬ হি:)

হিদায়া গ্রন্থকারের বিশেষ উস্তাদগণের অন্যতম। ৫৩৬ হিজরীতে তার শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। তিনি ''আলফাতাওয়াল কুবরা'' নামে ফিকহ ও ফতোয়ার একটি সংকলন প্রস্ত্তত করেছেন। যার বিন্যাসের কাজ করেছেন ইমাম নাজমুদ্দীন ইউসুফ ইবনে আহমদ আলখাসী। এর একটি মাখতূতা রিয়াসত রামপুরের মাকতাবায়ে রেযা'তে সংরক্ষিত আছে। এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোর ফটোকপি দেওবন্দের মাওলানা মোশতাক আহমাদ আমার জন্য পাঠিয়েছেন।

এর 'আলফাতাওয়াল কুবরা'র (পৃ. ১৬) ''কিতাবুস সাওমে'র ''আলফাসলুল খামিস''-এ লেখেন

ولو صام أهل بلدة الرؤية ثلثين يوما وبلدة أخرى تسعة وعشرين يوما فعلم من صام تسعة وعشرين يوما فعليهم قضاء يوم، لأن الذين صاموا ثلثين يوما رأوا هلال رمضان قبلهم بليلة والعمل بقول من رأى لا بقول من لم ير، هذا إذا كان بين البلدتبين تقارب بحيث لا تختلف المطالع، وإن كانت تختلف لا يلزم أهل أحد من البلدتين حكم الآخر.

অর্থ : কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রাখে আর অন্য শহরের অধিবাসীরা উনত্রিশ দিন রোযা রাখে অতপর উনত্রিশ রোযা আদায়কারীগণ তা জানতে পারে তাহলে তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে। কারণ যারা ত্রিশ রোযা রেখেছে তারা

একরাত আগে চাঁদ দেখেছে। আর আমল তো তাদের কথা অনুসারেই হওয়া চাই যারা (চাঁদ) দেখেছে। তাদের কথা অনুসারে নয় যারা দেখেনি।

এ (বিধান) ঐ ক্ষেত্রে যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, এদের উদয়স্থল আলাদা না হয়। উদয়স্থল আলাদা হলে কোনো শহরের বিধান অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে না। (আলফাতাওয়াল কুবরা পৃ. ১৬, মাখতুতা মাকতাবায়ে রেযা, রামপুর, হিন্দুস্তান)

৩. ইমাম আব্দুর রশীদ আলওয়ালওয়ালিজী (৪৬৭ হি.-৫৪০ হি.-এর পর)

তিনি 'আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ' তে আলোচিত মাসআলা লিখে সাথে সাথে তাম্বীহ করেছেন যে,

وهذا إذا كان بين البلدتين تفاوت بحيث لا تختلف المطالع، فإن كانت تختلف لا يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

অর্থাৎ, এ বিধান ঐ সময় প্রযোজ্য যখন দুই শহর কাছাকাছি হয় যার কারণে এদের উদয়স্থল আলাদা হয় না। পক্ষান্তরে উদয়স্থল আলাদা হলে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে না। (আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ খ. ১ পৃ.২৩৬, মুদ্রন, দারুল ঈমান, সাহারানপুর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুতের সংস্করণের ফটো সংস্করণ)

৪. ইমাম রযিউদ্দীন আসসারাখসী (৫৪৪ হি.)

তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, উপাধী রযিউদ্দীন, নিসবত, সারাখসী ইনি শামসুল আইম্মা সারাখসী মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ, 'মাবসূত'-লেখক (৪৮৩ হি.)-এর কিছু পরের। ইবনে আবেদীন শামী রাহ. 'রদ্দুল মুহতার' (খ.১, পৃ. : ৬৯)-এ তাঁর কিতাব 'আলমুহিত' (যাকে আলমুহীতুর রাযাভী ও 'মুহীতুস সারাখসী' বলা

হয়)-এর প্রশংসা করেছেন যে, তিনি জাহির রিওয়ায়াহ, নাদির রিওয়ায়াহ ও ফাতাওয়া মাসাইলকে আলাদা আলাদা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম রযীউদ্দীন 'আলমুহীত' গ্রন্থে 'নাওয়াদিরে হিশাম'-এর বরাতে উপরোক্ত মাসআলা বর্ণনা করার পর লেখেন-

وهذا إذا كان (بينهما تقارب) بحيث لا يختلف فيه مطلع الهلال، لأن الرؤية لا تفاوت ولا يختلف، فيلزم أحدهما حكم الآخر، وإن كان بينهما مسافة مزيدة بحيث يختلف فيها المطالع لم يلزم أحدهما حكم الآخر.

অর্থাৎ এ বিধান ঐ সময় প্রযোজ্য, যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, যদ্বারা চাঁদের উদয়স্থল অভিন্ন থাকে। কারণ এ অবস্থায় তো চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে
(বাস্তবের বিচারে) কোনো বিভিন্নতা নেই। তাই এক শহরের বিধান অপর শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি দুই শহরের মাঝে দূরত্ব বেশি হয় যদ্বারা এদের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এক শহরের উপর অন্য শহরের বিধান প্রযোজ্য হবে না। (মুহীতুস সারাখসী পৃ ১৯১-১৯২, মাখতূতা, আহসানুল উলূম, গুলশান ইকবাল, করাচী)

৫. কাযিল কুযাত ইমাম জামালুদ্দীন আলমুতাহহির ইবনে হুসাইন আলইয়াযদী

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রশীদ রুকনুদ্দীন আলকিরমানী (৫৬৫ হি.)-এর খাস উস্তাজ। 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া' -গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের (কিতাবের) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (বাব) তিনি শুধু তাঁর ফতোয়াগুলো সংকলন করেছেন। ভূমিকায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে এ যামানার (হিজরী ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের) ইমাম।

... فإنه إمام هذا العصر في العلم والفقه واستنباط المعاني وحل المشكلات وكشف المعضلات.

'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'র মাখতূতা শাবাকায় (ইন্টারনেটে) আছে। জামেয়াতুল মালিক সাউদ রিয়াদের মাখতূতা শাবাকায় পড়া যায়। এতে ইমাম জামালুদ্দীন আলইয়াযদী থেকে যখন উপরোক্ত মাসআলা বর্ণনা করেছেন তখন সাথে সাথে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এ বিধান কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে। আরবী পাঠ এই

لو صام أهل بلد تسعة وعشرين وأهل بلدة ثلثين إن كان يختلف المطالع لا يلزم أحدهما حكم الآخر، وإن كان لا يختلف المطالع يلزم.

(জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া : ৩২-৩৩, মাখতূতা, জামেয়া মালিক সাউদ রিয়ায)

৬. ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী রাহ. (৫৬৫ হি.)

তিনি 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'র বিভন্ন জায়গায় এ মতই উল্লেখ করেছেন। এবং এর বিপরীতে কোনো কথা বর্ণনা করেননি।

৭. ইমাম বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল মারগীনানী (৫৯৩ হি.) হিদায়া গ্রন্থকার।

তাঁর কিতাব 'আততাজনীছু ওয়াল মাযীদ' অনেক দিন আগেই ছাপা হয়েছে। এতে তিনি এ মাসআলা উল্লেখ করে ঐ নোট দিয়েছেন যে, এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে। দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের জন্য অবশ্য-প্রযোজ্য নয়। আরবী পাঠ এই

وهذا إذا كان بين البلدين تقارب، بحيث لا تختلف المطالع، فإن كان يختلف لا يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

(আততাজনীছু ওয়াল মাযীদ খ. ২ পৃ. ৪২৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

সারকথা এই যে, নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার ব্যাখ্যা তৃতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বড় বড় ফকীহগণ এ-ই করেছেন যে, এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দূর-দরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের বিধান অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়।

এখানে তো শুধু আকাবিরের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল, যারা নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। আর যাঁরা এ মাসআলা উল্লেখ করা ছাড়া মূল বিধানটি বলেছেন যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের জন্য অন্য অঞ্চলের চাঁদ দেখা অবশ্য প্রযোজ্য নয়, তাদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁদের উদ্ধৃতি সামনে আসছে। ইনশাআল্লাহ। এখন শুধু এইটুকু নিবেদন যে, নাদির রেওয়ায়েতের যে মাসআলা খুলাসা খানিয়ার লেখক ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য মনে করেছেন, তাঁদের আগের ও তাদের সমসাময়িক বড় বড় ফকীহ এ বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন।

এক আবু বকর জাসসাস আররাযী (৩৭০হি.) যাঁর কিতাব 'আহকামুল কুরআন' (খ. ১ পৃ. ২২০-২২২) এর বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি এ বিধানকে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য মনে করেন। দ্বিতীয় ব্যাক্তিত্ব শামসুল আইম্মাহ হালওয়ানী (৪৪৮ হি.), তাঁর বরাতে খুলাসা গ্রন্থকার যে ইবারত উদ্ধৃত করেছেন বর্ণনায় কোনো তাসামুহ না হয়ে থাকলে তিনিও সম্ভবত এ বিধানকে আম ও ব্যাপক মনে করেন। এ দুজন ছাড়া ষষ্ঠ হিজরী শতক পর্যন্ত কোনো বড় ফকীহ সম্পর্কে আমার জানা নেই যে, তিনি এ বিধানকে আম ও ব্যাপক মনে করেছেন।

এ পর্যন্ত যা কিছু নিবেদন করা হল তার সারসংক্ষেপ এই -

১. لاعبرة لاختلاف المطالع ড়(উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়) এ কথার উল্লেখ হানাফী মাযহাবের জাহির রিওয়ায়াহ ও নাদির রেওয়ায়াহ

কোথাও নেই। এবং তা মাযহাবের প্রথম তিন ইমামের কারো থেকেই বর্ণিত নয়।

২. নাদির রিওয়ায়েতের ঐ মাসআলাটি শুধু সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ.) থেকে বর্ণিত।

৩. এ মাসআলাকে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বড় বড় ফকীহ শুধু কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে তারা এ মাসআলা প্রযোজ্য মনে করেন না।

৪. لاعبرة لاختلاف المطالع ড়(চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়) এ বাক্য আমাদের জানামতে সর্বপ্রথম খুলাসা ও খানিয়ার লেখকদ্বয় ব্যবহার করেছেন।

[জাহিরুর রিওয়ায়াহ ও হানাফী মাযহাবের বাকি আলোচনা আগামী সংখ্যায় পড়ুন]

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

নভেম্বর ২০১৩, মুহাররম ১৪৩৫

একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-- ৪

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। তবে ইলমুল ফিকহের প্রাথমিক স্তরের তালিবে ইলম ভাইদের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমরা শুনেছি, ‘মুতূন’ শিরোনামে ফিকহের যে মুখতাসার কিতাবসমূহ আছে তা ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’-এর মাসাইলের জন্য সংকলিত। এ শ্রেণির একটি গুরুত্বপূর্ণ মতন ‘কানযুদ দাকাইক’, যা দরসে নেযামীর এক বিশেষ কিতাব। তাতে আছে-

لا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়।)

এ থেকে তো বোঝা যায়, এটি 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র মাসআলা। এ তালিবানে ইলমের খিদমতে আরজ এই যে, প্রথমত, এ কথা সঠিক নয় যে, 'মুতূন'শ্রেণির গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত সকল মাসআলা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর। এ সকল কিতাবে অনেক মাসআলা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর বাইরেরও আছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, 'মুতূন'-এর প্রাচীন গ্রন্থসমূহ, যা সালাফের মাঝে 'মুতালাক্কা বিল কবূল' (ব্যাপকভাবে সমাদৃত) ছিল তাতে এ মাসআলা নেই। মুখতাসারুত তহাবী, মুখতাসারুল হাকিমিশ শহীদ, মুখতাসারুল কারখী, মুখতাসারুল কুদূরী, তুহফাতুল ফুকাহা, বিদায়াতুল মুবতাদী-এ সব তো মুতূন-শ্রেণির কিতাব। এসব কিতাবে আমাদের জানা মতে এ মাসআলা নেই।

মুতাআখখিরীনের নিকটে প্রসিদ্ধ 'মুতূন'-গ্রন্থাবলির অন্যতম হচ্ছে 'আলবিকায়া'। এতে এ মাসআলা নেই। মাওসিলীর 'আলমুখতার' কিতাবে যদিওবা খানিয়ার অনুসরণে এ মাসআলা লেখা হয়েছে, কিন্তু মাওসিলী নিজেই 'আলমুখতার'-এর ভাষ্যগ্রন্থে বিপরীত সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

এক 'মতন'-গ্রন্থ সাআতীর 'মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান নাইয়িরাইন'। এতে তিনি 'মুখতাসারুল কুদূরী' ও 'মানযূমাতুন নাসাফী'র মাসায়েল একত্র করেছেন। এতে তিনি উপরোক্ত মাসআলা এনেছেন د (দাল) বর্ণের নির্দেশিকার সাথে। د (দাল) বর্ণের অর্থ, এটি 'যাইদ' বা অতিরিক্ত মাসআলা। অর্থাৎ যে দুই কিতাব থেকে তিনি মাসআলা সংকলন করেছেন তাতে এ মাসআলা নেই।

সারকথা এই যে, অধিকাংশ মতন, বিশেষত মুতাকাদ্দিমীনের মতনসমূহে এ মাসআলার (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) উল্লেখ নেই। 'মাজমাউল বাহরাইন', 'কানয', 'মুলতাকাল আবহুর'সহ দু' চার মতনে যদিওবা এ মাসআলা আছে, কিন্তু এগুলোর লেখকগণ

সকলেই খুলাসা-খানিয়ার পরের এবং এগুলোর অধিকাংশ গবেষক ভাষ্যকার অন্য সিদ্ধান্ত (দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাযিম নয়)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ হওয়াই কি অগ্রগণ্যতার একমাত্র কারণ?

একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, কোনো মাসআলা জাহির রিওয়ায়া হওয়াই অগ্রগণ্যতার একমাত্র কারণ নয়। এটা খুবই সম্ভব যে, ‘আসহাবুত তারজীহ’ (ইখতিলাফী মাসাআলাসমূহে রাজিহ-মারজূহ নির্ধারণকারী ফকীহবৃন্দ) দলীলের শক্তি বা অন্য কোনো বিবেচনায় অন্য কওলকে (বক্তব্য) তারজীহ দিবেন। ফলে সেক্ষেত্রে ঐ অগ্রগণ্য কওল অনুসারেই আমল হবে, ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ অনুসারে নয়। যেমনটা রাসমুল মুফতী ও উসূলুল ইফতার কিতাবসমূহে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। আর ইবরাহীম হালাবীর বাক্যে এ মূলনীতি তো খুই প্রসিদ্ধ-

ولا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية

সুতরাং ‘উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া’ যদি বাস্তবে ‘জাহিরুর রিওয়ায়া’ও হত এরপরও যেহেতু মাযহাবের বড় বড় ফকীহগণের কেউ হয়তো তা উল্লেখই করেননি, শুধু বিপরীত কওলটিই উল্লেখ করেছেন কিংবা উল্লেখ করলেও বিপরীত কওলটিকে ‘সহীহ’ বা ‘আশবাহ’ (অর্থাৎ দলীলের বিচারে অধিক উপযুক্ত এবং শরীয়তের নীতিমালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ) বলেছেন। সুতরাং এ অনুসারে ফতোয়া দেওয়া ও এর উপর আমল করায় আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কারণ বিষয়টি তো ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী।

তাহলে বাস্তবতা যখন এই যে, একে ‘জাহিরুর রিওয়ায়াহ’ বলাই ভুল, তখন এর বিপরীত কওল গ্রহণ করায় তো আপত্তির প্রশ্নই আসে না।

তলাবায়ে কেরাম এ বিষয়টিও লক্ষ্য করুন যে, যখন এই প্রসিদ্ধ

কওলকে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলা 'তাসামূহ' (ভ্রম) তখন পরের যে লেখকগণ এই কওলকে শুধু এ কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' তাদের এই 'তারজীহ' এ কওলের শক্তি বৃদ্ধি করে না। 'আলবাহরুর রাইক' ও 'মাজমাউল আনহুর'সহ বিভিন্ন ফিকহের কিতাবে এ কওলকে এ কারণেই তারজীহ দেওয়া হয়েছে যে, এটি 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' সুতরাং এ তারজীহ বিশেষ কোনো শক্তি রাখে না।

সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে দুটি জরুরি নোট :

এক. অধম যা লিখেছি যে, আলোচিত বিষয়ে মুতাআখখিরীনের নিকটে যে সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ, তা 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' নয়, এটি আমার সাধ্য অনুযায়ী তাহকীক-অনুসন্ধানের পর লিখেছি। এরপরও যদি এক্ষেত্রে আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তলাবায়ে কেরাম ও ফিকহ-ফতোয়ার সাথে মশগুল উলামায়ে কেরামের কাছে বিনীত নিবেদন, তাঁরা অনুগ্রহ করে আমাকে তাম্বীহ করবেন, আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।*

দুই. প্রসিদ্ধ কওলটি সম্পর্কে উপরের আলোচনায় শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে, একে হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' সাব্যস্ত করা ভুল। এর অর্থ এই নয় যে, হানাফী মাযহাবের সাথে এ কওলের কোনো সম্পর্কই নেই। কারণ একাধিক হানাফী ফকীহর কাছে এ কওল রাজিহ-অগ্রগণ্য এবং তাঁরা একে 'মুফতা বিহী কওল' (যে কওল অনুসারে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে বা ফতোয়া দেওয়া উচিত) সাব্যস্ত করেছেন। এরপর অন্যান্য ফিকহী মাযহাবের অনেক ফকীহরও মাসলাক এটিই। এবং এ কওলেরও শরয়ী দলীল আছে। এ কারণে কোনো দেশের দায়িত্বশীলগণ যদি এই কওল অনুযায়ী ফয়সালা করেন তাহলে এর উপরও আপত্তি করা ঠিক নয়। কারণ যেমনটা আগে বলা হয়েছে যে, এ মাসআলা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী।

আপত্তি তো ঐ সকল লোকদের উপর, যারা এই প্রসিদ্ধ কওলের আড়ালে (যাকে ভুলবশত 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলে দেওয়া হয়েছে) মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের ব্যাপারে কটূক্তি করে, যারা নিজেদের আলিম-উলামা ও দায়িত্বশীলদের ফয়সালা অনুসারে নিজ নিজ এলাকার চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করেন। অথচ তাদের এ আমল শরয়ী দলিলভিত্তিক এবং ঐ তরীকার মুতাবিক যা সব সময় মুতাওয়ারাছ চলে আসছে। আর যা হানাফী মাযহাবের অতি নির্ভরযোগ্য কওল, যে অনুযায়ী বহু আগে থেকেই বড় বড় ফকীহ ফতোয়া দিয়ে আসছেন। যদিও কোনো কোনো কিতাবের বর্ণনাভঙ্গি থেকে কিছু মানুষের বিভ্রান্তি হয়েছে যে, এ কওল হানাফী ফকীহগণের মাঝে শুধু যায়লায়ীর, বা কাসানী ও যায়লায়ীর কওল (সিদ্ধান্ত)!

এখন আমরা দেখব, এ কি বাস্তবেই শুধু ঐ দুই মনীষীর সিদ্ধান্ত, না তাঁরা ছাড়াও অনেক বড় বড় হানাফী ফকীহের সিদ্ধান্ত। বিশেষভাবে মুতাকাদ্দিমীনের (পূর্ববর্তীদের) কাছে তো এ কওলই বেশি প্রসিদ্ধ ছিল। সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলোচনা লম্বা হতে চলেছে, আমি পাঠকবৃন্দের কাছে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করছি।

এখন সংক্ষেপে ঐ বড় বড় ফকীহর কথা শুনুন, যাঁদের সিদ্ধান্ত এ-ই ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের কোনো এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

১. ইমাম আবু আবদিল্লাহ আলফকীহুল জুরজানী (৩৯৮ হি.)

ইমাম কুদূরী রাহ.-এর উস্তায ও ইমাম আবু বকর আলজাসসাস রাহ.-এর শাগরিদ। আলজামিউল কাবীর-এর ভাষ্যকার। 'ইখতিলাফুল মাতালি' (উদয়স্থলের ভিন্নতার) ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত এ-ই ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. ''আলআরফুশ শাযী''-তে (১/১৪৯ জামে তিরমিযীর হাশিয়ায়) আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী

রাহ. ''মাআরিফুস সুনানে'' (৫/৩৩৭) ও আরবের মশহূর ও জনপ্রিয় আলিম আল্লামা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ ''তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আহিল্লা'' কিতাবে (পৃষ্ঠা : ১৫) আলজুরজানীর** এ মাসলাকই (সিদ্ধান্তই) উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এ বিষয়ে যায়লায়ীর মাসলাক যা জুরজানীর মাসলাকও তা-ই।

২. আবুল হুসাইন আলকুদূরী (৪২৮ হি.)

গত সংখ্যায় তাঁর কিতাব 'শরহু মুখতাসারিল কারখী' এবং 'আলমুহীতুল বুরহানী'র বরাতে তাঁর মাসলাক লেখা হয়েছে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য 'লাযিম' বা অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

৩. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আবু বকর আলহাসীরী (৫০০ হি.)

ইলমুল ফিকহে বিশেষভাবে শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ.-এর এবং ইলমে হাদীসে অনেক মুহাদ্দিসের শাগরিদ। বুখারা নগরে ৫০০ হিজরীতে ইন্তিকাল। 'আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যা'হ (৩/৮) ও ''আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যা''য় তাঁর 'তরজমা' (পরিচিতি মূলক আলোচনা) আছে। ফিকহ-ফতোয়া বিষয়ে তাঁর কিতাব ''আলহাভী'' খুব নির্ভরযোগ্য ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বরাতগ্রন্থ। এবং 'হাভিয যাহিদী' ও 'আলহাভিল কুদসী'র আগের। (কাশফুয যুনূন)

এ কিতাবের একাধিক মাখতূতা মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। এ মুহূর্তে আমি তাঁর বক্তব্য হিদায়া-গ্রন্থকার ইমাম বুরহানুদ্দীন আলমারগীনানী রাহ.-এর কিতাব 'আততাজনীস' থেকে নকল করছি। ছাহিবে হেদায়া লেখেন-

وفي الحاوي : أهل بلدة رأوا الهلال يوم الثلثاء، وأهل بلدة أخرى يوم الأربعاء يحكم لكل بلدة بما رأوا، ولا ينظر إلى أهل بلدة أخرى ... .

অর্থ : 'আলহাভী'তে আছে, যদি কোনো শহরবাসী মঙ্গলবার চাঁদ দেখে আর অন্য শহরের অধিবাসীগণ বুধবার তাহলে প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসারে ফয়সালা করা হবে। অন্য শহরের দিকে দেখা হবে না। (আততাজনীস ওয়াল মাযীদ ২/৪২৩)

ইমাম আবু বকর হাসীরী রাহ.-এর বক্তব্য বর্ণনা করে হেদায়া-গ্রন্থকার যে মন্তব্য লিখেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে, এ বিধান দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে। কাছাকাছি অঞ্চলসমূহে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় শরয়ী পদ্ধতিতে প্রমাণিত হলে দায়িত্বশীলগণ সে অনুযায়ী ফয়সালা করবেন।

৪. হুসামুদ্দীন আসসদরুশ শহীদ (৫৩৬ হি.)

''আলমুহীতুল বুরহানী''র লেখকের সম্মানিত চাচা, হেদায়া-লেখক ও আল্লামা কাযীখান রাহ.-এর খাস উস্তাদ, ফিকহ-ফতোয়ার প্রসিদ্ধ ইমাম। তাঁর বক্তব্য তাঁর কিতাব ''আলফাতাওয়াল কুবরা'র 'মাখতূতা' (হস্তলিখিত পান্ডুলিপি) থেকে গত সংখ্যায় পেশ করা হয়েছে।

৫. ফকীহ আবদুর রশীদ আলওয়ালওয়ালিজী (মৃত্যু ৫৪০ হি.-এর পরে)

তাঁর কিতাব 'আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ' থেকে উদ্ধৃত বক্তব্য আপনারা গত সংখ্যায় পাঠ করেছেন।

৬. রুকনুদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আলকিরমানী (৫৪৩ হি.)

গত সংখ্যায় 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'র বর্ণনায় পাঠক এ বাক্য পাঠ করেছেন-

وفي التجريد : يعتبر اختلاف المطالع

অর্থাৎ 'তাজরীদ'-গ্রন্থে আছে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া) এর অর্থ, তাজরীদ-লেখকের কাছে দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাযিম নয়।

ফিকহে হানাফীতে যদিও 'তাজরীদ' নামে একাধিক কিতাব আছে, তবে বেশি প্রসিদ্ধ দুটি কিতাব : এক. ইমাম আবুল হুসাইন আলকুদূরী রাহ.-এর ''আততাজরীদ'', যা কয়েক বছর আগে ১২ খন্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু এ ''তাজরীদ''ই বেশি প্রসিদ্ধ এবং এর লেখক ইমাম কুদূরী রাহ.ও খুলাসা-লেখকের আগের আর বাস্তবেও ইমাম কুদূরীর মাসলাকও সেটিই এ কারণে কারো ধারণা হতে পারে যে, উপরের বরাতে ইমাম কুদূরীর তাজরীদই উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। প্রথমত এ কারণে যে, কুদূরী রাহ.-এর ''তাজরীদে''র মুদ্রিত নুসখায় আমাদের জানামতে এ মাসআলা নেই, দ্বিতীয়ত ''খুলাসায়'' এমন অনেক মাসআলায় ''তাজরীদে''র বরাত দেয়া হয়েছে ও ইবারত আনা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে কুদূরীর তাজরীদে নেই। তৃতীয়ত কুদূরীর এ কিতাবের বিষয়বস্তু হচ্ছে, ঐ সকল মাসআলার দালীলিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ, যেগুলোতে ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে। অথচ 'উদয়স্থলের ভিন্নতা' শীর্ষক মাসআলা (অন্তত ইমাম কুদূরীর মতে) এ শ্রেণির নয়। ইমাম কুদূরী রাহ. এ মাসআলার যে সমাধান ''শরহু মুখতাসারিল কারখী'' তে উল্লেখ করেছেন ফিকহে শাফেয়ীর সমাধানও তাই। এ কারণে তাঁর নিকটে এ মাসআলা তাঁর ''তাজরীদ'' গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে সরাসরি যুক্ত নয়।

''তাজরীদ'' নামে দ্বিতীয় মশহূর কিতাব ইমাম রুকনুদ্দীন আবুল ফযল আলকিরমানী রাহ. (৪৫৭-৫৪৩ হি.)-এর, যা ফিকহে হানাফীর বুনিয়াদী কিতাবসমূহের অন্যতম। 'তাজরীদুল কুদূরী' থেকে আলাদা

করার জন্য কখনো কখনো একে 'তাজরীদুর রুকনী' নামেও উল্লেখ করা হয়।

আফসোস, এ অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যা এখনো মুদ্রিত হয়নি, তবে আনন্দের কথা এই যে, মক্কা মুকাররমায় উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির 'কুল্লিয়াতুশ শারীয়া'য় (ফিকহ বিভাগ) এ কিতাবের তাহকীকের (পান্ডুলিপি সম্পাদনার) কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৪৩২-১৪৩৩ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান বিন ওয়ায়িল আত-তুয়াইজিরী কিতাবের শুরু থেকে 'বাবুয যিহার' পর্যন্ত তাহকীক করে ফিকহ বিষয়ে ডক্টরেট এর অভিসন্দর্ভ প্রস্ত্তত করেছেন।

''খুলাসাতুল ফাতাওয়া''য় যে তাজরীদের বরাত বারবার আসে তা এই ''আততাজরীদুর রুকনী''।*** এ কিতাবের উপর জামেয়া উম্মুল কুরায় যে কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করেছেন আমাদের ফিকহ-বিভাগের চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত তালিবে ইলম মৌলভী ফয়যুল্লাহ। এরপর আমার অনুরোধে শায়খ ত্বহা হোসাইন কিতাবের সম্পাদিত নুসখা থেকে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো আমার জন্য পাঠিয়েছেন। এতে এ মাসআলার উপর যে আলোচনা এসেছে তা নিম্নরূপ :

ولو صام أهل مصر ثلاثين يوما للرؤية، وصام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلى هؤلاء قضاء يوم واحد، وهذا إذا كان بين البلدين تقارب لا تختلف المطالع، فإن كان يختلف لم يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

(আততাজরীদ, আবুল ফজল আলকিরমানী ১/৩৪০-৩৪১; এতে তিনি ঐ কথাই বলেছেন, যা ইমাম কুদূরীসহ অন্যান্য ফকীহগণ বলেছেন।)

৭. রযীউদ্দীন আসসারাখসী (৫৪৪ হি.)

গত সংখ্যায় ''মুহীতুস সারাখসী'' (মাখতূত) থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে।

৮. মাজদুশ শরীয়া সুলায়মান ইবনুল হাসান আলকিরমানী (কাযি মুহাম্মাদ)

আপন যুগে কাযিল কুযাত ছিলেন এবং ফিকহ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে সমাধানদাতা মনীষী ছিলেন। ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী রাহ. (৫৬৫ হি.) ''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া''য় প্রত্যেক বিষয়ের অধীনে 'আলবাবুল খামিস' শিরোনামে তাঁর ফতোয়াসমূহ সংকলন করেছেন। ''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া''র 'কিতাবুস সওমে'র 'আলবাবুল খামিসে' আছে-

أهل بلد عيَّدوا يوم الإثنين، وأهل بلد آخر عيَّدوا يوم الثلثاء لا يجب عليهم قضاء يوم.

أهل بلد رأوا هلال رمضان وأعلموا أهل البلد الآخر بذلك، وهم لم يروا، فهذا على وجهين : إن كان المطلع في حقهما متحداً يلزم كل واحد منهما حكم الآخر، فإذا أعلمهم عدلان منهم يلزمهم حكم الصوم والفطر، وإن كان بين البلدين مسافة يختلف المطالع في حقهم فلا يلزم واحدا حكم الآخر.

অর্থ : কোনো শহরের অধিবাসীগণ সোমবার ঈদ করেছে, অন্য শহরের অধিবাসীগণ মঙ্গলবার তাহলে প্রথমোক্তদের উপর একদিনের কাযা জরুরি নয়।

কোনো শহরের অধিবাসীগণ রমযানের চাঁদ দেখেছে এবং অন্য কোনো শহরের অধিবাসীদেরকে এ সংবাদ পৌঁছাল, যারা নিজেরা চাঁদ দেখেনি, এক্ষেত্রে দুই অবস্থা : যদি উভয় শহরের উদয়স্থল অভিন্ন হয় তাহলে একের হুকুম অন্যের জন্য লাযিম হবে। সুতরাং তাদের দুজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাদেরকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে থাকলে তাদের উপর রোযা-ঈদের বিধান আরোপিত হবে।

পক্ষান্তরে দুই শহরের মাঝে যদি এ পরিমাণ দূরত্ব হয় যে, উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায় তাহলে এক শহরের উপর অন্য শহরের বিধান 'লাযিম' হবে না।

(জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া : ৩৬, মাখতূতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, রিয়ায, সৌদী আরব)

৯. জামালুদ্দীন আলমুতাহহির ইবনে হুসাইন আলইয়াযদী

তাঁর বক্তব্য 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'র বরাতে বিগত সংখ্যায় পাঠ করেছেন।

১০. রুকনুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রশীদ আলকিরমানী (৫৬৫ হি.)

''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া''র কিতাবুস সওমে ''আলবাবুছ ছালিছে''র অধীনে আতা ইবনে হামযা সাদীর একটি ফতোয়া নকল করার পর তাঁর মন্তব্য-

وهذا إذا كان بين البلدتين لا يختلف المطالع بحيث يلزم أحدهما حكم الآخر.

অর্থাৎ এ বিধান ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন দুই শহরের অবস্থান এমন হবে যে, তাদের উদয়স্থল অভিন্ন থাকে, যার কারণে একের হুকুম অন্যের উপর লাযিম হয়।

আতা ইবনে হামযার ফতোয়া এই ছিল যে, এক শহরের কাযীর কাছে অন্য শহরের কাযীর সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিষয়ে যদি দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় এবং সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পাওয়া যায় তাহলে এই কাযী সে অনুযায়ী ফয়সালা করবে।

এ ফতোয়ার উপর ইমাম রুকনুদ্দীন কিরমানী উপরোক্ত মন্তব্য লিখেছেন।

১১. সিরাজুদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল আভীশী (৫৬৯ হি.)

তিনি ''আলফতোয়াস সিরাজিয়্যাহ''য় এ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করেছেন। তিনি লেখেন-

أهل بلدة صاموا للرؤية ثلاثين يوما، وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلى هؤلاء قضاء يوم إلا إذا كان بين البلدتين تباين بحيث تختلف المطالع.

এক শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রাখল অন্য শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখেই রাখল উনত্রিশ রোযা তাহলে এদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে যদি না দুই শহরের মাঝে এমন পার্থক্য হয় যার দ্বারা উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায়। (আলফাতাওয়াস সিরাজিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ১৬৯, প্রকাশনায় দারুল উলূম যাকারিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা)

১২. মালিকুল উলামা আলাউদ্দীন আলকাসানী (৫৮৭ হি.)

তাঁর কিতাব ''বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে'' ফিকহে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় কিতাবসমূহের একটি। এ কিতাবে তিনি আলোচিত মাসআলায় এ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করেছেন, যা অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহের সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাযিম নয়। যার শিরোনাম তাঁরা এভাবে দিয়েছেন যে, উদয়স্থল আলাদা হলে তার ইতিবার করা চাই এবং এক জায়গার হুকুম অন্য জায়গায় প্রয়োগ না করা চাই।

যেহেতু কাসানীর এ সিদ্ধান্ত এতই প্রসিদ্ধ যে, একে শুধু তাঁর ও যায়লায়ীর সিদ্ধান্ত মনে করা হয়েছে, এ কারণে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারো উৎসাহ থাকলে বাদায়েউস সানায়ে (২/২২৪-২২৫, দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত) খুলে দেখতে পারেন।

ফিকহ-ফতোয়ার অনুশীলনে রত তলাবায়ে কিরামের খিদমতে এ কথাও আরজ করছি যে, হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী রাহ. (১৪২২ হি.) ''আহসানুল ফাতাওয়া''য় (৪/৪৯৫) ইমাম কাসানী রাহ.-এর বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা সঠিক

নয়। এটি

توجيه القول بما لا يرضى به القائل

এর আওতায় পড়ে। আহসানুল ফাতাওয়ার দাবি সঠিক হলে বাদায়ের ইবারত

فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر

না হয়ে এরূপ হত-

فيعتبر في أهل كل بلد حكم قاضيهم دون البلد الآخر.

তিনি ইমাম কাসানীর বক্তব্যকে যে মাসআলার দিকে নিতে চেয়েছেন তা তো 'বাদায়ে'-তে আলোচনায়ই আসেনি। সুতরাং এ প্রয়াস অর্থহীন। কাসানী এখানে যে বিষয়টি আলোচনা করছেন তা হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে উনত্রিশওয়ালাদের উপর ত্রিশওয়ালাদের কারণে এক দিনের কাযা ওয়াজিব হবে, কোন ক্ষেত্রে হবে না। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, উদয়স্থল আলাদা হলে কাযা ওয়াজিব নয়। কারণ এ অবস্থায় এক শহরের জন্য অন্য শহরের হুকুম অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

এখানে এ বিষয়ে একটু ইশারা করা হল। 'চাঁদ প্রমাণিত হওয়া' এবং চাঁদের হুকুম প্রয়োগ' শীর্ষক আলোচনায় ''আহসানুল ফাতাওয়া''র ব্যাখ্যার ত্রুটি আরো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

১৩. বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আলমারগীনানী (৫৯৩ হি.)

হেদায়া-গ্রন্থকারের ইলমী অবস্থান কারো অজানা নয়। তাঁর কিতাব ''আততাজনীসু ওয়াল মাযীদ''-এর বরাতে তাঁর বক্তব্য ইতিমধ্যে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তাঁর কিতাব ''মুখতারাতুন

নাওয়াযিল''-এর ইবারত (উদ্ধৃতি)ও উল্লেখ করছি। ঐ কিতাবের ইবারত ''তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আহিল্লা''য় (পৃষ্ঠা : ১৩) নকল করা হয়েছে। তাতে আছে-

وقال في مختارات النوازل : أهل بلد صاموا تسعة وعشرين يوما بالرؤية وأهل بلدة أخرى صاموا ثلاثين يوما بالرؤية، على الأولين قضاء يوم إذا لم تختلف المطالع بينهما، وأما إذا اختلفت المطالع لا يجب القضاء ... .

এ উদ্ধৃতির অর্থও তাই যা ''আততাজনীসু ওয়াল মাযীদ''-এর উদ্ধৃতির অর্থ।****

১৪ ও ১৫. জহীরুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল বুখারী (৬১৯ হি.)

তাঁর কিতাব ''আলফাতাওয়ায যহীরিয়্যাহ'' ও ''আলফাওয়াইদুয যহীরিয়্যাহ'' খুবই প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বরাত-গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। তিনি ইমাম যহীরুদ্দীন আলহাসান ইবনে আলী আলমারগীনানীর শাগরিদ ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁরই নামানুসারে নিজের কিতাবের নাম রেখেছেন। তিনি 'আযযাহীরিয়্যাহ'র কিতাবুস সওম-এ এ মাসআলার উপর আলোচনা করেছেন, যার শুধু একটি বাক্য হিজরী অষ্টম শতকের ঐতিহাসিক ফতোয়া-সংকলন ''আলফাতাওয়াত তাতারখানিয়া''য় (৩/৩৬৫) (তাহকীক শাববীর আহমদ কাসেমী) নকল করা হয়েছে। এক প্রসঙ্গে ''আযযহীরিয়্যাহ''র 'কিতাবুল আইমান' (শপথ অধ্যায়)-এ-ও এ মাসআলার আলোচনা এসেছে। ওখানে তিনি যাকিছু লিখেছেন তা আল্লামা যাইন ইবনু নুজাইম ''আলবাহরুর রাইক'' কিতাবে নকল করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক স্থানের এ বরাত আমাকে সরবরাহ করেছে আমাদের শাগরিদ মৌলভী ফয়জুল্লাহ হবিগঞ্জী। আলবাহরুর রাইক-এর 'কিতাবুল আইমান'-এর শেষে ''আযযহীরিয়্যাহ'' থেকে অনেক মাসআলা একসাথে নকল করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মাসআলা এই-

وسئل الأوزجندي عمن قال لصاحب الدين : إن لم أقض حقك يوم العيد فكذا، فجاء يوم العيد إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعله عيدا ولم يصل فيه صلاة العيد لدليل لاح عنده، وقاضي بلدة أخرى جعله عيدا؟

قال : إذا حكم قاضي بلدة بكونه عيدا يلزم ذلك أهل بلدة أخرى إذا لم تختلف المطالع، كما في الحكم بالرمضانية.

যহীরিয়্যাহ-লেখক বলেন, উযাজান্দীকে জিজ্ঞাসা করা হল, কেউ তার ঋণদাতাকে বলল, ঈদের দিন তোমার ঋণ আদায় না করলে এই হবে (কোনো কসম করল)। এখন ঈদ এমন হল যে, সে যে শহরের অধিবাসী সেখানের কাযী কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে ঈদ ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকল, কিন্তু অন্য কোনো শহরের কাযী ঈদ ঘোষণা করল। (তাহলে কোন দিন ঈদের দিন গণ্য হবে এবং এ লোকের কসমের কী হবে)।

উযাজান্দী রাহ. জবাব দিলেন, উপরোক্ত দুই শহরের উদয়স্থল যদি অভিন্ন হয় তাহলে এক শহরের কাযীর ঘোষণা অন্য শহরের জন্যও অবশ্য-অনুসরণীয় হবে। রমযান শুরুর ঘোষণার ক্ষেত্রেও এ মাসআলা। (আলবাহরুর রাইক, ইবনে নুজাইম মিসরী ৪/৬১৫)

এ ‘উযাজান্দী’ কে?

উযাজান্দের অধিবাসীদের মাঝে দুজন ফকীহই প্রসিদ্ধ। এক. কাযী খান রাহ. (৫৯২ হি.), যিনি ফতোয়া খানিয়ার লেখক। দুই. তাঁর দাদা শামসুল ইসলাম মাহমূদ উযাজান্দী রাহ.। কাযী খান তো কাযীখান নামেই মশহূর। আর ‘উযাজান্দী’ বলে সাধারণত তাঁর দাদাজানকেই নির্দেশ করা হয়। ‘‘খুলাসাতুল ফাতাওয়া’’ ও ‘‘আলমুহীতুল বুরহানী’’র কয়েক জায়গায় এ নিসবত দ্বারা তাঁকেই বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং ‘‘যহীরিয়্যাহ’’র উপরোক্ত মাসআলা থেকে যেমন আল্লামা জহীরুদ্দীন বুখারী রাহ. (৬১৬ হি.)-এর মত জানা গেল তেমনি

শামসুল ইসলাম ইমাম মাহমূদ উযাজান্দী রাহ.-এর মতও জানা গেল। আরো জানা গেল যে, 'ফাতাওয়া খানিয়া'য় নাতী উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় বললেও দাদা ধর্তব্যই বলেছেন।

১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাহমূদ আলমাওসিলী (৫৯৯ হি.-৬৮৩ হি.)

তিনি ''আলমুখতার'' গ্রন্থে খানিয়ার অনুসরণে প্রসিদ্ধ কওলটি লিখলেও ''আলমুখতার''-এর স্বরচিত ভাষ্য ''আলইখতিয়ার''-এ (১/৪০৫) ''আলফাতাওয়াল হুসামিয়্যাহ''র বরাতে ঐ মাসলাক নকল করেছেন, যা তাঁর আগের ফকীহরা লিখেছেন এবং যা হেদায়া-লেখক প্রমুখ ফকীহগণ বারবার বলেছেন।

''আলফাতাওয়াল হুসামিয়্যা'' দ্বারা উদ্দেশ্য হুসামুদ্দীন শহীদ রাহ. (৫৩৬ হি.)এ-র ফাতাওয়া। তাঁর ''আলফাতাওয়াল কুবরা''র ইবারত তো আমরা ইতিপূর্বে লিখেছি।

ফকীহ আবদুল্লাহ আলমাওসিলী তাঁর আলোচনা নিম্নোক্ত বাক্যে সমাপ্ত করেছেন-

وعن عائشة رضي الله عنها : فطر كل بلدة يوم فطر جماعتهم وأضحى كل بلدة يوم يضحي جماعتهم.

অর্থাৎ আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক শহরের ঈদুল ফিতর তখনই হবে যখন শহরের অধিবাসীগণ ঈদ করবে এবং ঈদুল আযহাও তখন হবে যখন সে শহরের অধিবাসীগণ কুরবানী করবে।

(আলইখতিয়ার লি-তা'লীলিল মুখতার ১/৪০৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন)

অর্থাৎ নিজ শহরের অধিবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ ঈদ বা কুরবানী করলে না তা অনুমোদিত, না গ্রহণযোগ্য।

১৭. ফখরুদ্দীন যায়লায়ী (৭৪৩ হি.)

একজন হলেন জামালুদ্দীন যায়লায়ী (৭৬২ হি.), যিনি ‘‘নাসবুর রায়াহ লিআহাদীসিল হেদায়া’’র লেখক। উদয়স্থলের ভিন্নতার প্রসঙ্গে যে যায়লায়ীর কথা আসে তিনি ইনি নন। তিনি ‘‘নাসবুর রায়াহ’’ লেখকের উস্তায ফখরুদ্দীন যায়লায়ী (৭৪৩ হি.)। ‘‘কানযুদ দাকাইক’’-এর বিখ্যাত শরহ ‘‘তাবয়ীনুল হাকাইক’’ এঁর রচনা।

এ মাসআলায় ‘‘তাবয়ীনুল হাকায়েক’’ গ্রন্থে তিনি শক্তিশালী দালীলিক আলোচনা করেছেন। তাঁর সে আলোচনা পরের অনেক লেখক স্ব স্ব গ্রন্থে নকল করেছেন। এখনকার তালিবে ইলমদের পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহ খোলার অভ্যাস কমে যাওয়ার কারণে এ কথা মশহূর হয়ে গেছে যে, হানাফীদের মধ্যে শুধু যায়লায়ী উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন। কেউ অনুগ্রহ করে এর সাথে কাসানীর নামটিও যুক্ত করেছেন। অথচ পাঠক দেখছেন, একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণেও যায়লায়ীর নাম কত নম্বরে এল।

১৮. ইবনে মালাক (৮০১ হি.) [আবদুল লতিফ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আমীনুদ্দীন ইবনে ফিরিশতা আলকিরমানী]

ফিকহ-ফতোয়ার অঙ্গনে এ নাম খুবই প্রসিদ্ধ ও আনন্দের। তিনি হাদীসের মশহূর কিতাব ‘‘মাশারিকুল আনওয়ার’’-এর শরহ ‘‘মাবারিকুল আযহার’’ নামে এবং ফিকহে হানাফীর কিতাব ‘‘মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান নাইয়েরাইন’’-এরও শরহ লিখেছেন, যা ‘‘শরহুল মাজমা লিবনে মালাক’’ নামে প্রসিদ্ধ। ফাতাওয়া শামীতে এর বরাত অনেক জায়গায় এসেছে।

এ কিতাবের মাখতূতা রিয়াদের জামিয়াতুল মালিক সাউদে আছে। তাতে তিনি ২৯ ওয়ালাদের উপর ৩০ ওয়ালাদের কারণে এক রোযা কাযা করার বিধানকে-

هذا إذا كان بينهما تقارب في المطلع

(যখন দুই শহরের উদয়স্থল কাছাকাছি হয়)

শর্তের সাথে যুক্ত করেছেন এবং উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

هذا هو الأشبه

এ সিদ্ধান্তই শরীয়তের নীতিমালার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। *(মাখতূতা, পাতা : ৬৩)*

১৯. ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান আলকাহিরী, 'ছাহিবুল ফায়য' (৯২৩ হি.)

মুহাদ্দিস তকীউদ্দীন শুমুন্নী রাহ. থেকে ইলমে হাদীস হাসিল করেছেন এবং ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. থেকে ইলমুল ফিকহ ওয়াল ফতোয়া। হাদীসে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. থেকেও তাঁর ইজাযত আছে।-আযযওউল লামি, শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২ হি.), ১/৫৯-৬৪

তাঁর ফতোয়া-সংকলনের নাম, যা তিনি নিজে সংকলন করেছেন ''ফয়যুল মাওলাল কারীম আলা আবদিহী ইবরাহীম''।

ইবনে আবেদীন শামী লেখেন-

وقد قال في خطبته : وضعت في كتابي هذا ما هو الراجح والمعتمد، ليقطع بصحة ما يوجد فيه أو منه يستمد.

অর্থাৎ তিনি (আল্লামা ইবরাহীম রাহ. তাঁর ফতোয়া সংকলন 'ফয়যুল মাওলা'র) ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবে আমি শুধু নির্ভরযোগ্য ও অগ্রগণ্য কওলসমূহ লিখেছি। যাতে এ কিতাবে যা কিছু পাওয়া যাবে তার বিশুদ্ধতার বিষয়ে আস্থা রাখা যায় এবং এর দ্বারা ফিকহ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া যায়। (রদ্দুল মুহতার ১/১০২)

ইবনে আবেদীন শামী রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা সংক্রান্ত আলোচনায়

লেখেন, ফয়েয-লেখক ঐ সিদ্ধান্তকেই নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন যার উপর যায়লায়ী আস্থা রেখেছেন।

(واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض)

২০. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬ হি.)

তিনি 'মুয়াত্তা মালিকে'র ফার্সী শরহ ''আলমুসাফফা''য় এ মাসলাকই অবলম্বন করেছেন। তিনি লেখেন-

اگر ہلال را در یك شہر دیدہ شد ودر شہر دیگر تفحص کردند وندیدند اگر آں شہر قریب است لازم است حکم رویت ایشاں، واگر بعید است لازم نیست بحدیث ابن عباس، وبقیاس بر مسئلہ فطر وحج کہ در حدیث منصوص شدہ.

وظاہر آنست کہ مراد از بعد مسافت قصر است، وایراد کردہ نشود کہ مسافت قصر را بامر ہلال ہیچ تعلق نیست زیرا کہ مشروعیت اکتفائے ہر ناحیہ برویت خود از جہت حرج است در تکلیف بابلاغ اخبار نہ از جہت اختلاف مطالع، وعادت قاضیہ است ببلوغ اخبار در مواضع قریبہ، بس اگر از آخر شہرے کہ در آں رویت متحقق شد بر دو مرحلہ باشد حکم آں لازم نیست.

(মুসাফফা শরহে মুয়াত্তা, ফার্সী ১/২৩৭, ১২৯৩ হিজরীর মুদ্রণের ফটোসংস্করণ, প্রকাশক, মীর মুহাম্মাদ করাচী)

এ উদ্ধৃতিতে শাহ ছাহেব রাহ. পরিষ্কার বলেছেন, দূর-দূরান্তের দুই শহরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। এরপর তিনি এ বিধানের হিকমত এবং দূরত্বের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যা এ মুহূর্তে আলোচ্য বিষয় নয়।

২১. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৩৫২ হি.)

শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রাহ. ফিকহ-হাদীস-তাফসীর বিষয়ে বিগত শতাব্দীর ইমাম গণ্য হতেন। তিনি অত্যন্ত তাকীদের সাথে যায়লায়ীর মাসলাকের সমর্থন করেছেন। জামে তিরমিযীর উপর তার দরসী আলোচনা ''আলআরফুশ শাযী'' নামে তিরমিযীর হাশিয়ায় মুদ্রিত। সেখানে তাঁর আলোচনা দেখা যেতে পারে।

২২. মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. (১৩৯৬ হি.)

বহু বছর দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী আযম ছিলেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান তাশরীফ নিয়ে যান এবং আমৃত্যু পাকিস্তানের মুফতী আযম ছিলেন। এ বিষয়ে তার কিতাব ''রুয়তে হেলাল'' মুদ্রিত, যার বাংলা তরজমাও হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা পাঠ করে দেখতে পারেন, কী জোরের সাথে তিনি যায়লায়ী ও কাসানীর মাসলাকের সমর্থন করেছেন।

২৩. মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী (১৩৯৭ হি.)

গত শতাব্দীর অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ। আরব-আজমে সমান বরণীয়। জামি তিরমিযীর উপর তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ ''মাআরিফুস সুনান'' মুদ্রিত ও সহজলভ্য। এর পঞ্চম খন্ডে কিতাবুস সওমের পঞ্চম ও নবম পরিচ্ছেদের (বাবের) অধীনে অতি বিজ্ঞতাপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং যায়লায়ীর মাসলাকের জোরালো সমর্থন করেছেন। তলাবায়ে কেরাম তা পাঠ করতে পারেন। (মাআরিফুস সুনান ৫/৩৩৫-৩৪১, ৩৫১-৩৫৪)

আপাতত এ সংক্ষিপ্ত তালিকার উপরই ক্ষান্ত করছি। আশা করি, এ থেকেই পাঠকবৃন্দ বাস্তব অবস্থা অনুমান করতে পারবেন।

এ তালিকার উপর নজর বুলিয়ে গেলেও জানা যাবে যে, 'ইখতিলাফে মাতালি' (উদয়স্থলের ভিন্নতা) সংক্রান্ত আলোচনায় হানাফী মাযহাব বর্ণনার সময় নির্দ্বিধায় এ কথা বলে দেওয়া যে, এ মাযহাবের 'জাহের রেওয়ায়েত' হচ্ছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া, যেন এটিই

একমাত্র অগ্রগণ্য মাসলাক, খুবই আপত্তিকর।

তেমনি এই অভিমত দাঁড় করানোও বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিরোধী যে, মুতাকাদ্দিমীন-মুতাআখখিরীন তথা আগের ও পরের ফকীহগণের মাঝে যেন শুধু কাসানী ও যায়লায়ীই উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন। ইনসাফের দাবি হচ্ছে এমন বলা :

১. হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'য় উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া না-হওয়া কোনোটাই আলোচনায় আসেনি।

২. নাদির রেওয়ায়েতে ৩০ ওয়ালাদের কারণে ২৯ ওয়ালাদেরকে যে এক রোযা কাযা করতে বলা হয়েছে তাকে অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহ, যাদের মাঝে আছেন হানাফী মাযহাবের বড় বড় ইমাম, কাছাকাছি শহর-নগরের বিধান মনে করেন।

৩. لا عبرة لاختلاف المطالع

(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) শীর্ষক মূলনীতিধর্মী বাক্যের খোঁজ হানাফী মাযহাবে পঞ্চম শতক পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ শতকের শেষে সবার আগে খানিয়া ও খুলাসা-লেখক এ বাক্য ব্যবহার করেন।

৪. বক্তার সংখ্যা ও ইলমী অবস্থানের বিচারে দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাযিম না হওয়ার সিদ্ধান্তই হানাফী মাযহাবের রাজিহ-অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হওয়ার হকদার এবং আকাবির মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্বসূরীদের মাঝে বড় বড় ফকীহগণ এ মাসলাকই গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা হায়াতে রাখলে অবশিষ্ট কথা আগামী সংখ্যায় হবে ইনশাআল্লাহ।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب

টীকা

* এখানে মনে রাখা দরকার যে, 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'র প্রসিদ্ধ পরিভাষা হল, ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর ছয় কিতাবের কোনোটিতে (মূলত পাঁচ কিতাব, কেননা ''আসসিয়ারুস সগীর'' কিতাবটি 'কিতাবুল আছল'-এর অংশ।) মাসআলাটি উল্লেখিত হওয়া, আর এ হিসেবেই উপরের পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু 'খানিয়া' ও 'খুলাসা'য় এ শব্দ অন্য কোনো অপ্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হলে তা আমাদের জানা নেই। তবে এ কথা স্মরণ রাখা জরুরি যে, 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' হওয়া-যা প্রাধান্যের একটি কারণ-তা এই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ অর্থ হিসেবেই।

** ইমাম কুদূরী রাহ.-এর উস্তায আবু আবদুল্লাহ জুরজানী ছাড়াও হানাফী ফকীহগণের মাঝে আরও একজন জুরজানী নামে পরিচিত। যিনি প্রথমোক্ত জুরজানী থেকে পরের ও 'খিযানাতুল আকমাল' কিতাবের লেখক।

খিযানাতুল আকমালে সপ্তম অধ্যায়ে 'ইখতিলাফে মাতালি'-এর পক্ষে-বিপক্ষে কিছুই নেই।

'খিযানাতুল আকমাল'-এর ভূমিকায় লেখক ইউসুফ ইবনে আলী জুরজানী রাহ. নিজেই লিখেছেন যে, ''তিনি এই কিতাবটি ৫২২ হিজরীর ঈদুল আযহায় শুরু করেছেন।'' কাশফুয যুনূন কিতাবেও তাঁর উদ্ধৃতিতে এই তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে, 'খিযানাতুল আকমাল'-এর লেখক হলেন আবুল হাসান কারখী (৩৪১ হি.)-এর শাগরিদ। আর এ কথার পক্ষে 'তাজুত তারাজিম'-এর সম্পাদকের সমর্থন শুধু অনুমান নির্ভর। খিযানা কিতাবে পঞ্চম শতাব্দীর কিতাবসমূহের অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে।

হেদায়া ও বাদায়ে কিতাবে صفة الصلاة এর আলোচনায় كذا في تخريج

الجرجاني কথাটি উল্লেখ আছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম কুদূরীর উস্তায আবু আবদুল্লাহ জুরজানী, ইউসুফ ইবনে আলী জুরজানী নয়। আর বাদায়ের সম্পাদক এখানে বিষয়টি গোলমাল করে দিয়েছেন। তাই এ থেকে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

*** এখানে এই সংশয় হওয়া উচিত নয় যে, ''আততাজরীদুর রুকনী''র লেখকের মৃত্যুসন ৫৪৩ হি. বলা হয়েছে। অথচ 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'র লেখকের মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরী। তাহলে এঁরা দুজন সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও এটা কিভাবে হয় যে, তিনি এত অধিক পরিমাণে তাঁর উদ্ধৃতি উল্লেখ করবেন?

এই সংশয়ের কোনো ভিত্তি নেই। প্রথমত এ কারণে যে, খুলাসায় এমন অনেক কিতাবের উদ্ধৃতি আছে, যে সকল কিতাবের লেখক খুলাসা-লেখকের সমকালীন ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুসন ছিল ৬শ হিজরীর পরে কিংবা কিছু আগে। যেমন তাতে 'মুহীত' ও 'যখীরাহ'র উদ্ধৃতি আছে। বিভিন্ন উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখা গেছে তা 'আলমুহীতুল বুরহানী'র উদ্ধৃতি। আর 'যখীরাহ' তো আলমুহীতুল বুরহানীর লেখকেরই কিতাব, যার মৃত্যুসন ৬১৬ হিজরী বলা হয়েছে।

এমনিভাবে যানদাবিসাতীর 'আররওযা' ও ওস্তরুশনীর 'আলফুসূলে'র হাওয়ালা সম্পর্কেও ভেবে দেখুন।

এমনিভাবে 'খুলাসা'তে 'ফাতাওয়া খানিয়া' থেকে খুব নকল করা হয়েছে এবং কাযীখানের 'আলজামিউস সগীর'-এর শরহ থেকেও নকল করা হয়েছে। অথচ কাযীখানের মৃত্যুসন হল ৫৯২ হিজরী। খুলাসার মুসান্নিফ ও কাযীখান পরস্পর আত্মীয়ও। খানিয়ার মুসান্নিফ হলেন তাঁর মামাতো ভাই। যে ভঙ্গিতে ও যে পরিমাণে তিনি কাযীখান রাহ.-এর হাওয়ালা উল্লেখ করেছেন তাতে এটাই মনে হয় যে, কাযীখান রাহ.কে তিনি মুরববী মনে করতেন। বয়সের দিক থেকে কে বড় তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

'আততাবাকাতুস সানিয়্যাহ'-এর লেখক কারো থেকে একটি বিচ্ছিন্ন

সূত্রে একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন, যাতে খুলাসার মুসান্নিফের জন্মসন ৪৮১ বা ৪৮২ হিজরী বলা হয়েছে। আর তার মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরী। 'কাশফুয যুনূনে'ও তার মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরীই উল্লেখ করেছেন। এ সকল সন-তারিখের ভিত্তিতে ধারণা ছিল যে, খুলাসার লেখক বয়সের দিক থেকে কাযীখানের বড়। কিন্তু উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে খুলাসার মুসান্নিফ রাহ.-এর জন্ম ও মৃত্যুসন দু'টোই আরো অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

তেমনিভাবে ইসমাঈল পাশা বাগদাদী রাহ. ''হাদিয়াতুল আরেফীনে'' 'আলমুহীতুল বুরহানীর মুসান্নিফের জন্মসন ৫৫১ হিজরী লিখেছেন। এটিরও তাহকীক প্রয়োজন। কারণ কাফাবী রাহ. তার উস্তাযগণের তালিকায় তাঁর চাচাজান হুসামুদ্দীন শহীদকেও উল্লেখ করেছেন, যিনি ৫৩৬ হিজরীতে শাহাদত বরণ করেছেন।

যাইহোক, এখানে আমার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু বলা যে, আততাজরীদুর রুকনীর লেখকের মৃত্যুসন ৫৪৩ হিজরী হওয়ার কারণে এই সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই যে, তা খুলাসাতুল ফাতাওয়ার মাসদার/উৎসগ্রন্থ কীভাবে হতে পারে?

**** তলাবায়ে কেরামের আরো অবগতির জন্য এখানে এ কথাও বলতে চাই, 'তিবয়ানুল আদিল্লা'র মধ্যে হেদায়ার মুসান্নিফের কিতাব 'মুখতারাতুন নাওয়াযিল' এর উদ্ধৃতিতে যে ইবারত উল্লেখ করা হয়েছে শব্দের কিছু ভিন্নতার সাথে তা আবুল লাইছ সমরকন্দীর নামে প্রকাশিত কিতাব ''ফাতাওয়ান নাওয়াযিলে''ও বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই প্রকাশিত কিতাব আবুল লাইছ রাহ.-এর নয়। আবুল লাইছ রাহ.-এর কিতাবের যে পরিচিতি ''কাশফুয যুনূন'' ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এর কোনো মিল নেই। শতবর্ষ পূর্বে কেউ একটি মাখতূতা পেয়েছিল। কিন্তু তাতে وجادة صحيحة এর শর্তগুলো পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও হিন্দুস্তানের কোনো প্রকাশক তা প্রকাশ করেছেন। আর সেই সংস্করণ থেকেই মীর মুহাম্মাদ করাচী ফটো সংস্করণ প্রকাশ করেন। আর দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত তা

কম্পোজ করে প্রকাশ করে।

আবুল লাইছের কিতাব ''আননাওয়াযিল'' এখনও মাখতূত আকারে রয়েছে। ইস্তাম্বুলের মাকতাবায়ে ফয়যুল্লাহ ও মাকতাবায়ে দামাদ ইবরাহীম-এ এর সঠিক নুসখা বিদ্যমান আছে। হায়দারাবাদ আসফিয়্যাহ ও লাজনাতু ইহইয়াইল মাআরিফিন নুমানিয়্যাহয় দামাদ ইবরাহীম-এর নুসখার ফটোকপি সংরক্ষিত আছে। আর জামিআ উম্মুল কুরাতে উভয় নুসখার ফটোকপি আছে। মাওলানা মুশতাক আহমদ হায়দারাবাদের নুসখার সিডি সংগ্রহ করেছেন। আর শায়খ ত্বহা উম্মুল কুরার উভয় নুসখা থেকে কিতাবুস সওম-এর ফটোকপি পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়কে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

নাওয়াযিল আবুল লাইছ রাহ.-এর উভয় সহীহ নুসখা মুতালাআ করা হয়েছে। তাতে আলোচিত মাসআলা নেই।

কোনো কোনো গবেষক এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রকাশিত ফাতাওয়ান নাওয়াযিল মূলত ছাহিবে হেদায়ার কিতাব মুখতারাতুন নাওয়াদির। তবে বিষয়টি আরো অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

ডিসেম্বর ২০১৩, সফর ১৪৩৫

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-৫

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

শাফেয়ী মাযহাব

আলোচিত মাসআলায় হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে। আরো কিছু কথা সামনের শিরোনামগুলোর অধীনেও হবে ইনশাআল্লাহ। এখন অন্য তিন মাযহাবের (শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী) ফকীহগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে।

প্রথমে শাফেয়ী মাযহাব। তবে তা বর্ণনার আগে ভূমিকা হিসেবে এটুকু বলে নিচ্ছি যে, শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহের কিতাবগুলোর পরিভাষায় ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর সিদ্ধান্তগুলোকে 'ক্বওল' (قول) ব.ব আকওয়াল (أقوال) বলে। আর মাযহাবের অনুসারী ও ভাষ্যকার ইমামদের ইস্তিমবাতকৃত মতামতকে 'ওয়াজহ' (وجه) ব.ব 'উজূহ' (وجوه) বলে। 'আকওয়াল' বা 'উজূহ' বর্ণনার ক্ষেত্রে মাযহাবের ফকীহগণের মাঝে পার্থক্য বা বিভিন্নতা দেখা দিলে একে 'তরীক'

(طريق) বলে।

শাফেয়ী মাযহাবের বর্ণনা ও উপস্থাপনা এবং ব্যাখ্যা ও দলিল-নির্দেশের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে দুটি বড় ‘তরীকা’ আছে : ‘তরীকাতুল ইরাকিয়ীন’ (ইরাকীগণের তরীকা) ও ‘তরীকাতুল খুরাসানিয়ীন’ (খুরাসানীগণের তরীকা)। প্রথম তরীকার শায়খ (প্রধান) হলেন আবু হামিদ আসফারাইনী (৩৪৪-৪০৬ হি.)। আর দ্বিতীয় তরীকার শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ কাফফাল মারওয়াযী (৪১৭ হি.)। (আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নববী, ভূমিকা; তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, তাজুদ্দীন সুবকী ৫/৫৪)

ভূমিকার পর এবার মূল প্রসঙ্গ

শাফেয়ী ফকীহগণ আলোচিত মাসআলায় (এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় কি না) শুধু ‘উজূহ’ বর্ণনা করেছেন, ‘আকওয়াল’ বর্ণনা করেননি। এর অর্থ, তাঁরা এ মাসআলা ইমাম শাফেয়ীর কিতাবসমূহে পাননি এবং ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত পৌঁছেনি। তাঁদের কাছে শুধু আছে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর অনুসারী ফকীহ ইমামগণের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে এ মাসআলা স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হওয়ার এক বড় আলামত এ-ও যে, শাফেয়ী মাযহাবের সবচেয়ে বড় সহায়তাকারী ইমাম বায়হাকী রাহ.-এর কিতাব ‘‘মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার’’-এ (যার বিষয়বস্তুই হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর সিদ্ধান্তসমূহের দলিল উল্লেখ করা) আমাদের জানা মতে, এ মাসআলার উল্লেখ নেই। এখন দেখার বিষয় এই যে, শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ কোন দিকে। সাইমারী ও আবুত তাইয়েব তবারীসহ কতিপয় মনীষী যদিও বলেন, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়, কিন্তু অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহর সিদ্ধান্ত এই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক

জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়াই সঠিক। তবে নিকট ও দূরের মাপকাঠি সম্পর্কে শাফেয়ী ফকীহ ও অন্যান্য ফকীহগণের বিভিন্ন মত আছে। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে পরে আলাদাভাবে আলোচনা হবে। শাফেয়ী মাযহাবের সর্বসম্মত মুখপাত্র ইমাম আবু যাকারিয়া নববী রাহ. (৬৭৬ হি.) ''শরহুল মুহাযযাবে'' লেখেন-

إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين :

أصحهما : لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبَنْدَنِيْجِي وآخرون، وصححه العَبْدَرِي والرافعي والأكثرون.

والثاني : يجب، وبه قال الصيمري، وصححه القاضي أبو الطيب، والدارمي، وأبو علي السِّنْجِي وغيرهم.

অর্থ, এক শহরের লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখেছে, অন্য শহরের লোকেরা দেখেনি এক্ষেত্রে শহর দুটি কাছাকাছি হলে তা এক শহরের মতো গণ্য হবে। সুতরাং দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদেরও রোযা রাখা জরুরি হবে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যদি দুই শহর পরস্পর দূরবর্তী হয় তাহলে এক্ষেত্রে দুই 'তরীকায়' দুটি প্রসিদ্ধ 'ওয়াজহ' রয়েছে : অধিকতর শুদ্ধ 'ওয়াজহ' এই যে, (এক শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণে) অন্য শহরের অধিবাসীদের উপর রোযা রাখা জরুরি হবে না। গ্রন্থকার (আবু ইসহাক শীরাজী), শায়খ আবু হামিদ, বান্দানীজী ও অন্যরা নিশ্চিতভাবে এ কথাই বলেছেন। (অর্থাৎ অন্য মতের উল্লেখও করেননি) আবদারি ও রাফেয়ীসহ অধিকাংশ মনীষী একেই সহীহ বলেছেন।

'দ্বিতীয় 'ওয়াজহ' এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। সাইমারী তা বলেছেন এবং কাযী আবুত তাইয়্যেব, দারিমী ও আবু আলী ছিনজী প্রমুখ একে সহীহ বলেছেন। (আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব ৭/৪২৭, দারুল হাদীস, কাহেরা)

ইমাম নববী রাহ. এখানে শুধু الأكثر নয়; বরং বহুবচন الأكثرون ব্যবহার করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, কী বিপুলসংখ্যক শাফেয়ী ফকীহ ঐ সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেছেন। 'আলমাজমূ'-এর পূর্ণ আলোচনা, যা এখানে নকল করা হয়নি এবং ফিকহে শাফেয়ীর অন্যান্য কিতাব থেকে এ আলোচনা আদ্যোপান্ত পড়া হলে দেখা যাবে, শাফেয়ী মাযহাবের উভয় ঘরানা 'ইরাকী তরীকা' ও 'খুরাসানী তরীকা'র অধিকাংশ ফকীহ এ মতই গ্রহণ করেছেন। আর উভয় ঘরানার শায়খ (প্রধান) আবু হামিদ আসফারাইনী রাহ ও কাফফাল মারওয়াযী রাহ.-এর অবস্থানও তাই।

'আলমাজমূ' তো ইমাম আবু ইসহাক শীরাজী (৩৯৩ হি.-৪৭৬ হি.) কৃত 'আলমুহাযযাব'-এর ভাষ্যগ্রন্থ, 'আলমুহাযযাব'-এর মতো ফিকহে শাফেয়ীর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কিতাব ইমাম গাযালী রাহ.-এর 'আলওজীয'। এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয় ইমাম আবদুল কারীম রাফেয়ী (৬২৩ হি.)-এর 'ফাতহুল আযীয', যা 'আশশরহুল কাবীর' নামে প্রসিদ্ধ।

শাফেয়ী মাযহাবে রাফেয়ী ও নববীকে 'শায়খাইন' উপাধিতে স্মরণ করা হয় এবং এঁদের সম্মিলিত মতামত (متفقه تصحيح وترجيح) কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে পাঠক নববী রাহ.-এর আলোচনা পাঠ করেছেন। এবার রাফেয়ীর বক্তব্য দেখুন-

إذا رئي الهلال في بلدة ولم ير في أخرى نظر، إن تقاربت البلدتان فحمهما حكم البلدة الواحدة، وإن تباعدتا فوجهان : أظهرهما، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ أبي حامد أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى ...

والثاني : يجب، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، ويروى عن أحمد ...

এক শহরে চাঁদ দেখা গেল, অন্য শহরে দেখা গেল না এ অবস্থায় দেখতে হবে : যদি শহর দুটি কাছাকাছি হয়, তাহলে দুটোকে এক শহরের মতো গণ্য করা হবে। (অর্থাৎ এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য

জায়গার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয় হবে) আর যদি শহর দুটি পরস্পর দূরবর্তী হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে দুটি ‘ওয়াজহ’ রয়েছে : অধিক জাহির (অর্থাৎ দলিলের বিচারে অধিক স্পষ্ট এবং গ্রহণকারীর সংখ্যার বিচারে অধিক প্রসিদ্ধ) ‘ওয়াজহ’ এই যে, দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদের রোযা রাখা জরুরি হবে না। আবু হানীফা রাহ. এ-ই বলেছেন এবং শায়খ আবু হামিদও তা গ্রহণ করেছেন।

‘দ্বিতীয় ওয়াজহ’ এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। কাযী আবুত তাইয়েব তা গ্রহণ করেছেন আর আহমদ রাহ. থেকেও তা বর্ণিত।’’

(ফাতহুল আযীয শরহুল ওয়াজীয, আবদুল করীম রাফেয়ী, কিতাবুস সওম ৩/১৭৯-১৮০)

রাফেয়ী রাহ.-এর বৃত্তান্ত থেকে এ-ও বোঝা গেল, কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে সব ইমাম একমত যে, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়। মতভেদ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে।

তেমনি এ-ও জানা গেল যে, মতভেদের ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাবের ‘আযহার’ তথা বেশি যাহির ও অগ্রগণ্য মত, যা তা ইমাম রাফেয়ীর দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফারও মত। তবে আমার জানা নেই, আবু হানীফার এ মত তিনি কোথায় পেয়েছেন। না কি তার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, হানাফী মাযহাবেরও অগ্রগণ্য মত এটি। অর্থাৎ ‘আবু হানীফা’ বলে তিনি ‘হানাফী মাযহাব’ নির্দেশ করেছেন।

ফিকহে শাফেয়ীর বহু গ্রন্থ মাশাআল্লাহ মুদ্রিত। সেসব থেকে নকল করতে থাকলে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। তাই এখানে ফিকহে শাফেয়ীর কিছু কিতাবের শুধু বরাত উল্লেখ করছি। আগ্রহী পাঠক সেগুলো খুলে দেখতে পারেন।

১. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ইমাম গাযালী শাফেয়ী (৪৫০-৫০৫ হি.)
ইমাম গাযালী রাহ.-এর এই কিতাব তো মাশাআল্লাহ আম-খাস,

আলিম-বুদ্ধিজীবী সব মহলে সমান সমাদৃত। এতে (১/৩৩৮) সিয়ামের আলোচনায় প্রথম পরিচ্ছেদেই এ মাসআলা আছে। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন-

إذا رؤي ببلدة ولم ير بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على الكل، وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب.

২. আততাহযীব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফেয়ী, আবু মুহাম্মাদ হুসাইন ইবনে মাসউদ আলবাগাভী (৫১৬ হি.) (৩/১৪৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৮ হি., ১৯৯৭ ঈ.)

৩. আলবায়ান ফী মাযহাবিল ইমামিশ শাফেয়ী (৩/৪৭৮, দারুল মিনহাজ, জিদ্দা), আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া ইবনে আবিল খায়ের আলইমরানী আশশাফেয়ী (৪৮৯-৫৫৮)

৪. রওযাতুত তালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন (২/৩৪৮), ইমাম নববী শাফেয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি.)

৫. তুহফাতুল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ (৪/৫০৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত), ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী শাফেয়ী (৯৭৪ হি.)

৬. মুগনিল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ (১/৫৬৯, দারুল ফিকর, বৈরুত), আলখতীবুশ শিরবীনী শাফেয়ী (৯৭৭ হি.)

৭. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ (৩/২৩৫-২৩৬, আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যা, কায়রো), শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আররামলী শাফেয়ী (১০০৪ হি.)

মিনহাজ ফিকহে শাফেয়ীর নির্ভরযোগ্যতম 'মতন'। এর অনেক ভাষ্যগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে 'তুহফাতুল মুহতাজ' ও 'নিহায়াতুল মুহতাজ' শাফেয়ী ফকীহগণের কাছে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত। মিনহাজের অন্য অনেক শরহের মতো এ দুটোতেও আলোচিত মাসআলায় শায়খাইন (রাফেয়ী ও নববী)-এরই সহমত পোষণ করা হয়েছে।

৮. আলফাতাওয়াল ফিকহিয়্যাহ, ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী ২/৬০

৯. আহকামুল কুরআন (১/৭০) ইলকিয়া আততবারী (৪৫০-৫০৪ হি.)

১০. বাহরুল মাযহাব, আবুল মাহাসিন আররুয়ানী (৪১৫-৫০২ হি.)
শেষোক্ত দুই কিতাবের আলোচনা এখানে তুলে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে। ইমাম ইলকিয়া তবারী (শামসুল ইসলাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইলকিয়া আলহাররাছী) ''আহকামুল কুরআনে'' লেখেন-

وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بلد تسعة وعشرين يوما، أن على الذين صاموا تسعة وعشرين قضاء يوم.

وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك، إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف.

অর্থ, আসহাবে আবু হানীফার (অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের ধারক-বাহক ফকীহবৃন্দের) ইজমা আছে যে, যদি কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে যে শহরের অধিবাসীরা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে।
আর আসহাবে শাফেয়ী (অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাবের ধারক-বাহক ফকীহবৃন্দ) একে জরুরি মনে করেন না। কারণ দুই শহরের উদয়স্থলে পার্থক্য হতে পারে। (আহকামুল কুরআন, ইলকিয়া তবারী ১/৭০; আলজামি লিআহকামিল কুরআন, কুরতুবী ৩/১৫৭, আলবাকারা ২ : ১৮৫)
ইলকিয়া রাহ. আপন মাযহাব সম্পর্কে যা বলেছেন সে সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য নেই। তিনিই তাঁর মাযহাব সম্পর্কে ভালো জানেন। কিন্তু আসহাবে আবু হানীফার বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন সে সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, এ মাসআলা শুধু আবু ইউসুফ রাহ. ও মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণিত এবং অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহ এ বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন, যা ইতিপূর্বে নির্ভরযোগ্য বরাত সহকারে লেখা হয়েছে। আমার ধারণা, এখানে ইলকিয়া রাহ.-এর বিভ্রান্তি হয়েছে আবু বকর রাযী রাহ.-এর বক্তব্য থেকে। এ কারণে তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবে 'আসহাবে আবু হানীফা'র সাথে একটি কথা সম্বন্ধ করে বলে দিয়েছেন যে, ঐ বিষয়ে সকলের ইজমা আছে।

মূল ঘটনা এই যে, জাসসাস রাহ. ‘‘আহকামুল কুরআনে’’ আল্লাহ তাআলার বাণী- فعدة من ايام اخر এর অধীনে দুটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন : এক. যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে রমযানে কোনো রোযা রাখতে পারেনি সে কয়দিনের রোযা কাযা করবে-উনত্রিশ না ত্রিশ। দুই. কোনো শহরে ত্রিশ দিন রোযা রাখা হয়েছে তাহলে যারা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে কি না।

এই দুই মাসআলার বর্ণনা জাসসাস রাহ. এভাবে শুরু করেছেন-

ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف، وهشام عن محمد، من غير خلاف من أحد من أصحابنا، قالوا ... .

অর্থাৎ, বিশর ইবনুল ওয়ালীদ আবু ইউসুফ রাহ. থেকে, এবং হিশাম মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণনা করেন-আর এ বিষয়ে আমাদের ইমামদের থেকে বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি-তাঁরা বলেন, ...।

এভাবে কথা শুরু করে জাসসাস মাসআলা দুটি বলেছেন যে, অসুস্থ ব্যক্তি যে শহরের অধিবাসী ঐ শহরের অধিবাসীরা যদি ২৯ রোযা রেখে থাকে তাহলে তাকেও উনত্রিশ রোযা কাযা করতে হবে। আর কোনো শহরে যদি চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ত্রিশ রোযা রাখা হয় এবং উনত্রিশওয়ালারা তা জানতে পারেন তাহলে তাদের একদিনের রোযা কাযা করা জরুরি। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস ১/২২০)

জাসসাসের বক্তব্যের অর্থ, এ মাসআলা আবু ইউসুফ রাহ. ও মুহাম্মাদ রাহ. থেকে (নাদির রেওয়ায়েতে বিশর ও হিশামের সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে। আর আমাদের অন্য কোনো ইমাম থেকে এ মাসআলা বর্ণিত না হলেও বিপরীত সিদ্ধান্ত তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি। এ হচ্ছে তাঁর বক্তব্য। কিন্তু চিন্তা না করলে এ বক্তব্য পড়ামাত্র কারো মনে হতে পারে এর অর্থ, ‘‘আমাদের সকল ফকীহ এমনটা বলেছেন, কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি।’’ সম্ভবত ইলকিয়া রাহ.-এর এ বিভ্রান্তিই হয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে তিনি এ কথাটিকে সকল হানাফী ফকীহর ইজমাকৃত মাসআলা বানিয়ে দিয়েছেন!!

অথচ জাসসাস রাহ.-এর উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, এটি ফিকহে

হানাফীর ইজমায়ী মাসআলা। এখানে ইলকিয়া রাহ.-এর এক 'তাসামুহ' তো এই যে, ইজমায়ী নয় এমন মাসআলাকে ইজমায়ী বানিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় তাসামুহ এই যে, এ মাসআলা কি সকলস্থানের জন্য প্রযোজ্য, না শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে-এ দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। অথচ বড় বড় অনেক হানাফী ফকীহ একে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের বিধান মনে করেন।
যাহোক, বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে এসেছিল। আলোচনা হচ্ছিল শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে, তো এ বিষয়ে ফিকহে শাফেয়ীর অন্যান্য উদ্ধৃতির মতো ইলকিয়া রাহ.-এর উপরোক্ত উদ্ধৃতিরও মূলকথা হচ্ছে, শাফেয়ী মাযহাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য।

এবার শুনুন আবুল মাহাসিন রুয়ানী রাহ.-এর 'বাহরুল মাযহাব'-এর বরাত। ফিকহে শাফেয়ীতে আবুল মাহাসিন রুয়ানীর মাকাম ও অবস্থান কী তা এ ঘটনা থেকেও অনুমান করা যায় যে, একবার তিনি আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা হিসেবে বলেছেন-

لو احترقت كتب الشافعي لأ مليتها من حفظي

অর্থাৎ আল্লাহ না করুন, যদি শাফেয়ীর গ্রন্থাবলী পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাহলে আমি তা নিজ স্মৃতি থেকে লিখিয়ে দিতে পারব। (তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ, তাজুদ্দীন সুবকী ৭/১৯৪)

তাঁর জন্ম ৪১৫ হিজরীতে। আর মৃত্যু ৫০২ হিজরীতে। আশুরার দিন জুমার আগে যখন তিনি ইমলার মজলিস থেকে ফারিগ হন ঐ সময় বাতেনী মালাউনেরা তাকে শহীদ করে দেয়। (রাহিমাহুল্লাহ ওয়া রাযিয়া আনহু)

তিনি ফিকহে শাফেয়ীর উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনের শেষের দিকে লিখেছেন 'বাহরুল মাযহাব গ্রন্থটি। এর ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'মাযহাব' ও 'খিলাফিয়্যাত' বিষয়ে ছোট-বড় অনেক গ্রন্থ রচনা করেছি। পরে ইমামগণের আরো অনেক ফাওয়াইদ (মাসাইল

ও দালাইল) সংগৃহীত হয়েছে। তো ইচ্ছে হল, জীবনের শেষদিকে এক কিতাবে আমার কথাগুলো একত্র করে দেই -

(أحببت أن أجمع كلامي في آخر عمري في كتاب واحد)

যাতে আমার জন্য জানা সহজ হয় যে, ঐ কিতাবগুলোতে কী আছে। আর এ গ্রন্থে আমি 'আসাহ' (أصح)-এর উপর নির্ভর করব। (অর্থাৎ অধিকতর বিশুদ্ধ 'কওল' ও 'ওয়াজহে'র উপর এ কিতাবের বুনিয়াদ হবে) আর এর নাম রাখছি 'বাহরুল মাযহাব।' (বাহরুল মাযহাব, রুয়ানী, ভূমিকা)

তাঁর এ প্রিয়তম গ্রন্থে তিনি লেখেন, (অর্থ) এক শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখল অন্য শহরের অধিবাসীরা দেখল না-যদি দুই শহরের মাঝে দূরত্ব এত কম হয় যে, উদয়স্থল আলাদা হয় না, যেমন বাগদাদ ও বসরা, তাহলে অন্য শহরের অধিবাসীদের উপরও ঐ শহরের চাঁদ দেখার কারণে রোযা ফরয হবে।

আর যদি দুই শহর দূর-দূরান্তের হয় যেমন ইরাক ও হিজায বা শাম ও খোরাসান, তাহলে আবু হামেদ (আসফারাইনী, ইরাকী তরীকার শায়খ) বলেন, এক্ষেত্রে এক শহরের অধিবাসীদের অন্য শহরের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা জরুরি নয়। কাযী আবু হামেদ (আলমারওয়াররূযী, মৃত্যু : ৩৬২ হি.)ও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ...।

এরপর রুয়ানী এর দলীল উল্লেখ করেছেন। অতপর কাযী আবুত তাইয়েব তবারীর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন যে, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য সর্বাবস্থায় অবশ্যঅনুসরণীয়। এরপর রুয়ানী লেখেন- والأول أظهر عندي ড়অর্থাৎ প্রথম সিদ্ধান্তই আমার কাছে অধিক 'জাহির' (স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ)। (বাহরুল মাযহাব, আবুল মাহাসিন রুয়ানী ৪/২৭১, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত)

আবুল মাহাসিন রুয়ানীর শেষজীবনের এ কিতাবের বর্ণনার আলোকে

'তরহুত তাছরীব' অলিউদ্দীন ইরাকীর* মুদ্রিত নুসখায় (৪/১১২) রুয়ানীর বরাতে যে বিবরণ আছে তা সংশোধন করে নেওয়া উচিত।

[টীকা : * আহকামের হাদীসের উপর যায়নুদ্দীন ইরাকীর অতি উত্তম কিতাব 'তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ'। এরই শরহ-ভাষ্যগ্রন্থ হচ্ছে 'তরহুত তাছরীব'। এর রচনা তিনি নিজেই শুরু করেছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করেছেন তাঁর পুত্র অলিউদ্দীন ইরাকী। কিতাবুস সিয়ামের এ পরিচ্ছেদগুলো অলিউদ্দীন ইরাকীকৃত তাকমিলারই অংশ।]

তাতে এ স্পষ্ট বৃত্তান্তের পর যে, শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় মনীষী উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন না এবং এ বৃত্তান্তেরও পর যে, শায়খ আবু হামেদ (আসফারাইনী), আবু ইসহাক শীরাজী, গাযালী, শাশী (আবু বকর ফখরুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ৪২৯ হি-৫০৭ হি., হিলয়াতুল উলামার লেখক) ও অধিকাংশের নিকট 'আসাহ' অধিকতর সহীহ এই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায় রোযা জরুরি হবে না-এই দুই স্পষ্ট বিবরণের পর তরহুত তাছরীবের মুদ্রিত নুসখায় লেখা আছে-

والثاني : الوجوب، وإليه ذهب القاضي أبو الطيب، والروياني، وقال : إنه ظاهر المذهب، واختاره جميع أصحابنا.

অর্থাৎ দ্বিতীয় 'ওয়াজহ' এই যে, (দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায়) রোযা ওয়াজিব হবে। কাযী আবুত তাইয়েব এদিকেই গিয়েছেন, রুয়ানীও। তিনি বলেছেন, এটি 'জাহিরুল মাযহাব।' এবং একে আমাদের সকল আসহাব (সকল শাফেয়ী ফকীহ) গ্রহণ করেছেন।-তরহুত তাছরীব ৪/১১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২১ হিজরী)

আহমদ গুমারী এ বরাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চিন্তা না করে এবং আগে-পরের স্পষ্ট কথাগুলোর দিকে লক্ষ্য না করে তার কিতাব

‘‘তাওজীহুল আনযার’’-এ তা নকল করে দিয়েছেন!!

চিন্তা করার বিষয় এই যে, যখন অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহ্ প্রথম সিদ্ধান্তকে ‘আসাহ’ (অধিক বিশুদ্ধ/অগ্রগণ্য) বলছেন তখন দ্বিতীয় ওয়াজহের বিষয়ে واختاره جميع أصحابنا (আমাদের সকল ফকীহ তা গ্রহণ করেছেন) বলার কী অর্থ? এবং যখন ফিকহে শাফেয়ীর কিতাবসমূহে এ মাসআলায় শুধু শাফেয়ী ফকীহগণের মাসলাকই উল্লেখ করা হচ্ছে, সরাসরি ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কোনো উক্তি/বক্তব্য কেউ উল্লেখই করছেন না, স্বয়ং রুয়ানীও উল্লেখ করেননি তাহলে একে ‘জাহিরুল মাযহাব’ বলা যায় কীভাবে?

পাঠক ইতিমধ্যে তার শেষ জীবনের কিতাব ‘বাহরুল মাযহাবের’ আলোচনা পাঠ করেছেন। ওখানে তিনি পরিষ্কার বলছেন-

والأول أظهر عندي

অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়ার সিদ্ধান্তই আমার কাছে অধিক ‘জাহির’ (স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ)।

রুয়ানীর রচনাবলির মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব ‘হিলয়াতুল মুমিন’। জামেয়া উম্মুল কুরার একজন তালিবে ইলম এর এক অংশের তাহকীক (পান্ডুলিপি-সম্পাদনা) করেছেন। তাঁর সামনে এ কিতাবের দুটো হস্তলিখিত পান্ডুলিপি ছিল। দুটোতেই অনেক জায়াগায় কিছু কিছু বাক্য অস্পষ্ট।

‘হিলয়াতুল মুমিন’ সম্পর্কে ইবনুস সালাহ রাহ. (৬৪৩ হি.) বলেছেন, এ কিতাবে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের বাইরের অনেক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন (তাহযীবুল আসমা, নববী ১/৭৮৩)। এবং কাযী আবু শুহবা (৭৭৯-৮৫১ হি.) ‘তবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ’য় বলেছেন, এতে মাযহাবের বাইরে তাঁর নিজের অনেক ‘‘ইখতিয়ারাত’’ বা ব্যক্তিগত মত আছে, যার অনেক কিছুই মালেক রাহ.-এর মাযহাবের মুয়াফিক।

(শাযারাতুয যাহাব, ইবনুল ইমাদ ৪/৪, ৫০২ হি.)

হিলয়াতুল মুমিনের যে অংশ ঐ তালিবে ইলম তাহকীক করেছেন তাতে লেখা আছে-

ولو أن أهل بلد رأوا الهلال يلزم على جميع أهل البلاد الصوم في ذلك اليوم في ظاهر المذهب وهو اختيار جماعة من أصحابنا، وبه قال أحمد، ... وهو اختيار القاضي الطبري.

অর্থ, যদি কোনো শহরবাসী চাঁদ দেখে তাহলে অন্য সকল শহরের অধিবাসীদের উপর ঐ দিন রোযা রাখা জরুরি হবে, জাহের মাযহাব অনুযায়ী।

এটিই আমাদের আসহাবের (ফকীহদের) এক জামাতের গৃহীত সিদ্ধান্ত। আর আহমদ রাহ. এমনটি বলেছেন ... এবং কাযী তবারীর গৃহীত মাসলাকও তা। (হিলয়াতুল মুমিন, আবুল মাহাসিন রুয়ানী, তাহকীক, তালিবে ইলম মুহাম্মাদ ইবনে মাতার ইবনে আলী আলমালেকী, জামেয়া উম্মুল কুরা ১৪২৮ হি.)

''হিলয়াতুল মুমিনে'র এ উদ্ধৃতি 'তরহুত তাছরীবে'র সূত্র হতে পারে। তবে اختيار جماعة من أصحابنا (আমাদের ফকীহগণের মধ্যে এক জামাতের গৃহীত মাসলাক) বিকৃত হয়ে اختاره جميع أصحابنا (আমাদের সকল আসহাব তথা ফকীহগণের গৃহীত মাসলাক)-এ পরিণত হয়েছে।

এখন থাকল একে 'জাহিরুল মাযহাব' বলা, যদি 'জাহিরুল মাযহাব' শব্দবন্ধের বিষয়ে রুয়ানীর বা শাফেয়ী লেখকগণের নিজস্ব কোনো পরিভাষা* না থাকে তাহলে প্রবল সম্ভাবনা এই যে, ওখানে বাক্যের কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে। প্রাচীন ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পান্ডুলিপি খুঁজলে প্রকৃত বিষয়টি বোঝা যাবে। আমার ধারণা, এখানে বাক্যটি এরকম হয়ে থাকবে-

في ظاهر مذهب مالك، وهو اختيار جماعة من أصحابنا

অর্থাৎ (উপরোক্ত সিদ্ধান্ত) মালেক রাহ.-এর মাযহাবের জাহির অনুযায়ী। আর তা আমাদের এক জামাত আসহাবের (ফকীহের) গৃহীত মাসলাক।

ফিকহের কিতাবের সাথে অন্তরঙ্গতা রাখা তালিবে ইলমগণ চিন্তা করলে দেখবেন في ظاهر المذهب (ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মাযহাবের জাহের রেওয়ায়েত) বলার পর (وهو اختيار جماعة من أصحابنا) বাক্যটি অসংলগ্ন মনে হয়। এ বাক্য তখনই সংলগ্ন হতে পারে যখন ইতিপূর্বে অন্য কোনো ইমাম বা ফকীহের মাযহাব বর্ণনা করা হবে। অন্যথায় যে মাসলাক ইমাম শাফেয়ীর জাহির রেওয়ায়েত তা তো ঐ মাযহাবের একদল ফকীহর নয়, অধিকাংশ ফকীহর মাসলাক হবে। আর তা হবে 'ইত্তিবা'র (অনুসরণের) ভিত্তিতে, 'ইখতিয়ারে'র (পছন্দ ও গ্রহণের) ভিত্তিতে নয়। এটাই সাধারণ নিয়মের কথা।

যাহোক, এ বিষয়ে চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা তো 'হিলয়াতুল মুমিনে'র প্রাচীন পান্ডুলিপিসমূহ এবং এর লেখকের পরিভাষাসমূহের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর এবং এ যুগের গবেষক শাফেয়ী আলিমগণের শরণাপন্ন হওয়ার পরই বলা যেতে পারে। আফসোস, এ মুহূর্তে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা হয়তো এর সুযোগ করে দিবেন। আমীন।

কিন্তু যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, 'হিলয়াতুল মুমিনে' রুয়ানীর এ বাক্য এভাবেই আছে এবং এর সাধারণ অর্থই উদ্দেশ্য তাহলে বলাই বাহুল্য যে, এটি একটি অবাস্তব কথা, যা তাঁর শেষ জীবনে লেখা ''বাহরুল মাযহাবে''র বিবরণেরও পরিপন্থী। এতে তিনি দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়াকেই 'আযহার' বলেছেন। আর তাঁর আগের-পরের অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহর বক্তব্যও তা-ই। وبالله التوفيق

* টীকা :

যেমন এ পরিভাষা হতে পারে যে, মাযহাবের কোনো ফকীহর (আসহাবুত তারজীহ স্তরের) দৃষ্টিতে যে সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ বা অগ্রগণ্য মনে হবে তিনি তাকে المذهب বা ظاهر المذهب শব্দে ব্যক্ত করেন। যদিও তা ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কোনো 'মানসূস আলাইহি' স্পষ্ট বক্তব্য না হয়; বরং তাঁর মাযহাবের কোনো ফকীহর ইস্তিমবাত হয়।

কিংবা এ পরিভাষাও হতে পারে যে, মাযহাবের কোনো ফকীহ (মুজতাহিদ ফিল মাসাইল স্তরের, বা শাফেয়ীগণের পরিভাষা অনুযায়ী 'আসহাবুল উজূহ' স্তরের) যে সিদ্ধান্ত ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে বর্ণিত কোনো মাসআলার ভিত্তিতে ইসতিখরাজ করেছেন এবং তা তাঁর দৃষ্টিতে শাফেয়ী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হওয়ার দাবি রাখে, একে তিনি 'জাহিরুল মাযহাব' বলবেন।

কোনো লেখকের গ্রন্থে এ ধরনের কোনো পরিভাষার অনুসরণ বিচিত্র নয়। তবে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া নিশ্চিতভাবে কিছু বলা গবেষণার নীতির পরিপন্থী এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয।

মালেকী মাযহাব

ইবনুল কাসিম রাহ. ও ইবনে ওয়াহব রাহ. ইমাম মালেক রাহ. থেকে বর্ণনা করেন-

إن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان، ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء.

অর্থ, বসরার লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখল, এরপর এর সংবাদ কুফা, মদীনা ও ইয়ামানবাসীদের নিকট পৌঁছল তাহলে তাদের রোযা রাখা জরুরি হবে। আর সময় অতিবাহিত হয়ে থাকলে কাযা করা জরুরি হবে।

এ বর্ণনা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুস ''আলমাজমুআ''য় উল্লেখ করেছেন। ইনি ইমাম সুহনূনের অন্যতম বড় শাগরিদ। আর সুহনূন রাহ. হলেন ইবনুল কাসিম ও ইবনে ওয়াহবের শাগরিদ। আর এঁরা দুজন ইমাম মালিক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ।

''কিতাবুল মাজমূআ'' থেকে এ রেওয়ায়েত মুফাসসির আবু আবদুল্লাহ কুরতুবী (৬৭১ হি.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'আলজামি লিআহকামিল কুরআনে (৩/১৫৯) নকল করেছেন। আরো দেখুন : আননাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত, আবদুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ আলকাইরাওয়ানী (৩৮৬ হি.) খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১; আলমুনতাকা শরহুল মুয়াত্তা, আবুল ওয়ালীদ আলবাজী (৪৯৪ হি.) খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩০।

উল্লেখ্য, বসরা থেকে কুফার দূরত্ব ৩৬৭ কি.মি.। আর মদীনার দূরত্ব ১০৫০ কি.মি., ইয়ামানের দূরত্ব ১৭১৭ কি.মি. (আনুমানিক)।

এতো ছিল ইমাম মালেক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদদ্বয়ের বর্ণনা। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রাহ.-এর মাদানী শাগরিদ আবদুল মালিক ইবনুল মাজিশূন (২১২ হি.)-এর বর্ণনা কিছুটা আলাদা। তিনি বলেছেন-

إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له، فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين، لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكمُ ذلك الحاكم ممن هو في وِلايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين، فيلزم القضاءُ جماعةَ المسلمين. قال : وهذا قول مالك.

বসরায় চাঁদ দেখা যদি এমন ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হয়ে থাকে যে, সাক্ষ্য ও সাক্ষীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনই হয়নি তাহলে অন্য শহরের অধিবাসীদের ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতে হবে (অথবা অর্থ, অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্য বসরার কাযীর ফয়সালাই অবশ্যঅনুসরণীয় হবে) আর যদি বসরার শাসকের কাছে দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হয় তাহলে তা শুধু ঐ কাযীর কর্তৃত্বের

এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় হবে, অন্য শহরে নয়। তবে হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীনের কাছে চাঁদ প্রমাণিত হলে তাঁর ফয়সালা সকল মুসলিমের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে।

তিনি (ইবনুল মাজিশূন রাহ.) বলেন, এটা মালিক রাহ.-এর সিদ্ধান্ত। ইবনুল মাজিশূন রাহ.-এর এ বর্ণনা ইমাম আবু ইসহাক ইসমাইল ইবনে ইসহাক আলবাগদাদী আলমালেকী রাহ. (২০০-২৮২ হি.)-এর বরাতে মুফাসসির কুরতুবী ''আলজামি লিআহকামিল কুরআনে'' (৩/১৫৯) এবং ইমাম আবুল ওয়ালীদ বাজী রাহ. ''আলমুনতাকা''য় (২/৪৩০-৪৩১) নকল করেছেন।

এবং একে আরো স্পষ্ট ভাষায় ইমাম ইবনে আবী যায়েদ আলকাইরাওয়ানী (৩৮৬ হি.) ''আননাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত'' গ্রন্থে (২/১১) ইবনে হাবীব (আবদুল মালিক ইবনে হাবীব, 'আলওয়াজিহা' লেখক ও ইবনুল মাজিশূন এর শাগরিদ)-এর বরাতে নকল করেছেন। ওখানে শেষ বাক্যটি এই - (وهذا قول مالك وأصحابه)

অর্থাৎ এটি মালিক রাহ. ও তাঁর শাগরিদগণের সিদ্ধান্ত।

ইমাম মালেক রাহ.-এর ঐ শাগরিদদের মাঝে মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান (১২৪-১৮৮ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে দীনার (১৮২ হি.) বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবদুল বার রাহ. ''আলইসতিযকারে'' (১০/২৯) ইবনুল মাজিশূনের সাথে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন।

(وهو قول المغيرة وابن دينار وابن الماجشون)

পরবর্তীতে মালেকী মাযহাবের কিতাবসমূহে সাধারণভাবে ইবনুল কাসিমের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটিই তাঁদের প্রসিদ্ধ মাযহাব। কিন্তু চিন্তা করার বিষয় এই যে, ইবনুল কাসিম ও ইবনুল মাজিশূন উভয়ের বর্ণনায় মাসআলার প্রেক্ষাপট এই ধরা হয়েছে যে, বসরায় চাঁদের সিদ্ধান্ত হয়েছে আর এর সংবাদ কুফা, মদীনা ও

ইয়েমেনে পৌঁছেছে।

এ প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তাঁর উদ্দেশ্য কি শুধু একটি উদাহরণ দেওয়া, না এ কথা জানানো যে, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় তখনই হবে যখন এদের পরস্পরের দূরত্ব অনেক বেশি না হবে; বরং কাছাকাছি হবে বা দূরের হলেও খুব বেশি দূরের না হবে।

মালেকী মাযহাবের অনেক লেখক বিষয়টি পরিষ্কার না করলেও কোনো কোনো গবেষক ফকীহ একথা স্পষ্ট বলেছেন যে, ইমাম মালিক রাহ.-এর বক্তব্যে যে শহরগুলোর কথা এসেছে এ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, পরস্পর দূরত্ব খুব বেশি হলে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে না।

যে লেখকগণ একে সর্বাবস্থার বিধান হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের একজনের বরাত নকল করছি।

আবুয যিয়া খলীল ইবনে ইসহাক (৭৬৭ হি.)-এর ''মুখতাসারু খলীল'' ফিকহে মালেকীর এক প্রসিদ্ধ মতন। এর অনেক শরহ-হাওয়াশী (ভাষ্য ও টীকা) রচিত হয়েছে। এক শরহ আল্লামা আবুল বারাকাত আহমদ ইবনে আহমদ দরদের মালেকী (১১২৭-১২০১ হি.)-এর রচিত, যা 'আশশারহুল কাবীর' নামে প্রসিদ্ধ। এই শরহের উপর আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ দুসূকী (১২৩০ হি.)-এর হাশিয়া (টীকা) আছে এবং দুটো একসাথে মুদ্রিত।

দরদের লেখেন-

(وعَمَّ) الصومُ سائر البلاد قريبا أو بعيدا، ولا يراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه (إن نقل) ثبوته (بهما) أي بالعدلين أو المستفيضة (عنهما) أي عن العدلين، أو عن المستفيضة.

فالصور أربع : استفاضة عن مثلها، أو عن عدلين، وعدلان عن مثلهما، أو عن استفاضة.

ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل واحد اثنان، فيكفي نقل اثنين عن واحد، ثم عن الآخر، ولا يكفي نقل واحد عن واحد ... وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين، فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح.

দরদের রাহ.-এর এ বর্ণনার সারকথা এই যে, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়। যদিও এ দুই জায়গার মাঝে কসরের দূরত্ব বা তার চেয়েও বেশি দূরত্ব হয় এবং যদিও দুই জায়গার উদয়স্থল আলাদা হয়। তবে শর্ত এই যে, শরীয়তমতে চাঁদ প্রমাণিত হতে হবে। এরপর তিনি চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এবং এও বলেছেন যে, কোনো শহরের কাযীর চাঁদের ফয়সালা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও যদি অন্য শহরে পৌঁছে দেয় তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য মত অনুসারে এ ফয়সালার উপর আমল করা জরুরি হবে। (আশশরহুল কাবীর ১/৫১০-৫১১, দারুল ফিকর, বৈরুত)

''আশশরহুল কাবীর'' এ মুহূর্তে আমার সামনে নেই। আমি এ উদ্ধৃতি উস্তাযে মুহতারাম হযরত শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর প্রবন্ধ رؤية الهلال : قبول الشهادة برؤية الهلال وموانعها থেকে নকল করেছি। প্রবন্ধটি بحوث في قضايا فقهية معاصرة -এর দ্বিতীয় সংস্করণের, যা দারুল কলম দামেশক কর্তৃক ১৪৩২ হিজরী, ২০১১ ঈসায়ী প্রকাশিত, দ্বিতীয় খন্ডে আছে।

পরবর্তী (মুতাআখখিরীন) মালেকী ফকীহগণের বিপরীতে এ মাযহাবের একাধিক গবেষক ফকীহ, ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীরে যাঁদের অনেক উঁচু মাকাম রয়েছে, স্পষ্ট বলেছেন, যে সকল অঞ্চল পরস্পর অনেক বেশি দূরবর্তী সেগুলোতে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। যেমন -

১. ইমাম আবু উমার ইবনে আবদিল বার মালেকী রাহ. (৪৬৩ হি.) ''আলইসতিযকার'' গ্রন্থে ইমাম মালেক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ ও মাদানী শাগরিদগণের বর্ণনা ও অন্যান্য ফকীহগণের মাযহাব বর্ণনার

পর লেখেন-

২. وأجمعوا أنه لا تُراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالاندلس من خراسان.

অর্থাৎ তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, যে সকল শহর পরস্পর অনেক বেশি দূরে অবস্থিত যেমন আন্দালুস থেকে খোরাসান, সেখানে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় প্রযোজ্য হবে না। (আলইসতিযকার শরহুল মুয়াত্তা ১০/৩০)

ইবনে আবদুল বার রাহ. আন্দালুসের কুরতুবা (কর্ডোবা) নগরীর অধিবাসী ছিলেন। কুরতুবা থেকে (উত্তর) খোরাসান (আনুমানিক) ৫৩০৩) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৩. আবু বকর ইবনুল আরাবী
এমনিভাবে কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী (মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ৪৬৮-৫৪৩ হি.) তাঁর কিতাব ''আরিযাতুল আহওয়াযী'' (৩/২১০-২১১)-এর আলোচনার বিপরীতে তার অন্য কিতাব ''আহকামুল কুরআনে'' লেখেন-

إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فقد قال قوم : لأهل كل بلد رؤيتهم. وقيل يلزمهم ذلك ...

واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا، فقيل : رده لأنه خبر واحد، وقيل : رده، لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح، لأن كريبا لم يشهد، وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة، ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزئ فيه خبر الواحد.

ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأَغْمَات، وأهل بإشبيلية ليلة السبت، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم ...

অর্থ, কেউ যদি অন্য কোনো শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সংবাদ দেয় তাহলে হয়তো সে শহর কাছে হবে অথবা দূরে। যদি কাছে হয় তাহলে দুই শহরের বিধান একই। আর দূরে হলে এক দল (ফকীহগণের এক জামাত) বলেন, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে,

তাদের জন্যও (সে চাঁদ দেখা) অবশ্যঅনুসরণীয়। (এরপর ইবনে আরাবী রাহ. আদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর ঐ হাদীস উল্লেখ করে বলেন) ইবনে আববাস রা.-এর এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় ইখতিলাফ আছে : কেউ বলেছেন, তিনি এর (শামে চাঁদ দেখার) ইতিবার এজন্য করেননি যে, বর্ণনাকারী ছিলেন একজন। আর কেউ বলেছেন, ইতিবার না করার কারণ দুই এলাকার উদয়স্থল আলাদা হওয়া। এটিই সঠিক কথা। কারণ কুরাইব তো ফয়সালার সংবাদ দিয়েছিলেন। আর এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, কাযীর ফয়সালা নকল করার ক্ষেত্রে একজনের সংবাদও গ্রহণযোগ্য। (তাই ইতিবার না করার কারণ সংবাদদাতা একজন হওয়া নয়, উদয়স্থল আলাদা হওয়া।)

এর দৃষ্টান্ত এমন যে, যদি 'আগমাত'-এ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখা যায় আর ইশবীলিয়্যায় শুক্রবার দিবাগত রাতে, তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে।-আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ১/৮৪-৮৫

আর আগমাত থেকে ইশবিলিয়্যার দূরত্ব ৬৮১ কি.মি (আনুমানিক)

৪. ইবনে রুশদ আলহাফীদ

ইমাম আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ (৫২০-৫৯৫ হি.)ও ''বিদায়াতুল মুজতাহিদ'' গ্রন্থে ইমাম মালিক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ ও মাদানী শাগরিদদের বর্ণনা উল্লেখ করার পর লেখেন-

وأجمعوا أنه لا يُراعى ذلك في البلدان النائية، كالأندلس والحجاز.

এবং সবাই এ বিষয়ে একমত যে, অনেক দূরের শহরসমূহে যেমন আন্দালুস ও হিজাযে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য হবে না। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৩৫৮, দারুল আকীদা, কাহেরা)

(আন্দালুস থেকে মদীনা ৪৪৪৪ কি.মি. আনুমানিক)

৫. আবুল আববাস কুরতুবী

ফিকহ ও হাদীসের ইমাম আল্লামা আবুল আববাস আহমদ ইবনে উমার আলকুরতুবী (৫৭৮-৬৫৬ হি.) সহীহ মুসলিমের সংক্ষেপণ করেছেন। এরপর 'আলমুফহিম'' নামে নিজেই এর শরহ (ভাষ্য)

লিখেছেন। এতে 'কিতাবুস সওম-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম এই-

... باب لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد

অর্থাৎ, দূরে দূরে হলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য।

এ পরিচ্ছেদের ভাষ্যে তিনি লিখেছেন-অর্থ, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এ বাণী-

هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ আদেশ করেছেন) মারফূ হাদীস হওয়া স্পষ্ট। সুতরাং এ হাদীস দলিল যে, যেসব শহর শাম ও হিজাযের মতো দূরে দূরে অবস্থিত সেখানে প্রত্যেককে নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা চাই, যদিও কোনো জায়গার চাঁদ দেখা আমীরুল মুমিনীনের কাছেও প্রমাণিত হয়। হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীনের কাছে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি যদি ব্যাপকভাবে এর ফয়সালা করেন এবং সবাইকে সে অনুসারে আমলের হুকুম করেন তাহলে প্রত্যেককে এই চাঁদ দেখার উপরই আমল করতে হবে। আমীরের বিরোধিতা করা বৈধ হবে না। কারণ এ মাসআলা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। আর আমীরুল মুমিনীনের ফয়সালার পর বিপরীত ইজতিহাদের কার্যকারিতা থাকে না। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা অবৈধ হবে। তাঁর ভাষায়-

... فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته، إذ المسألة اجتهادية مختلف فيها، ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهاد، ولا تحل مخالفته.

আবুল আববাস কুরতুবী রাহ. তাঁর আলোচনায় সামনে গিয়ে বলেন-

وحكى أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تُراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان، قال : ولكل بلد رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين.

قلت : وهذا الإجماع الذي حكاه أبو عمر يدل على أن الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما هو

فيما تقارب من البلاد، ولم يكن في حكم القطر الواحد.

এই উদ্ধৃতির সারকথা হচ্ছে, ইবনে আবদুল বার রাহ. এ বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন যে, অনেক বেশি দূরের শহর-নগরে, যেমন আন্দালুস থেকে খোরাসান, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় ধর্তব্য হবে না। এই ইজমা থেকে জানা গেল যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা প্রসঙ্গে যে ইখতিলাফ তা এমন শহর-নগরের ক্ষেত্রে, যা একে অপর থেকে অনেক বেশি দূরে নয়, যে কারণে কুতরই (প্রান্ত) আলাদা হয়ে যায়।

এরপর মালেকী মাশায়েখের বক্তব্য যে, নিকট-দূর সকল ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য ধর্তব্য এর উপর পর্যালোচনা করে আবুল আববাস কুরতুবী রাহ. বলেন, মাশায়েখদের এ কথাকে ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর নকলকৃত ইজমার আলোকে বুঝতে হবে। তিনি লেখেন-

هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة، ولم يفرقوا بين البعيد والقريب من الأقاليم، والصواب الفرق، بدليل الإجماع الذي حكاه أبو عمر، فيحمل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة، والله تعالى أعلم.

(আলমুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীছি কিতাবি মুসলিম ৩/১৪২-১৪৪, দারু ইবনে কাছীর, দিমাশক ও বৈরুত)

আবুল আববাস কুরতুবীর শাগরিদ মুফাসসির আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী (৬৭১ হি.) 'আলজামি লিআহকামিল কুরআন''-এ নিজ শায়খের বিভিন্ন কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আরাবী ও ইবনে আবদিল বার এর বরাতও উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠক তাঁর আলোচনা 'আলজামি লিআহকামিল কুরআন (৩/১৫৭-১৫৯, সূরাতুল বাকারার আয়াত : ১৮৫-এর অধীনে) দেখতে পারেন।

তদ্রূপ ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল আববাস আলকারাফী আহমদ ইবনে ইদরীছ আলমালেকী (৬২৬-৬৮৪ হি.) ''আযযখীরাহ'' (২/৪৯০) ও ''আলফুরূক'' গ্রন্থে দালীলিক আলোচনার পর লেখেন-

وهذا حق ظاهر، وصواب متعين، أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الهلال بقطر منها

فبعيد عن القواعد، والأدلة لم تقتض ذلك، فاعلمه.

অর্থ, ‘এ (অর্থাৎ প্রত্যেক দিগন্তে নিজেদের চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হওয়া) স্পষ্ট বিধান; বরং এ-ই নির্ধারিত। কোনো ভূখন্ডে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা সকল ভূখন্ডের অধিবাসীর উপর রোযা ফরয হওয়ার বক্তব্য (শরীয়তের) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং শরীয়তের দলিলসমূহের দাবিও তা নয়। (আলফুরূক, কারাফী ২/৩০২ ফরক : ১০২)

তবে মনে রাখতে হবে, কারাফী উপরের কথাটি নিজের গবেষণা অনুসারে বলেছেন। একে মালেকী মাযহাবের সাথে সম্বন্ধ করেননি; বরং মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কওলের উপর আপত্তি আকারে পেশ করেছেন।

৬. ইবনে জুযাই আলকালবী (৬৯৩-৭৪১ হি.)

ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে জুযাই আলকালবী আলমালেকী ৭৪১ হিজরীতে যার শাহাদত, তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব ‘‘আলকাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ’’য় লেখেন-

إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان، وفاقا للشافعي، خلافا لابن الماجشون، ولا يلزم في البلاد البعيدة جدا، كالأندلس والحجاز إجماعا.

এখানে ইবনে জুযাই মালেকী রাহ. পরিষ্কার বলেছেন যে, অনেক দূরের শহর-নগরে যেমন আন্দালুস ও হিজায, এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় (লাযিম) না হওয়া ইজমায়ী বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (আলকাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৮৯, আলকিসমুল আওয়াল, কিতাবুস সিয়াম)

৭. ইবনে আরাফা (৭১৬-৮০৩ হি.)

অষ্টম হিজরী শতকে মালেকী মাযহাবের অনেক বড় ব্যক্তিত্ব

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরাফাও ইবনে আবদিল বার রাহ.-এর বক্তব্য নকল করে এর সমর্থন করেছেন।

ইবনে আরাফার ‘‘আলমুখতাসারুল কাবীর’’ আমার কাছে নেই। আর তাঁর ‘‘আলমাবসূত ফিল ফিকহ’’ সম্ভবত এখনো পান্ডুলিপি আকারে আছে। তবে তাঁর বক্তব্য ‘‘মাওয়াহিবুল জলীল’’ হাত্তাব

(৩/২৮৪), ''তাবয়ীনু উজূহিল ইখতিলাল ফী মুসতানাদি ইলানিল আদলিয়্যাতি বিছুবূতি রুয়াতিল হিলাল'', আবদুর রহমান ইবনে যায়দান (পৃষ্ঠা : ৭৪), এবং ''আলআযবুয যুলাল'' (১/২৭)-এ নকল করা হয়েছে।

৮. আবু আবদিল্লাহ আলহাত্তাব আলমালেকী (৯০২-৯৫৪ হি.)

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু আবদিল্লাহ আলহাত্তাব ''মুখতাসারু খলীলে''র প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত ভাষ্যকার। তিনি তার শরহে, ইবনে আরাফার সূত্রে আবু উমার ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর কথা নকল করেছেন যে, অনেক দূরের এলাকায় এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য না হওয়া সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। আর একে তিনি تنبيه শিরোনামে উল্লেখ করেছেন, যা বাংলায় অনেকটা 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শিরোনামের সমার্থক।

تنبيه : قال ابن عرفة : قال أبو عمر : وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤيته ما بعد كالأندلس من خراسان.

(মাওয়াহিবুল জলীল শরহু মুখতাসারি খলীল, হাত্তাব মালেকী ৩/২৮৪)

এ বিষয়ে মালেকী ফকীহগণের আরো বরাত-উদ্ধৃতির জন্য আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব-এর কিতাব ''আলআযবুয যুলাল ফী মাবাহিছি রুয়াতিল হিলাল'' অধ্যয়ন করা যায়, যা কাতারে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আনসারী রাহ.-এর তত্ত্বাবধানে মোটা মোটা দুই ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছে।

এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমার পক্ষে আরো বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

(আগামী সংখ্যায় পড়ুন : হাম্বলী মাযহাব ও অন্যান্য)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

জানুয়ারি ২০১৪, রবিউল আউয়াল ১৪৩৫

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন : একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-৬

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাম্বলী মাযহাব

চার মাযহাবের মধ্যে এক হাম্বলী মাযহাবেরই প্রায় সকল ফকীহ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন। দু চারজন আছেন, যারা এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

স্বয়ং ইমাম আহমদ রাহ. থেকেই এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। ইমাম আহমদ রাহ. (২৪১ হি.)-এর শাগরিদ ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী (২৭৫ হি.) যিনি ''আসুসনান''-এর সংকলক, ইমাম আহমদ রাহ.-এর কাছে যেসব ফিকহী মাসাইল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন বা তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কেউ করেছিলেন তা একটি

আলাদা কিতাবে সংকলিত হয়েছে। ''মাসাইলু আহমদ'' নামে তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আবু মুয়ায তারিক সম্পাদিত এডিশনটি এর উত্তম এডিশন। আমি সেখান থেকে এ মাসআলা নকল করছি।

سمعت أحمد، سئل عن حديث كريب، تذهب إليه؟ يعني حديث محمد بن أبي حرملة عن كريب، قدمت يعني من الشام، فسألني ابن عباس، قال : لا، يعني لا أذهب إليه. قال : إذا استبان لهم أنهم رأوه يعني قبل اليوم الذي صاموا قضى يعني ذلك اليوم، يعني هذا الحديث : حدثنا موسى بن إسماعيل ...

অর্থ, আবু দাউদ বলেন, আমি আহমদ রাহ.কে বলতে শুনেছি, তাঁকে কেউ প্রশ্ন করলেন, আপনার মাযহাব কি কুরাইবের হাদীসের অনুযায়ী? অর্থাৎ, ঐ হাদীস যাতে আছে যে, কুরাইব শাম থেকে মদীনায় এলেন তো আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।) আহমদ রাহ. বললেন, না। অর্থাৎ আমার মাযহাব সে অনুযায়ী নয়। আহমদ রাহ. বললেন, যখন (এ এলাকার লোকদের) পরিষ্কার জানা হয়ে যাবে যে, (ঐ এলাকার লোকেরা) এক দিন আগে চাঁদ দেখেছে তখন এদেরকে সেদিনের রোযা কাযা করতে হবে। (এরপর আবু দাউদ রাহ. এ হাদীসের পুরা মতন উল্লেখ করেন।) -মাসাইলু ইমাম আহমদ, আবু দাউদ সিজিস্তানী পৃষ্ঠা : ১২৮, বর্ণনা : ৬১৬

আবু দাউদ সিজিস্তানী রাহ.-এর এ উদ্ধৃতির দ্বারা একদিকে যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর মাযহাব জানা গেল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রেও তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার কথা বলতেন এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি নিজেদের চাঁদের ভিত্তিতে রোযা আরম্ভকারীদের কাছে প্রমাণিত হয় যে, অমুক শহরে চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই তাদের এক দিন আগে রোযা শুরু হয়েছে তাহলে তাদের ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

তেমনি এ-ও জানা গেল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর ঐ হাদীসের মূল কথা এটাই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়

নয়। আর এ কারণে এক শহরের অধিবাসীদের উপর অন্য শহরের অধিবাসীদের চাঁদ দেখার কারণে রোযার কাযা জরুরি হবে না।

ইমাম আহমদ রাহ.-এর সামনে এ হাদীস উল্লেখ করে যখন বলা হল-

تذهب إليه؟

আপনি কি তা গ্রহণ করেন? (আপনার মাযহাব কি এ অনুযায়ী?) তখন তিনি বললেন, 'না।' এরপর নিজের মাযহাব বর্ণনা করলেন। তিনি এ কথা বলেননি যে, আমার মাযহাব এ হাদীসের বিপরীত নয়। আমার মাযহাব তো এই যে, শামের চাঁদ দেখা মদীনাবাসীর জন্যও প্রযোজ্য আর এ হাদীসেও তা বলা হয়েছে বা এর বিপরীত কিছু বলা হয়নি। বরং ইমাম আহমদ রাহ., ইমাম আবু দাউদ ও প্রশ্নকারী সকলেই বুঝছেন যে, এ হাদীস দ্বারা শামের চাঁদ দেখা মদীনাবাসীর জন্য (এবং এভাবে দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য) ধর্তব্য না হওয়াই প্রমাণিত, তবে ইমাম আহমদ রাহ.-এর কাছে দলীলের বিচারে এর বিপরীত মাযহাব অগ্রগণ্য। তাই তিনি এ মাসলাক গ্রহণ করেননি।

যারা নির্দ্বিধায় বলে দেন কুরাইবের হাদীস উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার বিষয়ে দলীল হতে পারে না, তাদের জন্য এ ঘটনায় চিন্তার খোরাক রয়েছে।

যাহোক, এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইমাম আহমদ রাহ.-এর মাযহাব, তো এ বিষয়ে-আলহামদুলিল্লাহ-সরাসরি ইমাম আহমদ রাহ.-এর বক্তব্যই পাওয়া গেল। ফিকহে হাম্বলীর কিতাবসমূহে এ মাসআলা এভাবেই লেখা আছে। এখানে এ মাযহাবের সবচেয়ে সুলভ ও প্রসিদ্ধ কিতাবের বরাত নকল করছি।

শায়খ ইবনে কুদামা (আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আলমাকদিসী) হাম্বলী রাহ. (৫৪১-৬২০ হি.) ইমাম আহমদ রাহ.-এর শাগরিদদের শাগরিদ আবুল কাসেম উমার ইবনুল হুসাইন আলখিরাকী (৩৩৪ হি.)-এর সংকলিত ''মুখতাসার'' কিতাবের একটি উৎকৃষ্ট ও বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন ''আলমুগনী''

নামে, যা মাশাআল্লাহ খুবই সমাদৃত। ইবনে কুদামা তাতে লিখেছেন-

وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم جميعَ البلاد الصوم. وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم : إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم ..

অর্থ, কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখলে সকল শহরের অধিবাসীদের উপর রোযা অপরিহার্য হয়। এটি (আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর সাথে) লাইছ রাহ. (১৭৫ হি.)-এরও 'কওল'। এবং আসহাবুশ শাফেয়ীর কারো কারোর। আর কেউ কেউ বলেছেন, যদি দুই শহরের মাঝে দূরত্ব কম হয়, যার কারণে এদের উদয়স্থল অভিন্ন থাকে, যেমন বসরা ও বাগদাদ তো এদের কোনো শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা উভয় শহরের অধিবাসীদের রোযা রাখা জরুরি হবে। পক্ষান্তরে দুই শহরের মাঝে দূরত্ব বেশি হলে যেমন, ইরাক, হিজায ও শাম, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। (আলমুগনী, ইবনে কুদামা হাম্বলী রাহ. ৪/৩২৮, দারু আলামিল কুতুব, রিয়ায)

(বসরা থেকে বাগদাদের দূরত্ব ৪৪৮ কি.মি.।)

ইবনে কুদামা হাম্বলী রাহ. ফিকহে হাম্বলীতে একটি 'মতন'ও লিখেছেন। এর নাম ''আলমুকনি''। এর উপর হিজরী নবম শতাব্দীর গবেষক হাম্বলী ফকীহ শায়খুল ইসলাম আলাউদ্দীন আলী ইবনে সুলায়মান আলমারদাভী (৮১৭-৮৮৫ হি.) এক অসামান্য ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্ত্তত করেছেন, যার খুবই যথার্থ নাম রাখা হয়েছে-

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

এ কিতাবে মারদাভী রাহ. লেখেন-

''যাঁরা চাঁদ দেখেছেন তাদের উপর রোযা ফরয হওয়ার বিষয়ে তো কোনো ইখতিলাফ নেই, তবে যে অঞ্চলের লোকেরা দেখেনি-যদি উভয় অঞ্চলের উদয়স্থল এক হয় তাহলে তাদেরকেও রোযা রাখতে হবে। আর উদয়স্থল আলাদা হলেও (হাম্বলী) মাযহাবের সহীহ কওল এই যে, রোযা জরুরি হবে। 'আলফুরূ', 'আলফাইক' ও

'আররিয়ায়াহ' গ্রন্থে এ কওলই আগে লেখা হয়েছে (এ কওলকেই অগ্রগণ্য করা হয়েছে) (তবে) এ কওল (হাম্বলী মাযহাবের) 'মুফরাদাত'-এর অন্তর্ভুক্ত ...।' (আলইনসাফ ৩/২৭৩)

'মুফরাদাত' শব্দটি 'মুফরাদ'-এর বহুবচন। এর অর্থ, হাম্বলী মাযহাবের ঐ সকল মাসআলা, যেগুলোতে এ মাযহাব অন্যান্য মাযহাব থেকে আলাদা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য প্রসিদ্ধ মাযহাবের বিপরীত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। এ-ই এ পরিভাষার প্রসিদ্ধ অর্থ। এ অর্থে আলোচিত মাসআলাকে হাম্বলী মাযহাবের 'মুফরাদ' (সঙ্গীহীন) সিদ্ধান্ত বলা আপত্তিমুক্ত নয়। কারণ অন্যান্য মাযহাবেও এ সিদ্ধান্ত দানকারী ফকীহ রয়েছেন।

বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হাম্বলী আলেম শায়েখ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ, যিনি রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহী বোর্ডের অন্যতম রোকন, তার কিতাব تبيان الأدلة في إثبات الأهلة (পৃষ্ঠা : ৪০)-এ 'ইনসাফ'-লেখকের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন-

أي أن الجمهور على خلافه

অর্থাৎ যেহেতু অন্য সকল মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ এ সিদ্ধান্তের বিরোধী সম্ভবত এজন্যই তিনি একে হাম্বলী মাযহাবের 'মুফরাদ' (সঙ্গীহীন) সিদ্ধান্ত বলেছেন।

আল্লামা মারদাভী রাহ. সামনে লেখেন-

وقال في الفروع : وقال شيخنا : يعني به الشيخ تقي الدين، تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا.

وقال في الرعاية الكبرى : يلزم من لم يره حكم من رآه. ثم قال : قلت : بل هذا مع تقارب المطالع واتفاقها، دون مسافة القصر، لا فيما فوقها، مع اختلافها. انتهى

অর্থ, (ইমাম ইবনে মুফলিহ রাহ.) ''আলফুরু'' তে বলেছেন, আমাদের শায়খ অর্থাৎ শায়খ তকিউদ্দীন (ইবনে তাইমিয়া রাহ. ৭২৮ হি.) বলেছেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমত যে, উদয়স্থল আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। সুতরাং উদয়স্থল এক হলে এক জায়গায় চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায় রোযা জরুরি হবে। পক্ষান্তরে উদয়স্থল আলাদা হলে জরুরি হবে না।

এবং (ইমাম ইবনে হামদান রাহ. ৬৯৫ হি.) ''আররিয়ায়াতুল কুবরা''য় বলেন, যাঁরা চাঁদ দেখেনি তাদের উপর ঐ লোকদের হুকুম প্রযোজ্য হবে যারা চাঁদ দেখেছে।' কিছুদূর গিয়ে বলেন, 'বরং এ বিধান ঐ ক্ষেত্রে যখন দুই অঞ্চলের উদয়স্থল অভিন্ন বা কাছাকাছি হয় এবং পরস্পরের দূরত্ব কসরের দূরত্বের চেয়ে কম হয় (পক্ষান্তরে দুই শহরের দূরত্ব) কসরের দূরত্বের চেয়ে বেশি হলে এবং উদয়স্থল আলাদা হলে একের বিধান অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে না। (আলইনসাফ ৩/২৭৩, তাহকীক : হামিদ ফাক্কী, দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর ফিকহী 'ইখতিয়ারাত'-এর উপর আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলবা'লী (৮০৩ হি.) আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা ''আলআখবারুল ইলমিয়্যাহ মিনাল ইখতিয়ারাতিল ফিকহিয়্যাহ লিশাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ'' নামে প্রকাশিত। এর পৃষ্ঠা ১৫৮তেও ইবনে মুফলিহের উদ্ধৃত বক্তব্য বিদ্যমান আছে। সেখানে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর মন্তব্যও আছে যে, এ মাসলাক, যা তিনি গ্রহণ করেছেন, শাফেয়ী মাযহাবের ''আসাহ'' (অধিক সহীহ) মাসলাক এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি সিদ্ধান্ত।

وهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد.

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে জানা গেল, ইমাম আহমদ রাহ. থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আছে যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রেও তিনি এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় মনে করেন। তবে হাম্বলী মাযহাবের এক সিদ্ধান্ত এ-ও আছে যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য লাযিম নয়। ইমাম ইবনে হামদান হাম্বলী (৬০৩-৬৯৫ হি.) ও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (৬৬১-৭২৮ হি.) এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন।

সারসংক্ষেপ

সাহাবা ও তাবেয়ীনের আছর এবং চার মাযহাবের উদ্ধৃতিতে এ পর্যন্ত

যা কিছু বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই-

এক. সাহাবী-যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব এই ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য হবে না। এর বিপরীত কোনো ফতোয়া কোনো সাহাবী থেকে পাওয়া যায়নি।

দুই. তাবেয়ীন-যুগে ইকরিমা রাহ., সালিম রাহ. ও কাসিম রাহ. থেকেও অনুরূপ ফতোয়া পাওয়া গেছে। এর বিপরীত সিদ্ধান্ত কোনো তাবেয়ী থেকে পাওয়া যায়নি। তবে হাসান বসরী রাহ.-এর একটি ফতোয়া বিপরীত সিদ্ধান্তের ধারক হতে পারে।

তিন. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ রাহ.-এরও মাসলাক তাই ছিল, যা উপরের মনীষীদের ছিল।

চার. হানাফী মাযহাবের পূর্বসূরী ফকীহগণের অধিকাংশ আর পরবর্তীদেরও অনেক বড় বড় ফকীহর সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা তিন ইমাম বা তাঁদের শাগরিদ বা শাগরিদদের শাগরিদ কারো থেকেই لا عبرة لاختلاف المطالع শীর্ষক কথা পাওয়া যায়নি-না জাহির রিওয়ায়েতে, না নাদির রেওয়ায়েতে। আমাদের জানামতে, এ বাক্য لا عبرة لاختلاف المطالع সবার আগে এসেছে 'খানিয়া' ও 'খুলাসা'য় আর উভয় কিতাবে একে 'জাহের রেওয়ায়েত' বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, এ দাবি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ তা জাহির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়নি। সুতরাং বাস্তবে এখানে 'তাসামুহ' হয়েছে। একই সাথে উলামায়ে কেরাম ও তলাবায়ে নেকনেযামের কাছে দরখাস্ত করা হয়েছে যে, তাদের দৃষ্টিতে 'তাসামুহে'র দাবি ভুল হলে তাঁরা যেন জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দান করেন।

পাঁচ. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবরাহীম হালাবী, ইবনে নুজাইম, তানভীরুল আবসারের লেখক, আলাউদ্দীন হাসকাফী, ও ইবনে আবেদীনসহ পরবর্তী যুগের অনেক ফকীহ لا عبرة لاختلاف المطالع

কেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ছয়. শাফেয়ী মাযহাবের উভয় 'তরীকা'র (ইরাকীগণের 'তরীকা' ও খুরাসানীগণের 'তরীকা') অধিকাংশ ফকীহ, যাঁদের মাঝে উভয় তরীকার প্রধানগণও রয়েছেন, এ সিদ্ধান্ত পোষণ করেন যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য 'লাযিম' (অবশ্যঅনুসরণীয়) নয়। তবে আবুল কাসিম সাইমারী ও কাযী আবুত তাইয়েবসহ কতিপয় মনীষী দূরের শহরেও তা অবশ্যঅনুসরণীয় মনে করেন।

সাত. ইমাম মালিক রাহ. থেকে এ সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে যে, বসরার চাঁদ দেখা কুফা, মদীনা ও ইয়ামানে পৌঁছলে সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি। কোনো কোনো শাগরিদদের বর্ণনায় কোনো শর্ত ছাড়া আর ইবনুল মাজিশূনের বর্ণনায় একটি শর্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

আট. পরবর্তীতে ফিকহে মালেকীর অধিকাংশ লেখক এ বিধানকে দূরের-কাছের সকল শহরের জন্য প্রযোজ্য লিখেছেন এবং ঐ শর্তের পাবন্দীও জরুরি মনে করেননি।

নয়. তবে একাধিক গবেষক মালেকী ফকীহ স্পষ্ট বলেছেন যে, অনেক দূরের হলে, যেমন খোরাসান থেকে আন্দালুস বা আন্দালুস থেকে হিজায, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (বিলইজমা) ধর্তব্য নয়।

দশ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. থেকে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া গেছে যে, দূরের শহরেও যদি অন্য শহরের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় তাহলে তার ইতিবার করা জরুরি।

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মাসলাকও এটিই। তবে মাযহাবের একটি সিদ্ধান্ত এ-ও যে, উদয়স্থল আলাদা হলে দূরের এলাকাগুলোতে নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে। ইবনে হামদান রাহ. ও ইবনে তাইমিয়া রাহ. এটিই গ্রহণ করেছেন।

(তবে মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়ায় (২৫/১০৩) উল্লেখিত ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া এখানে উদ্ধৃত মাসলাক থেকে কিছুটা আলাদা। সামনে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হতে পারে।)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কোনো তালিবে ইলমের যদি এ মাসআলা ‘‘শরহুস সুন্নাহ’’ বগভী থেকে (আবু মুহাম্মাদ আলহুসাইন ইবনে মাসউদ, লেখক : ‘‘মাসাবীহুস সুন্নাহ’’, জন্ম : ৪৩৬ হি., মৃত্যু : ৫১৬ হি.) পড়া থাকে আর তিনি উপরের আলোচনা ও উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগের সাথে না পড়ে থাকেন তাহলে তার মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে। এজন্য ‘‘শরহুস সুন্নাহ’’র ইবারত নকল করে তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে।

শরহুস সুন্নাহয় লেখা আছে-

وإذا رئي الهلال ببلد، ورأى أهل بلد آخر بعده بليلة، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وإليه ذهب من التابعين القاسم بن محمد، وسا لم بن عبد الله بن عمر، وعكرمة، وبه قال إسحاق بن راهوية ...

قال ابن المنذر : قال أكثر الفقهاء : إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم، فعليهم قضاء ما أفطروا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي رحمهم الله.

অর্থ, কোনো শহরে চাঁদ দেখা গেল আর অন্য শহরের অধিবাসীরা পরের রাতে চাঁদ দেখল তো অনেক আহলে ইলমের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। তাবেয়ীদের মধ্যে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, ও ইকরিমার সিদ্ধান্ত তা-ই। ইসহাক ইবনে রাহূয়াহও একথা বলেছেন।

ইবনুল মুনযির বলেন, অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, যদি মানুষের সংবাদ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোনো শহরের অধিবাসীরা তাদের আগে চাঁদ দেখেছে তাহলে তাদেরকে ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতে হবে। এটি মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও আসহাবরুর রায়ের সিদ্ধান্ত। রাহিমাহুমুল্লাহ।

(শরহুস সুন্নাহ বাগাভী ৪/১৪৫ باب الشهادة على رؤية الهلال)

এখানে বাগাভী রাহ. ইবনুল মুনযিরের বরাতে যা লিখেছেন তাতে ‘তাসামুহ’ হয়েছে। এখানে ইবনুল মুনযিরের (মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আননাইসাবূরী জন্ম : ২৪১ হি., মৃত্যু :

৩১৮ হি.) কিতাব ‘‘আলইশরাফ আলা মাযাহিবি আহলিল ইলম’’ থেকে আমরা তাঁর বক্তব্য সরাসরি নকল করছি-

باب الهلال يراه أهل بلدة دون سائر البلدان : قال اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة، ولا يراه غيرهم. فروينا عن عكرمة أنه قال : لكل قوم رؤيتهم. وبه قال إسحاق، وهو مذهب القاسم والسا لم.

وقال آخرون : إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا. هذا قول الليث بن سعد، والشافعي وأحمد، ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي.

অর্থ, পরিচ্ছেদ : কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখল, অন্য শহরের অধিবাসীরা দেখল না :

কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখল, আর অন্য শহরের অধিবাসীরা দেখল না এক্ষেত্রে আহলে ইলমের ইখতিলাফ আছে : ইকরিমা থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক কওমের (শহরের) জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। ইসহাক রাহ.-এ-ই বলেছেন। আর এটাই কাসিম ও সালিমের মাযহাব।

অন্য কতেক আহলে ইলম বলেছেন, যদি লোকদের কাছে প্রমাণিত হয় কোনো শহরের অধিবাসীরা (তাদের আগে) চাঁদ দেখেছে তাহলে তাদেরকে ছুটে যাওয়া রোযা কাযা করতে হবে। এটা লাইছ ইবনে সাদ, শাফেয়ী ও আহমদ রাহ.-এর সিদ্ধান্ত।

আর আমার ধারণা, এটি মাদানী ও কুফীরও সিদ্ধান্ত। (আলইশরাফ, ইবনুল মুনযির ৩/১১২)

ইবনুল মুনযিরের বক্তব্যে وقال آخرون শব্দ আছে। وقال الآخرون শব্দ নয়। প্রথম শব্দের অর্থ তা-ই যা আমি তরজমায় লিখেছি (অন্য কতেক আহলে ইলম বলেছেন)। এর অর্থ ‘অন্যরা বলেন’ নয়, তেমনি ‘অন্য সবাই বলেন’ও নয়।

মনে হয় বগভী রাহ. ইবনুল মুনযিরের উদ্ধৃতি সরাসরি তাঁর কিতাব থেকে নকল করেননি। খাত্তাবী বা অন্য কারো সূত্রে নিয়েছেন। যাইহোক, মূল পাঠ সামনে না থাকায় وقال آخرون পরিবর্তন হয়ে قال أكثر الفقهاء (অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন) এ পরিণত হয়েছে আর বক্তব্য

এই দাঁড়িয়েছে, যা বাস্তবসম্মত থাকেনি।

এরপর ইবনুল মুনযির 'মাদানী' (ইমাম মালেক রাহ.) ও কুফী (ইমাম আবু হানীফা রাহ.)-এর মাযহাব সম্পর্কে প্রত্যয়ের সাথে কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন, ولا أعلمه إلا অর্থাৎ আমার ধারণা, এ দুজনের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। এখন ইমাম মালেক রাহ. সম্পর্কে তো এ ধারণা সঠিক পাওয়া গেছে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রাহ. সম্পর্কে সঠিক পাওয়া যায়নি। কারণ ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে এ মাসআলা বর্ণিত হয়নি। নাদির রেওয়ায়েতে তাঁর দুই শাগরিদ আবু ইউসুফ রাহ. ও মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ এ-ই করেছেন যে, তা কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়।

যাইহোক, এরপরও ইবনুল মুনযির কথাটি বলেছিলেন প্রত্যয় ছাড়া এবং শুধু আবু হানীফা সম্পর্কে, কিন্তু বগভীর বিবরণে ধারণার পরিবর্তে প্রত্যয়ের সাথে বলা হয়েছে আর শুধু আবু হানীফা সম্পর্কে নয়, সকল 'আসহাবুর রায়' (সব হানাফী ফকীহ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। আসল বক্তব্য সামনে না থাকায় মূল ও বর্ণনায় এত বড় পার্থক্য হয়ে গেল।

লাইছ ইবনে সাদ সম্পর্কে ইবনে কুদামাও লিখেছেন যে, তাঁর কাছে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়। আমার কাছে তাঁর সম্পর্কে কোনো বিপরীত বর্ণনা নেই। ইমাম আহমদ রাহ.-এর কথা তো ইমাম আবু দাউদ-এর বরাতেই এসেছে। থাকল ইমাম শাফেয়ীর উদ্ধৃতি, তো এ বিষয়ে শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহের কিতাবসমূহ ইবনুল মুনযিরের বর্ণনার অনুকূল দেখা যায় না। শাফেয়ী ফকীহগণ এ বিষয়ে শুধু আসহাবে শাফেয়ীর 'উজূহ' বর্ণনা করেছেন, ইমাম শাফেয়ীর কোনো 'কওল' বর্ণনা করেননি। আর ইলকিয়া তবারীর মতো বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী শাফেয়ী আলিমও 'আহকামুল কুরআনে' পরিষ্কার বলেছেন-

وأصحاب الشافعي لا يرونه

আসহাবে শাফেয়ী ত্রিশ ওয়ালাদের কারণে উনত্রিশ ওয়ালাদের উপর

একদিনের রোযা কাযা করতে হবে বলে মনে করেন না। তাহলে এ কীভাবে সম্ভব যে, সকল আসহাবে শাফেয়ী চুপচাপ ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কওলের বিপরীত ফতোয়া দেয়ার বিষয়ে একমত হয়ে যাবেন।*

এখানে এ কথাও জেনে রাখা ভালো যে, বগভী রাহ. শরহুস সুন্নাহয় যদিও ইবনুল মুনযিরের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যাতে ইমাম শাফেয়ী রাহ.কে ইমাম আহমদ রাহ.-এর সঙ্গে রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর ফিকহে শাফেয়ীর গ্রন্থ 'আততাহযীব' এর মধ্যে এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর কোনো বক্তব্যই উল্লেখ করেননি।

না নিজ থেকে, না ইবনুল মুনযিরের বরাতে। বরং শাফেয়ী মাযহাবের অন্যান্য কিতাবের মতো শাফেয়ী ফকীহগণের দুটি 'ওয়াজহ'ই উল্লেখ করেছেন এবং দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মতটিকেই 'আছাহ' (أصح) বা সর্বাধিক সহীহ বলেছেন।

وإن كانتا متباعدتين بأن كان بينهما مسافة القصر، فهل يجب على أهل البلد الذين لم يروا الهلال الاقتداء بالذين رأوا، فيه وجهان ... والثاني وهو الأصح، لا يجب ...

আততাহযীব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফেয়ী, আবু মুহাম্মাদ আলবাগাভী রাহ. (৫১৬ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪১৮, ৩/১৪৭

* টীকা :

قال الراقم : ويحتمل أن يكون مأخذ ابن المنذر في عزوه إلى الإمام الشافعي ما جاء في كتاب الأم للشافعي ج ٢ ص ١٠٣ : وإن غم الشهران معا فصاموا ثلاثين فجاءتهم بينة بأن شعبان رئي قبل صومهم بيوم قضوا يوما، لأنهم تركوا يوما من رمضان ... . انتهى (ولعل لفظ شعبان هنا محرف عن رمضان،)

ولكن القرائن متضافرة في أن هذه المسألة مفروضة في البلاد المتقاربة التي يمكن فيها مجيء البينة في مثل تلك البيئة. والمقام يحتاج إلى بحث أكثر، وتدبر أدق، ونظر في كتب الشافعية أوسع، ومذاكرة مع علمائهم أشمل، انتهى قول الراقم.

যাইহোক, ইবনুল মুনযিরের বক্তব্যে শাফেয়ী রাহ.-এর সাথে যে

সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ করা হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। এদিকে নববীও ''আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাযাবে'' ইষৎ ইঙ্গিত করেছেন। ''আলআযবুয যুলাল'' (১/৮৯) লেখক তা ধরতে পেরেছেন।

মোটকথা, দূর দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে অন্য জায়গার চাঁদ দেখা ধর্তব্য মনে করাকে অধিকাংশ ফকীহর মাসলাক বলে বর্ণনা করা ''শরহুস সুন্নাহ''র তাসামুহ। না ইবনুল মুনযির এমন বলেছেন, আর না তা বাস্তবসম্মত।

قال الراقم : واحتمال أن مأخذ البغوي كتاب آخر لابن المنذر غير الإشراف، بعيد، وإن كان كذلك فالاعتماد على عبارة الإشراف دون عبارة غيره لمخالفتها الواقع أشد مخالفة.

والشيء بالشيء يذكر، ذكر الوزير أبو المظفر ابن هُبَيْرَة في اختلاف الأئمة العلماء ج ١ ص ٢٣٢: واتفقوا على أنه إذا رئي الهلال في بلدة رؤية فاشية فإنه يجب الصوم على سائر أهل الدنيا ... . انتهى

قد صرح ابن هبيرة في مقدمة كتابه أنه يريد بمثل هذه العبارة اتفاق الأئمة الأربعة، فليس مراده اتفاق علماء الأمة مطلقا، ثم إن دعواه اتفاق الأربعة مبنية على عبارة الإشراف المبهمة والمبنية على التسامح، والإشراف من مصادر ابن هبيرة ينقل كلامه ويعزو إليه، فلا يغتر أحد بكلام ابن هبيرة هنا، فإنه بنى كلامه على كلام من تسامح ولم يدقق الأمر ولم يتقن النقل في هذه المسألة. والله الموفق.

هذا، وقد قال ابن هبيرة نفسُه في الإفصاح عن معاني الصحاح (ج ٣ ص ٢٣٢-٢٣٣، طبع دار الوطن الرياض) تحت حديث ابن عباس رضي الله عنهما المروي من طريق كُرَيب : في هذا الحديث ما يدل على أن لكل إقليم حكمه. انتهى فتأمل. انتهى قول الراقم.

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

ফেব্রুয়ারি ২০১৪, রবিউস সানি ১৪৩৫

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন : একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-৭

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আহলে হাদীস আলিমগণের মাযহাব

এই উপমহাদেশে কিছু আলেম এমনও আছেন, যারা ইলমে ফিকহ মূলত চার মাযহাবের ফকীহগণের নিকট থেকেই গ্রহণ করেন এবং হাদীস ও শরহে হাদীস (ব্যাখ্যা)ও সাধারণত ঐ সকল মুহাদ্দিসীনের নিকট থেকে নিয়ে থাকেন, যারা ফিকহের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ফকীহ ইমামের অনুসারী। কিন্তু কোনো বিভ্রান্তিবশত তারা নিজেদেরকে চার মাযহাবের কোনো একটির সাথে সম্বন্ধ করা থেকে বিরত থাকেন এবং নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে পরিচয় দেন। তাদের হাদীস অনুযায়ী আমলের পন্থা কতদূর সুন্নাহসম্মত বা সালাফের মাসলাকের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ সে প্রসঙ্গে আপাতত না গিয়ে তাদের কিছু অনুসরণীয় আলিমের সিদ্ধান্ত নকল করা মুনাসিব মনে করা হয়েছে।

1. মাওলানা ছানাউল্লাহ আমরতসরী (১২৮৭-১৩৬৭ হি.)

তাঁর ফতোয়া-সংকলন মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ দারাযের তত্ত্বাবধানে দুই খন্ডে 'ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ'' নামে প্রকাশিত হয়েছে, যার নজরে ছানী (নিরীক্ষণ) করেছেন মাওলানা আবু সায়ীদ শরফুদ্দীন। এ সংকলনে আলোচিত মাসআলাটিও আছে। এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা আমরতসরী রাহ. লেখেন, ''যদি কাছাকাছি এলাকা থেকে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, চাঁদ দেখা গেছে তাহলে আপনি সে অনুযায়ী হিসাব রাখবেন, পরে একটি রোযা কাযা করবেন। আর দূরের সাক্ষ্য আপনার জন্য দলীল নয়। (ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৫৭)

তিনি এ-ও লিখেছেন যে, ''আহলে হাদীসের কাছে দূর-দূরান্তের চাঁদ দেখা দলীল নয়। এ ফয়সালা সাহাবা-যুগেই সম্পন্ন হয়েছে।

তার ভাষায়-

اہل حدیث کے نزدیك دور دراز کی رویت ہلال حجت نہیں، یہ فیصلہ صحابۂ کرام کے زمانہ میں ہو چکا ہے.

(ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৬৩)

আরেক আহলে হাদীস আলেম মাওলানা আবু সায়ীদ মুহাম্মাদ শরফুদ্দীন দেহলভী লেখেন, ''অন্য শহরের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হওয়ার ক্ষেত্রে দূরত্ব অর্থাৎ মাইল নির্ধারণে কিতাব ও সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট নস নেই। এ কারণে উলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত ও মাযহাবও এ বিষয়ে বিভিন্ন। এক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালির ভিত্তিতে ফয়সালা করা ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য নয়। ...

আলাদা উদয়স্থল এই যে, এক শহর বা স্থানে দিন আর অন্যত্র রাত। বা এক জায়গায় জোহরের সময় অন্যত্র আসর বা মাগরিবের সময়। এমন যদি হয় তাহলে ওখানের চাঁদ দেখা অন্যদের জন্য যথেষ্ট হবে না যে পর্যন্ত না তারা বা এক উদয়স্থলের অধিবাসীরা চাঁদ দেখবে। ...

সুতরাং যেখানে দুই শহরের উদয়াস্তের মাঝে তিন ঘণ্টার পার্থক্য হয় তা আলাদা উদয়স্থল বলে গণ্য হবে। আর যেখানে এর চেয়ে কম তা এ থেকে আলাদা হবে।

(ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৫৭, ৬৫৯, ৬৬৩-৬৬৪)

তৃতীয় আলিম মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আল আজমীর বক্তব্যও ''ফাতাওয়ায়ে ছানাইয়্যাহ''য় আছে। তিনি লিখেছেন-আহলে হাদীস আলিমগণের আমল এই যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য।''
(ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৭৩, মাকতাবায়ে ছানাইয়্যাহ, সরগুধা)
2. মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ী রাহ. (আনুমানিক ১২৯৯-১৩৮৪ হিজরী)
তাঁর ফতোয়ার সংকলন প্রস্ত্তত করেছেন শায়খ আবুস সালাম মুহাম্মাদ সিদ্দীক এবং ''ফাতাওয়া আহলে হাদীস'' নামে প্রকাশ করেছেন। এ সংকলনে মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ীর বিস্তারিত ফতোয়া আছে। তিনি কুরাইবের হাদীস উল্লেখ করে লেখেন, ইমাম নববী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ঐ লোকদের বক্তব্য রদ করছেন যারা বলেন, ইবনে আববাস রা. কুরাইবের বর্ণনার উপর এজন্য আমল করেননি যে, তাঁর কাছে এক সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন-

لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا، وإنما رده لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد.

অর্থাৎ ইবনে আববাস রা.-এর হাদীসের জাহিরের দাবি এই যে, সাক্ষী একজন হওয়ার কারণে নয়; বরং এ কারণে রদ করেছেন যে, দূরের লোকদের ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার বিধান প্রযোজ্য হয় না।
ইমাম নববী যা বলেছেন ঠিক বলেছেন।
(আরো আলোচনার পর মাওলানা রৌপড়ী লেখেন) এ থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, সাক্ষী একজন হওয়ায় ইবনে আববাস রা. তা রদ করেননি; বরং দূরের সাক্ষ্য হওয়ায় তা রদ করেছেন। সুতরাং এ মাসআলা মজবুত হয়ে গেল যে, দূরের চাঁদ দেখা যথেষ্ট নয়। (ফতোয়ায়ে আহলে হাদীস ২/২০৯-২১১, প্রকাশক : ইদারায়ে ইহইয়াউস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা, সরগুধা, পাকিস্তান)
সামনে রৌপড়ী ছাহেব দূরত্বের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; যা তাঁর কিতাবে দেখা যেতে পারে।
3. শায়খ আবদুর রহমান কীলানী রাহ. (১৯২৩-১৯৯৫ ঈ.)
মাকতাবাতুস সালাম তাঁর ''ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত''

প্রকাশ করেছে, যাতে এ বিষয়ে ইলমুল ফালাক ও ইলমুল ফিকহ উভয় দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। এতে তিনি লেখেন, ''পরবর্তী সময়ের কেউ কেউ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন, কিন্তু সহীহ হাদীস ও প্রথম যুগসমূহের আছার এত নির্ভরযোগ্য যে, সেগুলোর মোকাবেলায় এই ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তের কোনো মূল্য থাকে না।

(প্রবন্ধকারের নিবেদন, এমন বলা ঠিক নয়, ইজতিহাদী বিষয়ে দলীলের আলোকে আপনি একটি সিদ্ধান্তকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তও যেহেতু দলীলের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং ইজতিহাদের গন্ডির অন্তর্ভুক্ত তাই একে মূল্যহীন বলার অধিকার রাখেন না।)

যাইহোক, মাওলানা কীলানী সামনে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার দলীলসমূহের জন্য বরাত দিয়ে বলেন-

''দেখুন : তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আহিল্লা, শায়খ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ, আররঈসুল আম লিলইশরাফিদ দীনী মক্কা মুকাররমা।

এ পুস্তকের উর্দূ তরজমা করেছেন মুহাম্মাদ রফীক ছাহেব আছারী, যা আলইতিসামে ধারাবাহিকভাবে এবং 'মুহাদ্দিস'-এ (মুহাররম-সফর ১৩৯৫ হি.) একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ পুস্তিকায় লেখক এ বিষয়ের সকল দিকের উপর আকলী-নকলী দলীল (যুক্তি ও বর্ণনা) দ্বারা প্রশান্তিদায়ক আলোচনা করেছেন। এ পুস্তিকা আলাদাও প্রকাশিত হয়েছে।''

সামনে গিয়ে মাওলানা কীলানী ''উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হওয়ার শরয়ী দলীলসমূহ'' শিরোনামে আলোচনা করেছেন এবং তৃতীয় নম্বরে কুরাইবের সূত্রে ইবনে আববাস রা.-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর চতুর্থ দলীল এ উল্লেখ করেছেন-

উদয়স্থলের বিভিন্নতা সম্পর্কে ইমাম ইবনে আবী শাইবা ''আলমুসান্নাফ'' গ্রন্থে এ আছার উল্লেখ করেছেন-

حدثنا ابن إدريس عن عبد الله بن سعيد، قال : ذكروا بالمدينة رؤية الهلال، وقالوا : أهل إستارة

قد رأوه، فقال القاسم والسالم : ما لنا ولأهل إستارة.

আবদুল্লাহ ইবনে সায়ীদ বলেন, মদীনায় চাঁদ দেখার কথা উঠল। কিছু লোক বললেন, ইস্তারাবাসী চাঁদ দেখেছে, তখন কাসিম ও সালিম উভয়ে বললেন, ইস্তারাবাসীর সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? (আলমুসান্নাফ ৬/২৮০)

(ইস্তারা মদীনা থেকে বেশ দূরে মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এখন তা 'ওয়াদী সিতারা'' নামে পরিচিত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। টীকা, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা)

মাওলানা কীলানী বলেন, এ হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কার জানা যায়, সাহাবায়ে কেরাম (ও তাবেয়ীন) নিজেদের অঞ্চলের সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। অন্য অঞ্চলের সাক্ষ্যের বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। (ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত, মাওলানা আবদুর রহমান কীলানী, পৃষ্ঠা : ৭৩-৭৫)

আরো দেখা যায় : হাফেয মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন ইউসুফের কিতাব ''মাসআলায়ে রুয়াতে হিলাল আওর বারাহ ইসালামী মাহিনে'', পৃষ্ঠা : ১১৭-১৫৫, প্রকাশনায় : ইদারায়ে দারুস সালাম

4 বাংলাদেশে মাওলানা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন রাহ. (২০০১ ঈ.)-এর রিসালা-'নতুন চাঁদ' আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী থেকে প্রকাশিত বিদ্যমান আছে। এতে (পৃষ্ঠা : ১০-১৬) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এবং দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় ধর্তব্য না হওয়ার সিদ্ধান্তকেই তিনি হাদীসসম্মত বলেছেন।

5 তেমনি মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া উত্তর যাত্রাবাড়ির মাওলানা মোস্তফা ইবনে বাহরুদ্দীন-এর তত্ত্বাবধানে এ বিষয়ে একটি রিসালা প্রস্ত্তত হয়েছে, যার নাম 'আলকুরআন, সহীহ হাদীস, সালাফে সালেহীনের বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ''। এটি তাওহীদ পাবলিকেশন্স বংশাল থেকে প্রকাশিত। এটি সংকলন করেছেন

জনাব আবদুর রশীদ ইবনু আলফায।
এতে ঐ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছে, যা অন্যান্য আহলে হাদীস আলিমের মাসলাক।
একই মত গ্রহণ করা হয়েছে তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত 'সৌদি আরবে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী রোযা শুরু ও ঈদ উদযাপন শরীয়তসম্মত নয়' পুস্তিকায়। লেখক : আবু আবদুল্লাহ আবদুর রাযযাক। এতেও শায়খ মোস্তফা কাসেমীর অভিমত রয়েছে।
তেমনিভাবে আহলে হাদীস ঘরানার প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'আত-তাহরীক', আগস্ট ২০১৩ ঈ. সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রসঙ্গ : সারাবিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ'-এও একই মত গ্রহণ করা হয়েছে।
6. উপমহাদেশের আহলে হাদীস আলেমদের সাধারণ ফতোয়ার বিপরীতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমন আহলে হাদীস আলেমও আছেন। যেমন হিন্দুস্তানে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান রাহ. (১২৪৮-১৩০৭ হি.) এবং বাংলাদেশে নিকট অতীতের একজন আলেম, মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আলকুরাইশী (১৯০০-১৯৬০ ঈ.)।
নওয়াব সিদ্দীক হাসান রাহ.-এর লিখিত কিতাব 'আররওযাতুন নাদিয়্যাহ'য় (১/৫৩৭-৫৩৮) তিনি আল্লামা শাওকানীর অনুসরণে 'ইখতিলাফে মাতালে'র ধর্তব্য নয়-এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আর মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী-এর নামে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' গ্রন্থে (পৃ. ১৭৬-১৮০) এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ ফতোয়া ছাপা হয়েছে, যাতে ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয় এবং এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য-এই মতটি গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য জনাব আবদুর রকীব ইবনে আলফাযের মতে এই ফতোয়াটি আবদুল্লাহিল কাফী রাহ.-এর নয়; বরং তা মূলত মাওলানা লুৎফল আলম ও মুহাম্মাদ ইসহাক আলী সরকারের। এ ব্যাপারে আমার মতামত সংরক্ষিত থাকল।

আরবের উলামা ও বিভিন্ন ফিকহ-ফতোয়া বোর্ডের ফয়সালা

অধিকাংশ আরব আলিম কোনো না কোনো মাযহাবেরই অনুসারী। কোনো আলেম সরাসরি কোনো মাযহাবের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধ না করলেও ফিকহ-ফতোয়া, ফিকহের কিতাব ও মাযহাব সম্পর্কে ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করেন। চার ইমামের প্রতি তাঁদের রয়েছে অনেক শ্রদ্ধা। আর সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা তাকলীদকে জরুরি মনে করেন। আলিমদের অনুসরণ ও তাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করেন। তাবলীগী জামাত, আকাবিরে দেওবন্দকে গোমরাহ বলার আর মাযহাব ও তাকলীদকে গোমরাহী আখ্যা দেওয়ার যে প্রবণতা, তা সেখানের কোনো দায়িত্বশীল আলিম বা অনুসরণীয় মাশাইখের নয়। এটা মূলত কিছু অপরিপক্ক ইলমের অধিকারী আবেগপ্রবণ লোকের কাজ।

আলোচিত বিষয়ে আরবের কয়েকজন প্রসিদ্ধ শায়খের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করাও মুনাসিব মনে হচ্ছে, ওখানে যাঁদের বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

1. শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায রাহ. (যুলহিজ্জাহ ১৩৩০-২৭.১.১৪২০ হিজরী)

শায়খ ইবনে বায রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলতেন, এ কওলই সঠিক। ‘‘মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায’’ (১৫/৭৪, ৮৩)-এ এ বিষয়ে তাঁর একাধিক ফতোয়া রয়েছে।

এ সত্ত্বেও শায়খ পরিষ্কার বলেছেন, এ মাসআলা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। ‘হাইআতু কিবারিল উলামা’র ঐ সিদ্ধান্তেও তিনি স্বাক্ষর করেছেন, যার উদ্ধৃতি এ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হয়েছে। বরং তিনি এ-ও বলেছেন-

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع ...، وهذا قول له

حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، جمعا بين الأدلة، والله ولي التوفيق.

অর্থ : এক জামাত আহলে ইলম এ দিকে গিয়েছেন যে, উদয়স্থল আলাদা হলে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য এবং এ সিদ্ধান্তেরও (দলীলের দিক থেকে) শক্তি আছে। সৌদি আরবের 'হাইআতু কিবারিল উলামা'র সদস্যগণ এ কওলই গ্রহণ করেছেন, যেন উভয় ধরনের দলীলের উপর আমল হয়। আল্লাহই তাওফীকদাতা। (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ১৫/৮৩)

যারা এ বিষয়ে প্রান্তিকতার শিকার তাদের জন্য শায়খের এ বক্তব্যে অনেক বড় শিক্ষা আছে; বরং শায়খ ইবনে বায রাহ. আরেক প্রশ্নের উত্তরে আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রতি বছর রমযানের শুরু ও শেষে বেশ অস্থিরতা দেখা যায়। মুসলিম দেশগুলোতে মতভেদ হয়-কেউ আগে ঈদ করে, কেউ পরে। এ সমস্যার সমাধান কী?

শায়খ জবাবে লেখেন-

الأمر واسع بحمد لله، ولكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما

''আলহামদুল্লিাহ! বিষয়টিতে প্রশস্ততা আছে (এতে কোনো সংকট নেই যে, অস্থির হতে হবে) আর যেমনটা আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য আলাদা চাঁদ দেখা ধর্তব্য।''

সামনে শায়খ বলেন, এক জামাত আহলে ইলম এ অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ যদি সৌদিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় আর শাম ও মিসরের অধিবাসীরাও রোযা রাখেন তাহলে তা ভালো। কারণ হাদীসসমূহ আম ও সাধারণ। আর যদি রোযা না রাখেন বরং নিজেদের এলাকার চাঁদ অন্বেষণ করেন ও নিজেদের চাঁদ

দেখা অনুসারে রোযা রাখেন তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। সৌদিয়ার 'হাইআতু কিবারিল উলামা' থেকে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, ইবনে আববাস রা.-এর উপরোক্ত হাদীস এবং এর সমার্থক বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য।

শায়খের আরবী ইবারতের মূল অংশ নিম্নরূপ-

فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلاً، وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن، لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس ...

(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৫/৮৪-৮৫)

এ বিষয়ে শায়খ ইবনে বায রাহ.-এর আরো কিছু ফতোয়া সামনে অন্য কোনো প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

2. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আলউছাইমীন রাহ. (২৭.০৯.১৩৪৭-১৫.১০.১৪২১ হিজরী)

শায়খের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রোযা ও ঈদে যেন গোটা উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এজন্য কিছু লোক মনে করেন, শুধু মক্কা মুকাররমার 'মাতলা' উদয়স্থলকেই বুনিয়াদ বানানো হোক। এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কী?

তিনি যে জবাব দিয়েছেন তার সারকথা এই যে, যখন এটা স্বীকৃত যে, উদয়স্থল আলাদা হয়ে থাকে তাহলে দলীলের দাবি প্রত্যেক এলাকার হুকুম আলাদা হওয়া, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে (রমযান) মাস পাবে সে যেন তার রোযা রাখে। (সূরা বাকারা ২ : ১৮৫)

তো এখন যদি মক্কায় চাঁদ উদিত হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা এ মাসে উপনীত হল আর অন্যরা তাদের অঞ্চলে চাঁদ না উঠায় উপনীত হল না তাহলে আয়াতের হুকুম তাদের জন্য কীভাবে প্রযোজ্য হবে? হাদীসে আছে, 'তোমরা চাঁদ দেখলে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখলে রোযা শেষ করবে।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৬৭)

তো মক্কাবাসীদের চাঁদ দেখার কারণে পাকিস্তান ও তারও পূবের লোকদের কীভাবে রোযা রাখতে বাধ্য করব? অথচ আমরা জানি যে, তাদের দিগন্তে চাঁদ ওঠেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রোযাকে চাঁদ দেখার সাথেই যুক্ত করেছেন।

আরো আলোচনার পর শায়খ পুনরায় বলেন, দলীলের দাবি এটাই যে, প্রত্যেক জায়গার জন্য আলাদা বিধান হবে। (মক্কার 'মাতলা' (উদয়স্থল)-কে সব অঞ্চলের জন্য বুনিয়াদ বানানো ঠিক নয়) তাঁর আরবী ইবারতের শেষ অনুচ্ছেদ এই-

فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهو شهود القمر (الهلال)، وشهود الشمس أو الفجر.

(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আলউছাইমীন পৃষ্ঠা : ৪৫১, মাসআলা : ৩৯৩)

এ বিষয়ে শায়খের কিতাব ''আশশরহুল মুমতি'' লিযাদিল *মুসতাকনি*' (৬/৩০৯-৩১০) এবং ''ফিকহুল ইবাদাত'-এও আলোচনা আছে, যার সারকথা এই যে, তিনি ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার সিদ্ধান্তকেই অগ্রগণ্য মনে করতেন। যদিও বিপরীত মতটিও তাঁর কাছে ছিল একটি দলীলভিত্তিক ইজতিহাদী মত।

ঢাকার সৌদি দূতাবাসের 'আলমালহাকুদ দ্বীনী'র একজন কর্মকর্তার পক্ষ থেকেও শায়খের কাছে একটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল, তাতে

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গীরা তিন দলে বিভক্ত হয়েছেন : কেউ বলেন, আমরা রোযা-ঈদ সৌদিয়ার সাথে করব। কেউ বলেন, বাংলাদেশের সাথে করব। আর কারো মত হচ্ছে, (রমযানের) রোযা বাংলাদেশের সাথে রাখা হবে তবে আরাফার রোযা সৌদিয়ার সাথে। (প্রশ্নকারী : আহমদ ইবনে আলী আররূমী)

শায়খ ২৮/৮/১৪২০ হি. তারিখে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি লেখেন, এ বিষয়ে আলিমদের ইখতিলাফ আছে যে, ঐ লোকদের জন্য, যারা অভিন্ন উদয়স্থল বা অভিন্ন শাসনের অধীনে বসবাসকারী। এ প্রসঙ্গে একাধিক মত আছে।

এরপর শায়খ তার নিজের কাছে অগ্রগণ্য মতটি উল্লেখ করার পর লেখেন-

ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم أو الفطر وجب امتثال أمره، لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلادكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه.

অর্থ : কিন্তু যদি উভয় শহর (যেখানে চাঁদ দেখা গেছে আর যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি) একই শাসনের অধীনে থাকে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে রোযা বা ঈদের হুকুম দেওয়া হয় তাহলে সে হুকুমের অনুসরণ করা জরুরি। কারণ এ মাসআলা 'ইখতিলাফী'। আর শাসকের ফয়সালা (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) 'ইখতিলাফ' (এর কার্যকারিতা) রহিত করে দেয়। (অর্থাৎ এ ধরনের ইখতিলাফী বিষয়ে শাসক কোনো এক মাসলাক অনুসারে ফয়সালা করলে অন্য মাসলাকের অনুসারীদেরও সে ফয়সালা অনুসারে আমল করা জরুরি হয়ে যায়) সুতরাং তোমরা যে দেশে থাক সেখানের অধিবাসীরা যেদিন রোযা শুরু করে তোমরাও ঐদিন শুরু করবে। আর যেদিন তারা রোযা শেষ করে তোমরাও ঐদিন শেষ করবে তা তোমাদের নিজ দেশের অনুযায়ী হোক বা না হোক। একইভাবে আরাফার দিনের ক্ষেত্রেও ঐ দেশের অনুসরণ

করবে যেখানে তোমরা থাক। (মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল ১৯/৪০-৪১; আলইজায ফী বা'যি মাখতালাফা ফীহিল আলবানী ওয়াবনু উছাইমীন ওয়াবনু বা'য ২/৫০১-৫০২)

ফতোয়াটি (পূর্ণ আরবী মতনসহ) শায়খ মুস্তাফা ইবনে বাহরুদ্দীনের তত্ত্বাবধানে প্রস্ততকৃত কিতাবেও ছাপা হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ। (দ্র. পৃষ্ঠা : ৭৯-৮১)

3. **শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জিবরীন** (১৩৫৩ হি.-২০ রজব ১৪৩০ হিজরী)

লোকেরা কি সৌদিয়ার চাঁদ অনুসারে রোযা ও ঈদ করবে, না নিজেদের ভূ-খন্ডের চাঁদ দেখা অনুসরণ করবে-এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন-

هذه المسألة خلافية ...، الراجح القول الثاني : وهو أن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا كان هناك مسافة بين البلدتين يمكن أن لا يرى في البلدة الأخرى، وهذا ما عليه العمل، وبالله التوفيق.

এ বিষয়ে ইখতিলাফ আছে। অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই অনুসরণীয় যদি দুই অঞ্চলের মাঝে এ পরিমাণ দূরত্ব হয় যে, (এক জায়গায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও) অন্য জায়গায় দৃষ্টিগোচর না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমল চলছে। (ফাতাওয়াস সিয়াম, ইবনে জিবরীন, পৃষ্ঠা : ২৬-২৭; ফাতাওয়া রমাদান ফিস সিয়াম ওয়াল কিয়াম ..., সংকলন : আবু মুহাম্মাদ আশরাফ ইবনে আবদুল মাকসূদ ১/১০৬)

4. **শায়খ সালেহ আলফাওযান, হাফিযাহুল্লাহু ওয়া রাআহু**

আরবের শায়খগণের মাঝে তাঁর অবস্থানও উল্লেখযোগ্য। হাইআতু কিবারিল উলামার সদস্য। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : সৌদিয়ায় শনিবারে রোযা শুরু হল আর আলজাযাইরে রবিবারে। এখন

আলজাযাইরের কোনো অধিবাসী যদি সৌদিয়ার সাথে রোযা শুরু করে তাহলে তা জায়েয হবে কি না? অতপর তিনি ঈদ করবেন কাদের সাথে? সৌদিয়ার সাথে করলে সমস্যা এই যে, তার দেশে ঐদিন রোযা চলছে আর সেদিন রোযা রাখলে সমস্যা এই যে, যাদের সাথে তিনি রোযা শুরু করেছিলেন তারা এদিন ঈদ করছে!

শায়খ সালেহ উত্তরে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ফরয হওয়াকে চাঁদ দেখার সাথে যুক্ত করেছেন। আর আলিমদের দুই কওলের মাঝে সহীহ কওল অনুসারে উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে চাঁদের বিধান ভিন্ন হয়। যেহেতু আলজাযাইরের উদয়স্থল নিঃসন্দেহে সৌদিয়ার উদয়স্থল থেকে আলাদা তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যে ইকলীম ও যে শহরে অবস্থান করছে সেখানের লোকেরা যখন চাঁদ দেখবে তখন তাদের সাথে রোযা রাখবে এবং তাদের সাথেই ঈদ করবে। এ কারণে আপনার হুকুম ঐ সকল মুসলমানের মতোই, যেখানে আপনি অবস্থান করছেন। আলজাযাইর হোক বা অন্য কোনো শহর। আপনি তাদের সাথেই রোযা রাখবেন এবং তাদের সাথেই ঈদ করবেন।

আরবী ইবারতের মূল অংশ এই-

فعلق صلى الله عليه وسلم وجوب الصيام برؤية الهلال، وذلك يختلف باختلاف المطالع على الصحيح من قولي العلماء ...، فكل إنسان يصوم مع أهل الإقليم وأهل البلد الذي هو فيه إذا رأوا الهلال ويفطر معهم، فأنت حكمك حكم المسلمين الذين تسكن معهم ... .

(মাজমূউ ফাতাওয়াশ শায়খ সালিহ আলফাওযান ১/৩৮৭)

আরো দেখুন : আলমুনতাকা মিন ফাতাওয়াশ শায়খ সালেহ আলফাওযান ৩/১২৪; মিন ফাতাওয়াল উলামা ফিস সিয়ামি ওয়াল

কিয়াম, ইশরাফ, মুসা ইউনুস, পৃষ্ঠা : ৬০

5. **সৌদি আরবের হাইআতু কিবারিল উলামার** সিদ্ধান্ত প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ ইবনে বায রাহ.ও নিজ ফতোয়ায় এর বরাত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, (দলীলের দিক থেকে) এই সিদ্ধান্তে গৃহীত মাসলাকেও শক্তি আছে; বরং এ কওলের উপর আমল করা হলে এ মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট উভয় মাসলাকের দলীলের উপর আমল হবে।

6. সৌদি আরবের মানুষের দ্বীনী প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য একটি জাতীয় ফতোয়া বোর্ড আছে, যার নাম '**আললাজনাতুদ দাইমা লিল বুহুছিল ইলমিয়্যাতি ওয়াল ইফতা**'। ফিকহ-হাদীস ও অন্যান্য ইলমের মাহির ব্যক্তিবর্গ এ বোর্ডের সদস্য হয়ে থাকেন, যারা গ্রান্ড মুফতীর অধীনে কাজ করেন। এ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াসমূহের একটি বড় সংকলন মুদ্রিতও আছে। ওখান থেকে একটি ফতোয়ার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি।

বোর্ডকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমরা রেডিওতে সৌদিয়ায় রোযা শুরু হওয়ার সংবাদ শুনি অথচ আমাদের এখানে আইভরি কোস্ট, গিনি, মালি ও সেনেগালে খুব গুরুত্বের সাথে চাঁদ খোঁজার পরও কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি। এ কারণে আমাদের মাঝে মতভেদ হয়ে যায় : কিছু লোক তো সৌদিয়ায় রোযা শুরু হওয়ার সংবাদ শুনে রোযা শুরু করেন। আর অধিকাংশ লোক আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

এর উপর আমল করে নিজেদের এলাকায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার অপেক্ষা করেন। এখন দুই দলের মাঝে খুব বিবাদ হচ্ছে। অনুগ্রহ

করে আমাদের ফতোয়া দিবেন।

বোর্ডের পক্ষ হতে যে ফতোয়া দেয়া হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই :

এটি একটি ইজতিহাদী বিষয়। এ কারণে আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে : প্রত্যেক দল কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও কিয়াস দ্বারা দলীল দিয়েছেন; বরং এমনও হয়েছে যে, উভয় দল একই নস দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন নিম্নোক্ত নসগুলো-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ওفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ও অন্যান্য।

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

(এই নসগুলো উভয় দলই দলীল হিসেবে পেশ করেছে।)

এটা এ কারণে যে, ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে নস বোঝা ও তা থেকে হুকুম বের করার মাঝেও মতভেদ হয়। তবে এ মতভেদ মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত। কারণ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ভালো ছিল (কর্মপন্থা সঠিক ছিল) এবং প্রত্যেক মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদের ইজতিহাদকে মূল্য দিতেন।

সুতরাং যখন ফিকহের পূর্বের ইমামদের মাঝে এ বিষয়ে ইখতিলাফ হয়েছে এবং প্রত্যেকের কাছে দলীল আছে এ কারণে আপনাদের কর্তব্য, যখন আপনাদের কাছে অন্য উদয়স্থলে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া প্রমাণিত হবে তখন আপনারা নিজে এতে হস্তক্ষেপ করবেন না; বরং একে আপনাদের রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলের উপর ছেড়ে দিবেন। তারা রোযার ফয়সালা করুন বা সেদিন রোযা শুরু না করার সিদ্ধান্ত নিন উভয় অবস্থায় আপনার জন্য তাদের আনুগত্য করা ফরয। কারণ এ ধরনের মাসআলায় শাসকের ফয়সালা ইখতিলাফের সমাপ্তি ঘটায়।

এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনাদের পরস্পর কোনো বিবাদ থাকবে

না। বরং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন এবং নবী পাক ও তার আল ও আসহাবের উপর রহমত নাযিল করুন।

আবদুর রাযযাক আফীফী, নায়েবে রঈস

আবদুল্লাহ ইবনে মানী, সদস্য

আবদুল্লাহ ইবনে গাদায়ান, সদস্য।-ফাতাওয়াল লাজনাতিত দায়িমা ১০/৯৬

7. রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর অধীনে নতুন-পুরাতন মাসাইলের তাহকীকে নিয়োজিত মজলিস, যার নাম '**আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী মক্কা মুকাররমা**' এবং সংক্ষেপে যাকে 'মাজমাউ মক্কা' বলা হয়, এর চতুর্থ দাওরায় (ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ ঈ.) 'চাঁদের ঐক্য' বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, যার মূল অংশ আলকাউসারের শাওয়াল ১৪৩৪ হি. সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে সেই সিদ্ধান্তেই 'ইখতিলাফুল মাতালি' উদয়স্থলের বিভিন্নতার প্রসঙ্গটিও আলোচনায় এসেছে এবং ঐ সিদ্ধান্তে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মাজমা উদয়স্থলের বিভিন্নতার প্রসঙ্গটির উপর 'দিরাসাহ' (গবেষণা) করেছে এবং উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকটিই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তাদের বক্তব্য, এতে মুকাল্লাফদের জন্য সহজতাও আছে। আর কিয়াসের দাবিও তা-ই। আর এর পক্ষে শরয়ী দলীলও রয়েছে।

لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع، ...، ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية ...، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا ...

وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع، للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي العليل ...

কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, পৃষ্ঠা :)
(৮৭-৮৮

শাওয়ালের সংখ্যায় গোটা মুসলিম জাহানের ঐ সকল আকাবির ও মাশাইখের নামও উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেছেন।

৪. এদিকে **মিসরের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার ফতোয়া**-সংকলনে বলা হয়েছে যে, অগ্রগণ্য মত এই যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। এ-ও বলা হয়েছে যে, ১৩৮৬ হি. মোতাবেক ১৯৬৬ ঈ. তে আলআযহারের 'মাজমাউল বুহূসিল ইসলামী'র পক্ষ হতে যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে এ ফয়সালাই হয়েছে।

একারণে ঐ ফতোয়ায় লেখা হয়েছে-

متى تحققت رؤية هلال رمضان في بلد من البلاد الإسلامية فإنه يجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامي الذي ثبتت فيه الرؤية في جزء من الليل، ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك في صحتها، امتثالا لقوله تعالى : **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**، والحديث الشريف : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

অর্থ : কোনো ইসলামী শহরে রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে যত শহর ঐ শহরের সাথে রাতের কোনো অংশে শরিক ঐসকল শহরে অবস্থানরত মুসলমানদের উপর রোযা ফরয হয়ে যাবে। যদি না এমন কোনো বিষয় সামনে আসে, যা এই চাঁদ দেখার বিশুদ্ধতাকে সংশয়যুক্ত করে দেয়। এ বিধান আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

ও হাদীসের হুকুম-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

-এর কারণে। (আলফাতাওয়াল ইসলামিয়া ২০/৭৪৪৬-৭৪৫০, আওকাফ মন্ত্রণালয়, মিসর)

তো মিসরের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সিদ্ধান্ত এই যে, যে সকল শহর চাঁদের শহরের সাথে (যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে) রাতে শরিক নয় এখানে চাঁদের ফয়সালা হল আর ওখানে সুবহে সাদিক, তো তাদের জন্য এ চাঁদ দেখা প্রযোজ্য নয়। এর অর্থ, যে এলাকায় চাঁদ দেখা গেল সেখানে চাঁদের ফয়সালা হতে হতে যেসব এলাকায় সুবহে সাদিক হয়ে যায় সেখানে এ চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে না; বরং এর দাবি তো এ-ও যে, ঐ অঞ্চলে চাঁদের ফয়সালা হওয়ার পর যেসব অঞ্চলের অধিবাসী সহজভাবে সাহরী ও নিয়ত করার সময় পাবেন না তাদের জন্যও এ চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে না। যেমনটা কুয়েতের দারুল ইফতার ফতোয়ায় স্পষ্ট বলা আছে।

এখান থেকে বোঝা গেল, যে আলিমগণ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন তাদের কাছেও এ হুকুম এত ব্যাপক নয় যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার সময় যে সকল অঞ্চলে সুবহে সাদিক হচ্ছে বা হয়েছে তাদের জন্যও তা প্রযোজ্য হবে। সামনে এ বিষয়ে আরো আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

9. কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, কুয়েত

এই দারুল ইফতার ফতোয়ার সংকলনও মুদ্রিত ও প্রকাশিত। তা থেকে দুটি ফতোয়ার সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি :

প্রথম ফতোয়াটি লেখা হয়েছে উত্তর আমেরিকার কোনো এক এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের প্রশ্নের উত্তরে। ওখানে একটি মুসলিম সংগঠন আছে এবং সে সংগঠনের একটি হেলাল কমিটিও আছে। কোনো রমযানে আরব দেশগুলোতে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে মঙ্গলবারে ঈদের ঘোষণা হয়। কিন্তু আমেরিকার ঐ এলাকার কমিটি সেখানে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হওয়ার কারণে মঙ্গলবার ত্রিশ রমযান ঘোষণা করে। এখন ঐ শহরের অধিবাসী কিছু আরব আরবের চাঁদ

দেখা অনুযায়ী মঙ্গলবার ঈদ করেন। অন্যরা করেন ঐ শহরের অধিবাসীদের সাথে। এ প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্ন কুয়েত ফতোয়া বোর্ডের সামনে উত্থাপিত হয় এর জওয়াবে তাঁরা লেখেন-

‘এ বিষয়ে আলিমদের দুটি সিদ্ধান্ত আছে :

ক. উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য এবং এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় নয়।

খ. যে কোনো ইসলামী শহরে চাঁদ দেখা গেলে সে অনুযায়ী সকল মুসলিমের আমল করা জরুরি যদি চাঁদ দেখার ‘ইলম’ (সংশয়হীন অবগতি) লাভ হয়।

উভয় মতের পক্ষেই দলীল আছে। কুয়েতের ফতোয়া বোর্ড (‘‘আলহাইআতুল আম্মাহ লিলফাতাওয়া’’) দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দেয় যেন রোযা ও ঈদে ঐক্য সম্ভব হয়। বোর্ড মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে আশা রাখে যে, তাঁরা এ মতের উপর আমল করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

وتأمل الهيئة العامة للفتوى بالكويت من زعماء المسلمين اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذا الرأي مع ملاحظة ما لا بد منه من الضوابط العلمية المسلمة.

কুয়েত কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ড উপরের ফতোয়ায় তাদের সিদ্ধান্ত বর্ণনার পর তৎক্ষণাৎ নিম্নোক্ত নোট লেখেন-

ولكن لما كان العمل في البلاد الإسلامية جاريا على الرأي الأول وهو اختلاف المطالع، وأن لكل بلد رؤيته، فترى الهيئة العامة للفتوى بالكويت أنه ينبغي على المسلمين في أمريكا الشمالية اتباع اللجنة المشكلة من جماعة المسلمين هناك، وأنه ينبغي طاعتها في هذا الأمر وسائر ما فيه مصلحة المسلمين، لأنه تقوم بالنسبة لمسلمي أمريكا مقام الهيئات الدينية الرسمية في البلاد الإسلامية، والله أعلم.

এই নোটের সারকথা এই যে, যেহেতু এখন পর্যন্ত মুসলিম

দেশগুলোতে প্রথম মাসলাকের উপরই আমল চলছে, অর্থাৎ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া এবং প্রত্যেক অঞ্চলে নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসরণ করা, এ কারণে কুয়েত ফতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত এই যে, উত্তর আমেরিকার মুসলিমদের উপর এখন মুসলিম সংগঠনের পক্ষ হতে নির্ধারিত কমিটির আনুগত্য করা জরুরি।

(মাজমূআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ, কুয়েত, ওযারাতুল আওকাফ ৩/৬৫-৬৬)

দ্বিতীয় ফতোয়াটি লেখা হয়েছে আর্জেন্টিনা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে। এতে বলা হয়েছে, যে শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়েছে তার ইকলীমে যত শহর আছে এবং যে সকল শহর-নগর *দ্রাঘিমা রেখায়* শরিক এবং যেসব শহর এর পশ্চিমে অবস্থিত তাদের উপর এ চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমলা করা জরুরি। আর যেসকল শহর চাঁদের শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত তাদের হেলাল কমিটির জন্যও ঐ চাঁদ দেখা অনুসারে ফয়সালা করার অবকাশ আছে, যদি এ শহর চাঁদের শহরের সাথে (অর্থাৎ যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে) রাতের কোনো অংশে শরিক হয়। তবে ঈদের চাঁদের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাদের ২৯ রোযা পুরা হতে হবে। আর রমযানের চাঁদের ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, তাদের এলাকায় যখন পশ্চিমের ঐ শহরের চাঁদ প্রমাণিত হচ্ছে তখন রাতের এ পরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকতে হবে যে, বিনা সংকটে সাহরী করার ও সুবহে সাদিকের আগে নিয়ত করার সুযোগ থাকে।

আরবী পাঠের একটি অংশ এই-

...، وأما البلاد التي تقع على جهة الشرق من ذلك الإقليم وتشترك مع إقليم الرؤية في جزء من الليل، فإن لهيئة الرؤية في ذلك الإقليم أن تأخذ بتلك الرؤية في الإفطار من رمضان مطلقا إذا أتموا تسعة وعشرين يوما ...، وكذلك في دخول شهر رمضان إذا علموا بالرؤية وقد بقي من الليل عندهم ما يكفي لتبييت النية مع السحور دون ضيق.

(মাজমূআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ কুয়েত, ওযারাতুল আওকাফ ৪/৮৫-৮৯)

দ্বিতীয় ফতোয়া থেকে দুটি বিষয় সামনে এল :

ক) কোনো শহর যদি চাঁদের শহর থেকে এত দূরবর্তী হয় যে, ওখানে যখন চাঁদের ইলম হচ্ছে তখন এখানে হয়তো সুবহে সাদিক হয়ে গেছে বা রাতের এত সামান্য অংশ বাকি আছে যে, এ সময়ের মধ্যে শান্তভাবে সাহরী করা যায় না। তাহলে এ শহরের অধিবাসীদের নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা উচিত। কুয়েত ফতোয়া বোর্ড সাধারণত উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় ঘোষণা করলেও উপরোক্ত ক্ষেত্রে তারাও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন।

খ) যে ফকীহগণ এ কথা বলেন যে, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য ধর্তব্য তাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, কেউ কোনো শহরে চাঁদের খবর দেখল বা শুনল অমনি সে তার সঙ্গীদের নিয়ে রোযা ও ঈদ করবে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, সংশ্লিষ্ট অথরিটি অর্থাৎ সরকার বা সরকারের পক্ষ হতে নির্ধারিত হেলাল কমিটি এই চাঁদ দেখার ইতিবার করে চাঁদের ফয়সালা করবে। এটি জনসাধারণের কাজ নয়, দায়িত্বশীলদের কাজ। সাধারণ জনগণের কর্তব্য দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা।

কুয়েত ফতোয়া বোর্ডসহ অন্যান্য বোর্ড এবং অন্যান্য ফকীহ ও মুহাদ্দিসের এই ফয়সালা আলাদা শিরোনামে আরো কিছু স্পষ্ট বরাতসহ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

10. মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (জিদ্দা ফিকহ একাডেমী)

সফর ১৪০৭ হিজরী (মোতাবেক অক্টোবর, ১৯৮৬ ঈ.)-এর ওমানে অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর মজলিসে এ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। তাতে যে ফয়সালা হয় তা ‘মাজমা’র মাজাল্লার বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নরূপ :

إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع، لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.

অর্থ, যে কোনো শহরে চাঁদ প্রমাণিত হলে সে অনুযায়ী সকল মুসলিমের আমল করা জরুরি। উদয়স্থলের ভিন্নতার কোনো ইতিবার নেই। কারণ (চাঁদ দেখা গেলে) রোযা রাখা এবং (চাঁদ দেখে) রোযা শেষ করার বিষয়ে যে বিধান (হাদীসে এসেছে) তা 'আম' বা সাধারণ। (মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, তৃতীয় দাওরা, তৃতীয় সংখ্যা, ২/১০৮৫, মুদ্রণ ১৪০৮-১৯৮৭)

মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী এখানে ঐ ফকীহগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যাদের মাসলাক, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। এটি বিস্তারিত দিকনির্দেশনাহীন এক সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত। এতে এ ফয়সালা অনুসারে আমলের উপায় ও নীতিমালা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তেমনি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদে একতাবদ্ধতাকে ফরযও বলা হয়নি। অথচ আমাদের এখানের কিছু গায়রে আলিম লেখক মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর এ সংক্ষিপ্ত ফয়সালাকে এ কথার সমার্থক মনে করেছেন যে, মাজমা এখন সকল মুসলিমের উপর রোযা ও ঈদের একতাকে ফরয হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আর তারা একে শুধু মাজমার ফয়সালা নয়; বরং সরাসরি মুনাযযামাতুত তাআউনিল ইসলামী (পুরোনো নাম 'মুনাযযামাতুল মু'তামারিল ইসলামী') ওআইসির সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করেছেন। তাদের উভয় কথাই ভুল। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত সকল আলোচনার সারসংক্ষেপ এই দাঁড়াচ্ছে যে, এ বিষয়টি যেমন আগের যুগের চার মাযহাবের ফকীহদের মাঝে মতভেদপূর্ণ ছিল তেমনি এ যুগের ফকীহদের মাঝেও মতভেদপূর্ণ। এমন নয় যে, বর্তমান যুগে এসে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়ে আলিমগণের ইজমা হয়েছে।

উপরের আলোচনা মনোযোগের সাথে পড়া হলে সম্ভবত আরো স্পষ্ট

হয়েছে যে, পূর্ববর্তী-পরবর্তী ও সমসাময়িক ফকীহগণের অনেক বড় জামাত বরং বলতে গেলে তাদের অধিকাংশই দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে অবশ্য-অনুসরণীয় না হওয়ার দিকেই রয়েছেন। আরব উলামা ও আহলে হাদীস আলিমগণেরও অধিকাংশই দলীলের দিক থেকে এ কওলকেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উপরের নিবেদনসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে সামনে আসে। তা হচ্ছে এ ধারণা করা যে, যে ফকীহই উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন তিনিই সারা বিশ্বে রোযা ও ঈদ এক করার প্রবক্তা-একান্তই ভুল। এ দুই বিষয় পরস্পর সংযুক্ত নয়। উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া আর ঈদ ও রমযানের ঐক্য জরুরি হওয়া দুটো এক কথা নয়। তদ্রূপ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যে কেউ নিজের তরফ থেকে ঈদ ও রমযানের ফয়সালা করতে পারে। বরং এ ফয়সালার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের। আর অন্যদের কর্তব্য তাদের আনুগত্য করা। সামনে এইবাস্তবতাগুলো আরো বিস্তারিত পেশ করার চেষ্টা করা হবে। 1

وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

মার্চ ২০১৪, জুমাদাল উলা ১৪৩৫

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-৮

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দূরবর্তী শহর বলতে কী বুঝায়?

আলহামদুলিল্লাহ, বিগত সংখ্যাগুলোয় আমরা সাহাবা-তাবিয়ীযুগের ফুকাহা, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, পরবর্তী ফুকাহা ও সমকালীন উলামা-মাশাইখের বক্তব্য পাঠ করেছি। আমরা দেখেছি যে, তাঁদের অনেক বড় এক জামাতের মাসলাক, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়।

এখন দেখতে হবে যে, দূর দুরান্তের শহর বলতে কী বুঝায়? কোন্ শহরগুলোকে আমরা দূরবর্তী শহর বলব?

দলিল-প্রমাণ দ্বারা এটুকু তো প্রমাণিত যে, এখানে নিকট ও দূরের বিধান এক নয়, কিন্তু কোনো স্পষ্ট নসে যেহেতু দূরবর্তী এলাকার

সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখিত হয়নি তাই এখানে শরীয়তের সাধারণ নির্দেশনা অনুসারে উম্মাহর ফকীহগণ এ মাসআলাকে শরীয়তের নীতিমালার আলোকে ইজতিহাদের দ্বারা সমাধান করেছেন। আর স্বভাবতই এতে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে :

১. হানাফী ফকীহগণের 'ইবারত-উদ্ধৃতি আমরা যুলহিজ্জাহ ১৪৩৪ হি. ও মুহাররামুল হারাম ১৪৩৫ হি.-এর দুই সংখ্যায় পাঠ করেছি। আমরা দেখেছি, ইমাম কুদূরী রাহ. এবং তাঁর উস্তায আবু আবদুল্লাহ আল জুরজানী রাহ. থেকে নিয়ে ছাহেবে হিদায়া এবং তাঁর উস্তাযগণসহ আগের পরের হানাফী ফকীহগণের বড় এক জামাত নাদির রেওয়ায়েতের ঐ মাসআলাটির ব্যাখ্যা করেছেন। যাতে বলা হয়েছে, কোনো শহরবাসী যদি চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রেখে ঈদ করে; পরে তাদের কাছে প্রমাণিত হয় যে অপর কোনো শহরবাসী চাঁদ দেখেই ত্রিশটি রোযা রেখেছে। তাহলে যারা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে। ঐসকল ফকীহ এই মাসআলার ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই হুকুম তখন; যখন উভয় শহর কাছাকাছি হবে এবং তাদের উদয়স্থল অভিন্ন হবে। আর যদি উভয় শহরের মাঝে এই পরিমাণ দূরত্ব হয় যে সেগুলোর উদয়স্থল ভিন্ন, তাহলে এ বিধান নয়। কারণ এই ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। তাদের ঐসকল বক্তব্যের সারকথা এই যে, তাদের নিকট এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য না হওয়ার ভিত্তি হলো ঐ অঞ্চলগুলোর উদয়স্থল ভিন্ন হওয়া।

ফিকহে শাফেয়ীতে ইরাকী ফকীহগণের অধিকাংশের মাসলাকও এ-ই। ইমাম ইবনুস সাববাগ (আবু নসর আবদুস সাইয়েদ ইবনে মুহাম্মাদ (জন্ম : ৪০০ হি.-মৃত্যু : ৪৭৭ হি.) ইরাকী 'তরীকা'র শায়খ আবু হামেদ আসফারাইনী (৩৪৪-৪০৬ হি.)-এর বরাতে নকল করেছেন-

إن كانا بلدين لا تختلف المطالع لأجلهما، كبغداد والبصرة، لزمهم برؤية بعضهم، وإن كانا

بلدين تختلف المطالع فيهما، كالعراق والحجاز، والشام وخراسان، وما أشبه ذلك، لم يلزم أحدهما برؤية الآخر. (قال صاحب البيان : وحكاه ـ يعني ابن الصباغ ـ عن الشيخ أبي حامد).

এ উদ্ধৃতির মর্মার্থ হল, যে দুই শহরের উদয়স্থল আলাদা হয় না যেমন বাগদাদ ও বসরা, এক্ষেত্রে এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে অন্য জায়গায় রোযা লাযিম হবে। পক্ষান্তরে দুই শহরের উদয়স্থল আলাদা হলে, যেমন ইরাক ও হিজায বা শাম ও খোরাসান, এক অঞ্চলের চাঁদের দ্বারা অন্য অঞ্চলে রোযা লাযিম হবে না।

ইবনুস সাববাগ থেকে এ ইবারত ইমাম আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া ইবনে আবুল খায়ের আলইমরানী আশশাফেয়ী (৪৮৯-৫৫৮ হি.) 'আলবায়ান'' খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৮০-এ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নববী রাহ. ''শারহুল মুহাযযাব'' কিতাবে লিখেছেন-

أصحها : وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم، أن التباعد يختلف باختلاف المطالع.

অর্থাৎ অধিক বিশুদ্ধ 'ওয়াজহ' এই যে, দূরবর্তী হওয়ার সিদ্ধান্ত উদয়স্থলের ভিন্নতার বিচারে হবে। ইরাকী ফকীহগণের অধিকাংশ এবং সয়দলানী ও অন্যরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথাই বলেছেন। (আলমাজমূ ৭/৪২৭)

'সয়দালানী' বলে আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ সয়দালানীকে নির্দেশ করা হয়েছে। যিনি আবু বকর আদদাউদী নামেও প্রসিদ্ধ। ইনি খোরাসানী 'তরীকা'র শায়খ কাফফাল মারওয়াযীর শাগরিদ। ''মুখতাসারুল মুযানী''র উপর তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ ''আততরীকাতুস সয়দালানিয়্যাহ'' নামে প্রসিদ্ধ। তাজুদ্দীন আসসুবকীর ''তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা''য় (খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৪৮-১৮৯; এবং খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৬৪) তাঁর 'তরজমা' (পরিচিতিমূলক আলোচনা) রয়েছে।

দুই অঞ্চলের মাঝে পার্থক্যের এ মাপকাঠির উপর ইনশাআল্লাহ আরো কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে। এর আগে দ্বিতীয় মতটি উল্লেখ

করছি।

২. দূরবর্তী শহর-নগরের সংজ্ঞায় শাফেয়ী ফকীহগণের দ্বিতীয় মাসলাক এই যে, চাঁদের শহর (যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে) থেকে যে শহর কসরের দূরত্বে অবস্থিত, একে দূরবর্তী ধরা হবে আর যা এর চেয়ে কম দূরত্বে অবস্থিত তাকে 'নিকটের' বলা হবে।

খোরাসানী 'তরীকা'র শায়খ কাফফাল মারওয়াযী (৩২৭-৪১৭ হি.)-এর শাগরিদ আবুল কাসেম আলফূরানী (৪৬১হি.), ইমামুল হারামাইন আবদুল মালিক ইবনুল জুয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.), তাঁর শাগরিদ ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) ও মুহিউস সুন্নাহ বগভী (৫১৬ হি.)সহ অনেক খোরাসানী ফকীহ এ মাসলাকেরই প্রবক্তা।

ভারতবর্ষের বড় আলিমগণের মাঝে হযরত শাহ ওলিউলাহ রাহ. ''আলমুসাফফা শরহুল মুয়াত্তা''য় (খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৭) এ মাসলাকই সমর্থন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ফার্সী ইবারত মুহাররম ১৪৩৫ হি. সংখ্যায় আমরা দেখেছি। তাতে তিনি আপন ইজতিহাদ অনুযায়ী এ মাসলাকের ব্যাখ্যা পেশ করারও চেষ্টা করেছেন। আহলে ইলম পাঠক তাঁর ঐ ইবারত আবার দেখে নিতে পারেন।

উল্লেখ্য, ফিকহে শাফেয়ীতে কসরের দূরত্ব বর্তমান পরিভাষা অনুসারে ৮৯.৪০০ কিলোমিটার।

সহীহ মুসলিম এর ভাষ্যগ্রন্থে (খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৯৭) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم শিরোনামের আলোচনায় ইমাম নববী রাহ. যদিও এ মাসলাককে প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ কসরের দূরত্বকে মানদন্ড সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু 'শরহুল মুহাযযাব' গ্রন্থে- যেমনটা আমরা দেখেছি-প্রথম মাসলাককে 'আসাহ' (অধিক শুদ্ধ) বলেছেন তেমনি ''আলমিনহাজে''ও; বরং শরহুল মুহাযযাবে দ্বিতীয় মাসলাককে স্পষ্ট ভাষায় 'জয়ীফ'ও বলেছেন। তিনি লেখেন-

وهذا ضعيف، لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، فالصحيح اعتبار المطالع كما سبق.

অর্থাৎ কসরের দূরত্বকে মাপকাঠি বানানো দুর্বল। কারণ কসরের দূরত্বের সাথে চাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণে সঠিক হচ্ছে উদয়স্থলের ভিন্নতাকে মাপকাঠি বানানো। (আলমাজমূ খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪২৮)

উদয়স্থলের অভিন্নতা ও ভিন্নতার অর্থ কী?

দুই এলাকার উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়ার এক অর্থ তো এই যে, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে যে, কোন কোন এলাকা নতুন চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার আওতার মধ্যে আর কোন কোন অঞ্চল এর বাইরে। ভিতরের অঞ্চলগুলোর মধ্যে কোন অঞ্চল থেকে চাঁদ খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হতে পারে আর কোন অঞ্চল থেকে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া সহজ নয়, বরং শুধু প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এবং চাঁদের অবস্থান সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ও চাঁদ দেখার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই দেখতে পারে। তেমনি কোথা থেকে খোলা চোখে চাঁদ দেখা যাবে আর কোথা থেকে শুধু টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যাবে। তো যে যে অঞ্চল নতুন চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার আওতাভূক্ত হবে সেগুলোর উদয়স্থল এক, আর যেগুলো এর আওতার বাইরে; সেগুলোর উদয়স্থল ভিন্ন। এ আওতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান থাকতে পারে। আবার আওতার শেষ প্রান্তের সাথে মিলিত পরবর্তী জায়গাটি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও আওতার বাইরে হওয়ার কারণে তার উদয়স্থল ভিন্ন। এভাবে সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্টভাবে দুই অঞ্চলের মাঝে এ ফয়সালা করা যে, এদের উদয়স্থল এক নাকি আলাদা। সেজন্যে জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতার প্রয়োজন। বিশেষ করে এজন্য যে, নতুন চাঁদের বয়স অবস্থা অবস্থান ও অন্যান্য কারণে পৃথিবী থেকে তার দর্শনযোগ্য হওয়ার আওতা পরিবর্তন হতে থাকে।

যে অঞ্চলগুলো কোনো এক মাসে অভিন্ন উদয়স্থলে ছিল তা সব মাসেই অভিন্ন উদয়স্থলে থাকবে তা অপরিহার্য নয়; বরং এ খুবই সম্ভব, আর তা ঘটতেও থাকে যে, ঐ সকল অঞ্চলের কোনো কোনোটা কোনো কোনো মাসে আওতার বাইরে থেকে যাবে।

একথাগুলো এমনি তো জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা যাদের আছে তাদের কাছে স্পষ্ট। এরপরও জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেগুলো চাঁদের জন্ম ও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্য সময় নির্দেশ করে থাকে তাদের সাইটসমূহ দেখলেও এসব বিষয় আরো স্পষ্ট হয়ে যায়, যেগুলোতে বিগত অনেক বছর ও ভবিষ্যতেরও বিবরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন :

1. http://moonsighting.com

2. http://www.icoproject.org

3. http://www.hilalsighting.org

4.http://drive.google.com
/folderview?id=0B8RzOGVdiUMBSXR4eWtnZWdxN3M&
usp=sharing

তালিবুল ইলম ভাইয়েরা 'ইখতিলাফে মাতালি'র এই শাস্ত্রীয় বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝার জন্য মুতালাআ করতে পারেন উস্তাযে মুহতারাম হযরত শাইখুল ইসলাম তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর সহীহ বুখারীর দরসে তাকরীরের সংকলন 'ইনআমুল বারী' খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪৯২-৪৯৪

এমনিভাবে হযরতের কিতাব 'বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআছিরাহ' খন্ড:২, পৃষ্ঠা:২৫৩-২৫৫

যাহোক, বিভিন্ন অঞ্চলের উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়ার এক অর্থ তো এই দাঁড়াল যে, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুসারে এক বা আলাদা

হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুই শহরকে এক উদয়স্থলের বা আলাদা উদয়স্থলের মনে করা। এ হিসাবে এমন প্রত্যেক অঞ্চলকে এক উদয়স্থলের গণ্য করা হবে, যেগুলো পরস্পর কাছাকাছি এবং সেগুলোতে চাঁদের তারিখও এক থাকে। আর যেখানে সাধারণত এমন হয় যে, চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার ক্ষেত্রে এক এলাকা অন্য এলাকা থেকে আগে বা পিছে থাকে এবং সেসকল অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল করলে দেখা যায় তাদের চান্দ্র তারিখে একদিনের পার্থক্য থাকে, তাহলে সেগুলোকে আলাদা উদয়স্থলের ধরা হবে।

نبه على أصل هذه النكتة في "تحفة الألمعي شرح سنن الترمذي" ج ٣ ص٦٥ وستعرف مأخذه من الفقه و الدليل إن شاء الله

উদয়স্থলের ভিন্নতা-অভিন্নতার এই সরল মাপকাঠি যা কোনো অংক বা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই ব্যবহারযোগ্য। এর আলোকে পরস্পর কাছাকাছি শহরগুলোকে অভিন্ন উদয়স্থলের মনে করা হয়, যদিও জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুসারে এগুলোর কোনোটি নতুন চাঁদ দর্শনের আওতার বাইরে থাকে। তদ্রূপ কোনো বড় শহর যদি এমন হয় যে, ঘটনাচক্রে কোনো মাসে তার কোনো অংশ ঐ আওতার বাইরে থেকে যায় তাহলে জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুসারে ঐ অংশের উদয়স্থল আলাদা হলেও সাধারণ পরিভাষায় গোটা শহরের উদয়স্থল অভিন্ন বলা হবে। অতএব উদয়স্থলের ভিন্নতা-অভিন্নতার দ্বিতীয় অর্থ এই হল যে, সাধারণ ধারণা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে দুই অঞ্চলের উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়া।

এখন দেখার বিষয় এই যে, হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহগণের যারা কাছের শহর ও দূরের শহরের মাঝে পার্থক্য করেছেন উদয়স্থলের ভিন্নতা বা অভিন্নতার ভিত্তিতে তারা উদয়স্থল বিভিন্ন হওয়ার কী অর্থ গ্রহণ করেছেন-জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব ভিত্তিক ভিন্নতা না সাধারণ ধারণা ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতা। তাকীউদ্দীন সুবকী রাহ., ইবনে হাজার মক্কী রাহ. এবং সমকালীন দু একজন আলিমের কথা থেকে যদিও

অনুমিত হয় যে, তাঁরা উদয়স্থলের ভিন্নতা-অভিন্নতার জ্যোতির্শাস্ত্রীয় অর্থ বুঝেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর বক্তব্য ও তার পূর্বাপর মনোযোগ সহকারে পড়লে জানা যায় যে তারা এ অর্থ নয় বরং দ্বিতীয় অর্থ হিসাবে এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। জ্যোতির্শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উদয়স্থলের যে ভিন্নতা-অভিন্নতা সেটা তাদের উদ্দেশ্য নয়।

এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে যদি নীচের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা যায় :

১. প্রথম কথা এই যে, কোনো কোনো ফকীহ তো একদম পরিষ্কার ভাষায় উদয়স্থলের ভিন্নতার এ সাধারণ অর্থই বর্ণনা করেছেন যেমন আল্লামা জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম আরদাবীলী শাফেয়ী রাহ. (৭৭৯ হি.আনুমানিক) লেখেন-

وإذا رؤي الهلال في بلدة ولم ير في أخرى فإن تقاربا فحكمهما واحد، وإن تباعدا فلا، والضبط بمسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع، وهو أن يتباعد البلدان بحيث لو رؤي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا.

এখানে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, উদয়স্থল আলাদা হওয়ার অর্থ, দুই শহর পরস্পর এত দূরের হওয়া যে, এক শহরে নতুন চাঁদ দেখা গেলে দ্বিতীয় শহরে সাধারণত দেখা যায় না। (দেখুন : আল্লামা আরদাবীলীর কিতাব ''আলআনওয়ার লি আমালিল আবরার'' খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০৬, দারুযযিয়া, কুয়েত ১৪২৭ হি.)

এ শুধু আরদাবীলীর কথা নয়, এর কাছাকাছি কথা তার অনেক আগে লিখেছেন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আহমদ আসসারাখসী (৪৯৪ হি.), যিনি আবুল ফারাজ আযযায নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সারাখসী ছিলেন ফিকহে শাফেয়ীর হাফিয।

শাফেয়ী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের মধ্যে তিনি গণ্য। সামআনী রাহ. লিখেছেন যে, তাঁর 'আমালী' খুবই সমাদৃত (মুতালাক্কা বিল

কবুল) গ্রন্থ। (তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, তাজুদ্দীন সুবকী খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০১-১০৪; তাহযীবুল আসমা, নববী খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২০৫)

ইমাম নববী রাহ. ''শরহুল মুহাযযাব'' গ্রন্থে তার প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কখনো শুধু ''আসসারাখসী'' বলে, কখনো তাঁর কিতাব ''আলআমালী''র উল্লেখ সহকারে। উদয়স্থলের ভিন্নতা প্রসঙ্গে নববী রাহ. তাঁর বরাতে লিখেছেন-

"قال السرخسي : إذا رآه أهل ناحية دون ناحية، فإن قربت المسافة لزمهم كلهم.

وضابط القرب أن يكون الغالب أنه إذا أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم إلا لعارض، سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها.

قال : فإن بعدت المسافة فثلاثة أوجه :

أحدها : يلزم الجميع، واختاره أبو علي السِّنْجِيْ.

والثاني : لا يلزمهم

والثالث : إن كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصور أن يرى ويخفى على أولئك بلا عارض، لزمهم، وإن كانت بحيث يتصور أن يخفى عليهم فلا".

(আলমাজমূ খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪২৮-৪২৯)

এ বর্ণনায় আবুল ফারাজ সারাখসী রাহ. কাছের শহরের মাপকাঠি বর্ণনা করে বলেছেন, যেখানে দূরত্ব এ পরিমাণ হয় যে, এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে সাধারণত অন্য জায়গায়ও দেখা যায় তা কাছের। আর যেখানে দূরত্ব এ পরিমাণ যে, এক জায়গায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা অন্য জায়গায় দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরি নয়; বরং চাঁদ ঐ শহরের অধিবাসীদের দৃষ্টির আড়ালে থাকার সম্ভাবনা আছে, তা দূরের শহর গণ্য করা হবে।

২. শায়খ আবু হামেদ আসফারাইনী ও ইবনুস সাববাগসহ অনেক ফকীহ অভিন্ন উদয়স্থলের ও আলাদা উদয়স্থলের শহর-নগরের কিছু উদাহরণও উল্লেখ করেছেন। যেমন তাঁরা কূফা ও বাগদাদ বা বসরা ও বাগদাদকে এক উদয়স্থলের আর হিজায ও ইরাক এবং শাম ও খোরাসানকে আলাদা উদয়স্থলের ধরেছেন। তাঁদের চিন্তায় যদি উদয়স্থলের জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবভিত্তিক অভিন্নতা ও ভিন্নতা থাকত তাহলে প্রথমত সুনির্দিষ্টভাবে সবসময়ের জন্য কিছু অঞ্চলকে এক উদয়স্থলের আর কিছু অঞ্চলকে আলাদা উদয়স্থলের সাব্যস্ত করতেন না। দ্বিতীয়ত ইরাক ও হিজায এবং শাম ও খোরাসানকে তারা পরস্পর ভিন্ন উদয়স্থলের হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে দেখা যায় প্রায় সময় এগুলোর উদয়স্থল একই থাকে। কোনো মাসে হয়তো উভয় শহর থেকেই চাঁদ দেখা সম্ভব নয়। আবার কোনো মাসে উভয় শহর থেকেই দেখা সম্ভব। কখনো ব্যতিক্রমও হয়। পিছনে যে লিংকগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোতে পরিবেশিত বিভিন্ন মাসের চাঁদ দেখার নকশাগুলো দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তাহলে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের দিক থেকে যখন এই শহরগুলো সাধারণত একই উদয়স্থলের হয়ে থাকে ফকীহগণ এগুলোকে ভিন্ন উদয়স্থলের বললেন কীভাবে? বুঝা গেলো, উদয়স্থলের ভিন্নতা বলতে তারা শাস্ত্রীয় ভিন্নতা বুঝান না।

এই ধারণা ঠিক নয় যে, আগের যুগের আলিমগণ জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ভিন্নতা-অভিন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁরা এসব উদাহরণ দিয়েছেন। এ ধারণা এজন্য ঠিক নয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহগণ 'ইলমে হাইয়াত' ও 'ফালাকিয়াত' (প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা) সম্বন্ধে মোটেও বেখবর ছিলেন না। কারো কারো নিশ্চয়ই এ শাস্ত্র জানা ছিল না, কিন্তু অনেকেই ছিলেন ফালাকিয়াত-এর আলিম।

ইমাম গাযালীর উস্তায ইমামুল হারামাইন আবদুল মালিক ইবনুল জুয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.) ''নিহায়াতুল মাতলাব'' গ্রন্থে পরিষ্কার

লিখেছেন যে, ''সফরের দূরত্বের কম দূরত্বেও উদয়স্থল আলাদা হতে পারে এবং উদয়স্থলের প্রকৃত ভিন্নতা সম্পর্কে অবগতি খুবই সূক্ষ্ম বিষয়, যা শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই বুঝতে পারে। বলাবাহুল্য, এ জাতীয় বিষয়ের উপর শরীয়তের বিধান নির্ভরশীল হয় না। এ কারণে নিকট ও দূরের পার্থক্যের ক্ষেত্রে (শাস্ত্রীয়) ভিন্নতা মানদন্ড হতে পারে না। আর কেউ একে মানদন্ড বলেনওনি''।

তাঁর আরবী বক্তব্য এই-

وذكر الأصحاب : أن البعد الذي ذكرناه هو مسافة القصر، ولو اعتبر مسافة يظهر في مثلها تفاوت المناظر في الاستهلال لكان متجها في المعنى، ولكن لا قائل به. (১)

فإن درك هذا يتعلق بالأرصاد والنموذارات الخفية، وقد تختلف المناظر في المسافة القاصرة عن مسافة القصر، للارتفاع والانخفاض، والشرع لم يُبنَ على التزام أمثال هذا، ولا ضبط عندنا وراء مسافة القصر للبعد. (نهاية المطلب في دراية المذهب ج ٤ ص ١٧)

তো জানা গেল যে, অতীতের ফকীহগণ উদয়স্থলের জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ভিন্নতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরপর তাদের আলোচনা ও উদাহরণ যখন এর সাথে মেলে না তখন কি প্রমাণ হয় না যে, তাদের উদ্দেশ্য সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিন্নতা?

৩. হানাফী ফকীহগণের আলোচনাতেও বেশ স্পষ্টভাবেই বলা আছে যে, তাদের উদ্দেশ্য উদয়স্থলের জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ভিন্নতা নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রশীদ আলকিরমানী (৫৬৫ হি.) ''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া''য় যখন এ মাসআলা উল্লেখ করেন যে, ৩০ ওয়ালাদের চাঁদ দেখার ইতিবার করে ২৯ ওয়ালাদেরকে যে এক রোযা কাযা করার কথা বলা হয়েছে এটা ঐ সময় যখন উভয় অঞ্চলের উদয়স্থল এক হবে। উদয়স্থল আলাদা হলে একের বিধান অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

এ মাসআলা উল্লেখ করার পরই তিনি তাঁর উস্তায ইমাম জামালুদ্দীন

ইয়াযদী থেকে একটি নোট নকল করেছেন-

قال شيخنا وسيدنا جمال الدين : لم يذكروا في ذلك حدا، بل أطلقوا، وأنا أقول : يجوز أن يعتبر فيه ما يعتبر في الغيبة المنقطعة في حق الولي.

قلت له : تحديدك في الغيبة المنقطعة لا يوجب زيادة في البيان، فإنهم اختلفوا فيها.

قال : ما لا يصل القوافل في السنة غالبا إلا مرة، وأقله مسيرة شهر، ألا يرى إلى قصة سليمان بن داود : "ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر".

وكان انتقاله من إقليم إلى إقليم، وقدره بشهر، فعرف أن بين الإقليمين لا يكون أقل من شهر. ولا يمكن الاعتماد على ما يقول المنجمة من زيادة الدرجة في العرض والطول، فلا يعتبر.

ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী হানাফী রাহ. এখানে পরিষ্কার বলেছেন যে, উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়ার ক্ষেত্রে (শরয়ী হুকুমের জন্য) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ এর হিসাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তাহলে উদয়স্থলের অভিন্নতা বা ভিন্নতার মাপকাঠি কী? তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমাদের ফকীহগণ বিশেষ কোনো সীমারেখা উল্লেখ করেননি। তবে তার মতে কিছু আলামতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এক মাসের দূরত্ব হলে তা আলাদা উদয়স্থলের শহর। (দ্রষ্টব্য : ''জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'' (মাখতূতাত) কিতাবুস সওম, আলবাবুছ ছানী।)

তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতার যে সীমা উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্টতঃ একটি আনুমানিক সীমা। তবে তাঁর বর্ণনা থেকে দু'টো বিষয় স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে :

ক. যে হানাফী ফকীহগণ ভিন্নতাকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য জোতির্বিদ্যার হিসাবভিত্তিক সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট ভিন্নতা নয়। এ কারণে পরের ফকীহগণকে এর কোনো আনুমানিক মাপকাঠি খুঁজতে হয়েছে।

খ. আলোচনার শেষের দিকে ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী রাহ. পরিষ্কার বলেছেন যে, ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় উদয়স্থলের যে ভিন্নতা তা জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ভিন্নতা নয়। ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী তা বর্ণনা করে মৌনতা অবলম্বন করেছেন।(২)

তো আমাদের ফকীহগণের কাছেও উদয়স্থলের ভিন্নতা অর্থ জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবভিত্তিক ভিন্নতা নয়; বরং সাধারণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভিন্নতাই উদ্দেশ্য, যার আনুমানিক পরিমাণ ঐ যুগের বিচারে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. সবচেয়ে বড় কথা এই যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে শরীয়ত গোড়া থেকেই জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবকে মানদন্ড বানায়নি; বরং উম্মতের সহজতার জন্য চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এমন মানদন্ড নির্ধারণ করেছে, যা সবযুগে সব অঞ্চলে সহজে অনুসরণযোগ্য। আর তা হচ্ছে চাঁদ দেখা বা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য। আর কোনো কারণে চাঁদ না দেখা গেলে ৩০ দিন পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছে। অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত এবং খাইরুল কুরূন (সাহাবা-যুগ, তাবিয়ীন-যুগ ও তাবে-তাবিয়ীন যুগ)-এর উলামা-ফুকাহার এ বিষয়ে ইজমাও রয়েছে যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাব ধর্তব্য নয়। যদিও খাইরুল কুরূন অতিবাহিত হওয়ার পর দু-চারজন আলিম বিশেষ অবস্থায় বিশেষ শর্ত-শারায়েতের সাথে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের দিক থেকে চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়াকেও যথেষ্ট মনে করেছেন, কিন্তু তাদের এ মতভিন্নতা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অগ্রহণযোগ্য মতভিন্নতা। সহীহ হাদীসসমূহের স্পষ্ট বক্তব্য ও খাইরুল কুরূনের ইজমার বিপরীতে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

তো যখন চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে গোড়া থেকেই জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবকে মানদন্ড বানানো হয়নি তখন নিকট ও দূরের পার্থক্যের ক্ষেত্রে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবভিত্তিক নির্ধারিত 'ইখতিলাফে মাতালি' (উদয়স্থলের বিভিন্নতা)কে কীভাবে মানদন্ড বানানো যায়?

কোনো অঞ্চলের চাঁদ দেখা ঐ অঞ্চল থেকে দূর-দূরান্তের শহর-নগরে অবশ্য-অনুসরণীয় হবে কি না-এ বিষয়ে মতভিন্নতা খাইরুল কুরূন থেকে চলে আসছে এবং প্রত্যেক অঞ্চল ও প্রত্যেক মাযহাবে তা স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারী ফকীহবৃন্দ আগেও ছিলেন, এখনো আছেন। তো এ বিষয়ে যদি জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের বিচারেই নিকট দূরের পার্থক্য করার হুকুম হত তাহলে খাইরুল কুরূন থেকেই এর উপর আমল থাকত এবং বিচারকদেরকে, যারা চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা কার্যকর করেন, এ বিষয়ে জ্যোতির্শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়ার আদেশ করা হত। অথচ আমাদের জানা মতে উম্মাহর ইতিহাস ও হাজার বছরের কর্ম-ধারায় এর কোনো প্রমাণ নেই।

মোটকথা, বিভিন্ন দিক থেকে পরিষ্কার যে, ফকীহগণের যে বড় জামাত, উদয়স্থলের ভিন্নতাকে মানদন্ড বানিয়েছেন, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিন্নতা। জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবভিত্তিক সূক্ষ্ম ভিন্নতা নয়।(৩)

এটা এজন্যও উদ্দেশ্য না হওয়া উচিত যে, জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবে উদয়স্থলের অভিন্নতার ভিত্তি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাকে বানানো হয় এবং যত অঞ্চলে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা আছে গোটা অঞ্চলকে অভিন্ন উদয়স্থলের গণ্য করা হয়। অথচ দৃষ্টিগোচর হওয়ার 'সম্ভাবনা' দৃষ্টিগোচর হওয়াকে অনিবার্য করে না। আর বলাই বাহুল্য, ফিকহী হুকুমের সম্পর্ক চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে, দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনার সাথে নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

নিকট ও দূরের পার্থক্যের বিষয়ে কাউকে কাউকে এ আপত্তি করতে শোনা যায় যে, নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্য করার কোনো মানদন্ড যখন কোনো স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফকীহগণ যে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন

তাতেও তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এ থেকে বোঝা যায়, বাস্তবে নিকট ও দূরের মাঝে কোনো পার্থক্যই নেই। যে কোনো জায়গায় চাঁদ দেখা গেলেই তা সব জায়গার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় হবে। নিকট ও দূরের বিধান যদি বাস্তবেই আলাদা হত তাহলে এর কোনো মানদন্ড শরীয়তের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হত।

প্রশ্নটি অমূলক। কারণ শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে শুধু এজন্য অস্বীকার করা যে, এর বিস্তারিত বিবরণ স্পষ্ট নসে উল্লেখ নেই, সঠিক নয়। এর দ্বারা একদিকে যেমন শরয়ী দলিলকে রদ করা হয় অন্যদিকে অনেক স্বীকৃত ফিকহী বিধানকেও অস্বীকার অনিবার্য হয়, যেগুলোতে পরিমাণের ভিন্নতার কারণে বিধানের ভিন্নতা এসেছে অথচ পরিমাণটি 'মানসূস আলাইহি' (স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত) নয়; বরং ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। যেমন :

১. পানিতে নাপাকি পড়লে পানি নাপাক হবে কি না?

নাপাকির কারণে যদি পানির বৈশিষ্ট্যগুলোর (বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ) কোনোটি পরিবর্তিত হয় তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক, কিন্তু যদি এ পরিমাণ নাপাকি না পড়ে তাহলে কী হুকুম? এ বিষয়ে অধিকাংশ ফকীহের মাসলাক এই যে, 'অল্প' পানি নাপাক হয়ে যাবে, কিন্তু 'বেশি' পানি নাপাক হবে না। এখন প্রশ্ন হল, কী পরিমান পানি 'অল্প' পানি আর কী পরিমাণ পানি 'বেশি' পানি। যেহেতু এর মাপকাঠি কোনো সর্বসম্মত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এ কারণে মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ হয়েছে এবং এ বিষয়ে স্বয়ং ফিকহে হানাফীর ফকীহগণেরও বিভিন্ন মত আছে। মুতাআখখিরীন হানাফী ফকীহদের মাঝে 'দহ দর দহ' শীর্ষক মতটি অধিক প্রসিদ্ধ।

২. মুসাফিরকে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে কসর করতে হয় এবং রোযা না রেখে পরে কাযা আদায়ের অবকাশ আছে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে 'সফরে'র সংজ্ঞা কী-এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ

আছে। ফিকহে হানাফীতে এর যে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে, আধুনিক পরিভাষায় তা হলো- ৭৭.২৪৮৫১২ কিলোমিটার।

তবে অন্যান্য মাযহাবের ফয়সালা এ থেকে আলাদা।

৩. মুসাফির কোথাও ইকামতের নিয়ত করলে তার উপর মুকীমের হুকুম প্রযোজ্য হয়। কিন্তু কতদিনের ইকামতের (অবস্থানের) নিয়ত করার দ্বারা মুকীম হয়-এ বিষয়ে মতভেদ আছে, ফিকহে হানাফীর 'মুফতাবিহী' সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) এই যে, পনেরো দিন বা তার বেশি ইকামতের নিয়ত করলে মুকীম হবে।

৪. নামাযে 'আমলে কলীল' মাফ। অর্থাৎ এর কারণে নামায নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে 'আমলে কাছীর' এর কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এখন কোন কাজ 'আমলে কলীল' আর কোন কাজ 'আমলে কাছীর'-এর কোনো নির্ধারিত মাপকাঠি কোনো সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ফলে এ বিষয়ে ফকীহগণের সিদ্ধান্তও বিভিন্ন। ফিকহে হানাফীতে অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত এই যে, যে কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখলে কেউ নামাযীই মনে করবে না; বরং নামাযের বাইরেই মনে করবে তা-ই 'আমলে কাছীর' যার দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।(৪)

মোটকথা, শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে শুধু এজন্য অস্বীকার করা যে, এর বিস্তারিত প্রায়োগিক রূপ কোনো স্পষ্ট নসে নেই, মোটেও ঠিক নয়। কারণ স্পষ্ট নসে বিস্তারিত বিবরণ না থাকার অর্থ, বিষয়টিকে শরীয়ত ফকীহগণের ইজতিহাদের উপর ন্যস্ত করেছে। অতএব এর সমাধান খুঁজতে হবে মুজতাহিদগণের কাছে। এ বিষয়ে যদি তাদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হয় তাহলে শরীয়তের নীতিমালার আলোকে আসহাবুত তারজীহ (অগ্রগণ্য নির্ধারণকারী) ফকীহগণ যে সিদ্ধান্তকে রাজিহ ও অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করবেন তা-ই অনুসরণ করা হবে। মাসআলাটি ইজতিহাদী বা ইখতিলাফী হওয়ার কারণে নিজের পক্ষ হতে মতামত দেওয়ার বা মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার অধিকার থাকবে না। আল্লাহ তাআলা যদি

চাইতেন তাহলে প্রত্যেক বিষয়ের বিধান স্পষ্ট নসের দ্বারাও দিতে পারতেন, কিন্তু এ তার দয়া ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ যে, অনেক বিষয়কে মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। জ্ঞানীরা জানেন, এটি ইসলামী শরীয়তের 'মাহাসিন' সৌন্দর্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

আলোচ্য বিষয়ে 'আসহাবুত তারজীহ' ফকীহগণের বরাতে বলা হয়েছে যে, রাজিহ ও অগ্রগণ্য মত অনুসারে উদয়স্থলের ভিন্নতাই হচ্ছে মাপকাঠি এবং বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ-ও বলা হয়েছে যে, ''ইখতিলাফুল মাতালি'' (উদয়স্থলের ভিন্নতা) অর্থ, সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিন্নতা, জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবভিত্তিক সূক্ষ্ম বিভিন্নতা নয়।

নোট :

উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য মনে করার মাসলাকের উপর এক প্রশ্ন, যা বেশ প্রসিদ্ধ তবে অগভীর চিন্তাপ্রসূত-এই যে, যে ইমামগণ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য বলেছেন তাঁরা তো এ কথা বলেননি যে, রাষ্ট্রসমূহের সীমান্তের ভিত্তিতে উদয়স্থল আলাদা হয়- না তারা এ বলেছেন আর না তা বাস্তবতা। তাহলে দেশে দেশে বিভিন্ন দিনে রোযা-ঈদ পালনের সাথে এ মাসলাকের কী সম্পর্ক?

এ প্রশ্ন শুনতে যতই চটকদার মনে হোক, এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক এবং নিতান্তই অগভীর চিন্তাপ্রসূত। পাঠকবৃন্দের হয়তো মনে থাকবে এ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতেই সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সামনে গিয়ে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। 1

وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

টিকা :

টীকা : ১

اعترض عليه الرافعي في "الشرح الكبير" (٣/١٨٠) بأن العراقيين قالوا بذلك، ويقول الراقم : إن كتب العراقيين أمام الإمام، فكيف يغفل عن قولهم، والذي أراه أن المراد من قوله : لا قائل به، أي باختلاف المطالع الذي لا يدركه إلا أهل العلم بالفلك والهيئة، وأما قول العراقيين فمحمول عنده على اختلاف المطالع العرفي المبني على بادئ الرأي. ولعله لم يذكر قولهم، لأنه لم يختره. والله تعالى أعلم.

টিকা : ২

قال الراقم: وليعلم الطلاب أن عبارة جواهر الفتاوى المذكورة نقلها القهستاني في "جامع الرموز" باختصار مخل، ونقلها عنه ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى في "رد المحتار" (٣/٢٦٤-٢٦٥) : و"مجموع رسائله" (١/٢٥٠) (رسالة "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان")، فوقع كذلك مبتورا، وقد عقب ابن عابدين على القدر الذي نقله بما أورده عن التاج التبريزي الشافعي أن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسخا، قال ابن عابدين : الظاهر من قول التبريزي : لا يمكن الخ أنه قدره بالقواعد الفلكية، ولا مانع من اعتبارها هنا كاعتبارها في أوقات الصلاة"، ذكره في "تنبيه الغافل".

ولو أنه رحمه الله تعالى وقف على عبارة "جواهر الفتاوى" بتمامها لما قال ما قال، ودعواه أن تحديد التاج التبريزي مبني على القواعد الفلكية، خطأ محض ترفضه قواعدُ علم الفلك القديم وعلم الفلك الحديث في آن واحد، كما أخبرني بذلك عالم من أصحاب الخبرة بعلم الهيئة وعلم الفلك، وهو رئيس قسم التحقيق لمركز الفلكيات في جامعة الرشيد كراتشي, وراجع "أحسن الفتاوي" ج٤ ص٥٠٣-٥٠٤ و"بحوث في قضايا فقهية معاصرة" لشيخنا الأستاذ العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى ورعاه
ج٢ ص٢٥٤-٢٥٥ , فقد نبها على خطأ أمثال هذه التحديدات, واستدلا بذلك على ضعف القول بكون اختلاف المطالع معتبرا, والذي يبدو للراقم عفا الله عنه أن ذلك دليل على أن مراد جل الفقهاء القائلين باختلاف المطالع هو الذي يدرك ببادئ النظر دون الذي يدرك بالحساب, والله تعالى أعلم.

وبالنسبة لخطأ التحديدات المذكورة ففيما أشرت إليه من جداول رجال علم الفلك المعاصرين غنية, وانظر ما سيأتي في التعليقة الثالثة, وقوله رحمه الله تعالى : ولا مانع من اعتبارها هنا, مخالف لكلام الفقهاء قبله, منهم جمال الدين اليزدي و صاحبه الكرماني, ومخالف لمقتضى حديث: نحن أمة أمية, كما سيأتي... انتهي قول الراقم.

টিকা : ৩

قال الراقم : وبهذا وبما تقدم يتبين الخلل في قول ابن حجر المكي رحمه الله تعالى في الفتاوى الفقهية ج٢ ص٨٩ إذ قال : "...، ولا يضر ما يلزم على ذلك من الرجوع لقول الحاسب والمنجم، لأنه في أمر تابع وخاص، والتوابع والأمور الخاصة يغتفر فيهما ما لا يغتفر في الأصول والأمور العامة ... ".

هكذا أطلق، ولم يبين كيف يلزم في ذلك الرجوع إلى الحاسب، وإنما يلزم الرجوع إذا ثبت أن المدار على اختلاف المطالع من حيث الحساب، ولم يبين ابن حجر ذلك ولا استَدَلَّ له بشيء. ولا أدري أنه كيف عَدَّ أمر افتراض الصوم وثبوت الرمضانية وعدمه من الأمور التابعة والخاصة!

هذا، مع أنه قال في الفتوى نفسها : "قال التاج التبريزي : ورؤيته في بلد توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا، لأنها في أقل من ذلك لا تختلف.

قال أبو شكيل : وعدن وزبيد وما والاهما من برعجم متحدة المطالع، وعدن وصنعاء وما والاهما من الجبال وتعز مختلفة اه." انتهى كلام ابن حجر المكي. فليتأمل القارئ الكريم فيما نقله عن التاج ومن طريقه عن أبي شكيل، هل ينطبق شيء من ذلك على قواعد علم الفلك أم لا؟ وإذا لم ينطبق عليها فهذا دليل آخر على وجود الخلل والتسامح في كلامه في هذا البحث.

টিকা : 8

قال الراقم : ويعلم طلاب الفقه وأصوله وطلاب الحديث وأصوله أن هذا باب واسع جدا، فأقل مقدار الجماعة التي شرطت للجمعة والعيدين، وأقل مقدار الخطبة فيهما، وأقل مقدار القراءة المفترضة في الصلاة، وأقل المهر المشروط في النكاح، ومقدار المتاع الواجب للمطلقة، ... ، إلى مسائل كثيرة في الفقه وأصول الحديث، كلها مجتهد فيها ومختلف فيها، فإنكار أصل لأجل وقوع الخلاف في تفصيله وعدم النص فيه لا ينبغي أن يصدر من متفقه، بل الشأن

البحث عن الراجح من الخلافيات المجتهد فيها. والله الموفق، انتهى قول الراقم.

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

এপ্রিল ২০১৪, জুমাদাল উখরা ১৪৩৫

একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন-৯

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দলীলের দিক থেকে কোন মাযহাবটি অগ্রগণ্য

ফিকহের বিধানে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য কি না এ বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ খাইরুল কুরূনের আইম্মা ও ফুকাহা এবং পরের যুগের ইমাম-ফকীহগণের মাযহাব মোটামুটি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু কোন মাযহাবের দলীল কী এবং দলীলের বিচারে কোন মাযহাব অগ্রগণ্য এ বিষয়ে আলাদা ও বিস্তারিত আলোচনা এখনো হয়নি। মূলত এর ইচ্ছাও আমার নেই। কারণ যেমনটা বারবার বলা হয়েছে যে, এ মাসআলা ইজতিহাদীও এবং ইখতিলাফীও। একইসাথে মাসআলাটির ধরনও খুব সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল। এ ধরনের বিষয়ে দলীলের পাঠ যেমনই হোক, ওয়াজহে ইসতিদলাল বা দলীল দ্বারা দাবি প্রমাণের প্রসঙ্গটি খুবই

সূক্ষ্ম হয়ে থাকে, যা উপলব্ধি করা ইলমুল ফিকহের যে কোনো তালিবে ইলম; বরং যে কোনো মুদাররিসের পক্ষেও সহজ হয় না। অথচ শুধু তরজমা পাঠ করেই অনেক গায়রে আলিম শুধু এ ধরনের বিষয়ই নয়, এর চেয়েও সূক্ষ্ম বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে থাকেন এবং ‘মত প্রকাশ’ করতে থাকেন। এতে আসলে আশ্চর্যের কিছু নেই, এ তো ভিন্ন শাস্ত্রে অনুপ্রবেশের সর্বনিম্ন কুফল।

যাইহোক, দলীল-প্রমাণের বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার ইচ্ছা আমার নেই, আমি শুধু দুটি বিষয়ে কিছু কথা আরজ করব। প্রথম বিষয়, আলোচিত মাসআলায় দলীল-প্রমাণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোনো কোনো বন্ধু যে ত্বরা-প্রবণতার শিকার হয়েছেন সে সম্পর্কে কিছু নিবেদন, আর দ্বিতীয় বিষয়, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া আর সওম ও ঈদের ঐক্য জরুরি হওয়া পরস্পর সমার্থক নয়।

দলীল-প্রমাণের বিশ্লেষণে ত্বরা-প্রবণতা মোটেও কাম্য নয়

যে কোনো ইলমী কাজেই চিন্তা-ভাবনা এবং ধৈর্য ও স্থিরতা অতি প্রয়োজন। আর ঐ সকল ইজতিহাদী বিষয়, যাতে খাইরুল কুরূন থেকে মতভেদ চলে আসছে তাতে উভয় দিকের ‘দলীল’ ও ‘ওয়াজহে ইসতিদলাল’ সংক্রান্ত আলোচনা তো এত সূক্ষ্ম হয় যে, এসব ক্ষেত্রে ত্বরা-প্রবণতা অতি মারাত্মক হয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে অনেক কারণেই চূড়ান্ত ধৈর্য ও স্থিরতা এবং চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন।

একটি ছোট কারণ এই যে, কখনো কোনো লেখকের তাসামুহ বা ভুলভ্রান্তি হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে যথাযথ তাহকীক না করলে এবং ধীরস্থিরভাবে কাজ না করলে প্রবল আশঙ্কা থাকে, পরের লেখকেরা সেই তাসামুহ বা ভ্রমই প্রচার করবেন। আর এ তাসামুহ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেই সন্তুষ্ট হয়ে ভাববেন, তারা একটি ‘দলীল’ পেশ করেছেন বা কোনো ‘ইসতিদলালে’র চূড়ান্ত জবাব দান করেছেন। যেমন, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার পক্ষে কোনো

কোনো ফকীহ এ দলীল দিয়েছেন যে, যখন সময় নির্ধারণকারী 'মীকাত' অর্থাৎ সূর্যের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য, যে কারণে প্রত্যেকে নিজেদের সুবহে সাদিক অনুযায়ী ফজরের নামায পড়ে, নিজের অঞ্চলে সূর্য ঢলার পর যোহর এবং সূর্যাস্তের পর মাগরিব আদায় করে তাহলে তারিখ নির্ধারণকারী 'মীকাত' অর্থাৎ চাঁদের ক্ষেত্রেও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া চাই এবং প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজ নিজ উদয়স্থল হিসেবে রোযা ও ঈদ করা চাই। কারণ চন্দ্র ও সূর্যের উদয়স্থলের মাঝে এমন সুস্পষ্ট ও যুক্তিসংগত কোনো পার্থক্য নেই যে, একটির বিভিন্নতা অবশ্যই ধর্তব্য হবে আর অন্যটির বিভিন্নতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হবে।

আমি বলি না, এ কোনো অকাট্য দলীল। ইজতিহাদী মাসআলায় তা পাওয়াই বা যাবে কোত্থেকে? কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, একটি ইজতিহাদী দলীল হিসেবে তা অবশ্যই গণ্য হতে পারে। সমপর্যায়ের আরেকটি ইজতিহাদ দ্বারা এর জবাব দেওয়া যায়, কিন্তু একে পত্রপাঠ নাকচ করে দেওয়া যায় না। অথচ আমরা একাধিক 'গবেষক'কে দেখেছি, তারা যেন এ যুক্তিটি হেসেই উড়িয়ে দিতে চান। আসলে 'উসূলে ফিকহ' ও 'কাওয়াইদে ইসতিদলালে'র ইলম না থাকলে এমন হওয়াই অনিবার্য। আর এ কারণেই বলা হল, ভিন শাস্ত্রে অনুপ্রবেশ অপরাধ। 'ইলমে ফিকহ' ও 'উসূলে ফিকহে' পারদর্শী লেখকগণ এ দলীলের জবাব দেওয়ার তো চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একে নাকচ করে দেননি। যেমন ইবনুল হুমাম রাহ. (৮৬১ হি.) হিদায়ার শরহ ''ফাতহুল কাদীর''-এ এই মাসআলার আলোচনায় এ দুই উদয়স্থলের ভিন্নতার মাঝে পার্থক্য করার একটি কারণ বর্ণনার চেষ্টা করেছেন। যদিও তা প্রশ্নমুক্ত নয়, কিন্তু তাঁর প্রয়াস থেকে এটুকু তো জানা গেল যে, তাঁর দৃষ্টিতে এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যের দলীল পেশ করা জরুরি। বিনা দলীলে এ 'কিয়াস'কে শুধু হেসে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।

ইবনুল হুমাম রাহ. লিখেছেন-

وجه الأول عموم الخطاب في قوله : صوموا معلقا بمطلق الرؤية في قوله لرؤيته، وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم، فيعم الوجوب، بخلاف الزوال والغروب، فإنه لم يثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماه في خطاب من الشارع، والله أعلم.

অর্থাৎ (চাঁদের হুকুমের বিষয়ে) উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার কারণ صوموا لرؤيته শীর্ষক হাদীসের সাধারণ সম্বোধন। এ হাদীসে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সওমকে সংযুক্ত করে সকল মুসলমানকে রোযা রাখার আদেশ করা হয়েছে। এখন যে অঞ্চলের অধিবাসীরাই চাঁদ দেখুক চাঁদ দেখা প্রমাণিত হল। সুতরাং চাঁদ দেখার সাথে সংযুক্ত বিধানও সাধারণভাবে প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু সূর্য ঢলা বা সূর্যাস্তের সময় (ইত্যাদি) এরূপ নয়। কারণ, এ সময়গুলোর নামের সাথে যুক্ত করে কুরআন-হাদীসে সালাতের কোনো ব্যাপক হুকুম করা হয়নি। (এ কারণে যে কোনো জায়গায় সূর্য ঢললে সব জায়গার অধিবাসীদের উপর যোহর, কিংবা যে কোনো জায়গায় সূর্যাস্ত হলে সব জায়গায় মাগরিবের নামায ফরয হবে না; বরং প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ এলাকায় সূর্য ঢলা ও সূর্যাস্তের হিসাবে নামায আদায় করবে।)-ফাতহুল কাদীর ২/৩১৩-৩১৪, দারুল ফিকর বৈরুত, فصل في رؤية الهلال

ইবনুল হুমামের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, কুরআন-হাদীসে নামাযের সময়গুলোর বর্ণনা আছে এবং সময়মতো নামায পড়ার হুকুমও আছে, যার অর্থ, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসী নিজেদের সময় অনুসারে নামায আদায় করবে। নিজেদের অঞ্চলে সূর্য ঢললে যোহর পড়বে, নিজেদের অঞ্চলে সূর্যাস্ত হলে মাগরিব পড়বে ... এভাবে। কিন্তু কোনো আয়াত বা হাদীসে কোনো বিশেষ সময়ের নামোল্লেখ করে সাধারণ সম্বোধনের শব্দে মুসলমানদের নামায পড়ার আদেশ করা হয়নি। তা করা হলে সওমের মতো সালাতও কোনো এক জায়গার সূর্য ঢলা বা সূর্যাস্তের সাথে যুক্ত হত।

এ-ই যদি ইবনুল হুমামের উদ্দেশ্য হয় তাহলে পরিষ্কার যে, কুরআন-

হাদীসে যেমন সালাতের সময়ের বিবরণ আছে তেমনি বিশেষ বিশেষ সময়ের নাম উল্লেখ করে তাতে সালাত আদায়ের বা সালাত থেকে বিরত থাকারও স্পষ্ট ও সাধারণ আদেশ আছে। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

অর্থাৎ জুমার দিন নামাযের ডাক এলে আল্লাহর যিকরের দিকে (খুতবা ও সালাতের দিকে) ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ত্যাগ কর। (আলজুমুআ ৬২ : ৯)

আরো ইরশাদ :

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ1 وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

অর্থ : সুতরাং আল্লাহর তাসবীহ কর ঐ সময় যখন তোমাদের ওপর সন্ধ্যা নামে এবং ঐ সময়ও যখন তোমাদের উপর 'সুবহ' উদিত হয়। আর তাঁর প্রশংসা হয় আসমানসমূহেও এবং যমীনেও। (তাঁর তাসবীহ কর) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমরা 'যুহরে' প্রবেশ কর। (আররূম ৩০ : ১৭-১৮)

হযরত আবদুলাহ ইবনে আববাস রা.-এর তাফসীর অনুযায়ী এ আয়াতে পাঁচ নামাযের হুকুম দেওয়া হয়েছে। এতে সময়ের নামোলেখ করে সকল মুমিনকে সালাতের মাধ্যমে হামদ ও তাসবীহের হুকুম করা হয়েছে। অর্থাৎ সন্ধ্যায় ও রাতে মাগরিব-ইশার নামায আদায় কর, সকালে ফজরের নামায, দুপুরে যোহরের নামায আর অপরাহ্নে আসরের নামায।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

صلوا المغرب حين تغيب الشمس

যখন সূর্য ডুবে যায় তখন তোমরা মাগরিবের নামায পড়। (আলমুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক ১/৫৫৩, হাদীস : ২০৯৪)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها

এ হাদীসেও সাধারণ হুকুম, সূর্যোদয়ের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় তোমাদের কেউ যেন নামায না পড়ে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮২৮; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ১৫৪৮)

এখন যদি উল্লেখিত আয়াত থেকে এ অর্থ নেওয়া ভুল হয় যে, যে কোনো জায়গায় জুমার আযান হলে প্রত্যেক অঞ্চলের মুমিনদের উপর খুতবা ও সালাতের জন্য ধাবিত হওয়া ফরয, কোথাও সূর্য ডুবলেই সবার ওপর মাগরিবের নামায আদায় করা ফরয হয়, এবং কোথাও সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হতে থাকলেই এ সময় সব জায়গার মুমিনদের জন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ হয় এবং এর সঠিক মর্ম এ-ই হয় যে, (নিজ নিজ) জুমার আযানের সময় জুমা আদায় কর (নিজ নিজ) সূর্যাস্তের সময় মাগরিব আদায় কর এবং (নিজ নিজ) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত থেকে বিরত থাক তাহলে صوموا لرؤيته (চাঁদ দেখলে রোযা রেখো) এবং لا تصوموا حتى تروه (যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে রোযা রাখবে না)-এই নির্দেশনাবলীর এ অর্থ কেন হতে পারবে না যে, '(নিজ নিজ) চাঁদ দেখা অনুসারে রোযা রাখ' এবং 'যে পর্যন্ত (নিজ এলাকায়) চাঁদ দেখা না যায় রোযা রাখা থেকে বিরত থাক।

আপনি যদি চিন্তা করে থাকেন তাহলে হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, ইবনুল হুমাম রাহ. যে দলীলের ভিত্তিতে সূর্য ও চন্দ্রের উদয়স্থলের মাঝে পার্থক্য করেছিলেন সে দলীল দ্বারাই এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য না হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে। ফতোয়া শামীর টীকায় শায়খ ফরফূরও

এদিকে ইশারা করেছেন। এ সত্ত্বেও দেখা যায়, কিছু মানুষ এ তাসামুহ (ভ্রান্তি) ভিত্তিক বর্ণনাকে বুনিয়াদ বানিয়ে একাধিক বড় বড় ফকীহর পক্ষ হতে উপস্থাপিত ঐ দলীলকে সম্পূর্ণ অসার সাব্যস্ত করতে চান।

অথচ সামনে গিয়ে ইবনুল হুমাম রাহ.ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এ হাদীস উল্লেখ করে লেখেন-

ولا شك أن هذا أولى، لأنه نص، وذلك محتمل لكون المراد أمر كل أهل مطلع بالصوم لرؤيتهم.

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এ দলীলই (অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হওয়ার) অধিক উপযোগী। কারণ এ (হাদীস তো) স্পষ্ট। আর ঐ হাদীসে (অর্থাৎ صوموا لرؤيته চাঁদ দেখে রোযা রাখ) এ অর্থেরও সম্ভাবনা আছে যে, প্রত্যেক উদয়স্থলের অধিবাসীদেরকে নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারেই রোযা রাখার আদেশ করা হয়েছে। *(১)* -ফাতহুল কাদীর ২/৩১৪

[একাধিক লেখক ঐ ব্যাখ্যার যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছেন, প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে একটি জবাবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা তো আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।]

ইবনুল হুমাম যে অর্থকে এ হাদীসের অন্যতম সম্ভাব্য অর্থ বলেছেন সালাফের কর্মপরম্পরার দ্বারা এ অর্থই প্রতিষ্ঠিত। খাইরুল কুরূনের কোনো ফকীহ থেকে এ হাদীসের অন্য কোনো অর্থ বর্ণিত হয়নি।

যাইহোক, এ কথাগুলো উদাহরণস্বরূপ বলা হল। দলীল-প্রমাণের বিশ্লেষণের উপর বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে আমার নেই। তবে কেউ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে চাইলে এবং উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার দলীলসমূহ দেখতে চাইলে ''আহকামুল কুরআন'' জাসসাস, ''আলমুগনী'' ইবনে কুদামা, ''নায়লুল আওতার'' শাওকানী, ''তাওজীহুল আনযার লি তাওহীদিল

মুসলিমীনা ফিস সাওমি ওয়াল ইফতার'' আহমদ গুমারী, ''কিফায়াতুল মুফতী'', ইনআমুল বারী (হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর দরসে বুখারী) এবং তাঁর কিতাব 'বুহুসুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ' দেখতে পারেন।

আর কেউ বিপরীত বক্তব্যের দলীলসমূহ দেখতে চাইলে ''আততামহীদ'' ইবনে আবদুল বার, ''আলইসতিযকার'' ইবনে আবদুল বার, ''তাবয়ীনুল হাকাইক'' যায়লায়ী, ''ইরশাদু আহলিল মিল্লাহ ইলা ইছবাতিল আহিল্লাহ'' মুহাম্মাদ বাখীত মুতীয়ী, ''মাআরিফুস সুনান শরহে জামেউত তিরমিযী ও ''আলআযবুয যুলাল ফী মাবাহিছি রুইয়াতিল হিলাল'' পাঠ করতে পারেন।

কিছু জরুরি কথা

আমি শুধু নীচের কিছু বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

১. এ কথা মনে রাখা চাই যে, এ মাসআলা যেমন ইজতিহাদী তেমন ইখতিলাফীও। এ কারণে দলীলের উপর যতই চিন্তাভাবনা করা হোক এবং যতই আলোচনা করা হোক, শেষের ফল এ-ই হবে যে, এখানে উভয় দিকে দলীল-প্রমাণ আছে এবং কোনো একটি দিককে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেওয়ার উপায় নেই। হাঁ, কেউ যদি ন্যায়সঙ্গত আলোচনার পরিবর্তে অন্যায় ও প্রান্তিকতার পথ অবলম্বন করে তাহলে আলাদা কথা। এ কারণে প্রত্যেক ইজতিহাদী মাসআলার মতো এখানেও ইনসাফ ও ইতিদাল রক্ষা করা খুব জরুরি এবং বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকা তো সর্বাবস্থায় ফরয।

২. দলীলের বিচারে কোন মাযহাব অগ্রগণ্য এ বিষয়ে নিজ থেকে কিছু লেখার পরিবর্তে মুনাসিব মনে হচ্ছে, ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী (৬৮৩ হি.-৭৫৬ হি.) রাহ.-এর আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে দেই। তিনি লেখেন-

''এক শহরের অধিবাসী অন্য শহরের চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল

করবে না, তা নিকটবর্তী হলেও''-এ সিদ্ধান্ত দুর্বল। কারণ ''সুনানে সায়ীদ ইবনে মানসূরে'' সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার ২৯ রমযানের সূর্যাস্তের পর শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেল না, ফলে সকলে ৩০ রমযান হিসেবে রোযা রেখেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন সন্ধ্যায় এক কাফেলা সফর থেকে ফিরল এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গত রাতে চাঁদ দেখেছে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে রোযা ভাঙ্গার আদেশ দেন এবং পরের দিন ঈদে যাওয়ার।'

(এ হাদীস থেকে জানা গেল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শহরের বাইরের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। এ কারণে একথা বলা ভুল যে, 'কাছাকাছি এলাকাগুলোতেও অন্য এলাকার সাক্ষ্য অনুসরণীয় নয়।'' আর যেমনটি ইতিপূর্বে আরজ করা হয়েছে যে, বাস্তবে এমন সিদ্ধান্ত কোনো ইমামের নেই। এ তো শুধু কোনো কোনো কিতাবের আলোচনার শুধু শব্দগত ব্যাপকতা থেকে ধারণা হয়। আর কিছু নয়।)

সুবকী রাহ. বলেন, নিকট ও দূরের পার্থক্যের জন্য সফরের দূরত্বের মাপকাঠি বানানোও দুর্বল সিদ্ধান্ত। তবুও এটিও একটি শরয়ী মাপকাঠি। নিকট ও দূরের পার্থক্যের জন্য সারাখসী শাফেয়ী উল্লেখিত মাপকাঠিটি উত্তম। *(২)*

[বিগত মার্চ সংখ্যায় ইমাম নববী রাহ.-এর আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাবের বরাতে উল্লেখিত হয়েছে।]

ইকলীম আলাদা হলে দূরের-'এটিও দুর্বল সিদ্ধান্ত (এ সিদ্ধান্ত আবুল হাসান আলমাওয়ারদী (মৃত্যু : ৪৫০ হি.) আলহাভীতে (খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮০) কোনো কোনো শাফেয়ী ফকীহের বরাতে উল্লেখ করেছেন।)

সামনে ইমাম সুবকী রাহ. বলেন-

وإلزام جميع البلاد إذا رؤي في بلد ضعيف جدا، لأن عمر بن الخطاب وسائر الخلفاء الراشدين لم ينقل أنهم كانوا إذا رأوا الهلال يكتبون إلى الآفاق، ولو كان لازما لهم لكتبوا إليهم لعنايتهم بأمور الدين، ولأنا نقطع بأنه قد يرى في بعض البلاد في وقت لا يمكن رؤيته في بلد آخر، كما نقطع بأن الشمس تغرب في مكان قبل أن تغرب في غيره، وكذا الطلوع والزوال والفجر وغياب الشفق، وما من حركة تتحركها الشمس إلا وهي فجر عند قوم وزوال عند قوم وغروب عند قوم وليل عند قوم.

وأجمع العلماء في أوقات الصلوات على أن المعتبر عند كل قوم فجرهم وزوالهم وغروبهم ولا يلزمهم حكم غيرهم، فكذلك الهلالُ بالقياس عليه، وبأن الله ما يخاطب قوما إلا بما يعرفونه مما هو عندهم.

এখানে ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী রাহ. বলেছেন, কোনো এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য একে লাযিম ও অনুসরণীয় সাব্যস্ত করার মতটি খুবই দুর্বল। প্রথমত এ কারণে যে, ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. ও অন্যান্য খুলাফায়ে রাশেদীনের কারো থেকেই বর্ণিত হয়নি যে, তারা চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর সে সংবাদ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দিগন্তের অধিবাসীদের লিখে পাঠাতেন। এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য সব অঞ্চলের জন্য লাযিম ও জরুরি হলে খুলাফায়ে রাশেদীন অবশ্যই তাদের লিখে পাঠাতেন। কারণ দ্বীনী বিষয়ে তাঁদের মাঝে যত্ন ও গুরুত্ব ছিল। (আলআলামুল মানশূর, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫)

এরপর সুবকী রাহ. আরো দুটি দলীল উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর উদ্ধৃত বক্তব্যে আছে।

৩. খুলাফায়ে রাশেদীন ও সালাফে সালেহীনের যে তাআমুল ও কর্ম ধারার দিকে তকীউদ্দীন সুবকী রাহ. দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন হাকীমের আয়াত فمن شهد منكم الشهر فليصمه এবং হাদীস صوموا لرؤيته -এর স্বাভাবিক ও সরল অর্থে দূরবর্তী

শহর-নগরের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সওম ফরয হওয়ার বিধান শামিলই নয়। এ কারণে এ মুতাওয়ারাছ মর্ম ও উপলব্ধিকে নাকচ করে দিয়ে শুধু ঐ সকল নসের শব্দগত ব্যাপকতার ফায়েদা গ্রহণ করা এবং এ দাবি করা যে, ঐ সকল নসের একমাত্র অর্থ, যে কোনো স্থানে চাঁদ দেখা গেলেই 'মাসের উপস্থিতি' প্রমাণিত হবে এবং যেকোনো অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলেই সওম ফরয হবে, এটা খুবই আপত্তিকর। *(৩)*

৪. এ থেকে আরো জানা গেল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের চাঁদ দেখা লাযিম না হওয়ার কারণ, তা লাযিম বা অবশ্য অনুসরণীয় হওয়ার কোনো শরয়ী দলীল না থাকা; সেজন্য মূল মাসআলাই হলো এমন যে, প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবে। অন্য অঞ্চলের চাঁদ দেখা তাদের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় হবে না। এ ধারণা ঠিক নয় যে, মূলত তা লাযিম বা অবশ্য-অনুসরণীয় ছিল, কিন্তু খাইরুল কুরূনে যেহেতু দূর-দূরান্তের শহর-নগরের সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল না তাই তারা ওজরের কারণে এ বিধান পালন করতে পারেননি। বিষয়টি এমন হলে তো তাঁরা নিজ নিজ যুগে তাদের সামর্থ্যের আওতা পর্যন্ত ব্যবস্থা নিতেন। অথচ এর সামান্য ব্যবস্থাও তাঁরা নিয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতেই এর উপর সংক্ষিপ্ত কথা হয়েছে। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. তাঁর পুস্তিকা 'রুয়াতে হিলালে' এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৫. আরো জানা গেল যে, কোনো কোনো ফকীহের ইবারতে দূর-দূরান্তের শহর-নগরের চাঁদ দেখা অবশ্য-অনুসরণীয় না হওয়ার বিষয়ে এই যে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকে তার অবগতি অনুসারে কর্মভার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে অঞ্চলের চাঁদ দেখা তার অবগতির বাইরে তার ভিত্তিতে তার উপর কর্তব্য অর্পিত হয় কীভাবে'?-এ কথাটি উপরোক্ত বিধানের ইল্লত বা কারণ নয়; বরং একটি 'হিকমত' বা যৌক্তিকতা বর্ণনার একটি দিক, যা মূলত ঐ যুগের অবস্থা হিসেবে বলা হয়েছে। এখন যদি যৌক্তিকতার ঐ দিকটি না

থাকে তাহলে সে কারণে বিধানই বদলে যেতে পারে না। কারণ হিকমতের পরিবর্তনে হুকুমের পরিবর্তন হয় না। এটি একটি স্বীকৃত ও সর্ববাদীসম্মত নীতি। তলাবায়ে কেরাম এর বিস্তারিত বর্ণনা উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উছমানী দামাত বারাকাতুহুমের অতিসাম্প্রতিক রচনা-''উসূলুল ইফতা''য় (পৃষ্ঠা : ২৪০-২৪৫) পাঠ করতে পারেন।

এ কারণে যারা এ হিকমতকে মাসআলার বুনিয়াদ বানিয়ে বলেন, 'এখন অবস্থা বদলে গেছে, এখন পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে চাঁদের খবর সংগ্রহ করা এবং তা প্রমাণিত হওয়ার ইলম হাসিল করা খুবই সহজ, এসব এখন প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। সুতরাং এ যুগে ঐ বিধান বলবৎ থাকবে না; এখন দূর-দূরান্তের শহর-নগরের চাঁদ দেখাও অবশ্য-অনুসরণীয় হবে।'

যারা এ কথা বলেন তারা মূলত হুকুমের একটি হিকমতকে হুকুমের ভিত্তি মনে করছেন, যা ভুল। এ হুকুমের ভিত্তি এই হিকমত নয় বরং এর ভিত্তি হচ্ছে শরীয়তের দলীল। আর এতে একটি নয়, বহু হিকমত থাকতে পারে। সুতরাং একটি হিকমত বাহ্যত বর্তমান যুগের উপযোগী মনে হচ্ছে না বলে মেনে নিলেও বিধানের ক্ষেত্রে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না।

৬. আমি স্বীকার করি যে, এ মাসআলা ইজতিহাদী। এ কারণে যে ফকীহগণ দূর-দূরান্তের চাঁদ দেখা অবশ্য-অনুসরণীয় বলেন তাঁদের কাছেও অন্তত এটুকু দলীল থাকবে, যার দ্বারা তাঁদের সিদ্ধান্তও ইজতিহাদের আওতায় থাকার দাবি রাখে, কিন্তু যেমনটা আমি ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আরজ করেছি যে, এই মাযহাব থেকে, যার প্রসিদ্ধ শিরোনাম لا عبرة لاختلاف المطالع (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়), আমাদের এ যুগের 'গবেষক'দের ফায়দা নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ এ মাযহাব যদি দলীলের দিক থেকে অগ্রগণ্যও হয় তবুও তা এদের দাবি ও কর্মের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ তাঁদের কর্ম ও দাবি নিম্নরূপ :

ক. সারা বিশ্বে একই দিন সওম শুরু করা ও একই দিনে ঈদ করা ফরয।

খ. এর জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের (উলামা ও উমারা) সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। কোথাও রোযা বা ঈদের খবর টেলিভিশনে দেখা গেল বা রেডিওতে শোনা হল বা ফোনে জানা গেল; ব্যস সে অনুযায়ী আমল করা ফরয।

গ. নিজ দেশের উলামা, উমারা ও সাধারণ জনগণের বিরোধিতা হলেও তা ফরয। নতুবা মাখলুকের আনুগত্য করে খালিকের অবাধ্যতার শিকার হতে হবে, যা হারাম।

ঘ. যারা এ ফরয বিধান তরক করেন তাদেরকে শুরু রমযানে এক দুই রোযা ত্যাগের কারণে কাফফারা হিসেবে ষাটটি করে রোযা রাখতে হবে। আর ফরয তরকের গুনাহ তো আলাদা আছেই। আর রমযান শেষে ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। তারা এ হারামে লিপ্ত।

তাদের অধিকাংশের দাবি এ-ও যে,

ঙ. রোযা ও ঈদের ঐক্যের জন্য সৌদিয়ার চাঁদ দেখাকে ভিত্তি বানানো জরুরি।

বলাবাহুল্য, এ সকল দাবি ও কর্মের কোনোটিই উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাব দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না। এ কারণে এ সকল গবেষকের এই মাযহাবের বরাত দেওয়া সম্পূর্ণ প্রতারণা। সামনে এটিই বিস্তারিত আলোচনায় আসছে।

অনেক বেশি দূরের হলে হুকুম ইজমায়ী

যে ইমামগণ বলেছেন, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় তাদের কথার এ অর্থ করা যে, ভূপৃষ্ঠের কোনো প্রান্তেও যদি চাঁদ প্রমাণিত হয় তাহলে তা সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয়

হবে, চাই এ চাঁদ অনুসারে সহজে আমল করা যাক বা না যাক। এ ব্যাখ্যা যেমন অযৌক্তিক তেমনি ইজমারও বিরোধী। কারো বক্তব্যকে এত ব্যাপক অর্থে নেওয়া, যা স্বয়ং বক্তার চিন্তাতেও আসেনি ব্যাখ্যা ও মর্ম-গ্রহণ নীতির বিরোধী। আল্লামা বানূরী রাহ. ''মাআরিফুস সুনান'' কিতাবে (খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৩৮-৩৪০, ৩৫২) এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এ মূলনীতির জন্য আরো দেখুন : বাওয়াদিরুন নাওয়াদির পৃষ্ঠা : ৬; বয়ানুল কুরআন ৪/৬২; মাবাদিউ ইলমিল হাদীস ওয়া উসূলুহু, পৃষ্ঠা : ১৯৪

এদিকে ইমাম ইবনে আবদিল বার, আল্লামা ইবনে রুশদ, ফকীহ ইবনে জুযাই-এর মতো বড় বড় ফকীহ ইজমা নকল করেছেন যে, অনেক বেশি দূরের হলে, যেমন খোরাসান ও আন্দালুস বা হিজায ও আন্দালুস, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য সর্বসম্মতভাবে লাযিম তথা অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। পাঠকবৃন্দ তাঁদের ইবারত/উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে পাঠ করেছেন।

মুহাদ্দিস আবুল হাসান ইবনুল কাত্তানও (৬২৮ হি.) ইজমায়ী মাসাইলের উপর লিখিত তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব - الاقناع في مسائل الإجماع (খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯২)-এ ইজমার উল্লেখ করেছেন এবং মুহাদ্দিস আবুল আববাস কুরতুবীও 'শরহু সহীহি মুসলিম' কিতাবে এ বিষয়ে ইবনু আবদিল বার-এর সমর্থন করেছেন। পিছনে পাঠকবৃন্দ তাদের ইবারত পাঠ করেছেন।

এই বড় বড় ফকীহ যে বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন সেখানে কোনো লেখকের ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এ বক্তব্য-'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়' এমন ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা, যার দ্বারা তা ইজমা-বিরোধী হয়ে যায়, নিঃসন্দেহে আপত্তিকর।

ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা সামনে আসছে। এ মুহূর্তে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাব এত ব্যাপক নয় যতটা

এ গবেষকগণ মনে করছেন। আর না এত ব্যাপকতার সাথে বাস্তবে এর উপর আমল করা সম্ভব। সামনে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা হবে।

এ মাযহাবের ব্যক্তিবর্গ সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করাকে ফরয বলেননি

দ্বিতীয় কথা এই যে, যে ইমামগণ বলেছেন, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় তাঁরা যদিও বলেছেন যে, দূর-দূরান্তের শহর থেকেও যদি 'তরীকে মুজিবে'র মাধ্যমে সাক্ষ্য সংগৃহীত হয় তখন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের তা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করা জরুরি। কিন্তু তাঁদের কেউ এ কথা বলেননি যে, পৃথিবীর দিগ-দিগন্ত থেকে চাঁদের সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করে সেগুলো পরীক্ষা করা এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করা ফরয।

তাঁদের কেউই একথা বলেননি আর না দলীলের ভিত্তিতে কেউ তা বলতে পারেন। শুধু তা-ই নয় তাঁদের একাধিক ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এমন পদক্ষেপ নেওয়া কক্ষনো জরুরি নয়।

হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ.-এর বক্তব্য

যেমন আমাদের এ গবেষকবৃন্দ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (১২৮২ হি.-১৩৬২ হি.) কে খুব বেশি উদ্ধৃত করে বলেন, তিনিও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার কথা বলেছেন। উদ্ধৃতিতে ''বেহেশতী গওহর''-এর ইবারত নকল করা হয়। অথচ হাকীমুল উম্মত রাহ. নিজেই বলেছেন-''এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্যান্য জায়গায় এমনভাবে প্রচার করা, যাতে বাড়াবাড়ির ও অতিশয়তা এবং ভুল-ত্রুটি ও জটিলতা থাকে, যার কারণে আকছার অস্থিরতা ও বিরোধিতা বেড়ে যায়-আমি এর বিরোধী।

(কামালাতে আশরাফিয়্যা, সংকলনে মাওলানা ঈসা ইলাহ আবাদী,

খলীফায়ে মুজায হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. পৃষ্ঠা : ৭২, মালফুয ২৭৬)

শুধু এ-ই নয়, বরং হযরত থানভী রাহ. এ মাসআলা আরো স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : ''যে শহরে মেঘ বা ধুলোবালির কারণে বা আকাশ পরিষ্কার থাকার ক্ষেত্রে ২৯ শাবান বা রমযানে চাঁদ দেখা যায়নি সে শহরের অধিবাসীদের উপর কি এ বিধান আছে যে, চেষ্টা করে অন্যান্য শহর থেকে সংবাদ সংগ্রহ করবে?

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. এ প্রশ্নের জবাবে লেখেন-

যেহেতু দলীল ছাড়া কোনো বিধান সাব্যস্ত হয় না আর প্রশ্নোক্ত কাজ ওয়াজিব হওয়ার কোনো দলীল নেই তাই তা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্নের অবশিষ্ট অংশ :

যদি বিধান থাকে তাহলে কোন সূত্রে খবর সংগ্রহ করলে তা নির্ভরযোগ্য হবে। আর যখন নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদ অন্যান্য শহরে এসে যাবে তখন ঐ শহরের কাযী বা মুফতীর তা মানা জরুরি কি না। কাযি যদি না মানেন এবং আমল না করেন তাহলে গোনাহগার হবেন কি না?

হযরত থানভী রাহ.-এর জবাব

তা করার বিধান তো নেই। তবে যদি অন্য জায়গা থেকে খবর এসে যায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত, 'তরীকে মুজিবে'র দ্বারা পৌঁছা। আর তরীকে মুজিব এই, এক. চাঁদ দেখার সাক্ষ্য, দুই. চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের সাক্ষ্য তিন. শাসকের ফয়সালার সাক্ষ্য, চার. ইস্তিফাযা (চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে সংবাদ আসা) যা শাসকের ফয়সালার মতো।

এ সকল সূত্রে সংবাদ এলে সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। আর বলাইবাহুল্য, ওয়াজিব তরক করা গুনাহ, কিন্তু যদি কারো ইজতিহাদে তা 'তরীকে মুজিব' না হয় তবে সে মাযূর ...। (যাওয়ালুস সিনাহ আন আমালিস সানাহ, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ., পৃষ্ঠা : ২৬; ইমদাদুল ফাতাওয়া খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২৯-১৩০)

থানভী রাহ. উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে ধর্তব্য নয় মনে করেন; বরং তিনি এ কওলকেই ফতোয়ায়ে শামীর অনুসরণে ফিকহে হানাফীর 'মুফতাবিহী' কওল মনে করেন। এ সত্ত্বেও তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, অন্য জায়গা থেকে খবর ও শাহাদত সংগ্রহ করা ওয়াজিব নয়। আর না তা লোকদের কর্তব্য। কথা শুধু এ-ই নয় যে, তা ওয়াজিব হওয়ার দলীল নেই; বরং তা ওয়াজিব না হওয়ার দলীল আছে।

আর হযরত থানভী রাহ. এই যে লিখেছেন, 'যখন ঐ সকল সূত্র থেকে সংবাদ আসবে তখন এর উপর আমল ওয়াজিব হবে' এখানে নিকট ও দূরের শহর-নগরের পার্থক্য এজন্য করেননি যে, হযরত রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন, কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ এখানে নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্যের প্রবক্তা। তো তাদের কাছে দূর-দূরান্তের শহর-নগর থেকে তরীকে মুজিবের সূত্রে শাহাদত এসে গেলেও এর উপর আমল ওয়াজিব হবে না এবং আমল না করা গুনাহও হবে না।

যাহোক, আমি শুধু দেখাতে চাচ্ছিলাম, উদয়স্থলের বিভিন্নতা অগ্রাহ্য করার অর্থ এই নয় যে, ঐ ফকীহগণের কাছে দূরের উদয়স্থল থেকে শাহাদত সংগ্রহ করাও জরুরি। তা হযরত থানভী রাহ.-এর বক্তব্যে পরিষ্কার ভাষায় পাওয়া গেল। আর এ শুধু একা হযরত থানভী রাহ.-এর কথা নয়, উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্যকারী যে কোনো ফকীহকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ জবাবই দেবেন; বরং আমাদের জানামতে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্যকারী বা অগ্রাহ্যকারী কোনো ইমাম বা ফকীহ পাওয়া যাবে না, যিনি দূরের শহর-নগর থেকে বা অন্যান্য

দেশ থেকে চাঁদের খবর সংগ্রহ করাকে ফরয বলেছেন।

আরো দু-একটি উদ্ধৃতি দেখে নিলে মন্দ হয় না :

আমাদের দেশে যারা একই দিনে সওম-ঈদ উদযাপন ফরয বলেন তারা দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির ও 'ফতোয়া দারুল উলূম দেওবন্দে'র খুব বরাত দিয়ে থাকেন। অথচ সকল আকাবিরে দেওবন্দ এ বিষয়ে একমত যে, সওম ও ঈদের ঐক্য ফরয-ওয়াজিব হওয়া তো দূরের কথা, সুন্নত-মুস্তাহাবও নয় এবং একাধিক আকাবিরে দেওবন্দ তো দূরের শহর-নগরে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্যই মনে করেন। তবে ''ফতোয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ''-এ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়ে একাধিক ফতোয়া আছে। একেই ঐ ভাইয়েরা তাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ যেমনটা বারবার বলা হয়েছে, শুধু উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করার ভিত্তিতে ঈদ ও সওমের ঐক্য প্রমাণের চেষ্টা সঠিক নয়।

হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের দ্বিতীয় সাড়ির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর বক্তব্য এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. জন্মভূমি, ছাত্রজীবন ও শিক্ষকতা-জীবন সব দিক থেকেই দেওবন্দী ছিলেন। ১৩৪৯ হি. থেকে ১৩৬২ হি. পর্যন্ত তো দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুফতী ছিলেন। এরপর পাকিস্তানে উলামায়ে দেওবন্দের মুখপাত্র ও মুফতী আযম পাকিস্তান হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অবিসংবাদিত। তাঁর পুস্তিকা 'রুয়াতে হেলাল' ছাপা আছে এবং এর বাংলা অনুবাদও হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট আলোচনা পাঠ করলে আলোচিত বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

মুফতী নেযামুদ্দীন আযমী রাহ. (১৩২৮ হি. -১৪২০ হি.) ১৩৮৫ হিজরী থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুফতী

ছিলেন। তাঁর ফতোয়াসমূহের এক সংকলন ''মুনতাখাবাতে নেযামুল ফাতাওয়া'' আরেকটি ''ফাতাওয়ায়ে নেযামিয়্যাহ'' এবং তৃতীয়টি ''নেযামুল ফাতাওয়া'' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এ মাসআলায় মুফতী নেযামুদ্দীন রাহ.-এর কাছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য। তিনি এর সমর্থনে ''মুনতাখাবাত'' (খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৫) ও ''নেযামিয়্যা'য় (খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৫) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ সত্ত্বেও তিনি লেখেন,

'মূল বিধান এই যে, প্রত্যেক জনপদের লোকদের কর্তব্য, ২৯ শাবান সন্ধ্যায় নিজ জনপদের হিসাবে বসতির আশেপাশে চাঁদ খুঁজবে এবং চাঁদ দেখলে সাক্ষ্য দেওয়ার স্থানে গিয়ে সাক্ষী দেবে। দায়িত্বশীলরা শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ঘোষণা করবে। আর অন্যরা এ ঘোষণা অনুসারে আমল করবে ...

এবং الدين يسر (দ্বীন সহজ) ও الدين الفطرة (দ্বীন স্বাভাবিক)-এর দাবি অনুসারে না (তারা) দূর-দূরান্তের শহর-নগরে চাঁদ খুঁজতে যেতেন আর না (সেখান থেকে) খবর আসার চিন্তা করতেন; বরং আশেপাশে চাঁদ দেখা গেলে বা আশপাশ থেকে চাঁদের খবর শরয়ী শাহাদতের ভিত্তিতে পাওয়া গেলে সে অনুযায়ী রোযা রাখতেন বা রাখতেন না। আর এটাই হচ্ছে এ শরয়ী নীতির মর্ম-

لأهل كل بلد رؤيتهم

প্রত্যেক জনপদের অধিবাসীদের জন্য তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। হাঁ, যদি কোনো প্রয়াস-প্রচেষ্টা ছাড়া 'তরীকে মুজিব'-এর সূত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা লেহাজ ছাড়া খবর পাওয়া যেত তাহলে গ্রহণ করতেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করতেন। এটুকুই।

(ফাতাওয়া নেযামিয়্যাহ খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৯, ১৭২, নেযামী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ১৪১৫ হি.)

তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, চাঁদের ঐক্য শরীয়তের কাম্য নয়

এবং এর পাবন্দীও প্রশংসার বিষয় নয়; বরং তা শরীয়তের ইচ্ছা-বিরোধী। তিনি আরো বলেছেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁর পুস্তিকা ''তাওহীদুল আহিল্লা'য় বিস্তারিত লিখেছেন। (দ্র. ''মুনতাখাবাতে নেযামুল ফাতাওয়া'', খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২২)

মুফতী নেযামুদ্দীন রাহ.-এর পরে দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুফতী হয়েছেন হযরত মাওলানা মুফতী হাবীবুর রহমান খাইরাবাদী। তিনি ১৪২৮ হিজরীতে আমার এক ইসতিফতার জবাবে শুরুতেই বলেন-

''রুয়তে হেলালের বিষয়ে শরীয়তে স্পষ্ট ও সোজা বিধান-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين

অর্থাৎ চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু কর এবং চাঁদ দেখেই রোযা শেষ কর। অর্থাৎ ঈদ কর। এখন যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে মাস ত্রিশ দিন পুরা কর।

''এ হাদীসের উপর আমল করা হলে কোনো বিশৃঙ্খলা হবে না। শরীয়ত আমাদের উপর এদিক সেদিক খোঁজ করার দায়িত্ব আরোপ করেনি এবং সকল মুসলমানকে একই দিন ঈদ করারও বিধান দেয়নি। আমরা টেলিফোন, ইন্টারনেট, টিভি-রেডিও ব্যবহার করে এদিক সেদিকের চাঁদের খবর অনুসন্ধান করতে শুরু করি বা একই দিন ঈদ পালনের রাজনৈতিক চিন্তা নিজেদের বিষয়ে কায়েম করে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়ি।''

এ ফতোয়ার উপর মুফতী ছাহেবের দস্তখতের সাথে তারিখ দেওয়া আছে ১৯ রবীউল আওয়াল ১৪২৮ হি. এবং এর উপর মুফতী মাহমূদ হাসান বুলন্দশহরী ও মুফতী মুহাম্মাদ যফীরুদ্দীন (যিনি ফতোয়া দারুল উলূমে'র সংকলক ও টীকাকার) এর সমর্থনমূলক স্বাক্ষর আছে।

এ বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের অতি সাম্প্রতিক ফতোয়াও ইনশাআল্লাহ্ পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করা হবে।

যাহোক, এ ধারা অনেক লম্বা। যদি ভারত উপমহাদেশের সকল দেশের বড় বড় উলামায়ে দেওবন্দ ও তাঁদের ফতোয়া-সংকলন থেকে এ ধরনের উদ্ধৃতি পেশ করতে থাকি তাহলে প্রবন্ধ আরো দীর্ঘ হয়ে পড়বে। এ কারণে আপাতত এ কয়েকটি বরাত উল্লেখ করেই প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

বর্তমান আলোচনায় উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্যকারী ফকীহগণের বক্তব্য তুলে ধরার যদিও প্রয়োজন নেই তবুও প্রাসঙ্গিক হিসেবে একজন ফকীহের বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে।

উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্যকারী একজন ফকীহ্ ইমাম ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী শাফেয়ী রাহ. (৯৭৫ হি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে,

'যদি কোনো শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, অমুক শহরে চাঁদ দেখা গেছে, কিন্তু সংবাদটি যথাযথ পন্থায় না পৌঁছায় তাহলে কি এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হবে ঐ শহর থেকে খবরের সত্যতা যাচাই করা, যাতে বিষয়টির যথার্থতা প্রমাণিত হলে সে অনুযায়ী করণীয় সম্পন্ন করা যায় কিংবা যেহেতু যথার্থ উপায়ে খবর আসেনি তাই সেটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কতর্ব্য নির্ধারণ করবে, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি লেখেন-

الظاهر أن ولي الأمر لا يلزمه في الصورة المذكورة إرسال من يحقق الخبر، أخذا من قولهم أن تحصيل سبب الوجوب لا يجب ...، فلا يجب الإرسال هنا جزما لأنه ليس سببا محققا للوجوب، سواء أقربت المسافة أم بعدت، نعم لو قيل يندب له ذلك لم يكن بعيدا، لأن فيه احتياطا للصوم، وهو إذا لم يجب يكون مندوبا ... .

এ জবাবের সারকথা এই যে, প্রশ্নোক্ত চাঁদের ফয়সালাকারী দায়িত্বশীলদের অন্যান্য শহরের চাঁদের খবর যাচাই করা জরুরি নয়।

বেশি থেকে বেশি এ বলা যেতে পারে যে, যাচাই করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ যাচাই করার পর যদি তা নির্ভরযোগ্য মনে হয় এবং উভয় শহর অভিন্ন উদয়স্থলের বলে জানা যায় তাহলে সে খবর অনুযায়ী আমল করবে।

(আলফাতাওয়াল ফিকহিয়্যাহ, ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০-৬১, মুআসসাসাতুত তারীখিল আরাবী, বৈরুত)

এ কারণে প্রথমেই বলেছি, যে ফকীহগণ দূরের শহর-নগরেও এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় বলেন তাদের উদ্দেশ্য এই যে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কাছে খবর এসে গেলে এবং সূত্রটি 'তরীকে মুজিব' হওয়ার বিষয়ে তারা আশ্বস্ত হলে সে অনুযায়ী ফয়সালা করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। তাদের উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, দায়িত্বশীলদের দূর-দূরান্তের শহর-নগর থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ যাচাই এবং সন্দেহযুক্ত পন্থায় পৌঁছা সংবাদ যাচাই করা ফরয। এ কথা যদি ঐ ফকীহগণ বলতেন তাহলে সওম ও ঈদের ঐক্য ফরয দাবিকারীগণ ঐ মতামতকে নিজেদের প্রমাণ হিসেবে পেশ করার কিছু সুযোগ পেতেন।

তারা যখন সুস্পষ্টভাবে তা জরুরি না হওয়ার ফতোয়া দিচ্ছেন তখন সওম ও ঈদের ঐক্য ফরয হওয়ার উপর তাদের সিদ্ধান্তকে কীভাবে প্রমাণ হিসেবে আনা যায়?

উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার তাঁদের এ ফতোয়া থেকে তো খুব বেশি হলে এটুকু প্রমাণ হয় যে, সওম ও ঈদের ঐক্যের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা বাধা নয়। এখন অন্য কোনো বাধা না থাকলে তাদের দৃষ্টিতে এ কাজ (যদি যথাযথ পন্থায় হয় এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে হয়) খুব বেশি হলে মোবাহ হবে। এরপর দেখতে হবে, কোনো মোবাহ কাজের উপর বাধ্য করা বৈধ কি না এবং একে বৈশ্বিক রূপ দেওয়ার শরয়ী বিধান কী। এর প্রত্যাশিত সুফল কী এবং কুফলগুলো কী কী?

আফসোস! এ সকল বিষয়ে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করার পরিবর্তে উল্টো এক মতভেদপূর্ণ মোবাহ কাজকে ফরয মনে করা হয়েছে এবং এর উপর আমলও করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দায়িশীলদের প্রতি বিদ্রোহ করে এবং শরীয়তসম্মত পন্থা ছাড়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে।

টিকা :

টীকা : ১

এরপর ইবনুল হুমাম রাহ. ইবনে আববাস রা.-এর হাদীসের এক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর আগে জাসসাস ও ইবনে কুদামা প্রমুখও উল্লেখ করেছেন এবং শেষ কথা এ বলেছেন যে, 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' অনুযায়ী আমল করাই অধিক সতর্কতাপূর্ণ।

টীকা : ২

وعبارة السبكي : واعتبار كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم جيد.

টীকা : ৩

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته এর সরল স্বাভাবিক অর্থে এ কথা শামিল হয় না যে, ভূপৃষ্ঠের যে কোনো জায়গায় চাঁদ দেখা গেলেই তোমাদের উপর রোযা ফরয হবে, তেমনি ভূপৃষ্ঠের যে কোনো জায়গায় চাঁদ দেখা গেলেই তোমাদের রোযা ছেড়ে ঈদ করা ফরয হবে।

এ হাদীসের স্বাভাবিক অর্থে এ কথা না আসা বিভিন্ন কারণে আমার কাছে স্পষ্ট ও নির্ধারিত বিশেষ বলে মনে হয়। নীচের বিষয়গুলিতে একটু চিন্তা করুন :

ক. প্রত্যেক 'নসে'র স্বাভাবিক অর্থ তা-ই যা ঐ সব মানুষের উপলব্ধিতে স্বাভাবিকভাবে এসেছে যারা এ নস সরাসরি আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন এবং তাঁর সামনে এ নস মোতাবেক আমল করেছেন।

খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের তাআমুল ও কর্মধারা প্রমাণ করে, তাঁরা এ নসের এ অর্থই বুঝেছেন যে, প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবে। এ কারণে কখনোও তারা অন্যান্য অঞ্চলের চাঁদের অনুসন্ধান সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ নেননি।

খ. হাদীসের শেষ বাক্য

فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

(চাঁদ তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকলে মাসকে ত্রিশ দিনের গণ্য করবে) এটিও এক বড় আলামত যে, হাদীসের প্রথম দুই বাক্যে প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করতে বলা হয়েছে; কারণ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সারা বিশ্বে একসাথে মেঘ কুয়াশা, বা ধুলোবালির কারণে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হওয়া এক রকম অসম্ভবই বলা যায়। সুতরাং যদি হাদীসের প্রথমাংশের অর্থ এ-ই হত যে, কোনো জায়গায় চাঁদ দেখা গেলেই তোমাদের উপর রোযা ফরয হবে তাহলে হাদীসের শেষ অংশ এমন হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, 'চাঁদ যদি অদৃশ্য থাকে তাহলে অন্যান্য অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেছে কিনা অনুসন্ধান কর কিংবা অন্তত কোনো জায়গা থেকে কোনো খবর আসে কিনা অপেক্ষা কর।' অথচ হাদীসে এমনটা বলা হয়নি; বরং মেঘ বা ধুলোবালির কারণে চাঁদ দেখা না গেলে মাসকে ত্রিশ দিনের গণ্য করতে বলা হয়েছে।

গ. যদি হাদীসের স্বাভাবিক অর্থ এই হত যে, 'কোথাও চাঁদ দেখা গেলেই রোযা রাখবে' তাহলে সতর্কতার দাবি হত, ৩০ শাবানের রাতে (২৯ শাবান দিবাগত রাতে) আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও যদি নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না যায় তাহলেও সতর্কতামূলকভাবে তারাবীহ পড়ে নেওয়া হবে, সাহরী খেয়ে নেওয়া হবে এবং

সতর্কতামূলকভাবে ত্রিশ শাবানের রোযা রাখা হবে। অথচ না এ সালাফের কর্মধারা ছিল, না তা ফিকহে ইসলামীর হুকুম; বরং মাসআলা এই যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার আগে তারাবীও পড়া হবে না এবং সাহরীও খাওয়া হবে না এবং সন্দেহের ভিত্তিতে ত্রিশ শাবানের রোযাও রাখা হবে না।

একইভাবে أفطروا لرؤيته -এর স্বাভাবিক অর্থ যদি এ হত যে, যেখানেই চাঁদ দেখা যাক তোমরা রোযা ত্যাগ করবে এবং ঈদ করবে তাহলে তো বিধান এ হওয়া দরকার ছিল যে, ২৯ রমযানের রাতে নিজ এলাকায় চাঁদ না দেখা গেলে ঐ রাতে তারাবী পড়বে না। কারণ হতে পারে কোনো জায়গা থেকে চাঁদের প্রমাণ এসে যাবে। তেমনি ত্রিশ রমযানের রোযার নিয়ত শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে, যাতে শাওয়ালের চাঁদ প্রমাণিত হলে শুধু শুধু রোযা ভাঙতে না হয়। অথচ এমন করা না সালাফের কর্মধারা ছিল, আর না এ ফিকহে ইসলামীর হুকুম। মাসআলা এই যে, নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না গেলে অপেক্ষায় থাকবে না। তারাবীর সময় হয়ে গেলে তারাবী পড়বে, সাহরীর সময় হয়ে গেলে সাহরী কর এবং রোযা রাখবে। কারণ এ মাস তোমাদের জন্য ত্রিশ দিনের।

মোটকথা, উপরোক্ত হাদীসে চাঁদ দেখাকে ব্যাপক অর্থে নেওয়া নিছক একটি শব্দগত সম্ভাবনা, এটি হাদীসের স্বাভাবিক অর্থ কখনো নয়। এ কারণেই সালাফের চিন্তায় এ অর্থ আসেনি এবং এ কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেছিলেন-

لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

৬. এখন প্রশ্ন এই যে, তাহলে এ মাসআলা (দূর-দূরান্তের চাঁদ দেখা অবশ্য অনুসরণীয় হওয়া না হওয়া) ইজতিহাদী কীভাবে থাকল? এর জবাব এই যে, এ হাদীসের স্বাভাবিক অর্থ তো সেটাই যা উপরে বলা হয়েছে এবং সে অর্থ অনুসারেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায়, খুলাফায়ে রাশেদীন ও খাইরুল কুরূনের

যুগে আমল জারি ছিল। কিন্তু এরই সাথে কিছু হাদীস ও আছার দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত যে, লোকেরা এ হাদীসের উপর আমল করে শাবান মাসকে ত্রিশ দিনের গণ্য করেছেন, রোযা রাখা থেকে বিরত থেকেছেন কিন্তু দিনের বেলায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য যখন এসেছে তখন তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট দিন পানাহার থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে। একইভাবে লোকেরা এ হাদীসের উপর আমল করে রমযানের ত্রিশ তারিখে রোযা অবস্থায় ছিলেন, হঠাৎ নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য এসেছে এবং তা গ্রহণ করে রোযা ভাংগার আদেশ করা হয়েছে।

সাক্ষ্য কবুল করার এ হাদীসগুলোর প্রেক্ষাপট এই যে, নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে সাক্ষ্য এসেছিল এবং তা গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন দূর দূরান্তের সাক্ষ্যের বিষয়টি অস্পষ্ট। হতে পারে, ঐ যুগে যদি এর কোনো সম্ভাবনা থাকত এবং দূর থেকে সাক্ষ্য আসত, তাহলে তা গ্রহণ করা হত। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, গ্রহণ করা হত না, তবে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর ঐ হাদীসে, যাতে শামবাসীদের চাঁদ দেখার ইতিবার করা হয়নি, এটাই প্রমাণিত হয় যে, দূর-দূরান্তের সাক্ষ্য জানার ব্যবস্থা হলেও তা কবুল করা হত না। যাইহোক, যেহেতু দূর-দূরান্তের সাক্ষ্যের বিষয়টি স্পষ্ট মারফু হাদীসে আসেনি তাই এ বিষয়ে ফকীহগণ ইজতিহাদ করেছেন এবং তাতে মতভিন্নতা হয়েছে। তো এই ইজতিহাদ ও মতভেদ অন্য এলাকার চাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীস ও তার মর্মের সাথে সম্পৃক্ত, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته -এর সাথে নয়। এ হাদীসের স্বাভাবিক অর্থ সেটিই যা সালাফের তাআমুল ও কর্মধারার দ্বারা প্রমাণিত।

والله تعالى أعلم بالصواب

দ্রষ্টব্য : তলাবায়ে কেরাম, হাদীসের কিতাবসমূহের দরসদানে নিয়োজিত এবং ফিকহ-ফতোয়ার খেদমতে মশগুল উলামায়ে কেরামের খেদমতে দরখাস্ত এই যে, এ টীকায় উল্লেখিত আলোচনায় বান্দার কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে তা জানিয়ে শোকরগোযারির

সুযোগ দান করবেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

মে-২০১৪, রজব ১৪৩৫

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন-১০

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চাঁদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার কাজ?

ঐ বন্ধুরা চিন্তা করেননি যে, চাঁদের সিদ্ধান্ত কে বাস্তবায়ন করবেন। রোযা ও ঈদের ঘোষণা কি নাগরিকসাধারণের কাজ, না রাষ্ট্র-প্রধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য?

সুন্নতে নববী, হাদীস ও আছার এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসের উপর যাদের দৃষ্টি আছে, উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এবং উম্মাহর মুজতাহিদ ও ফকীহগণের ফতোয়াসমূহের বিষয়ে অবগতি আছে তারা জানেন, শরীয়ত রোযা ও ঈদকে ব্যক্তিগত ইবাদতের মতো ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেয়নি; শরীয়ত একে সম্মিলিত ইবাদত সাব্যস্ত করেছে এবং এর ব্যবস্থার ভার অর্পণ করেছে রাষ্ট্র-প্রধান ও তার নায়েবগণের উপর। আর জনসাধারণকে আদেশ করেছে তাদের

আনুগত্যের। এ এক ইজমায়ী (সর্বসম্মত) মাসআলা, যাতে নির্ভরযোগ্য কোনো ফিকহী মাযহাবের ভিন্নমত নেই। নবী-যুগ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারায় এ নীতি অনুসৃত।

এ প্রসঙ্গে হাদীস-আছার ও ফিকহের কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি সহকারে বিশদ আলোচনা করা যায়, কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রবন্ধটি দীর্ঘ হয়ে পড়েছে; তাছাড়া প্রসঙ্গটিও আলাদা প্রবন্ধের দাবি রাখে তাই সংক্ষেপনের স্বার্থে শুধু কটি মৌলিক বিষয়ের দিকে ইশারা করছি :

১. হাদীসের যে কোনো কিতাব থেকে রমযান, শাওয়াল ও যুলহিজ্জাহর চাঁদ সংক্রান্ত হাদীস ও আছারগুলো পাঠ করুন এবং ফিকহ-ফতোয়ার যে কোনো কিতাবে সওম ও ঈদের মাসায়েল অধ্যয়ন করুন, তাহলে আপনার কাছে এ বাস্তবতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

২. হাদীসে দেখুন, যারা চাঁদ দেখেছেন তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আর তিনি সাক্ষ্য কবুল করে সওম ও ঈদের ফয়সালা করছেন এবং ঘোষক দ্বারা ঘোষণা করাচ্ছেন। একই অবস্থা ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও।

৩. তারীখ ও সীরাতের কিতাবসমূহ পাঠ করুন, দেখবেন, একই অবস্থা পরের আমীর ও খলীফাদের আমলেও ব্যাপকভাবে জারি। কেন্দ্রে এ ফয়সালা করছেন স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন, অন্যান্য অঞ্চলে সে জায়গার গভর্ণর বা তার আদেশে প্রত্যেক শহরের কাযী (বিচারপতি)।

৪. ফিকহে ইসলামীর যে কোনো গ্রন্থে 'কিতাবুস সওম' অংশটি পাঠ করলে দেখবেন, চাঁদ সংক্রান্ত সকল মাসআলা এ মৌলনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত যে, চাঁদের প্রসঙ্গ কাযীর উপর ন্যস্ত। তার কাছেই

সাক্ষ্য উপস্থাপিত হবে এবং তিনিই তা যাচাই করবেন ও ফয়সালা করবেন।

৫. সাহাবা-তাবেয়ীনের আছার ও চার মাযহাবের ফিকহের কিতাবসমূহে এ মাসআলা আলোচিত হয়েছে যে, এক বা একাধিক ব্যক্তি রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। কিন্তু ইমাম (রাষ্ট্র-প্রধান বা তার নিয়োগকৃত কাযী বা দায়িত্বশীল) কোনো কারণে তার সাক্ষ্য কবুল না করায় ত্রিশ শাবান ধরে সাধারণ জনগণ রোযা থেকে বিরত থাকল, এক্ষেত্রে এ ব্যক্তির করণীয় কী? তেমনি এ মাসআলাও এসেছে যে, দুই ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল, কিন্তু ইমাম কোনো কারণে সাক্ষ্য রদ করল তো এরা কি অন্যদের সাথে ত্রিশ রোযা রাখবে, না নিজে নিজে ঈদ করবে?

এ বিষয়ক সকল রেওয়ায়েত ও সকল ফিকহী ইবারত পাঠ করুন, কোনো কোনো ফকীহর এটুকু কথা তো আপনি পাবেন যে, এ ব্যক্তি চুপে চুপে নিজের রোযা রাখবে, কিন্তু সে অন্যদেরও রোযা রাখার আদেশ করবে-এ অনুমতি কেউ দেননি। তেমনি ঈদের চাঁদের মাসআলাতেও অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, তাকে ত্রিশতম রোযা রাখতে হবে। রোযা না রাখারও অনুমতি নেই, ঈদ করারও অনুমতি নেই। আবার কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, সেদিন সে রোযা রাখবে না তবে তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে। ঈদ তো অবশ্যই করবে অন্য সবার সাথে, একা একদমই নয়।

৬. এ সকল মাসাইল দ্বারা একদিকে যেমন পরিষ্কার হয় যে, রমযান ও ঈদের চাঁদের ফয়সালার অধিকার রাষ্ট্র-প্রধানের বা তার পক্ষ হতে নির্ধারিত ব্যক্তি বা মজলিসের, সাক্ষ্য তাদের কাছেই পেশ করা হবে এবং তারাই তা যাচাইয়ের পর শরীয়তের বিধান অনুসারে ফয়সালা জারি করবেন, তেমনি এ সকল মাসাইল থেকে এ-ও প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের অন্যদের থেকে আলাদা হওয়ার অনুমতি নেই, এমনকি তারও না যে নিজ ধারণায় চাঁদ দেখেছে ও তার সাক্ষ্যও দিয়েছে।

৭. ফিকহ ও ফতোয়ার গ্রন্থাদিতে এ মাসআলাও আলোচিত হয়েছে যে, অমুসলিম দেশগুলোতে অবস্থানকারী মুসলিমগণ রোযা ও ঈদ কীভাবে করবেন, যেখানে না আছেন মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধান, না কোনো মুসলিম কাযী। তেমনি গ্রামের লোকেরা কী করবেন, যেখানে কোনো কাযী থাকে না। ফিকহ-ফতোয়ার সমকালীন গ্রন্থাবলিতে এ মাসআলাও এসেছে যে, কোনো মুসলিম দেশে সরকারী হেলাল কমিটি আছে, কিন্তু চাঁদের ফয়সালার ক্ষেত্রে তারা শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণ করে না; বরং ফিকহে ইসলামীর ইজমায়ী ও সর্বসম্মত বিধানও লঙ্ঘন করে ফেলে, এক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের করণীয় কী।

ফিকহের এ সকল মাসআলাও প্রমাণ করে, চাঁদের ফয়সালার প্রকৃত হকদার হচ্ছেন রাষ্ট্র-প্রধান বা তার পক্ষ হতে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ। এতে সাধারণ মানুষের না অনুপ্রবেশের হক আছে, না সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার।

হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা যদি তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে- একেবারেই পালন না করে বা খোলাখুলিভাবে শরীয়তের নীতি ও বিধান লঙ্ঘন করতে থাকে তখন আলিমদের অবশ্য-কর্তব্য, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আর সাধারণ মানুষের কর্তব্য, আলিমদের ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা। তবে এক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলার অনুমতি নেই।১

চাঁদের ফয়সালা, রোযা ও ঈদের ঘোষণা রাষ্ট্র-প্রধান বা তার পক্ষ হতে নিয়োজিত ব্যক্তি বা কমিটির কাজ, এ সর্বসম্মত ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত ও অনুসৃত মূলনীতি উপলব্ধি করার পর খুব সহজেই বুঝে আসবে যে, কেউ যদি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাব অনুসরণ করতে চান তাহলে সে মাযহাবের প্রবক্তাদের কাছেও এর পদ্ধতি এই নয় যে, স্বদেশবাসীদের থেকে আলাদা হয়ে কিছু লোক নিজেদের রোযা শুরু করবেন বা ঈদ করবেন। কেউ এমন করলে তা ভুল হবে। সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, ঐ মাযহাব অনুসরণের

জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীলদের (উলামা ও উমারা) উদ্বুদ্ধ করা। তারা তা মেনে নিয়ে সে অনুসারে ফয়সালা করলে অধীনস্ত সকলের সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত দায়িত্বশীলগণ এ ফয়সালা না করেন সে পর্যন্ত তাদের কর্তব্য, দায়িত্বশীলদের অনুগত থেকে দেশবাসীর সাথে রোযা শুরু করা।

এ ফতোয়া শুধু ঐ আলিমদের নয়, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্য করেন; বরং এ ফতোয়া তাঁদেরও, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করেন। এমনকি সমকালীন ঐসব আলিমেরও, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করার মাযহাব থেকেও অগ্রসর হয়ে সরাসরি রোযা ও ঈদে ঐক্যের আহবান করেন।

মুনাসিব মনে হচ্ছে, তাঁদের কয়েকজনের ফতোয়া এখানে উল্লেখ করি। আল্লাহ করুন, আমাদের ঐ বন্ধুদেরও সঠিক কথা বুঝে এসে যায়। তবে এর আগে হাদীস ও আছার থেকে আকাবিরে উম্মতের এ সর্বসম্মত ফতোয়ার দু-একটি সূত্র নমুনাস্বরূপ পেশ করা হচ্ছে :

১. তাবেয়ী ইমাম মাসরূক রাহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি ও তার সাথী আরাফার দিন আয়েশা রা.-এর নিকটে গেলেন (ঐ দিনটি এমন ছিল, যা 'ইয়াওমুন নাহর' হওয়ারও সন্দেহ ছিল) আয়েশা রা. খাদেমাকে বললেন, তাদেরকে সুমিষ্ট করে ছাতুর শরবত পান করাও। আমি যদি রোযাদার না হতাম তাহলে আমিও পান করতাম। মাসরূক ও তার সঙ্গী বললেন, 'আপনি রোযা রেখেছেন! আজ যদি কোরবানীর দিন হয়ে থাকে?!' (মাসরূক এ কথাও বলেছিলেন, যে, আমি তো শুধু এই ভেবে রোযা রাখিনি যে, যদি আজ কোরবানীর দিন হয়?') উম্মুল মুমিনীন বললেন-

إنما النحر إذا نحر الإمام وعُظْمُ الناس، والفطرُ إذا أفطر الإمام وعُظْمُ الناس.

অর্থাৎ কোরবানী তো তখন যখন ইমাম (মুসলমানদের রাষ্ট্র-প্রধান) ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোরবানী করে এবং ইফতার (রোযা না-রাখা)

তো তখন যখন ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইফতার করে।

অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে আছে-

إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة الناس.

অর্থাৎ কোরবানীর দিন তো সেটি যেদিন ইমাম ও জনগণ কোরবানী করে।

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে-

إنما يوم النحر يوم ينحر الناس، ويوم الفطر يوم يفطر الناس

অর্থাৎ কোরবানীর দিন তো সেটি যেদিন লোকেরা কোরবানী করে এবং ফিতরের (ঈতুল ফিতরের) দিন তো সেটি যেদিন লোকেরা রোযা ছাড়ে।

(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/১৫৭, হাদীস : ৭৩১০; মাসাইলু আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ-আহকামুল ইখতিলাফ ফী রুয়াতি হিলালি যিলহিজ্জাহ, ইবনে রজব পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫; কিতাবুল আছার, ইমাম আবু হানীফা, রেওয়ায়েত ইমাম আবু ইউসুফ পৃষ্ঠা : ১৭৯, হাদীস : ৮১৮; আসসুনানুল কুবরা বাইহাকী ৪/২৫২)

ইমাম ইবনে রজব রাহ. লেখেন-

فهذا الأثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها، إسناده في غاية الصحة، ولا يعرف لعائشة مخالف من الصحابة.

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রা. থেকে এ বাণী প্রমাণিত। এর সনদ সর্বোচ্চ মানের সহীহ সনদ এবং এ সিদ্ধান্তে তাঁর সাথে কোনো সাহাবীর দ্বিমত পাওয়া যায় না। (আহকামুল ইখতিলাফ, ইবনে রজব পৃষ্ঠা : ৩৬)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর এ বাণী তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না; এ তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীরই প্রতিধ্বনি। সামনের হাদীসটি দেখুন :

২. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تُفْطِرُون، والأضحى يوم تُضَحُّون.

অর্থাৎ, সিয়াম হল যেদিন তোমরা রোযা রাখ; 'ফিতর' হল যেদিন তোমরা রোযা ছাড়। আর কোরবানী হল যেদিন তোমরা কোরবানী কর। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৭০৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩২৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৬০; আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৪/২৫১-২৫২)

ইমাম তিরমিযী রাহ. এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন, কিন্তু এর একাধিক সনদ আছে, যার সম্মিলনে তা 'সহীহ' হওয়া প্রমাণিত হয়। (আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব, নববী ৭/৪৪৫; আল আলামুল মানশূর, তকীউদ্দীন সুবকী পৃষ্ঠা : ১৮; ফয়যুল কাদীর, মুনাভী ৪/৪৪১; আততালীকুল মুগনী আলা সুনানিদ দারাকুতনী ২/২২৪; ইরওয়াউল গালীল ৪/১১)

ইবনুল মুনকাদির এর বর্ণনায় আছে, আয়েশা রা. নিজেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ নকল করেছেন-

عرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام

আরাফা হল যেদিন ইমাম আরাফায় উকুফ করে, কোরবানী হল যেদিন ইমাম কোরবানী করে, আর ফিতর হল যেদিন ইমাম রোযা ছাড়ে। (আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৫/১৭৫, باب خطأ الناس يوم عرفة)

রমযান ও ঈদ প্রমাণ হওয়ার বিষয়ে এ হাদীস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে

বেশ কিছু মৌলিক মাসআলার দলীল রয়েছে। আমি শুধু দুটি মাসআলা উল্লেখ করছি :

ক. রোযা, ঈদুল ফিতর, কোরবানী ও হজ্ব-এসব ইবাদতের সময় সম্পর্কে ফয়সালা করার অধিকার ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নয়, এ ফয়সালা করবেন ইমাম (রাষ্ট্র-প্রধান) বা তাঁর নায়েব। যেদিন শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে ইমাম ও জনগণ রোযা শুরু করবে সেদিনই পয়লা রমযান। যেদিন তারা রোযা ছাড়বে সেদিন ঈদ। যেদিন আরাফায় উকুফ করবে তা হজ্বের দিন আর যেদিন কোরবানী করবে তা কোরবানীর দিন। এ সকল বিষয়ে তাদের থেকে আলাদা হওয়ার অধিকার কারো নেই।

ইমাম তিরমিযীর ভাষায়-

وفسر بعض أهل العلم هذا الحديثَ، فقال : إنما معنى هذا : الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس.

এবং আবুল হাসান সিন্ধীর শব্দে-

الظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة.

(হাশিয়াতু সুনানি ইবনে মাজাহ, আবুল হাসান সিন্ধী খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৬, দারুল মারিফাহ, বৈরুত)

খ. দায়িত্বশীলরা যখন শরীয়তের বিধান অনুসারে এসকল ইবাদতের মাসের চাঁদ সম্পর্কে ফয়সালা করবে তো সেটা যদি বাস্তবসম্মত না-ও হয়, যা আমাদের অজানা, তো এ কারণে আল্লাহর কাছে কোনো জবাবদিহী হবে না। আল্লাহ তাআলা ইবাদত কবুল করবেন।

ইমাম তকীউদ্দীন সুবকীর ভাষায়-

وهذا معناه ـ والله أعلم ـ إذا اجتمع الناس على ذلك فلا يكلفون بما عسى أن يكون في نفس الأمر ولم يعلموا به.العلم المنشور ص ١٨

আরো জানার জন্য দেখুন : মাআলিমুস সুনান, ইমাম আবু সুলায়মান খাত্তাবী (৩৮৮ হি.) ২/৮২; শরহুস সুন্নাহ, ইমাম বগভী ৬/২৪৭-২৪৯; তাহযীবু সুনানি আবু দাউদ, ইবনুল কাইয়্যিম ৩/২১৩-২১৪; নায়লুল আওতার, শাওকানী ৩/৩৮১; কিতাবুল ঈদাইন; মাআরিফুস সুনান, ইউসুফ বানূরী ৫/৩৫৬-৩৫৭

এ ভূমিকার পর এবার আকাবির আলিমগণের ফতোয়া লক্ষ্য করুন। তাঁদের মধ্যে যারা উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রাহ্য করেন এবং যারা গ্রাহ্য করেন না, আর কিছু আলিম যারা আরো অগ্রসর হয়ে ঈদ ও সিয়ামের ঐক্যের বিষয়ে উৎসাহ দান করেন তাদের সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কারো জন্য নিজ দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও মুসলিম জনগণ থেকে আলাদা হয়ে রোযা ও ঈদ করা জায়েয নয়।

চাঁদের বিষয়ে স্বদেশবাসী থেকে আলাদা হওয়া জায়েয নয়

১. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ.

এ শিরোনামে সবার আগে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. (১৩৩২-১৪২০ হি.)-এর নাম উল্লেখ করছি। কারণ তিনি শুধু উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্যই করেন না, সকল মুসলিম দেশে একই দিনে রোযা ও ঈদেরও তাকীদ করেন। তিনি সাইয়েদ সাবেক মিসরী রাহ. (১৩৩৩-১৪২৫ হি.)-এর কিতাব 'ফিকহুল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ'-এর উপর একটি পর্যালোচনা-গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম, ''তামামুল মিন্নাহ ফিত তালীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ''। এতে তিনি সাইয়েদ সাবিক রাহ.-এর উপর এ আপত্তি করেছেন যে, তিনি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতকে অগ্রগণ্য করেননি। শায়খ আলবানী রাহ.-এর বক্তব্য এই যে, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته শীর্ষক হাদীসটি একদম 'আম' (ব্যাপক)। যে কোনো অঞ্চলের চাঁদ দেখার

ইলম যে কোনো জায়গায় পৌঁছবে সেখানের অধিবাসীদের উপর এ হুকুম আরোপিত হবে। এতে দূরত্ব বা ইকলীমের কোনো পার্থক্য নেই।

শায়খ আলবানী আরো বলেন-

وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى.

وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها، وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية، منذ بضع سنين. والله المستعان.

অর্থ : আর এ তো (অর্থাৎ দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার ইলম হাসিল হওয়া) এ যুগে একেবারেই সহজ, কিন্তু এর জন্য ইসলামী দেশগুলোর মনোযোগ দরকার, যাতে-আল্লাহ করুন- তা বাস্তবায়ন করা যায়।

কিন্তু যে পর্যন্ত সকল ইসলামী দেশ এ বিষয়ে একমত না হবে, আমার সিদ্ধান্ত, সকল দেশের অধিবাসী নিজ দেশের জনগণের সাথেই রোযা রাখবে। এমন যেন না হয় যে, তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, কেউ স্বদেশবাসীর সাথে রোযা রাখল আর কেউ অন্য দেশের সাথে। সে দেশে রোযা-ঈদ আগে হোক বা পরে। কারণ এমনটা হলে মতভেদের গন্ডি আরো প্রশস্ত হবে, যেমনটা কয়েক বছর যাবৎ আরব দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে। বাস, শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়।

(তামামুল মিন্নাহ ফিততালীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ ৩৯৮, দারুর রায়াহ, রিয়ায ১৪২৬ হি., মোতাবেক ২০০৫ ঈ., পঞ্চম সংস্করণ)

শায়খ আলবানী রাহ. এ বিষয়ে ‘‘সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা

ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা''তেও আলোচনা করেছেন। এ কিতাবে ২২৪ নম্বরে ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, যার আলোচনা এখনি হয়েছে-

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

শায়খ প্রথমে এ হাদীসের বরাতসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদের উপর আলোচনা করেছেন, যার সারকথা, এ হাদীস তাঁর দৃষ্টিতে 'হুজ্জত' (দলিল হওয়ার যোগ্য)। এরপর এ হাদীসের মর্ম ও নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, এ হাদীসের সহজ অর্থ তা-ই যা আবুল হাসান সিন্ধী রাহ. ''সুনানে ইবনে মাজাহ''র টীকায় উল্লেখ করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, সওম, ফিতর (ঈদুল ফিতর) ও আযহা (কোরবানী)র মতো সম্মিলিত ইবাদতসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির হাতে নয়; বরং 'ইমাম' ও 'আলজামাআ' (রাষ্ট্র-প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠে)র হাতে। ব্যক্তির কর্তব্য, তাদের অনুগত থাকা।

শায়খ বলেন, মাসরূকের প্রশ্নের উত্তরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. যে এ হাদীস পেশ করেছেন তা থেকেও এ অর্থের সমর্থন হয়। আর এ অর্থই শরীয়তের শান উপযোগী। শরীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদ উম্মাহর ঐক্য অটুট রাখা, তাদের ছত্রভঙ্গ হতে না দেওয়া এবং যত ব্যক্তিগত মতামত তাদের ঐক্যে ফাটল ধরায় তা থেকে তাদের দূরে রাখা।

এ কারণে কারো ব্যক্তিগত মত, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হলেও, সম্মিলিত ইবাদতের ক্ষেত্রে, যেমন রোযা, ঈদ ও জামাতের নামায, শরীয়ত গ্রাহ্য করে না।

সামনে শায়খ সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থার উদ্ধৃতি দিয়ে হুঁশিয়ার করেছেন যে, এ হাদীস থেকে ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা থেকে ঐ সকল লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা শাখাগত বিষয়ে

মতভেদের কারণে কোনো ইমামের পিছনে ইকতিদা করা থেকে বিরত থাকে এবং যারা জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবে পারদর্শিতার দাবি করে নিজ মুসলিম ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে রোযা ও ঈদ করে। তারা চিন্তা-ভাবনা করলে এ আলোচনায় আছে তাদের অজ্ঞতা ও অহঙ্কার-ব্যধির উপশম।

শায়খ আলবানীর ভাষায়-

وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث ...، وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يُفرِّق جمعَهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد، ولو كان صوابا من وجهة نظره، في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة ...

فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم ...، وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ممن يصوم وحده ويفطر وحده، متقدما أو متأخرا على جماعة المسلمين، معتدا برأيه وعلمه، غير مبال بالخروج عنهم.

فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور، فيكونون صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين، فإن يد الله على الجماعة.

(সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ১/১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস : ২২৪)

''সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা''য় (হাদীস নং : ২৬২৪-এর অধীনে) শায়খ আলবানী রাহ. দ্বিতীয়বার এ মাসআলা আলোচনা করেছেন এবং ''তামামুল মিন্নাহ''-এর আলোচনার মতো পরিষ্কার বলেছেন, সকল মুসলিম দেশের পক্ষ হতে সম্মিলিত ব্যবস্থা হওয়ার আগে আমরা প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের নিজেদের ঐক্য অটুট রাখাকে জরুরি মনে করি। কিছু লোক স্বদেশবাসীর সাথে আর কিছু অন্য দেশের অধিবাসীদের সাথে-এভাবে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়াকে আমরা জায়েয মনে করি না।

শায়খ আলবানীর এ দুই আলোচনা শায়খ হুসাইন আলআওযাইশাও

তাঁর কিতাব ‘‘আলমওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলমুইয়াসসারা ফী ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতিল মুতাহহারা’’য় (৩/২০৮-২১৩) নকল করে সমর্থন করেছেন।

২. ড. ইউসুফ কারযাভী (হাফিযাহুল্লাহু ওয়া রাআহু)

ড. কারযাভীও ঈদ ও সিয়ামে ঐক্যের সমর্থনকারীদের অন্যতম। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁর ফতোয়া-সংকলনে পরিষ্কার লিখেছেন, রোযা ও ঈদে মুসলমানদের এক হওয়া কাম্য। এ বিষয়ে নিরাশ হওয়া উচিত নয়, তবে যে বিষয়ে জোর দেওয়া ওয়াজিব এবং যে বিষয়ে কখনোই ত্রুটি হওয়া উচিত নয় তা এই যে, আমরা যদি বৈশ্বিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম না হই তবে অন্তত আঞ্চলিক ঐক্য অটুট রাখা তো ওয়াজিব।

তাই একই শহরের বা একই দেশের লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হবে-কেউ পয়লা রমযান বলে রোযা রাখবে আর কেউ ত্রিশ শাবান বলে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। তেমনি মাসের শেষে কেউ ত্রিশ রমযান বলে রোযা রাখবে আর কেউ পয়লা শাওয়াল বলে ঈদ করবে-এ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ ইজমায়ী ও সর্বসম্মত বিধান এই যে, হাকিমের ফয়সালা বা দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্ত মতভেদপূর্ণ মাসআলায় মতভেদের সমাপ্তি ঘটায়।

এ কারণে কোনো মুসলিম দেশে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান যদি রোযা ও ঈদের ফয়সালা করে তাহলে সে দেশের মুসলমানদের তা মান্য করা অপরিহার্য। কারণ এ ‘তআত ফিল মারূফ’ (ন্যায়ের ক্ষেত্রে আনুগত্যের) মধ্যে পড়ে (যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয)। যদিও তার সিদ্ধান্ত অন্য দেশের সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়। কারণ হাকিমের ফয়সালা এখানে ঐ মাযহাবকেই নির্ধারিত/অগ্রগণ্য করেছে, যাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক জনপদে নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসরণীয়। হাদীস শরীফে প্রমাণিত-

صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون.

ড. কারযাভীর আরবী ইবারতের এক অংশ দেখুন-

ولكن الذي يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال، هو : أننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد.

(ফাতাওয়া মুআসিরা, ড. ইউসুফ কারযাভী ২/২২২-২২৪)

৩. শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায (১৩৩০-১৪২০ হি.)

শায়খ ইবনে বাযের কয়েকটি ফতোয়া আমরা বিগত সংখ্যাগুলোতে পাঠ করেছি। এখানে আরো একটি ফতোয়া উদ্ধৃত করছি। তাঁর কাছে পাকিস্তান থেকে প্রশ্ন এসেছিল যে, পাকিস্তানে রমযান ও শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায় সৌদিয়ার পরে, কখনো দুই দিন পরে। এখন প্রশ্ন এই যে, আমরা কি সৌদিয়ার সাথে রোযা শুরু করব, না পাকিস্তানবাসীর সাথে।

প্রশ্নকারী পাকিস্তানে বসবাস করলেও পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন না। সম্ভবত সৌদী ছিলেন। শায়খ ইবনে বায যে উত্তর দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم، لأمرين : أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وسلم : الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون وإفطاركم معهم حين يفطرون، لأنكم داخلون في هذا الخطاب.

ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع، وقد ذهب جمع من أهل العلم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم.

الأمر الثاني : أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف، ولهذا قال تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن : بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا.

শায়খ এ প্রজ্ঞাপূর্ণ ইলমী ফতোয়ায় ঐ প্রশ্নকারীদের বলেছেন, তোমাদের বিষয়ে পবিত্র শরীয়তের বিধান আমাদের এ-ই মনে হচ্ছে যে, যাদের সাথে তোমাদের অবস্থান তাদের সাথেই তোমাদের রোযা রাখা জরুরি। এটা দুই কারণে : এক. ঐ হাদীসের ইরশাদ, যাতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

এ কারণে তুমি ও তোমার সাথীরা যে পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকবে তোমাদের রোযা ও ঈদ তাদের সাথেই হওয়া চাই। কারণ তোমরা এ হাদীসের সম্বোধনে শামিল।

দ্বিতীয় কারণ, তোমরা যেখানে আছ, রোযা ও ঈদে যদি ঐখানের মুসলমানদের বিরোধিতা কর তাহলে বিশৃঙ্খলা হবে। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পথ খুলবে। ঝগড়া-বিবাদ হবে, অথচ শরীয়তের আদেশ নিজেদের একতা ও সম্প্রীতি রক্ষা করা এবং নেকী ও খোদাভীরুতার পথে পরস্পর সহযোগী হওয়া।

(এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.সহ আহলে ইলমের এক জামাত যখন প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা চাঁদ দেখার প্রবক্তা তখন পাকিস্তানের অধিবাসীরা যদি নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসরণ করে তাহলে এটিও নেকীর কাজ। এতে তাদের সহযোগিতা করা জরুরি। ওখানে অবস্থান করে তাদের বিরোধিতা করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ তোমাদের নেই।)

(মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুম মুতানাউইয়াহ, শায়খ ইবনে বায ১৫/১০৩-১০৪, তৃতীয় প্রকাশ ১৪২৮ হি.)

একই নির্দেশনা শায়খ ইবনে বায অন্যান্য ফতোয়াতেও দান করেছেন যা তার ঐ কিতাবে দেখা যেতে পারে। (১৫/১০০-১০২)

৪. ড. হুসামুদ্দীন ইবনে মূসা

জামেয়াতুল কুদস ফিলিস্তীনের ''কুল্লিয়াতুদ দাওয়াহ''-এর প্রফেসর ড. হুসামুদ্দীন ইবনে মূসার ''ইয়াসআলূনাকা আন রমযান'' কিতাবে এ বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন আছে। জবাবে তিনি একটি কথাই বলেছেন, যদিও আমি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাককেই অগ্রগণ্য মনে করি এবং আমারও ইচ্ছা, সকল মুসলিম একই চাঁদ দেখার উপর ঐক্যবদ্ধ হোক, কিন্তু এ বাস্তবতা উপেক্ষা করাও সঠিক নয় যে, উদয়স্থলসমূহের ঐক্য সাধনের মাসলাক এখনো পর্যন্ত একটি নীতিমাত্র, যা নবী-যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত কখনো বাস্তবতার মুখ দেখেনি।

এজন্য আমি বলি-

يجب على أهل كل بلد من بلدان المسلمين أن يصوموا في يوم واحد، وأن يكون عيدهم في يوم واحد، فنحن أهل فلسطين علينا أن نصوم جميعا في يوم واحد وأن يكون عيدنا واحدا، لأن في هذا الأمر محافظة على وحدتنا الجزئية إلى أن تتحقق وحدة العالم الإسلامي الكلية، فلا يقبل أن يختلف أهل البلدة الواحدة أو المدينة الواحدة أو القرية الواحدة، فبعضهم صائم وبعضهم يصلي العيد.

وضابط هذا الأمر هو الالتزام بما يصدر عن أهل العلم في ذلك البلد، وهم القضاة في المحاكم الشرعية، وطاعتهم في ذلك طاعة في المعروف، وإن كان هذا مخالفا لرؤية أهل بلد آخر، لأن الأصل في الصوم أن يكون مع جماعة المسلمين وعامتهم، لما ثبت في الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، الأضحى يوم تضحون. رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح ...

অর্থ : প্রত্যেক মুসলিম-দেশের অধিবাসীদের অবশ্য-কর্তব্য নিজেরা একই দিন রোযা শুরু করা এবং একই দিন ঈদ করা। বৈশ্বিক ঐক্য বাস্তবায়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্তত আঞ্চলিক ঐক্য সংরক্ষণ করা জরুরি। এ কারণে একই দেশের জনগণ বা এক শহরের অধিবাসী নিজেদের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া-কেউ রোযাদার, কেউ ঈদ উদযাপনরত-মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে মূলনীতি এই যে, প্রত্যেক দেশে স্থানীয় দায়িত্বশীল আহলে ইলমের পক্ষ হতে চাঁদের বিষয়ে যে ফয়সালা প্রকাশিত হয় গোটা দেশবাসী তা অনুসরণ করবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করবে। কারণ তা ''ইতাআত ফিল মারূফ'' (ন্যায়ের ক্ষেত্রে আনুগত্য)-এর অংশ। তাদের চাঁদের ফয়সালা যদি অন্য কোনো দেশের চাঁদ দেখার বিরোধীও হয় তবুও তাদের আনুগত্য করবে এবং তাদের ফয়সালা অনুসরণ করবে।

হাদীস শরীফে আছে-

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

তিরমিযী, আবু দাউদ ও বাইহাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তা সহীহ হাদীস। এ হাদীসের দাবি তা-ই, যা উপরে বলা হয়েছে। (ইয়াসআলূনাকা আন রমাযান পৃষ্ঠা : ২৯-৩০)

ড. হুসামুদ্দীন আরো লেখেন-

وأخيرا أقول : إن على المنادين بوحدة المسلمين في الصوم أن يكفوا عن هذه الدعوى لما فيها من تفريق المسلمين في البلد الواحد، وأن يسعوا سعيا حقيقيا إلى الوحدة الحقيقية للمسلمين، لا مجرد كلام وتنظير فلسفي.

وعليهم أن يتركوا قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في دول مسلمي اليوم، وإن الذي يكفل وحدة المسلمين الحقيقية هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، وليس مجرد اتفاقهم على الصيام والعيد في يوم واحد.

অর্থ : ‘‘সবশেষে আমি বলতে চাই, রোযা ও ঈদে ঐক্যের শ্লোগান দানকারীদের এ শ্লোগান পরিহার করা কর্তব্য। কারণ এভাবে তারা একই দেশের মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছে। তাদের কর্তব্য, শুধু মৌখিক জমা-খরচের স্থলে মুসলমানদের মাঝে বাস্তব ঐক্য প্রতিষ্ঠার কার্যকর প্রয়াস গ্রহণ করা। তাদের কর্তব্য, প্রত্যেক দেশের চাঁদের ফয়সালা সে দেশের ফতোয়া-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের উপর (সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের উপর) ছেড়ে দেওয়া। আর যা দ্বারা সকল মুসলিমের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে তা হচ্ছে, সকলে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক আমলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। শুধু একদিন একসাথে রোযা ও ঈদে সম্মত হওয়া প্রকৃত ঐক্য নয়। (ইয়াসআলূনাকা আন রামাযান পৃষ্ঠা : ৩৫)

ড. হুসামুদ্দীন এ কিতাবে আরো লেখেন-

إن الصوم والفطر ليس عملا فرديا يقوم به فرد أو أفراد لوحدهم بل الصيام والعيد عبادة جماعية تتم مع الجماعة فلا يصح أن يصوم أحد رمضان لوحده، وكذلك لا يصح أن يعيد فرد لوحده، وهذا هو المفهوم المستمد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح ...

অর্থ : রমযানের রোযা ও ঈদ কোনো ব্যক্তিগত আমল নয় যে, এক বা একাধিক ব্যক্তি নিজেদের মতো করে তা পালন করবে। বরং রমযানের রোযা ও ঈদ হচ্ছে সম্মিলিত ইবাদত, যা সম্মিলিতভাবে আদায় করা হয়। এ কারণে কেউ একা নিজের মতো রোযা রাখা বা একা ঈদ করা জায়েয নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে তা গৃহীত। তিনি ইরশাদ করেছেন-

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

(প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা : ৩৯)

৫. ড. শায়খ আবদুল মুহসিন আলআববাদ আলবদর

মসজিদে নববীর ইমাম ও মুদাররিস এবং জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার প্রফেসর শায়খ আবদুল মুহসিন আলআববাদ ''সুনানে আবু দাউদ''-এর ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন, মনে তো হয় যে, সকল মুসলিমের একসাথে রোযা শুরু করাই ভালো, কিন্তু যখন তা হচ্ছে না তখন প্রত্যেক দেশের অধিবাসী নিজেদের আলিমগণের ফতোয়ার উপর আমল করবে, তাঁরা অন্য কোনো দেশের চাঁদ দেখা অনুসরণ করুন বা নিজের দেশের চাঁদ দেখা। এটাই সঠিক পন্থা।

(শরহে সুনানে আবু দাউদ, শায়খ আবদুল মুহসিন আলআববাদ, দরস নং : ২৬৮ باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة يلة)

৬. শায়খ আবু আবদিল মুয়িয ফারকূস

সালাফী আলেম ''জামেয়াতুল জাযাইর''-এ 'কুল্লিয়াতু উসূলিদ্দীন'-এর প্রফেসর শায়খ আবদুল মুয়িয মুহাম্মাদ আলী ফারকূস তার ''ফিকহু আহাদীসিস সিয়াম'' সিরিজের তৃতীয় কিতাব ''হাদীসুল আমরি বিস সওমি ওয়াল ইফতার লিরুয়াতিল হিলাল''-এ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাককেই অগ্রগণ্য ও পছন্দনীয় বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কোনো শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে পৃথিবীর যত শহর ঐ শহরের সাথে রাতে বা রাতের কোনো অংশে শরিক সব জায়গায় ঐ চাঁদ দেখা অবশ্য-অনুসরণীয়। আর যে সব জায়গায় ঐ সময় দিন হয়ে গেছে সেখানে তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসরণীয়।

এরপরও তিনি পরিষ্কার লেখেন-

على أن الميزان المقاصدي يقتضي أنه إذا ثبت عند ولي المسلمين وإمامهم الأعلى أحد النظرين المجتهد فيهما، وأصدر حكما على وفقه لزم على جيمع من تحت ولايته التزام بصوم أو إفطار

لاعتقاده بأحقيته في اجتهاده . كما تقدم . ولو في خصوص بلد إسلامي، إذ الاعتبار الشرعي في العبادات الجماعية مع الجماعة وإمامهم، لقوله صلى الله عليه وسلم : الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

وعليه فلا تجوز مخالفته شرعا قولا واحدا، درءًا للنزاع ودفعا للمفسدة وإبعادا للفرقة، سواء عند من اعتبر المطالع في ثبوت الأهلة أو من نازعه في هذا الاعتبار.

অর্থ : এ সত্ত্বেও মাকাসিদে শরীয়া ভিত্তিক মানদন্ডের দাবি এই যে, যখন রাষ্ট্র-প্রধান (বা তার পক্ষ হতে চাঁদের ফয়সালার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি বা কমিটি)র কাছে ইজতিহাদী দুই মাসলাকের কোনো একটি প্রমাণিত হবে এবং তাদের পক্ষ হতে সে অনুযায়ী কোনো ফয়সালা প্রকাশিত হবে তখন সে রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী সকলের এ ফয়সালার আনুগত্য করা জরুরি।

রোযা রাখার বিষয়েও এবং রোযা ছাড়ার বিষয়েও ...। কারণ সম্মিলিত ইবাদত-বন্দেগীতে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই যে, সকলে (দেশের) সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও তাদের রাষ্ট্র-প্রধানের সাথেই থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

এ কারণে সর্বসম্মত শরয়ী নীতি এই যে, এ বিষয়ে রাষ্ট্র-প্রধানের বিরোধিতা জায়েয নয়। যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্য করেন তাঁদের কাছেও, যারা গ্রাহ্য করেন না তাদের কাছেও। (হাদীসুল আমরি বিস সিয়ামি ওয়াল ইফতারি লিরুয়াতিল হিলাল, শায়খ আবু আবদিল মুয়িয ফারকূস ৯১-৯২, মুদ্রণ : ১৪২২ হি., মোতাবেক ২০০১ ঈ.)

হুবহু এ কথাই তিনি তাঁর ''ফাতাওয়া''তেও বলেছেন। দেখুন : সিয়াম সংক্রান্ত ফতোয়াসমূহে ফতোয়া নং : ১৬২, তারিখ ২৪ শাবান ১৪১৬ হি. মোতাবেক ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৬ ঈ.

(www.ferkous.com)

আরেক ফতোয়ায় 'কেউ এক দেশে রোযা শুরু করে অন্য দেশে গেলে তার ঈদের নিয়ম কী হবে' এ প্রশ্নের উত্তরে শায়খ আবু আবদিল মুয়িয বলেন, 'যে দেশে তার/তাদের অবস্থান ওখানের রাষ্ট্র-প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের নিয়মে তারা রোযা ও ঈদ করবে। দেশে দেশের হিসাবে, প্রবাসে ওখানের হিসাবে। ... হাদীস দ্বারা এমনটাই প্রমাণিত হয় যে, সওম ও ইফতার এবং ঈদ ও কোরবানীর মতো সম্মিলিত ইবাদতে ব্যক্তির কোনো ইতিবার নেই এবং এসব ক্ষেত্রে কারো বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের সুযোগ নেই। যে দেশে তার অবস্থান ওখানকার মুসলিম জনগণ ও রাষ্ট্র-প্রধানকে ছেড়ে অন্য দেশের লোকদের অনুসরণ তার জন্য জায়েয নয়। যেখানে সে আছে সেখানের মুসলমান ও রাষ্ট্র-প্রধানের সাথে তাকে রোযা রাখতে হবে ও রোযা ছাড়তে হবে। আর এ কারণে যদি ঐ মুসাফিরের রোযা ২৯-এর কম থেকে যায় তাহলে একটি রোযা কাযা করতে হবে। আর যদি ত্রিশের বেশি হয় তবুও যে দেশে তার অবস্থান সেখানের লোকদের সাথেই ঈদ করবে। অতিরিক্ত রোযা তার জন্য নফল হবে ...।

(*ফতোয়া নং :* ৫০০, ১১ রমযান ১৪২৭ হি., মোতাবেক ৪ অক্টোবর ২০০৬ ঈ.)

ফতোয়ার আরবী পাঠের মূল অংশ নিম্নরূপ :

ومنه يفهم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرد فيها، ولا أن يتبعوا الجماعة غير الجماعة التي يتواجدون بينهم، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة التي وجد معهم صوما وإفطارا ... .

৭. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ উছাইমীন (১৩৪৭ হি .-১৪২১ হি.)

বিগত সংখ্যাগুলোতে আমরা শায়খের বিভিন্ন বক্তব্য পাঠ করেছি। বাংলাদেশে অবস্থিত সৌদী দূতাবাসের এক কর্মকর্তার পক্ষ হতে

শায়খের কাছে যে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল তাতে শায়খ বাংলাদেশে অবস্থানকারী সৌদী নাগরিকদেরও এখানের জনগণের সাথে রোযা ও ঈদ করতে বলেছেন এবং এখানের তারিখ অনুসারে আরাফার রোযা রাখতে বলেছেন।

৮. কুয়েত ফতোয়া বোর্ড

কুয়েত 'ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ'র ফতোয়া বোড,র্ যা ওখানের ফিকহ-ফতোয়ার বড় বড় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করে না। এ সত্ত্বেও তার দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, যতদিন গোটা মুসলিম বিশ্বে রোযা ও ঈদে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন প্রত্যেক মুসলিম দেশ নিজেদের (নির্ভরযোগ্য) সরকারী হেলাল কমিটির অনুসরণ করবে। আর অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম সংগঠনগুলোর ফয়সালা অনুসরণ করা হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে বোর্ড লিখেছে-

ولكن لما كان العمل في البلاد الإسلامية جاريا على الرأي الأول، وهو اختلاف المطالع، وأن لكل بلد رؤيته، فترى الهيئة العامة للفتوى بالكويت أنه ينبغي على المسلمين في أمريكا الشمالية اتباع اللجنة المشكلة من جماعة المسلمين هناك، وأنه ينبغي طاعتها في هذا الأمر وسائر ما فيها مصلحة المسلمين، لأنه تقوم بالنسبة لمسلمي أمريكا مقام الهيئات الدينية الرسمية في البلاد الإسلامية، والله أعلم.

(মাজমূআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ, কুয়েত ওযারাতুল আওকাফ ৩/৬৫-৬৬)

কুয়েত ফতোয়া বোর্ডে একবার এ মর্মে অনেক প্রশ্ন এল যে, কুয়েত হেলাল কমিটির ফয়সালা অনুসারে ১৪০৩ হিজরীর রমযানুল মুবারক শুরু হয় ১২ জুন (১৯৮৩ ঈ.)। অথচ কোনো কোনো ইসলামী দেশে সে বছর পয়লা রমযান ছিল ১১ জুন (১৯৮৩ ঈ.)। প্রশ্নকারীদের জিজ্ঞাসা ছিল, তাদের কি একদিনের (শনিবারের) রোযা কাযা করতে

হবে।

কুয়েত ফতোয়া বোর্ড জবাব দিয়েছে-

إنه بالنسبة لأهل الكويت والمقيمين فيها يجب التقيد بما قررته هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، لأنها الجهة المختصة المعينة من الدولة لهذه المهمة الشرعية.

وبناء عليه لا يلزم قضاء يوم السبت المشار إليه، لأن أول رمضان في حق أهل الكويت والمقيمين فيها هو يوم الأحد الموافق ١٩٨٣/٦/١٢ ...

অর্থাৎ কুয়েতবাসী ও কুয়েতে অবস্থানকারী প্রবাসীদের কুয়েত হেলাল কমিটির ফয়সালা অনুসরণ করা অপরিহার্য। কারণ রাষ্ট্রের পক্ষ হতে এ কমিটিই এ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের (চাঁদের সিদ্ধান্ত দেওয়ার) জন্য নির্ধারিত। তাই শনিবারের রোযা তাদের কাযা করতে হবে না। তাদের জন্য পয়লা রমযান ছিল রবিবার অর্থাৎ ১২ জুন, ১৯৮৩ ঈ.।

(মাজমূআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ ১/২৩৩-২৩৪)

৯. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উছমানী দামাত বারাকাতুহুম

হযরত মাওলানা ''রুয়াতে হেলাল'' (চাঁদ দেখা) বিষয়ে লিখিত তাঁর প্রবন্ধে, যা তাঁর আযীমুশ শান ফিকহী কিতাব ''বুহূছুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরা''র দ্বিতীয় খন্ডে মুদ্রিত, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাককে দলিলের দিক থেকে শক্তিশালী বলেছেন এবং এ-ও বলেছেন যে, এ মাসলাক অনুসারে সারা বিশ্বে চাঁদের মাসগুলোর সূচনায় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এ সত্ত্বেও হযরত মাওলানা পরিষ্কার বলেছেন, যতদিন এ বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা শরীয়তসম্মত উপায়ে না হবে ততদিন প্রত্যেক দেশের জনগণ নিজ দেশের সাথেই রোযা ও ঈদ করবেন। স্বদেশবাসী থেকে আলাদা হওয়া তাদের জন্য জায়েয নয়।

হযরতের দুরূসে বুখারীর যে সংকলন ‘‘ইনআমুল বারী’’ নামে প্রকাশিত হয়েছে এর পঞ্চম খন্ডে কিতাবুস সওমের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা রয়েছে। সহীহ বুখারীর কিতাবুস সওমের পঞ্চম বাবের দরসে সংশ্লিষ্ট মাসাইলের উপর তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ওখানে সৌদী আরবের রুয়াতে হেলাল (চাঁদ দেখার) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص یہاں (پاکستان میں) رہتے ہوئے سعودی عرب کے مطابق عمل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے سعودی عرب کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ یہاں پر سعودی عرب کے فیصلے کو ولایت حاصل نہیں، اور جس کو ولایت حاصل ہے اس نے اُس کے مطابق یہاں فیصلہ نہیں کیا، یہاں تو یہاں کی ولایت کے مطابق (عمل) ہوگا.

‘‘প্রশ্ন এই যে, কোনো ব্যক্তি কি এখানে (পাকিস্তানে) থেকে সৌদী আরবের অনুসরণ করতে পারে? জবাব এই যে, এখানে থেকে সৌদী আরবের অনুসরণ করা জায়েয নয়। কারণ এখানে সৌদী আরবের ফয়সালার ‘বিলায়াত’ (ক্ষমতা) নেই। আর যার ক্ষমতা আছে তিনি ঐ অনুযায়ী এখানে ফয়সালা করেননি এখানে তো আমল হবে এখানের ‘‘বিলায়াত’’ অনুসারে।

(ইনআমুল বারী দরসে বুখারী, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উছমানী ৫/৪৯৭)

অধম প্রবন্ধকার হযরতওয়ালার খিদমতে ২৫ জুমাদাল উখরা ১৪৩৪ হিজরীতে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম। হযরত ৮ রমযানুল মুবারক ১৪৩৪ হি. সেগুলোর জবাব লেখেন। এ পত্রে হযরতওয়ালা বলেছেন, যদি ‘‘খবরে মুস্তাফীয’’ (চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে আসা সংবাদ)-এর সূত্রে অন্য দেশে রোযা শুরু হওয়ার ইলম হয় তাহলে এর উপর আমল করা এই শর্তের সাথে যুক্ত যে, এর দ্বারা নিজ দেশের ‘‘বিলায়াত’’ (দায়িত্বশীল)-এর বিরোধিতা হবে না।’ আরো

বলেছেন, الصوم يوم تصومون ... শীর্ষক হাদীস থেকে জানা যায়, এতে সম্মিলিত রূপ থাকা চাই।

এ চিঠিতে হযরত এ কথার সমর্থন করেছেন যে, রমযানের চাঁদ ও শাওয়ালের চাঁদ দুটোই ''ইস্তিফাযায়ে খবর'' ও 'আদমে ইস্তিফাযা' (সংবাদ ব্যাপকভাবে আসা বা ব্যাপকভাবে না আসা) উভয় অবস্থায় 'বিলায়াতে'র অধীনে থাকবে।

বর্তমান প্রবন্ধ পুস্তিকা আকারে প্রকাশের সুযোগ হলে এতে হযরতওয়ালার পুরো চিঠি শামিল করার ইচ্ছা থাকল।

১০.অন্যান্য ফিকহ-ফতোয়া বিশারদ

উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্যকারী ফকীহ ও আলিমগণের ফতোয়াই যখন এই যে, রোযা ও ঈদে নিজ দেশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা বৈধ নয়, তেমনি সমসাময়িক এমন কিছু আলিমের ফতোয়াও যখন এ-ই, যারা সরাসরি রোযা ও ঈদে ঐক্যেরও উৎসাহ দেন তখন ঐ সকল আলিম ও ফকীহের ফতোয়া কী হবে, যারা দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য ধর্তব্যই মনে করেন না। বলাবাহুল্য, তাঁদের ফতোয়াও এ-ই হবে যে, কোনো দেশে বসবাসকারীর জন্য ঐ দেশের সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন জায়েয হবে না। বিগত সংখ্যাগুলোতে আমরা এ বিষয়ে যত ফিকহী উদ্ধৃতি পড়েছি সবগুলোর দাবি তা-ই। বিশেষত প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে উল্লেখিত ''আলমাজমাউল ফিকহিল ইসলামী মক্কা মুকাররমা'' এবং ''হাইআতু কিবারিল উলামা সৌদী আরব''-এর সদস্যবৃন্দের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত তো এখানে আবার উল্লেখ করা যায়। আশা করি, পাঠকবৃন্দ তা আরেকবার দেখে নিবেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত মুসলিম বিশ্বের আরো কয়েকটি ফিকহী বোর্ড ও সেমিনারে গৃহীত হয়েছে। দীর্ঘতার আশঙ্কায় সেগুলোর উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি।

আলহামদুলিল্লাহ, মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশের ফকীহবৃন্দ ও আকাবির আহলে ইলমের ফতোয়া সামনে এসেছে। কিছু বরাত ও আলোচনা পরে আসছে। আর এখানে যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে এর কয়েক গুণ বরাত-উদ্ধৃতি আছে ফিকহের কিতাবসমূহে, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে ও ফতোয়া সংকলনগুলোতে। তবে বিষয়ের উপলব্ধি ও উপদেশ গ্রহণের জন্য এটুকুও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

সারকথা এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাকের উপর নির্ভর করে আমাদের এখানের যে বন্ধুরা রোযা ও ঈদের ঐক্য ফরয বলতে চান আর এ কারণে তারা স্বদেশের উলামা, রাষ্ট্রপরিচালনাকারী দায়িত্বশীল ও সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা হয়ে রোযা ও ঈদে আগে-পরে হয়ে যান তাদের এ কর্মপন্থা গোটা মুসলিম জাহানের প্রত্যেক মাযহাবের ফকীহ ও মুফতীগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে অশুদ্ধ, ভুল। সুতরাং তাদের কর্তব্য, নিজ দেশের আলিমদের নিন্দার পরিবর্তে নিজ কর্মপন্থা সংশোধন করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কল্যাণের বিষয়ে অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক দিন এবং সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

এ প্রবন্ধ এখানেই সমাপ্ত করা যেত কারণ যে প্রেক্ষাপটে তা লেখা হয়েছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়ে গেছে। এরপরও মনে হচ্ছে, ঐ সকল প্রবন্ধ ও পুস্তিকার উপরও একটি হালকা পর্যালোচনা হয়ে গেলে ভালো হয়, যেগুলো অনেক দিন ধরে অধমের কাছে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে রাখা আছে। আগামী আলোচনার অধিকাংশই এ নিয়ে হবে ইনশাআল্লাহ।

وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

টীকা :

টীকা : ১.

قال الراقم : ولا يغرن أحدا ما وقع في البحر ورد المحتار من أن هلال رمضان لا يدخل تحت الحكم، فإن عدم دخول شيء تحت الحكم أو القضاء من حيث الاصطلاح لا يلزم منه أن لا يكون ذلك الشيء من فرائض الحاكم والقاضي، فهلال رمضان وإن كان مما لا يدخل تحت الحكم فهو وهلال شوال لا ريب في كون الحكم بثبوتهما من فرائض الولاة أو نوابهم من القضاة والحكام، وهذا أمر معلوم من التاريخ ضرورة. وتأمل كم من مسألة في البحر ورد المحتار بنيت على أن أمر الهلال، هلال رمضان كان أو هلال شوال، إلى الخليفة أو نائبه من وال أو قاض.

ولأجل تلك العبارات المبهمة والموهمة في بعض كتبنا وبعض كتب المذاهب الأخرى اشتبه الأمر على بعض المصنفين، فوقعوا في تخليط في هذا الباب، كما تراه عند بخيت المطيعي، ومحمد بن عبد الرزاق المرَّاكُشِي، وأحمد الغُماري وغيرهم، فلا تغتر بكلامهم وتذكر ما قاله العلامة السيد يوسف البنوري رحمه الله تعالى في معارف السنن ٥/٣٥٧ في باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، تحت قول الإمام الترمذي : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس.

قال البنوري رحمه الله تعالى : ومن هنا أدار الفقهاء حكم ثبوت الهلال على قضاء القاضي، ثم ما يذكر في كتب الفقه من أن القضاء لا ينفذ إلا في المعاملات ولا مدخل له في العبادات، فقال الشيخ الإمام (أنور شاه الكشميري) : ليس هذا مطردا عاما، فإنا نجد لقضاء القاضي مدخلا في العبادات، ألا ترى أن إقامة الحج والأعياد وصلاة الكسوف مفوضة إلى الإمام والحاكم، ...، وكذلك الصيام يحتاج ثبوتها إلى حكم القاضي على الشهادة أو الإخبار عند الغيم، فإن رد القاضي الشهادة لا يكون قوله حجة.

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

জুন-জুলাই ২০১৪, শাবান-রমযান ১৪৩৫

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন-১১

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিছু পুস্তিকা : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সওম ও ঈদে ঐক্য ফরয দাবি করে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। পুস্তকও কম নয়; কিন্তু অধিকাংশ প্রবন্ধ ও পুস্তিকা এমন লোকদের লেখা, যাদের যথানিয়মে ইলমে দ্বীন হাসিল করার সুযোগ হয়নি। এ সত্ত্বেও শুধু ব্যক্তিগত পড়াশোনাকে পুঁজি করে, যা কিছু কিতাবের শুধু অনুবাদ পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, একটি একান্তই দ্বীনী ও ইলমী বিষয়ে কলম ধরেছেন যা বেশ কঠিনও বটে। শুধু কলমই ধরেননি একদম বিচারকসুলভ ভঙ্গিতে ও আক্রমণাত্মক ভাষায় 'অনেক কিছু' লিখে ফেলেছেন। আল্লাহ তাদের মাফ করুন এবং তাদের সদিচ্ছা ও ভালো কাজের প্রেরণাকে সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক পন্থায় ব্যবহারের তাওফীক দান করুন। আমীন।

কিছু পুস্তিকা এমনও আছে, যেগুলোর লেখক হয়তো পদাধিকার বলেই নিজেকে এ বিষয়ে কলম ধরার যোগ্য মনে করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হল, সেগুলোতেও রয়েছে অনেক অবান্তর-অমূলক কথা। সাথে সাথে আলিমগণের প্রতি অজ্ঞতা, ভীরুতা, বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ ও সত্য গোপনের অভিযোগ। তাছাড়া একটি ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী মাসআলার এমন উপস্থাপন তারা করেছেন, যেন তা এক মানসূস আলাইহি অকাট্য ও ইজমায়ী মাসআলা!!

পুস্তিকাগুলি (বিশেষ করে যেগুলি কোনো পদাধিকার বলেও লেখা হয়নি) যদিও নীতিগতভাবে কোনো খন্ডন বা পর্যালোচনার যোগ্য নয়, তথাপি যেহেতু অনেকে এ ধরনের বইপত্রের কারণে বিভ্রান্তির শিকার হন সেজন্য একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা মুনাসিব মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা আমাদের সকলকে উপকৃত করুন। আমীন।

কিছু কথা এমন আছে, যা অধিকাংশ পুস্তিকায় এক এবং সেগুলোর কয়েকটির উপর ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। যেমন-

এক. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়াকে হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলে দাবি করা। এবং দুই. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়া আর গোটা বিশ্বে রোযা ও ঈদ একই দিনে হওয়াকে সমার্থক মনে করা। ইতিপূর্বে দলিল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, এ মাসলাক (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়া) হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' হওয়া প্রমাণিত নয়; বরং অন্য মাসলাকটিই হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বড় বড় ফকীহদের সিদ্ধান্ত। আর তা হচ্ছে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য এবং দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। তদ্রূপ একথাও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে,

উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অনিবার্য অর্থ এই নয় যে, সওম ও ঈদ এক করার প্রচেষ্টা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরি।

সুতরাং 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়'-এ মাসলাকের উল্লেখ কোথাও দেখলে এ মনে করে আনন্দিত হয়ে যাওয়া যে, এতে সিয়াম ও ঈদের বিষয়ে ঐক্য কাম্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে নিতান্তই বালখিল্যতা।

এ কথাও অনেক বিশদভাবেই বলা হয়েছে যে, 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া'র মাসলাককে বাহানা বানিয়ে নিজ দেশের ওলামা ও উমারা থেকে আলাদা হয়ে পৃথক পৃথক দিনে রোযা ও ঈদ করা বিচ্ছিন্নতার শামিল, যা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

আলোচিত পুস্তিকাগুলোর অভিন্ন বক্তব্যসমূহের অনেক কথাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। আর কিছু কথা অসার ও হাস্যকর। তবে আফসোসের বিষয় এই যে, এসব কথাকেও অনেকে বাস্তব ও ওজনদার মনে করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তাই এই অভিন্ন বক্তব্যগুলোর পর্যালোচনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে করার ইচ্ছ রাখি। আর তা হবে নিম্নের শিরোনামসমূহের অধীনে।

১. কুরাইব রাহ.-এর বর্ণিত হাদীস 'ছুবূত' ও 'দালালত' (হাদীস হিসেবে প্রমাণিত হওয়া ও তা থেকে বিধান সাব্যস্ত হওয়া) উভয় দিক থেকে নির্ভরযোগ্য দলিল।

২. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া দলিলের দাবি, বিশেষ কোনো সময় বা পরিবেশের বিধান নয়।

৩. দেশের রাজনৈতিক সীমা ও পৃথক পৃথক হেলাল কমিটি : একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী বিশ্লেষণ।

৪. সিয়াম ও ঈদে ঐক্য এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদগণ :

একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

৫. কিছু অনর্থক আপত্তি

ক) ফরয রোযা ত্যাগ করে হারাম রোযা রাখা প্রসঙ্গ

খ) এক একটি রোযার জন্য ৬০টি করে রোযার কাফফারা

গ) নাজায়েয কাজে রাষ্ট্রের আনুগত্যের অপবাদ

ঘ) আরাফা দিবসের রোযা, তাকবীরে তাশরীক, ঈদুল আযহা, শবে কদর ইত্যাদি নস্যাৎ হওয়া

৬. কিছু হাস্যকর আপত্তি

৭. সিয়াম ও ঈদ বিষয়ে ঐক্যের প্রবক্তাদের প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন

ক) ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার দলিল কী?

খ) এই ফরযের উদ্ভাবন দেড় হাজার বছর পরে কেন?

গ) কী হবে ঐক্যের ভিত্তি-সৌদি আরবের হেলাল কমিটির সিদ্ধান্ত, প্রথম চাঁদ দেখা, নাকি চান্দ্র ক্যালেন্ডার?

ঘ) ঐক্য সাধনের দায়িত্ব কে পালন করবেন?

ঙ) বাস্তবতার আলোকে ঐক্যের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভাবা হয়েছে কি?

আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে এসব বিষয়ে আলোচনা করার পর ইনশাআল্লাহ প্রবন্ধের সর্বশেষ শিরোনাম হবে-''সিয়াম ও ঈদে ঐক্য : দলিল ও বাস্তবতার আলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মতামত''

প্রবন্ধের এই শেষ অধ্যায়ের আগে এ বিষয়ে লিখিত কয়েকটি পুস্তিকা

সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন কিছু কথা আলোচনা করা

মুনাসিব মনে করছি। যেন পাঠকবৃন্দ সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, আমাদের দেশে যারা সিয়াম ও ঈদে ঐক্যের আড়ালে ওলামায়ে কেরামের প্রতি জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করছেন তারা আসলেই কি কোনো ইলমী ও দ্বীনী বিষয়ে কলম ধরার অধিকার রাখেন?

১. ফাতাওয়া-এ-ইছাহাকীয়া

সাদ্রা, হাজীগঞ্জ

অনেক আগে থেকেই শুনে আসছি যে, সাদ্রা, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুরের পীর সাহেব ও তাঁর মুরীদরা প্রতি বছর সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে ঈদ করেন এবং এ-ও শুনতাম যে, তার খানদানে এ নিয়ম অনেক পুরানো। আমাদের আশ্চর্য লাগত যে, কেন তাদের এই নিয়ম? কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামীতে চাঁদ দেখা, বা রমযান ও ঈদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য কি সৌদি আরব বা বিশেষ কোনো অঞ্চলকে মানদন্ড বানানো হয়েছে? আরো চিন্তা করতাম যে, দ্রুতগতির যোগাযোগ মাধ্যম আসার আগে সৌদিয়ার চাঁদ দেখার সংবাদই বা তাদের কাছে কোন সূত্রে পৌঁছত? 'তরীকে মুজিবে'র প্রসঙ্গ না হয় বাদই রইল।

মোটকথা, উদয়স্থলের ভিন্নতাকে ধর্তব্য বলুন বা না বলুন, উপরের নিয়মে সৌদিয়ার সাথে ঈদ করা, একটি আবেগপ্রসূত কর্মপন্থা তো হতে পারে, ইলমী কর্মপন্থা হতে পারে না।

পরে মাওলানা আবু যোফর মুহাম্মদ আবদুল হাই সাদ্রাভী অনূদিত পুস্তিকা ''চাঁদ, রোযা ও ঈদের ফতোয়া'' (ফাতাওয়া ইছাহাকীয়া)

হস্তগত হল, যা মূলত তার পিতা ও পীর মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক রাহ.-এর একটি অমুদ্রিত পুস্তিকা।

পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করে দেখা গেল, এতে ফিকহের কিছু কিতাবের উদ্ধৃতিতে ''উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়''-এই মাসলাক প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এতেও আমার আশ্চর্য কমল না। কেননা 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়' এই মাযহাবের দাবি তো এই নয় যে, সৌদি আরবের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হওয়া উচিত; বরং এর দাবি হল, সবার আগে দেখা চাঁদ ধর্তব্য হবে। তাহলে তাদের নিকট উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, অন্যান্য এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ সংগ্রহ করা ও তা যাচাই করা জরুরি তবে তো সবচেয়ে আগে দেখা চাঁদ অনুযায়ী আমল করতে হবে। আগে দেখা চাঁদের বিষয়টি যাচাই করা ছাড়াই প্রতি বছর চোখ বন্ধ করে সৌদি আরবের সাথে কেন সিয়াম ও ঈদ পালন করেন? তাও আবার নিজ দেশের ওলামা ও উমারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে? অথচ এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্যপরিত্যাজ্য। এছাড়া কোন্ 'তরীকে মুজিবে'র মাধ্যমে পীর সাহেব সত্তর বছর আগেও সৌদি আরবের চাঁদ দেখার বিষয়টি সময়মতো অবগত হতেন? তেমনি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা কাযীর ফয়সালা তার কর্তৃত্বের সীমানার বাইরে আমলযোগ্য হওয়ার বিষয়টিও পীর সাহেব ফিকহ-ফতোয়ার কোন্ কিতাব থেকে গ্রহণ করলেন?

পরে পীর সাহেবের (আবু যোফার মুহাম্মদ আবদুল হাই হাফিযাহুল্লাহ) আরেকটি পুস্তিকা 'ইয়াসআলূনাকা আনিল আহিল্লাহ' হস্তগত হল। এর দ্বিতীয় অংশে পীর সাহেবের সম্মতি ও সমর্থনসহ দৈনিক মানব জমিন পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় (২০০৬ ঈ.) প্রকাশিত রানা জামানের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার পড়ে প্রথম আশ্চর্য আরো দৃঢ় হল। কারণ এই পুরো সাক্ষাৎকারে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার প্রসঙ্গ কোথাও নেই; বরং পরিষ্কার ভাষায় এ কথাই বলা হয়েছে যে, তারা সৌদিয়ার অনুসরণে (নিজ দেশের উলামা ও উমারা

থেকে আলাদা হয়ে) রোযা আগে শুরু করেন এবং ঈদও আগে করেন এবং এর ইতিহাস ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, উনিশ শতকের প্রথম-দ্বিতীয় দশকের দিকে নোয়াখালির বসিকপুর (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর)-এর মাওলানা আবদুল হামীদ সাহেব সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে ঈদ করেছিলেন। ঐ সময় সাদ্রার সাবেক পীর সাহেব মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ছিলেন বসিকপুর মাদরাসার তালিবে ইলম। ঐ সময় তিনি হাদীস ও বিভিন্ন দ্বীনী কিতাব পড়ে এ কথার দলিল পান যে, ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে উদযাপন করা চাই। এরপর তিনি নিজ এলাকায় এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের সংকল্প করেন। সেমতে ১৯২৮ খৃ. তিনি এর চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে সফল না হলেও পরে ধীরে ধীরে এ ধারা ব্যাপক হতে থাকে। (ইয়াসআলূনাকা আনিল আহিল্লাহ পৃ. ৮)

পীর সাহেবের হালত আমার জানা নেই। তবে আমরা শুদ্ধ আকীদার সুন্নত ও শরীয়তের পাবন্দ পরহেযগার বুযুর্গদের সম্মান করি, কিন্তু স্বয়ং ঐ বুযুর্গদের শিক্ষা এই যে, পীর সাহেবের কথা-কাজ শরীয়তের দলিল নয়; বরং তিনি নিজেও শরীয়তের দলিল অনুযায়ী চলতে ও মুরীদগণকেও সে অনুযায়ী চালাতে বাধ্য। এজন্য আদবের সাথে আমাদের প্রশ্ন, কোন্ হাদীসে ও কোন্ দ্বীনী কিতাবে পীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব ও তার উস্তায এ মাসআলা পেয়েছেন যে, সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে ঈদ উদযাপন করা উচিত? কোনো 'হাদীসে' এ কথা থাকলে তো সেটা পৃথিবীর মানচিত্রে সৌদিয়ার জন্মের পর প্রস্তুতকৃত 'হাদীস' হবে! সহীহ হাদীসে সৌদিয়ার কথা কীভাবে থাকতে পারে? অতপর হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ, তাফসীর গ্রন্থ এবং ফিকহ-ফতোয়ার কোন কিতাবে এ মাসআলা আছে যে, সৌদি আরবের সাথে ঈদ কর?! এ তো কিছু আবেগপ্রবণ মানুষের আবেগপ্রসূত কর্মকান্ড। কোনো শরয়ী দলিলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

যাইহোক, ওই সাক্ষাৎকার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে,

সাদ্রাওয়ালাদের এই বিচ্ছিন্ন কর্মপন্থা মূলত আবেগপ্রসূত। কিন্তু ফাতওয়া ইছ্হাকীয়া ও ইয়াসআলূনাকা আনিল আহিল্লা-এর প্রথম অংশে 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার মাসলাকের অবতারণা তাদের কর্মপন্থা আবেগপ্রসূত হওয়ার বিষয়টি গোপন করার প্রচেষ্টামাত্র। তাই এ সম্পর্কেও সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আরয করছি :

ক. ''ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ'' ও ''ইয়াসআলূনাকা আনিল আহিল্লাহ''-এর প্রথম অংশের সকল আলোচনার ভিত্তি পীর সাহেবের ভাষায় এই যে, আমরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ। আর মুকাল্লিদের জন্য নিজ মাযহাবের বিরোধিতা বৈধ নয়। হানাফীদের জন্য শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে আমল করা শরীয়তে জায়েয নয়।

এবং হানাফী মাযহাবের জাহিরুর রিওয়াহ'র ফয়সালা এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। পশ্চিমের লোকেরা চাঁদ দেখলে পুবের লোকদের উপর রোযা ফরয হয়ে যায়। আর হানাফী মাযহাবে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র ফয়সালা অকাট্য ও চূড়ান্ত। সুতরাং কোনো কিতাবে এর বিপরীত কিছু থাকলে তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, না জায়েয ও অবৈধ। (ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ পৃ. ৪২, ২৬-৩২, ইয়াসআলূনাকা আনিল আহিল্লাহ পৃ. ১১)

যেহেতু পীর সাহেবের সকল আলোচনার সারসংক্ষেপ এ কটি কথাই এজন্য বিস্তারিত পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রথমত ''উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া'' শীর্ষক মাসলাক 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' হওয়াই প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়ত এ কথাও ঠিক নয় যে, 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র বিপরীতে কোনো মাসআলা গ্রহণযোগ্য নয়; পীর সাহেবের জানা থাকার কথা, তিনি কমপক্ষে ইবনে আবেদীন শামীর 'শরহু উকূদি রাসমিল মুফতী' অবশ্যই পড়ে থাকবেন। আর না হয় 'আদ্দুররুল মুখতার' ও 'ফাতাওয়া শামী'র ভূমিকায় লিখিত

'রাসমুল মুফতী' তো পড়েছেনই। তাই এ বিষয়ে তার কোনো বিভ্রান্তি থাকার কথা নয়। একটু খেয়াল করলে তিনি তার নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করে নিতে পারেন। কত স্পষ্টভাবে এসব কিতাবে এবং উসূলুল ইফতার অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবে এ নীতির উল্লেখ রয়েছে যে, 'আসহাবুত তারজীহ'শ্রেণীর ফকীহগণ মাযহাবের যে রেওয়ায়েতকে বা মাশায়েখে মাযহাবের যে 'ক্বওলকে' অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেন তার উপর আমল করা জরুরি।

আলোচ্য বিষয়ে অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহ, যাদের অনেকেই আসহাবুত তারজীহের অন্তর্ভুক্ত, দূর দূরান্তের শহর-নগরে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকই গ্রহণ করেছেন। যেমনটা তাদের বরাতসমূহে গিয়েছে। আলকাউসার যিলহজ্ব ১৪৩৪ হি. ও

মুহাররম ১৪৩৫ হি. সংখ্যায় এ বিষয়ে পাঠকবৃন্দ অনেক নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতিতে সে সকল ফকীহগণের ইবারত/মূলপাঠ দেখেছেন। তাই এ বিষয়ে অতিরিক্ত পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই।

খ. পৃষ্ঠা ২৭-এ দাবি করা হয়েছে, হেদায়া কিতাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার কথা আছে। অথচ হেদায়ায় এ ধরনের কোনো কথা মোটেই নেই; বরং হেদায়া লেখক ইমাম আবু বকর আলমারগীনানী (মৃত্যু : ৫৯৩ হি.)-এর কিতাব ''আততাজনীছু ওয়াল মাযীদ'' ও ''মুখতারাতুন নাওয়াযিল''-এ দূর-দূরান্তের শহর-নগরে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার ফতোয়া আছে। ইতিপূর্বে তার বরাত ও উদ্ধৃতি উল্লেখিত হয়েছে।

হেদায়ার মতো একটি প্রসিদ্ধ কিতাবের নামে এ অমূলক উদ্ধৃতি কীভাবে দেওয়া হল তা আল্লাহ তাআলাই জানেন।

গ. পৃষ্ঠা ৪১-৪২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তাকরারুল মা'সিয়াতি কুফরুন' বা ইছরারুন আলাল মা'ছিয়াতি কুফরুন' এবং ব্র্যাকেটে তরজমা করা হয়েছে : 'গুনাহ বার বার করা কুফরী'

পীর সাহেব একে এ বিষয়ে প্রয়োগ করেছেন যে, প্রতি বছর নিজ দেশের চাঁদ দেখার উপর আমল করার কারণে তাকবীরে তাশরীক নয় যিলহজ্বের স্থলে দশ বা এগার যিলহজ্বে শুরু হয়। এভাবে প্রতি বছর পাঁচ বা দশ ওয়াজিব ফওত হয়ে যায়। পীর সাহেব বলেন, এর প্রেক্ষিতে আমার ঐ মত ''গুনাহ বারবার করা কুফরী'' মনে পড়ে এবং দিল কেঁপে ওঠে। (পৃষ্ঠা : ৪২)

প্রশ্ন এই যে, উপরোক্ত কথাটি কুরআনের কোন আয়াত বা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? আর তা হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে আছে?

এ কথা মূলত কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবেই নির্ভরযোগ্য দলিলসহ বিদ্যমান নেই। সমঝদার সবাই বুঝে, এটি একটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

কোনো মুমিন এক গুনাহ বারবার করতে পারে না। গুনাহ হয়ে গেলেই তাকে তওবা করে নিতে হবে। কিন্তু এ কথা কে বলল যে, কোনো গুনাহ বারবার করা হলে সেটা কুফর হয়ে যায়!!

তো প্রথম কথা হল, পীর সাহেবের এই বক্তব্যটিই ভুল। দ্বিতীয় কথা হল, তিনি এটাকে একটি মুজতাহাদ ফীহ ইখতিলাফী মাসআলায় প্রয়োগ করেছেন, যে ব্যাপারে সকল মুজতাহিদের ঐকমত্য রয়েছে যে, এজাতীয় মাসআলায় প্রত্যেক মুজতাহিদ ও তার অনুসারী মুকাল্লিদগণ নিজেদের মাসলাক অনুযায়ী আমল করবেন। যদিও অন্য মুজতাহিদের দৃষ্টিতে তার এ কাজ ভুল হোক না কেন!?

এজন্য যেসকল ফকীহ ও তাদের অনুসারীগণ নিজ নিজ এলাকার চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করেন তাদের ব্যাপারে এই দাবি করা যে, তারা তাকবীরে তাশরীক শুরু করেন পরে এবং এভাবে তারা গুনাহগার হন-এ কথা সম্পূর্ণ ইজমা পরিপন্থী। অন্যথায় উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাক অনুযায়ী আমলকারীদের ব্যাপারে

এ ধারণা করা যাবে যে, তারা নির্ধারিত সময়ের আগেই তাকবীরে তাশরীক শুরু করে দেয় এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ করে। ফলে তাদেরও পাঁচ বা দশ ওয়াক্তের তাকবীর ফওত হয়ে যায়। কুরবানী ১০ যিলহজ্বের পরিবর্তে ৯ যিলহজ্বে করে।

রোযা পহেলা রমযানের পরিবর্তে ৩০ শাবানে শুরু করে। ঈদুল ফিতর পহেলা শাওয়ালের পরিবর্তে ৩০ রমযানে করে। পীর সাহেব কি এসব কথা মেনে নিবেন? অথচ তার এসব মেনে নেওয়া উচিত। কারণ তাদের আমল তো কোনো মুজতাহাদ ফীহ

মাযহাব অনুযায়ীও হচ্ছে না; বরং ভুল কর্মপদ্ধতির কারণে তারা 'শুযূয'-এর সীমানায় চলে যান।

তো তাদের দৃষ্টি নিজেদের ভুল কর্মপদ্ধতির উপর না পড়ে সঠিক পদ্ধতিতে আমলকারীদের উপর গিয়ে পড়ছে। এমনকি সেজন্য তাদের উপর পরোক্ষভাবে কুফরের অপবাদও চাপিয়ে দেওয়া চ্ছে।

ঘ. 'ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ' পৃষ্ঠা : ৩৪-এ লেখা হয়েছে-

''কুরআনে পাকের কোন আয়াত বা কোন হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা করিতে হইলে নিজ মাযহাবের রায় অনুপাতে করিতে হয় তাই ঐসমূহের অছুল এবং নিজ ইমাম বা মাহযাবের মতামত ভালরূপে জানা আবশ্যক।

অন্যথায় মনগড়া ব্যাখ্যার কারণে বিভ্রান্তি ও বিপদ ঘটে এবং গোমরাহ হওয়ার ভয় থাকে।''

এ আশ্চর্য বাক্য পীর সাহেবের কলমে কীভাবে এল? এ ধরনের অসতর্ক কথা বা অসতর্ক বাক্যের দ্বারা মানুষের আকীদা নষ্ট হয় এবং মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধিতাকারীরাও সুযোগ পায়।

কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য নিয়ম-নীতি আছে, যা উসূলে তাফসীর, শরহে হাদীস ও উসূলে ফিকহের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। ঐ নীতিমালা শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত। মুজতাহিদ ইমামগণ ঐ সকল নীতির আলোকেই কুরআন-হাদীস থেকে মাসাইল আহরণ করেছেন। আর এই সকল নীতির কোনো কোনোটি ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী হওয়ায় এবং কোনো কোনো নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতভিন্নতার সম্ভাবনা থাকায় কিছু আয়াত ও কিছু হাদীসের অর্থ নির্ধারণ ও তা থেকে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে মতভেদ হয়েছে, তবে নবী-যুগ ও সাহাবা-যুগ থেকে তাওয়ারুছের সাথে বর্ণিত ও 'মুতালাক্কা বিল কবুল' (সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত ও ইসলামের শুরু যুগ থেকে ব্যাপকভাবে অনুসৃত) কোনো তাফসীর বা ব্যাখ্যায় ইমামদের মাঝে মতভেদ হয়নি।

কিছু মুলহিদের রীতি, তারা আয়াত ও হাদীসের 'মুতালাক্কা বিল কবুল' ও 'ইজমায়ী' অর্থ অস্বীকার করে ইসলামী আকীদাসমূহের 'তাহরীফ' ও অপব্যাখ্যা করে থাকে। আর কিছু লোকের নিয়ম, ইজতিহাদী-ইখতিলাফী বিধান, যা ইখতিলাফী ও ইজতিহাদী হওয়া সর্বজন স্বীকৃত; তাতে একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করে অন্য সকল ইজতিহাদী ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা অস্বীকার করে। আর স্বীকৃত তাকলীদকে অস্বীকার করে পরোক্ষভাবে মানুষকে নিজের তাকলীদে বাধ্য করে।

পীর সাহেব সম্ভবত ঐ 'মুতাআসসিব' লোকদের ভুল কর্মপন্থার দরজা বন্ধ করার জন্য এ কথা লিখেছেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি, তার বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ থেকে কত বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে!!

কে না জানে যে, কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মূল আর মাযহাব তার ব্যাখ্যাতা। মাযহাব যিনি সংকলন করেছেন তিনি ইমাম, মা'সূম নন। কোথাও তার ভুল হয়ে থাকলে না সেই ভুলকে কুরআন ও হাদীসের তাফসীর বানানো যায় আর না তা মাযহাবের অনুসরণযোগ্য অংশে

শামিল হতে পারে। কিন্তু অমুক মুজতাহিদ অমুক মাসআলায় সত্যিই ভুল করেছেন এ সিদ্ধান্ত শুধু অন্য মুজতাহিদ ও গভীর পান্ডিত্যর অধিকারী আলিমগণই দিতে পারেন। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, সাধারণ আলিমদের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। আর এ ফয়সালা শুধু দাবির দ্বারাই প্রমাণিত হবে না, তা প্রমাণিত হতে হবে দলিল দ্বারা।

মোটকথা, কুরআন ও হাদীসের তাফসীর কোনো বিশেষ ইমামের বিশেষ মতকে ভিত্তি বানিয়ে হবে না; বরং তা হবে তাফসীর ও শরহে হাদীসের স্বীকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে। আর সে অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য আহলে ইলমের পক্ষ থেকে যে তাফসীর হবে তা থেকে ইজমায়ী বিধানগুলোর অকাট্যতা স্পষ্ট হতে থাকবে এবং ইজতিহাদী বিষয়গুলো ইজতিহাদী হওয়া প্রমাণিত হবে। তেমনি কোনো মুফাসসির বা ভাষ্যকার থেকে তাফসীর বা ভাষ্যে এবং কোনো ফকীহ থেকে কোনো হুকুম ইস্তিম্বাতে ভুল হয়ে থাকলে তা থেকে সেটার ভুল হওয়াও স্পষ্ট হতে থাকবে।

যা হোক, এ তো ছিল পীর সাহেবের ঐ বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অস্পষ্ট বাক্যের উপর প্রয়োজনীয় সংশোধনী, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এখানে এ আলোচনার সূত্রপাত করার প্রয়োজনই বা কী ছিল। তিনি কি তার নিজের বানানো এই নীতি দ্বারা রোযা ও ঈদ বিষয়ে তার বিচ্ছিন্ন কর্মপন্থা প্রমাণ করতে পারবেন? কিংবা তার উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব দিতে পারবেন? বলাবাহুল্য, কোনোটাই সম্ভব না। তাহলে শুধু শুধু এ আলোচনার অবতারণা কেন?

৬. ''ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ''য় কয়েক জায়গায় এ-ও লেখা হয়েছে যে-

يجب العمل بالأسبق رؤية

অর্থাৎ শুধু প্রথম চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। (পৃষ্ঠা : ৩৬, ৫০)

যেমনটি আগেও বলা হয়েছে যে, কথা যদি এই হয় তাহলে সৌদি আরবের সাথে কেন, যে মাসে যে অঞ্চলে প্রথম চাঁদ দেখা যাবে ঐ মাসে তাদের সাথেই মাসের হিসাব রাখতে হবে। তাহলে সৌদি আরবকে মাপকাঠি বানানো কেন? প্রত্যেক রমযান বা প্রত্যেক শাওয়ালে প্রথম চাঁদ দেখা কি সৌদিতে হয় যে, সবসময় তার সাথে মিল রেখেই আমল করা হবে?! (বিশদ আলোচনার জন্য প্রবন্ধের শেষ অধ্যায় দেখুন)

চ. সৌদি আরবের চাঁদের ফয়সালাকারী আলিম ও কাযীগণ হাম্বলী মাযহাব অনুসারে ফয়সালা করেন। যেমন তাদের মাসলাক এই যে, উদয়স্থল একদম পরিষ্কার হলেও রমযান প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুই সাক্ষীর বেশি জরুরি নয়; বরং তাদের কোনো কোনো আলিম এক সাক্ষীও যথেষ্ট মনে করেন। তেমনি ঈদের চাঁদ প্রমাণের জন্যও তারা আকাশ পরিষ্কার থাকার ক্ষেত্রেও দুই সাক্ষীর বেশি শর্ত করেন না।১

তাদের হেলাল কমিটি সবসময় এ নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করে থাকে।২

পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের রাজেহ কওল এই যে, আকাশ পরিষ্কার থাকার ক্ষেত্রে 'জম্মে গাফীর' অর্থাৎ অনেক মানুষের চাঁদ দেখতে হবে। দুই নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়।৩

সৌদিয়ার চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা হলে হানাফী মাযহাবের এ মাসআলার উপর আমল কীভাবে হবে, যা দলিলের দিক থেকেও রাজেহ এবং শক্তিশালী? সৌদি চাঁদ দেখার উপর এ দেশে আমল করা উচিত কি না-এ বিষয়ে 'ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ' ওয়ালাদের অন্তত এদিক থেকে তো চিন্তা করা উচিত।

কিন্তু তারা এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন না। কেননা নিয়ম-নীতি বহির্ভূত, আবেগপ্রসূত কর্মপন্থা অবলম্বনকারীরা আর যাই হোক উসূল অনুযায়ী চিন্তা করবেন কীভাবে?

পীর সাহেবের সাথে একবার ফোনে কথা হয়েছিল। তিনি জানালেন, রানা জামানের প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বশিকপুরের আবদুল হামীদ সাহেবের নিজ এলাকায় সৌদি আরবের তারিখ অনুযায়ী ঈদ করার যে কথা লেখা হয়েছে এর সত্যতা তার জানা নেই।

তবে এ কথা ঠিক যে, আবদুল হামীদ সাহেব 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া'র মাযহাবটি খুব প্রচার করতেন। আর পীর মুহাম্মাদ ইসহাক এই শিক্ষা সর্বপ্রথম তার কাছ থেকেই লাভ করেছেন।

পীর সাহেব আরো বলেছেন, রেডিও আসার পর আমরা রেডিওর খবরের উপর নির্ভর করে থাকি। তবে এর আগে আমরা চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রোযা শুরু করতাম। আর ঈদের জন্য সৌদি আরবে রোযা কবে শুরু হয়েছে তা চিঠির মাধ্যমে জেনে নিতাম এবং সে হিসাবে ঈদ করতাম। কিন্তু এরপরও পরবর্তীতে আমরা চিঠির মাধ্যমে জানতে পারতাম যে, কখনো কখনো সৌদি আরবে ঈদ আমাদের আগেই পালিত হয়ে গেছে।

পীর সাহেব আরো বলেন, যখন আমরা চাঁদ দেখে রমযান শুরু করতাম তখনো আমাদের চাঁদ দেখা দেশবাসীরও আগে হত। আমরা লোকদেরকে বলতাম, শরীয়তে অমাবস্যা নামে কিছু নেই। তোমরা চাঁদ তালাশ কর। তখন তালাশ করলে চাঁদ দেখা যেত!!

পীর সাহেব খোলামেলাভাবেই সব কথা বলে দিয়েছেন। আসলে এসব কথা ছাড়া তার পূর্ণ কর্মপন্থা বোঝাও সম্ভব হত না। তবে এটি এক ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, তার এই কর্মপন্থা সঠিক না ভুল।

এবার একটু লক্ষ্য করুন :

১. চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য যেখানে শাহাদত প্রয়োজন, শুধু সংবাদ যথেষ্ট নয় সেখানে রেডিওর খবরের উপর নির্ভর করার হুকুম কী হবে? রেডিও বা টেলিভিশনে শাহাদত দেওয়া হলে তা কি

গ্রহণযোগ্য হবে?

২. রেডিওতে যদি কোনো দায়িত্বশীলের ফয়সালা প্রচার করা হয় তাহলে দায়িত্বশীলের ইখতিয়ার বহির্ভূত এলাকায় সে ফয়সালার উপর আমল করার বিধান ও পদ্ধতি কী?

৩. কেউ চাঁদ দেখে রোযা শুরু করল। পরবর্তীতে চিঠির মাধ্যমে জানতে পারল যে, অমুক স্থানে ১/২ দিন আগেই রোযা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে কি শুধু এই চিঠির উপর ভিত্তি করে সাতাশ বা আটাশতম রোযার পরই ঈদ পালন করার বিধান আছে? অথচ না নিজেরা ঈদের চাঁদ দেখল, না অন্য কোনো স্থানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পেল।

৪. শরীয়তে অমাবস্যা নেই-এই কথা কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত? আর কোন ইমাম এ কথা বলেছেন? এই ভিত্তিহীন কথায় প্রতারিত হয়ে লোকেরা যদি অমাবস্যার সময় নতুন চাঁদ তালাশ করতে থাকে এবং কেউ চাঁদ দেখার দাবিও করে বসে তবে নিঃসন্দেহে তা হবে কাল্পনিক চাঁদ। কেননা অমাবস্যার চাঁদ তো হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, যা দেখার মতো চাঁদ বা হেলাল নয়। এ দৃষ্টিগোচর হওয়াই সম্ভব নয়। তবে কি শরীয়তে এ ধরনের কাল্পনিক চাঁদের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করার অনুমতি আছে?

এসব প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে উসূল ও দলিল-প্রমাণের আলোকে পীর সাহেব ও তার অনুসারীরা চিন্তা করারও প্রয়োজন বোধ করবেন না। কারণ তাদের কর্মপন্থা তো গোড়া থেকেই আবেগভিত্তিক, নিয়ম ও উসূলভিত্তিক নয়। বিচ্ছিন্ন কর্মপন্থার লোকেরা নীতি ও উসূলের আলোকে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলে তাদের বিচ্ছিন্নতা বাকি থাকবে কীভাবে?

ছ. 'ইয়াসআলূনাকা আনিল আহিল্লাহ' দ্বিতীয় অংশে এ-ও বলা হয়েছে যে, পীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেব

হযরত মাওলানা আলহাজ আবু বকর সিদ্দীকী রাহ.-এর খলীফা ছিলেন। (পৃষ্ঠা : ৭)

ফুরফুরার হযরতের তো আমাদের এ দেশে মাশাআল্লাহ আরো খলীফা আছেন। ছারছীনার পীর সাহেবও ঐ সিলসিলার। মাগুরা, কুমিল্লা ও কিশোরগঞ্জেও ফুরফুরার সিলসিলা আছে। আমাদের জানামতে তাদের কেউ সওম ও ঈদে এখানের উলামা-উমারা সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন না। তাহলে সাদ্রার ওই ভাইদের কী প্রয়োজন ছিল নিজেদের পীর ভাইদের থেকে আলাদা পথে যাওয়ার?

জ. ফতোয়া ইসহাকিয়্যাহয় (পৃষ্ঠা : ২৭) দুটো কিতাবের নাম এভাবে আছে ''মাজমাউল আনহার'' ও ''জাওয়াহেরুন্নাইয়্যারা''। এটি ভুল। শুদ্ধ হল 'মাজমাউল আনহুর' ও 'আলজাওহারাতুন নাইয়িরাহ'।

ফতোয়াতেই যদি ফতোয়ার কিতাবের নাম ভুল লেখা হয় তাহলে?

ঝ. পৃষ্ঠা ১৮ তে ظن المؤمن خيرا ড়বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর তরজমা এই করা হয়েছে : মোমেন লোকের ধারণা ভাল। সাথে সাথে তা হাদীস বলে দাবি করা হয়েছে। প্রশ্ন এই যে, হাদীসের কোন কিতাবে এটি আছে এবং এর সনদ কী? এরপর এর যে ই'বারত ও তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে তা কি সঠিক? আরবী ব্যাকরণের একজন প্রাথমিক তালিবে ইলমেরও এ ধরনের ভুল করা উচিত নয়!

আমরা তো এ উক্তি শুনেছি-

ظنوا بالمؤمنين خيرا

যার অর্থ, 'মুমিনদের বিষয়ে সুধারণা রেখো।' তবে তা হাদীস হওয়া তো প্রমাণিত নয়।

তাহলে বিষয়টি এমন নয় যে, 'ফতওয়া ইছাহাকীয়া'য় শুধু ভুল

ফতোয়া আছে। এতে ভুল ফতোয়ার পাশাপাশি অন্যান্য অনেক ধরনের ভুল-ভ্রান্তিও রয়েছে। সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় এরচেয়ে দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নয়। আর নসীহত ও কল্যাণকামিতার জন্য এটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। যদি কল্যাণকামিতার কোনো কদরকারী পাওয়া যায়!

টীকা :

টীকা : ১. আলইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ আলা মাযহাবিল ইমামি আহমদ, মারদাভী খ : ৩, পৃষ্ঠা : ২৭৩-২৭৫

টীকা : ২. আহকামুল আহিল্লাহ ওয়াল আছারুল মুতারাত্তিবাতু আলাইহা, আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ

টীকা : ৩. আততাজরীদ, কুদূরী ৩/১৪৬৭; আলইখতিয়ার লিতালীলিল মুখতার ১/৪০৪; হেদায়া ও ফাতহুল কাদীর ২/২৫১-২৫২

২. আল-হেলাল

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

আলহেলাল প্রকাশনীর প্রকাশিত পুস্তিকা ড. আবদুল্লাহ আলমারূফ মুহাম্মাদ শাহ আলমের লিখিত ''আলহেলাল''ও হস্তগত হয়েছে। এ বিষয়ের অন্যান্য পুস্তিকার তুলনায় কোনো কোনো দিক থেকে বিশেষত্বের অধিকারী। কিন্তু দাবি প্রমাণে এ পুস্তিকাও ব্যর্থ। পাশাপাশি উদ্ধৃতি বর্ণনা ও তরজমার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসতর্কতাও রয়েছে। লক্ষ্য করুন :

১. প্রথমে সংক্ষেপ কথা এই যে, পুস্তিকার দাবি, সারা বিশ্বে একই

দিনে ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালন করাই বিধান। (আলহেলাল পৃ. ১)

এখন এ বিধান কি ফরয, না ওয়াজিব, সুন্নত না মুস্তাহাব তা স্পষ্ট ভাষায় পুস্তিকার কোথাও পাইনি। তবে গোটা পুস্তিকায় এমন অনেক বাক্য আছে, যা থেকে বোঝা যায়, তিনি একে ফরয বিধান মনে করেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি এ দাবির উপর না ফিকহে হানাফীর কোনো কিতাবের উদ্ধৃতি নকল করেছেন, না অন্য কোনো মাযহাবের বরাত! ১৪ পৃষ্ঠায় যদিওবা লিখেছেন-

''প্রিয় পাঠকবৃন্দ আমরা জানলাম চারটি মাযহাবের মধ্যে হানাফীসহ অন্য তিনটি মাযহাব এই ঐক্যমতে পৌঁছেছে যে সারা বিশ্বে একই চাঁদের অনুসরণে ঈদ-রোযা একই দিনে হবে। আশা করি এতগুলো অকাট্য দলিল প্রমাণের পর আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়-সন্দেহ থাকার কথা নয়।''

কিন্তু কোনো মাযহাবের কোনো কিতাব থেকেই তিনি নকল করেননি যে, একই চাঁদ দেখা অনুসারে গোটা পৃথিবীতে রোযা ও ঈদ করা ফরয। যা কিছু নকল করেছেন তা শুধু উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া সংক্রান্ত উদ্ধৃতি। অথচ ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার অপরিহার্য অর্থ এই নয় যে, সিয়াম ও ঈদ একই দিনে হওয়া জরুরি। এ কারণে তিন মাযহাবের যে ফকীহগণ উদয়স্থলের ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করেছেন, আমার জানামতে তাদের কেউ অন্য অঞ্চলের চাঁদ দেখার সংবাদ সংগ্রহ করা বা এ অঞ্চলের চাঁদ দেখার সংবাদ অন্য অঞ্চলে পৌঁছানোকে ফরয বলেননি। সহজ কথা যে, গোটা বিশ্বে এক দিনে রোযা বা ঈদ ফরয হলে প্রত্যেক যুগের উপকরণ অনুযায়ী সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত চাঁদের খবর আদান-প্রদানও ফরয হত। কিন্তু এর একটি নযীরও কি

পাওয়া যায় খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-তাবেয়ীনের আমলে কিংবা কোনো ফকীহ ও মুজতাহিদের উক্তিতে? একটি নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতিও কি পেশ করবেন ড. আবদুল্লাহ?

২. আলহেলাল পৃষ্ঠা : ১২ ও পৃষ্ঠা : ১৫ তে ''আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ''-এর বরাত আছে। কিন্তু তার বক্তব্য পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এ কিতাবের লেখক ড. ওয়াহবা যুহাইলী শাফেয়ী; উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতকে অগ্রগণ্য করেছেন এবং দ্বিতীয় খন্ডের ৬১০ পৃষ্ঠায় নিজ বুঝ অনুযায়ী এর হিকমতও এভাবে বয়ান করেছেন-

توحيدا للعبادة بين المسلمين، ومنعا من الاختلاف غير المقبول في عصرنا.

অর্থাৎ যাতে ইবাদতে (রোযায়) মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সম্ভব হয় এবং অযৌক্তিক/অগ্রহণযোগ্য ইখতিলাফ থেকে তারা বাঁচতে পারেন।

এ সত্ত্বেও ড. ওয়াহবা পরিষ্কার বলেছেন-

ولا خلاف في أن للإمام الأمر بالصوم بما ثبت لديه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية جداً، كالأندلس والحجاز، واندونيسيا والمغرب العربي.

অর্থাৎ (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য কি না-এ বিষয়ে যদিও ইখতিলাফ আছে, কিন্তু) এতে কোনো ইখতিলাফ নেই যে, রাষ্ট্রের কর্ণধারের কাছে যে মাসলাকই প্রমাণিত হবে, সে অনুযায়ী ফয়সালা করার অধিকার তাঁর আছে। কারণ হাকিমের ফয়সালা ইখতিলাফের সমাপ্তি ঘটায়।

তদ্রূপ এ বিষয়ে ইজমা আছে যে, অনেক দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক জায়গার দেখা অন্য জায়গার জন্য ইতিবার নেই। যেমন স্পেন ও হিজায বা ইন্দোনেশিয়া ও মরক্কো। (আলফিকহুল ইসলামী ওয়া

আদিল্লাতুহু ২/৬০৬)

আলহেলাল ১৫ পৃষ্ঠায় যে কথার উপর আলফিকহুল ইসলামীর বরাত দেওয়া হয়েছে ঐ কথার সাথেই ড. ওয়াহবা যুহাইলী লেখেন-

والاحتياط هو الاكتفاء بتوحيد الأعياد في حدود البلاد العربية بدءا من عمان في الشرق إلى المغرب الأقصى.

অর্থ : সতর্কতা এতেই যে, ঈদ এককরণ শুধু আরব দেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ রাখা। আম্মান থেকে মাগরিব পর্যন্ত। (আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৬১০)

আবদুল্লাহ আলমারূফ ছাহেব কি আলহেলালে ড. ওয়াহবা-এর এ দুটি কথা নকল করতে পারতেন না? তাহলে কেন তা করলেন না?

যাইহোক, পাঠকবৃন্দের কাছে নিবেদন এই যে, ড. ওয়াহবা-এর বক্তব্য-

ولا خلاف في أن للإمام الأمر بالصوم بما ثبت لديه، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

(রাষ্ট্রের কর্ণধারের কাছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া বা না-হওয়ার দুই কওলের মাঝে যেটি প্রমাণিত হবে সে অনুযায়ী তাঁর রোযার ফয়সালা করার অধিকার আছে। কারণ হাকিমের ফয়সালা ইখতিলাফের সমাপ্তি ঘটায়।) সবসময় স্মরণ রাখুন।

ইখতিলাফের সমাপ্তি ঘটানোর অর্থ, ঐ হাকিমের কর্তৃত্বের সীমানায় যারা থাকেন তাদের মাযহাব আলাদা হলেও হাকিমের ফয়সালার কারণে তারা এ বিষয়ে হাকিমেরই আনুগত্য করবেন, নিজের মাযহাব ত্যাগ করবেন।

সকল মুজতাহাদ ফীহ ইখতিলাফী মাসআলায় শরীয়তের এ ফয়সালা

ইজমায়ী। ফাতাওয়া শামীর ভূমিকায় 'জাহিরুর রিওয়াহ'র কিতাবের বরাতে এ মূলনীতি উল্লেখিত হয়েছে। ড. আবদুল্লাহ আলমারূফের অবশ্যই তা জানা থাকবে। যদি শুধু এ মূলনীতির মর্ম এ সকল পুস্তিকা লেখকদের স্মরণ থাকত তাহলেও তাদের লেখার ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা হত; বরং হয়তো তারা এ বিষয়ে কলম ধরারও প্রয়োজন বোধ করতেন না।

৩. পৃষ্ঠা ২-এ ''জাহিরুল মাযহাব''-এর তরজমা করা হয়েছে, 'এটা (হানাফী) মাযহাবের চূড়ান্ত মত (ظاهر)।

এ তরজমার সূত্র কী? কোনো বরাত তো অবশ্যই লাগবে। আমাদের জানামতে ফিকহে হানাফীর কিতাবাদির প্রসিদ্ধ ব্যবহার হিসেবে এ শব্দকে ''জাহিরুর রিওয়ায়াহ''-এর সমার্থক মনে করা হয়।

৪. পৃষ্ঠা ৩-এর عليه الفتوى -এর তরজমা করা হয়েছে :

আর এ সিদ্ধান্তের পক্ষেই পরবর্তী আলেমদের ফতোয়া বিদ্যমান।

এতে 'পরবর্তী আলিমদের' কথাটা কোন শব্দের অনুবাদ?

৫. পৃষ্ঠা ৩-এ বলেছেন-

'এমনকি তাঁরা বলেছেন যে, যদি পৃথিবীর পশ্চিমাংশের বাসিন্দারা নতুন চাঁদ দেখেন তাহলে তাদের এ দেখাতেই পূর্বাংশের লোকদের উপর (রোযা ও ঈদ) ওয়াজেব হয়ে যাবে।'

পশ্চিমের লোক রমযানের চাঁদ দেখলে পুবের লোকের উপর রোযা জরুরি হয়ে যায়-এ তো শুধু শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। একে 'এমনকি তাঁরা বলেছেন' বলে সকল হানাফী

ফকীহগণের বক্তব্য বানিয়ে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

এ বাক্যের সাথে আলহেলাল ৩ পৃষ্ঠায় আলবাহরুর রায়েক, মাজমাউল আনহুর, আলহিন্দিয়া, ফাতহুল কাদীর ও আলবাযযাযিয়া'র বরাত যুক্ত করা হয়েছে। বাহর, হিন্দিয়া ও আলবাযযাযিয়া এবং এরও আগে আলখুলাসায় একে শুধু সম্বন্ধ করা হয়েছে হালওয়ানীর সাথে। ফাতহুল কাদীরে বক্তার নাম নেই, শুধু ''মাজমাউল আনহুর''-এ এখানে قالوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ড. আবদুল্লাহর কর্তব্য ছিল, 'মাজমাউল আনহুর' থেকেও অধিক প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য অন্যান্য কিতাবের বর্ণনা থেকে মাজমাউল আনহুর-এর এই 'তাসামুহ' (ভ্রম) সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সে বিষয়ে সংশোধনী নোট লিখা কিংবা অন্তত এর উল্লেখ থেকে বিরত থাকা। অথচ তিনি সেই ভ্রমকেই তরজমা করে সাধারণ পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন হানাফী মাযহাবের অকাট্য সিদ্ধান্তরূপে!

৬. পৃষ্ঠা ৭-এ দাবি করা হয়েছে যে-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

এ হাদীসই সারা দুনিয়ায় এক হুকুমের সুদৃঢ় ভিত্তি, যা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ. ও প্রখ্যাত আলিমগণ দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

আমি বিনীতভাবে ড. আবদুল্লাহ আলমারূফের কাছে শুধু একটি নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি চাচ্ছি, যাতে এ তিন ইমাম সারা বিশ্বে এক চাঁদ দেখা কার্যকর করার বিষয়ে এই হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

শুধু একটি উদ্ধৃতি!

৭. পৃষ্ঠা ৩১-এ লিখেছেন-

‘‘আর যদি অন্য দেশের সরকারী মুফতী বা হেলাল কমিটির ঘোষণা সরাসরি অন্যদেশে বসে শোনা যায় তাহলে তো আর দোসরা সাক্ষীরই দরকার নেই। যেমন আজকাল আমরা ঘরে বসে সেকেন্ডে দুনিয়ার এক প্রান্তের কাজীর ঘোষণা অন্য প্রান্তে বসে নিজ কানে শুনতে পারছি।’’

প্রশ্ন এই যে, কোনো দেশের সরকারি মুফতী বা হেলাল কমিটির ঘোষণা তার কর্তৃত্ব সীমার বাইরে অনুসরণীয় হওয়ার কথাটা কোন দলিলের ভিত্তিতে বা কোন ফিকহী বরাতের আলোকে লেখা হয়েছে? এ তো সাধারণ বিবেক ও শরয়ী বিধান দু দিক থেকে স্বীকৃত যে, কোনো দায়িত্বশীলের ফায়সালা তার কর্তৃত্বের সীমার বাইরে অনুসরণীয় নয়। আপাতত শুধু ছাহেবে হেদায়ার একটি ইবারতের দিকে আলহেলাল লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, যা হেদায়া লেখকের ‘‘আততাজনীসু ওয়াল মাযীদ’’ গ্রন্থে (খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২৩) চাঁদ দেখার আলোচনায় রয়েছে-

أهل مصر اشتبه عليهم الهلال، فشهد شاهدان عند القاضي برؤيته، وقضى بذلك، لا يظهر هذا الحكم في أهل أمصار أخر، ويظهر في أهل قرى المصر ومحاله.

ولو شهد عند قاضي بلدة شاهدان ولم ير أهله الهلال، أن قاضي مصر كذا قضى بالهلال من وقت كذا، واستجمعت الشرائط، يقضي القاضي به، ذكره في مجموع النوازل.

والمعنى فيه أن في الوجه الأول قاضي هذا المصر ليس له ولاية على مصر أخر، أما له ولاية على القرى، فيظهر قضاؤه على أهل قرى مصره، لا على أهل مصر أخر، وفي الوجه الثاني يلزمهم الصوم بإمضاء قاضي مصرهم، حكمَ قاضي ذلك المصر الأخر... .

قال رضي الله عنه : وهذا إذا تقاربت مطالع البلدتين، أما إذا تباعدت ليس للثاني أن يمضي قضاء الأول في أهل مصره، مطالع سمرقند وبخارا قريب، فيمضي قاضي أحدهما قضاء قاض آخر.

(التجنيس والمزيد ج ٢ ص ٤٣٠-٤٣٢، مسألة ١٢٤٩، ١٢٥٠، طبع إدارة القرآن كراتشي)

ইমাম আবু বকর আলমারগীনানীর উপরোক্ত বর্ণনা মনোযোগ সহকারে পড়লে আশা করি ড. আবদুল্লাহ বুঝতে পারবেন যে, তিনি উপরোক্ত কথাটিতে কত বড় ভুলের শিকার হয়েছেন।

৮. পৃষ্ঠা ৩৪-এ 'রাহমতী' কে অখ্যাত বলা হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন এগার শতকের অনেক বড় ফকীহ। ইনি আদ্দুররুল মুখতার-এর টীকা লিখেছেন। ইলমুল ইসনাদেও তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। পুরো নাম আবুল বারাকাত যাইনুদ্দীন মুসতফা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রাহমাতুল্লাহ আলআনসারী আররাহমাতী, দামেশকে ১১৩৫ হিজরীতে জন্ম, ১২০৫ হিজরীতে মৃত্যু। মক্কা মুকাররমায় সমাহিত।

ফিহরিসুল ফাহারিস খ : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৪-৪২৫; রওযুল বাশার পৃষ্ঠা : ২৪২; মুনতাখাবাতুত তাওয়ারীখ লিদিমাশক খ : ২, পৃষ্ঠা : ৬৭৭; হাদিয়্যাতুল আরেফীন খ : ২, পৃষ্ঠা : ৪৫৪ এবং খাইরুদ্দীন যিরিকলীর ''আলআ'লাম'' (৭/২৪১)-এ তাঁর তরজমা (পরিচিতিমূলক আলোচনা) আছে এবং তাঁর যে বক্তব্যে আলহেলাল লেখক অসন্তুষ্ট হয়েছেন তা অনেক ফকীহ গুরুত্বের সাথে কবুল করেছেন।

৯. পৃষ্ঠা ৪০-এ ডক্টর সাহেব আলিমদের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন যে, 'তাঁরা পড়াশোনা করেন না'। বান্দার প্রশ্ন, আলহেলাল লেখক তো মাশাআল্লাহ পড়াশোনা করেন এবং কোনো কোনো আন্তর্জাতিক লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হওয়ার উল্লেখ তো তিনি নিজেই করেছেন। এরপরও হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের এত বিপুল সংখ্যক

ফকীহ, যাঁরা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য বলে মতপ্রকাশ করেছেন তাদের বক্তব্য কীভাবে তাঁর অজানা থাকল? আর জানা থাকলে কী কারণে অনুল্লেখিত রইল? বিশেষত এত বিপুল সংখ্যক হানাফী ফকীহর স্পষ্ট বক্তব্যগুলো কীভাবে তিনি এড়িয়ে গেলেন? আলকাউসারের গত যিলহজ্ব ও মুহাররম সংখ্যায় পাঠক ঐ বক্তব্যগুলো পাঠ করেছেন।

এরপর যখন তিনি

لا عبرة لاختلاف المطالع

সম্পর্কে বললেন যে, এ 'জাহিরুল মাযহাব' ও 'জাহেরুর রিওয়ায়াহ' এবং পৃষ্ঠা ২-এ ''জাহিরুর রিওয়ায়াহ''-এর তরজমা করেছেন : আর এটাই মৌলিক বর্ণনায় রয়েছে (যা প্রতিটি মাযহাবের উৎস ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা) তখন সমীচীন ছিল, ঐ মৌলিক ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো পাঠ করে সেগুলোর বরাত দেওয়া। এ কি হতে পারে না যে, তিনি ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর ছয় কিতাবের কোনো একটি থেকে, মাযহাবের অন্যান্য মৌলিক সূত্র থেকে এবং ষষ্ঠ শতকে সংকলিত খানিয়া-খুলাসার আগের কোনো কিতাব থেকে ঐ বাক্য এবং তা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর বাণী হওয়ার কোনো উদ্ধৃতি এনে দিবেন? তাহলে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

'আলিমরা পড়েন না' এ অভিযোগ করার সময় তো একবার নিজের পড়াশোনার সীমাটাও দেখে নেওয়া দরকার। গ্রন্থের জগতের সাথে আছে এমন কেউ কি প্রকাশকের অসতর্কতায় 'ফাতহুল কাদীর'-এর প্রচ্ছদে ''শরহু ফাতহিল কাদীর'' মুদ্রিত দেখে একে অন্য কিতাব মনে করতে পারেন?

এবং ফাতহুল কাদীরের বরাত দেওয়ার সময় ''ফাতহুল কাদীর ...শরহু ফাতহিল কাদীর''সহ এমন শব্দ লিখতে পারেন? অথচ ঐ

সমগ্রে ফাতহুল কাদীরের কোনো শরহ বা ভাষ্য বিদ্যমানই নেই। প্রকাশক ফাতহুল কাদীরকেই শরহু ফাতহুল কাদীর লিখেছে। উদ্দেশ্য, এ কথা জানানো যে, ফাতহুল কাদীর একটি শরহ বা ভাষ্যগ্রন্থ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তা হেদায়ার শরহ বা ভাষ্যগ্রন্থ বটে।

১০. বলার মতো অনেক বিষয় আছে, সে সব রেখে সর্বশেষ যে কথাটি নিবেদন করতে চাই তা এই যে, আলহেলালের শুরুতে মাওলানা মুহাম্মাদ খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দীকী ছাহেবের যে অভিমত, তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। কথাটি খুবই মনোযোগের দাবিদার। তিনি লিখেছেন, চার মাযহাবের শাফেয়ী মাযহাব ব্যতীত বাকি তিন মাযহাবেই সারা মুসলিম জগতে এক দিবসে ঈদ করার জাওয়ায বিদ্যমান। (আলহেলাল পৃষ্ঠা ৯, ভূমিকা)

আমার জানা নেই, আলহেলাল লেখক তাঁর এ কথাটা মনোযোগের সাথে পড়েছেন কি না। মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দীকী ছাহেব এ অত্যন্ত গোড়ার কথা লিখেছেন। আসলে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাবের সাথে একদিনে ঈদ ও সিয়ামের (যদি সম্ভাব্য সীমার ভিতরে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পূরণ করে বিধান অনুযায়ী হয় এবং উলুল আমর উলামা-উমারার ফয়সালা অনুসারে হয়) খুব বেশি হলে জাওয়ায (বৈধতা)ই প্রমাণিত হতে পারে। এর বেশি কিছু নয়। আমাদের এ গবেষকবৃন্দ যদি এ বাস্তবতাটুকুও উপলব্ধি করতে পারেন, যার দিকে মুহতারাম সিদ্দীকী ছাহেব ইশারা করেছেন তাহলে ইনশাআল্লাহ তাদের সব বিবাদের নিষ্পত্তি হতে পারে।

কারণ প্রথমত একটি পদ্ধতির 'জাওয়াযে'র অর্থ তো এটাই যে, তা জরুরি নয়। এ কারণে তা প্রতিষ্ঠার জন্য না মানুষকে বাধ্য করা যায়, আর না সে কারণে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা যায়। দ্বিতীয়ত, ফরয ও ওয়াজিব আমল আদায় করারও বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতি আছে, যার

অন্যথা করা জায়েয নয় তাহলে যে কাজ শুধু 'জায়েয' (বৈধ) পর্যায়ে তা করতে গিয়ে শরীয়তের নীতি ও বিধানের অন্যথা করা কীভাবে জায়েয হবে? তাই শুধু আবেগবশত অধৈর্য হওয়ার সুযোগ নেই; বরং যে পর্যন্ত না নিয়ম অনুযায়ী 'উলুল আম্র' (উলামা-উমারা)-এর পক্ষ হতে নীতি ও বিধান অনুসারে শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা হয় ঐ পর্যন্ত যে নিয়মে আমল চলছে (আর তা-ও একটি সঠিক নিয়ম) সে অনুযায়ীই আমল করতে হবে। তৃতীয়ত কোনো 'জায়েয' পর্যায়ের কাজ না করার কারণে নিন্দা-সমালোচনার তো প্রশ্নই আসে না, এখানে 'নাহি আনিল মুনকার' নীতি প্রয়োগ করাও জায়েয নয়।

কিন্তু এই মাসআলায় উসূল অনুযায়ী না ড. আবদুল্লাহ আলমারূফ চিন্তা করবেন আর না তার সমমনা লোকেরা। কারণ তাদের এই কর্মপন্থা পুরোপুরি আবেগপ্রসূত। উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাকের উদ্ধৃতি একটি আড়ালমাত্র। অন্যথায় আপনারা আমাকে বলুন, আবদুল্লাহ আলমারূফ ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের বইয়ের সাথে কীভাবে একাত্মতা ঘোষণা করলেন? অথচ তিনি তাতে আয়াত ও হাদীসের তাহরীফ করেছেন, ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, হিসাবের ভিত্তিতে পূর্ব তৈরিকৃত চান্দ্র ক্যালেন্ডারের তারিখ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করাই কুরআনের হুকুম এবং এটিই শরীয়তের বিধান।

এ ধরনের আরো অসংখ্য শরীয়তবিরোধী বিষয় যার পুস্তিকায় আছে আব্দুল্লাহ আলমারূফ তার সমর্থন কীভাবে করেন? এ কারণেই করতে পারেন যে, উদ্দেশ্য শরীয়তের অনুসরণ নয়, শুধু সিয়াম ও ঈদে ঐক্যের বিষয়ে নিজের আবেগ চরিতার্থ করা। তা যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

সেপ্টেম্বর ২০১৪, যিলক্বদ ১৪৩৫

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন-১২

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

{বর্তমান সংখ্যাটি এই প্রবন্ধের বারোতম কিস্তি। বিগত কিস্তি থেকে এই বিষয়ে লিখিত কয়েকটি পুস্তিকার পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। সেই সূত্রে গত সংখ্যায় (শাবান-রমযান) সাদ্রার পীর সাহেব ও ড. আবদুল্লাহ আল মারূফ এর পুস্তিকার উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যায় পর্যালোচনা হয়েছে ড. মাহবুবুর রহমান সাহেবের লিখিত পুস্তিকার। প্রবন্ধের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে বিগত কিস্তিগুলো পাঠক দেখে নিতে পারেন।

এছাড়া পর্যালোচনাকৃত পুস্তিকাগুলোর যে আপত্তিকর বিষয়গুলো অভিন্ন সে সম্পর্কে পরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা হবে। -প্রবন্ধকার}

পুস্তিকাটির গ্রন্থনা ও সম্পাদনা শিরোনামে প্রথম নামটি ড. মাহবুবুর রহমানেরই। সম্ভবত তিনিই আসল লেখক। পুস্তিকাটি মুদ্রিত অবস্থায়

হাতে এল মাত্র দুই-তিন মাস আগে। তবে কয়েক বছর আগে তা ফতোয়া আকারে নজরে এসেছিল। পুস্তিকার দাবি কী-বাহ্যত ৫ ও ১৫ পৃষ্ঠায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবী গোল হওয়ার কারণে নতুন চাঁদ কখনো একই সময়ে গোটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না আর তা সম্ভবও নয়। তাহলে এখন প্রশ্ন, কীসের ভিত্তিতে তারিখ গণনা করা হবে। যে সকল অঞ্চলে প্রথম রাতে নতুন চাঁদ দেখা গেল সেখানে ঐ রাত থেকে পয়লা তারিখ আর অন্যান্য অঞ্চলে পরের রাত থেকে পয়লা তারিখ গণনা করবেন? না প্রথম চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই একটি বৈশ্বিক তারিখ গণনা করা হবে?

ড. মাহবুবুর রহমানের বক্তব্য, একেই ফিকহের পরিভাষায়-

اختلاف المطالع معتبر أم لا

বলা হয়। ড. মাহবুব লিখেছেন-

“এ প্রশ্নের জবাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দেড় হাজার বছরের এ সুদীর্ঘ সময়কালে রচিত সকল ফিকহ গ্রন্থে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, হানাফী, হাম্বলী, মালেকী মাযহাবের ঐক্যমতে এবং শাফেয়ী মাযহাবের একদলের মতে পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দেখা গেলে সমগ্র পৃথিবীর জন্য ঐ চাঁদ চান্দ্রমাসের ১ তারিখ নির্ধারণ করবে এবং ঐ দিন থেকেই সমগ্র পৃথিবীতে বিশ্বজনীন ১ তারিখ গণনা শুরু হবে। ফলে সমগ্র পৃথিবীতে একই দিনে রোযা, ঈদ, কুরবানী, আইয়্যামে তাশরীকসহ চান্দ্রমাসের তারিখ নির্ভর সকল ইসলামী ইবাদাত পালিত হবে। নিম্নে উপস্থাপিত বিশ্বমানের ফিকহ গ্রন্থের তথ্যসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত।

অনেক বিশ্বমানের ফিকহী কিতাবে চাঁদ দেখার ব্যাপারে যে সকল মতামত প্রদান করা হয়েছে সংক্ষেপে সূত্রসহ তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।”

এই উদ্ধৃতিতে কয়েকটি দাবি আছে :

ক. চান্দ্রমাসসমূহের সূচনা গোটা পৃথিবীর জন্য প্রথম চাঁদ দেখার ভিত্তিতে হওয়া চাই।

এ বিষয়টির শিরোনাম,

توحيد أوائل/بدايات الشهور القمرية/العربية

এটি একটি নতুন ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়; যে সম্পর্কে বিভিন্ন ফিকহী ও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় বোর্ড কয়েক বছর যাবৎ চিন্তা-ভাবনা করছে। আমাদের জানামতে তাফসীর-গ্রন্থ, হাদীসের ভাষ্য-গ্রন্থ ও ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবসমূহে এ বিষয়টি আলোচনায় আসেনি। কিন্তু ড. মাহবুব সাহেবের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি একে ফিকহী মাসআলা মনে করেন। আর তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, এ মাসআলা ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবসমূহে সুস্পষ্টভাবে আছে এবং এ বিষয়ে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী তিন মাযহাবের এই ঐকমত্যপূর্ণ সমাধান উল্লেখিত হয়েছে যে, পৃথিবীর যেখানেই চাঁদ দেখা যাক গোটা দুনিয়ায় এরই ভিত্তিতে পয়লা তারিখ গণনা করা হবে।

কিন্তু সামনে গিয়ে যত বরাত তিনি নকল করেছেন কোনোটিতেই তার এ দাবির উল্লেখ নেই। যে বরাতগুলো সঠিক তাতে শুধু এটুকু কথা আছে যে, রোযা রাখা ও রোযা ছেড়ে ঈদ করা-কোনোটিতেই উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। বলাবাহুল্য, শুধু এটুকু দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, মুজতাহিদ ইমাম ও পূর্ববর্তী ফকীহগণ বিশ্বব্যাপী চান্দ্রমাসের শুরু এক করার প্রসঙ্গকে আলোচ্য বিষয় বানিয়েছেন বা একে কোনো শরয়ী হুকুম সাব্যস্ত করেছেন।

খ. ড. মাহবুবুর রহমানের উপরোক্ত বক্তব্যে দ্বিতীয় দাবি এই যে, সর্বপ্রথম চাঁদ দেখাকে ভিত্তি বানিয়ে বিশ্বব্যাপী রোযা, ঈদ, কোরবানী, আইয়ামুত তাশরীকসহ ঐ সকল ইবাদত, যা চান্দ্রমাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, একই দিনে আদায় করা হবে। তাঁর দাবি, এ বিষয়ে চার মাযহাবের তিন মাযহাবই একমত। শাফেয়ী মাযহাবের এক জামাত ফকীহের মাসলাকও তাই।

এ দাবির পক্ষেও তিনি কোনো বরাত দেননি। ঈদ ও রোযার ঐক্যের এ দাবিও নতুন। এর বয়স ষাট-সত্তর বছরের বেশি নয়। এটি পূর্ববর্তী ফকীহগণের আলোচনাতেই আসেনি। পনের শতকে যখন এ দাবি উঠল তখন সমসাময়িক ফকীহগণ এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং তাদের কেউ কেউ আগের ফকীহদের, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করেছেন তাদের মাসলাকে এর সমাধান ও সূত্র অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের এখানকার গবেষকগণ বিশ্বব্যাপী একই দিনে সওম ও ঈদের এই নতুন চিন্তা ও দাবিকে কুরআন-হাদীসের সরাসরি মর্ম ও মুজতাহিদ ইমাম ও পূর্ববর্তী ফকীহগণের স্পষ্ট ফতোয়া সাব্যস্ত করছেন! অথচ দলীলের বিস্তারিত আলোচনায় গেলে কোনো আয়াত বা হাদীসের তরজমার পর যখন দেখেন যে, দাবি প্রমাণ হচ্ছে না তখন নিজের তরফ থেকে ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যাখ্যায় নিজ দাবি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। কিন্তু তাফসীরের স্বীকৃত কোনো উৎস থেকে নিজ ব্যাখ্যার সঠিক কোনো উদ্ধৃতি পেশ করতে পারেন না।

তদ্রূপ যখন ফিকহের কিতাবের বরাত নকল করেন তখন উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার বরাত নকল করেই মনে করেন যে, তারা সওম ও ঈদ একই দিনে হওয়ার বরাত পেশ করেছেন। এমনকি শুধু বৈধতার নয়; ফরয হওয়ার বরাত! নাউযু বিল্লাহিল আযীম।

পাঠকবৃন্দের কাছে নিবেদন, তারা যেন আলকাউসারের জুমাদাল উখরা ১৪৩৫ হিজরী সংখ্যায় ''উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অপরিহার্য অর্থ এই নয় যে, সওম ও ঈদে বৈশ্বিক ঐক্য শরীয়তের আদেশ'' সংক্রান্ত আলোচনা আরেকবার পাঠ করেন।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ-এর তাফসীর সম্পর্কে

ড. মাহবুবুর রহমান পুস্তিকার ৬ পৃষ্ঠায় নিজ দাবির পক্ষে সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতের এ অংশ পেশ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

তরজমা করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ (রমযান) মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। ... (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

এরপর লিখেছেন, ''এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোযা পালন করার শর্ত হিসেবে রমযান মাসের উপস্থিতিকে উল্লেখ করেছেন। এখন দেখা যাক যে, মাসের উপস্থিতি বলতে কী বুঝায়। পৃথিবীর আকাশে কোথাও নতুন চাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেই সারা বিশ্বময় চাঁদের উপস্থিতি প্রমাণিত হবে এবং পৃথিবীতে মাস শুরু হবে।'' (পৃষ্ঠা : ৬)

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, আয়াতের অর্থ শুধু এটুকু যে, যে ব্যক্তি রমযানে উপনীত হল, (রমযান পেল) তাকে রোযা রাখতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই, আয়াতে مَنْ শব্দটি 'আম' (ব্যাপক)। এ কারণেই গোটা বিশ্বের লোকদের উপর রোযা ফরয। কোনো অঞ্চল ও কোনো যুগের লোক এ বিধানের বাইরে নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মাসের সূচনা ও সমাপ্তি কীভাবে প্রমাণিত হবে। রমযান ও শাওয়ালের উপস্থিতি কীভাবে সাব্যস্ত হবে এবং এর বিধিবিধান কী-এ সকল বিষয়ে এ আয়াত নীরব।

মুফাসসির মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আশূর (১২৯৬-১৩৯৪ হি.) কী সুন্দর বলেছেন-

ولهذا فليس في الآية تصريح على طريق ثبوت الشهر، وإنما بينته السنةُ بحديث : لا تصوموا حتى تروا الهلال ...

মাস কীভাবে প্রমাণিত হবে এ আয়াতে এর স্পষ্ট বর্ণনা নেই। এর বর্ণনা আছে সুন্নাহয়-

... لا تصوموا حتى تروا الهلال

(আততাহরীর ওয়াত তানভীর, ইবনে আশূর ২/১৭২)

তো এ আয়াতে মাস প্রমাণিত হওয়ার বিবরণই নেই। উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া-না হওয়া তো অনেক দূরের কথা। এ কারণেই ড. মাহবুবকে বলতে হয়েছে, ''এখন দেখা যাক যে, মাসের উপস্থিতি বলতে কী বোঝায়।'' কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব তিনি কোনো আয়াত থেকে দেননি; বরং তিনি আমাদের নিজের মত সম্পর্কে অবগত করেছেন। আর তা এই যে, কোথাও নতুন চাঁদ প্রমাণিত হলে গোটা বিশ্বের জন্য চাঁদ প্রমাণিত হয়ে যাবে। অথচ যে আয়াত তিনি পেশ করেছেন এ আয়াতে বা অন্য কোনো আয়াতের অর্থে এ কথাটি নেই।

এখন বাইরের যে দলীল দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় তা যদি অকাট্য না হয় এবং তার উপর ইজমা না হয়ে থাকে তাহলে একে আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখিত বিধানের মতো অকাট্য সাব্যস্ত করাও সঠিক হবে না এবং এতে অন্য কোনো ফকীহের ইজতিহাদ-ভিত্তিক মতকে বাতিল বা আয়াত বিরোধী সাব্যস্ত করারও অবকাশ থাকবে না।

আলোচ্য মাসআলার অবস্থাও এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য কি না-তা এ আয়াতের বিষয়বস্তুও নয় আর না এর বিধান এ আয়াতে সরাসরি উল্লেখিত হয়েছে। মাসে উপস্থিতির যে প্রায়োগিক অর্থ অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হবে তার যেটুকু অংশ 'কতয়ী' (অকাট্য) তা কতয়ীভাবে আর যেটুকু অংশ 'যন্নী' তা যন্নীভাবে এ আয়াতের বিধানগুলোতে শামিল হবে। এ কারণে শুধু এ আয়াতের বরাত দিয়ে সংশ্লিষ্ট ইজতিহাদী বিষয়কে কতয়ী (অকাট্য) ও ইজমায়ী (সর্ববাদীসম্মত) বানানোর কোনো উপায় নেই।

ড. মাহবুব সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের বর্ণনার আলোকেই চিন্তা করুন। এতে তারা সামনে গিয়ে 'মাসে উপস্থিতি' কীভাবে হয়-এ সম্পর্কে 'তাফসীরে কাবীর' ও 'তাফসীরে বাইযাবী'র বরাত নকল করেছেন। বাইযাবীর বরাতে লিখেছেন-

يثبت شهود هذا الشهر برؤية البصر أو بالسماع

অর্থাৎ, নতুন চাঁদ দেখা বা চাঁদ উদয়ের সংবাদ শোনার দ্বারাই মাস

প্রমাণিত হবে। (পৃ. ১০)

পুস্তিকার লেখকগণ ভেবেছেন যে, এটুকু দ্বারাই সওম ও ঈদের ঐক্য কুরআন দ্বারা প্রমাণ হয়েছে। অথচ রাযী ও বাইযাবী এ কথা আয়াতের অর্থ হিসেবে বলেননি; বরং আয়াতে অনুল্লেখিত একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়কে হাদীসের আলোকে অতি সংক্ষেপে বলেছেন যে, মাস প্রমাণিত হয় সে মাসের নতুন চাঁদ দেখা বা দেখার সাক্ষ্য পাওয়ার মাধ্যমে। এখানে তারা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়াকে রদ করেননি; শুধু এটুকু যে, এ বিষয়ের অবতারণা এখানে করেননি। নতুবা রাযী ও বাইযাবী দু'জনই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। বলাইবাহুল্য, তারা উদয়স্থলের ভিন্নতা স্বীকার করবেন।

ফিকহ-ফতোয়ার উপর রাযীর কোনো কিতাব মুদ্রিত আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু বাইযাবীর কিতাব ''আলগায়াতুল কুস্‌ওয়া ফী দিরায়াতিল ফাতওয়া'' মুদ্রিত। তাতে কিতাবুস সওমে (সওম অধ্যায়ে) তিনি লেখেন-

ورؤية الهلال تثبت بشهادة عدلين، وفي رمضان بعدل على الأصح، احتياطا للعبادة ...، ويتعدى حكمه إلى ما دون مسافة القصر، فإنها حد البعد شرعا، وقيل : إلى ما هو من ذلك الإقليم، ورد بأن تحكيم المنجمين قبيح شرعا.

الغاية القصوى في دراية الفتوى، عبد الله بن عمر بيضاوي (٦٨٥ هـ)، ١/ ٤٠٣-٤٠٤، القاهرة ١٤٠٠هـ

এখানে বাইযাবী বলেছেন যে, রমযানের চাঁদ এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর অন্যান্য মাসের চাঁদ দুই বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা। এরপর চাঁদের হুকুম কতদূর পর্যন্ত যাবে-এ প্রসঙ্গে নিজ মাযহাব অনুসারে বলেছেন, কসরের দূরত্ব পর্যন্ত চাঁদের হুকুম যাবে।

এখন চিন্তা করুন, পুস্তিকায় উদ্ধৃত বক্তব্যে বাইযাবীর উদ্দেশ্য যদি তা-ই হত যা এঁরা বলছেন অর্থাৎ যেখানেই চাঁদ প্রমাণিত হোক গোটা পৃথিবীর জন্য মাসের উপস্থিতি সাব্যস্ত হবে এবং সবার উপর রোযা

ফরয হবে! আর এ কথা সরাসরি আয়াতের অর্থ হওয়ার কারণে অকাট্য! সুতরাং নিজ দেশে চাঁদ দেখার অপেক্ষায় যে থাকবে সে ফরয তরককারী! বাইযাবীর ঐ বরাতের অর্থ যদি এ-ই হত তাহলে ''আলগায়াতুল কুসওয়া'' কিতাবে তিনি ঐ কথা কীভাবে লিখতে পারেন, যা উপরে নকল করা হয়েছে?

তদ্রূপ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহ.-এর যে বরাত নকল করা হয়েছে তাতেও সংক্ষেপে মাসে উপস্থিতির উপায় বলা হয়েছে। উদয়স্থলের ভিন্নতা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়নি এবং তা রদও করা হয়নি। এই বরাত দ্বারা তা রদ প্রমাণ করতে যাওয়া সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

ফখরুদ্দীন রাযী রাহ.-এর তাফসীরের এক শানদার মুখতাসার (সংক্ষেপণ) প্রস্ত্তত করেছেন ইমাম নেযামুদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মাদ নিশাপুরী (৭২৮ হি.), যার নাম ''গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান''। এতে তিনি উপরোক্ত আয়াত- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ এর আলোচনায় লেখেন-

وأما أن الشهر بمَ يثبت حتى يعتبر الشهود فيه فقد قال صلى الله عليه وسلم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاستكملوا العدة ...

ومهما شهد عند القاضي عدل واحد أنه رأى الهلال ثبت ...، ولا يثبت الهلال في سائر الشهور إلا برؤية عدلين، وعند أبي حنيفة : يثبت هلال رمضان في الغيم بواحد، وفي الصحو تعتبر الاستفاضة.ڽڽ وإذا رؤي في موضع شمل الحكم لمن هو على ما دون مسافة القصر منه، ولا يجب الصوم بذلك على من عداهم.

(গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান ১/৫০৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত ১৪১৬ হি.)

এখানে নেযামুদ্দীন নিশাপুরী রাহ. হাদীসের আলোকে মাসে উপস্থিতির পদ্ধতি বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, কোথাও যদি চাঁদ দেখা যায় তাহলে এর হুকুম সফরের দূরত্ব পর্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের শামিল করবে। এর বাইরের লোকদের উপর শুধু এ চাঁদ দেখার কারণে রোযা ওয়াজিব হবে না।

দূরের অঞ্চল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সফরের দূরত্বকে মানদন্ড বানানো দলীলের বিচারে কতদূর শক্তিশালী তা ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে। এখানে আমার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু জানানো যে, কোনো লেখক যদি মাস প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন যে, চাঁদ দেখা বা চাঁদের সংবাদ শোনার দ্বারা মাসের সূচনা প্রমাণিত হবে তাহলে এ থেকে এ কথা বুঝে নেওয়া সম্পূর্ণ ভুল যে, তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ইতিবার করার মাসলাক রদ করেছেন এবং তিনি নিকট ও দূরের পার্থক্য অস্বীকার করেছেন। আর তিনি প্রথম চাঁদ দেখাকে গোটা বিশ্বের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় হওয়াকে উল্লেখিত আয়াতের সরাসরি অর্থ মনে করেছেন! কারণ এগুলো তো আলাদা আলাদা বিষয় : **এক.** মাস প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি **দুই.** এক অঞ্চলের নতুন চাঁদ দেখা কতদূর পর্যন্ত অবশ্য-অনুসরণীয়। প্রথম মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ যদি বলেন, এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির চাঁদ দেখা সবার পক্ষ হতে যথেষ্ট তাহলে এর অর্থ এই হয় না যে, এ চাঁদ দেখা গোটা বিশ্বের জন্য যথেষ্ট; বরং এর অর্থ, একজনের দেখা যথেষ্ট, প্রত্যেককে আলাদা করে দেখতে হবে না। ড. মাহবুবুর রহমানসহ একাধিক লেখক এখানে এ গোলমাল করেছেন যে, প্রথম মাসআলা-সংক্রান্ত বরাতকে দ্বিতীয় মাসআলার উপর প্রয়োগ করেছেন এবং সেই ফকীহগণের দিকে এমন কথা সম্বন্ধ করে দিয়েছেন যা তারা বলেননি।

এই কর্মপন্থার বিচ্যুতি পরিষ্কার হওয়ার জন্য এ দিকটিও চিন্তা করুন, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নিকট ২৯ শাবান রাতে, তেমনি ২৯ রমযান রাতে চাঁদ খোঁজার সময় যদি আকাশ একদম পরিষ্কার থাকে তাহলে দুই জনের সাক্ষ্যও যথেষ্ট নয়; বরং চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য জম্মে গাফীর (অনেক মানুষের) সংবাদ জরুরি।

অথচ তিন মাযহাবের ইমামদের কাছে দুই বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট; বরং রমযানে তাদের কাছে এ ক্ষেত্রেও এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

এখন যদি ঐ ইমামদের সমর্থনে কোনো লেখক এ দাবি করে যে, আয়াতে মাসে উপনীত হওয়ার কারণে রোযা ফরয করা হয়েছে। এক বা দুই বিশ্বস্তের সাক্ষ্য দ্বারা যখন মাস প্রমাণিত হল তখন রোযা ফরয হবে। অনেক লোকের সাক্ষ্য না পেলে রোযা না রাখা ফরয তরকেরই নামান্তর ও তা কুরআনী হুকুম অস্বীকার করার শামিল।

আমার প্রশ্ন, এ লেখকের এই দাবির বিষয়ে ড. মাহবুবুর রহমান সাহেব ও ড. আবদুল্লাহ মা'রূফ সাহেব কী বলবেন? ইনসাফের সাথে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তাঁরা যে আয়াতে কারীমা- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ -এর উদ্ধৃতিতে উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করছেন তা-ও এ প্রকারের।

সারকথা, যে হুকুম সম্পর্কে আয়াত নীরব এবং অন্য কোনো যন্নী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কারণে তা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফীর আওতাভুক্ত তাতে কোনো একটি মতকে আয়াতের অকাট্য অর্থ সাব্যস্ত করে অন্য মতকে নাকচ করে দেওয়া ভুল ও তাফসীরের সর্বসম্মত নীতির বিরোধী।

ড. মাহবুবুর রহমানের কাছে অনুরোধ, তিনি যেন এ মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ উছাইমীনের বক্তব্যগুলো পাঠ করেন। তিনি তো উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার উপর এ আয়াত-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

দ্বারা দলীল দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, আয়াতে ঐ সকল লোককে রোযা রাখতে বলা হয়েছে, যারা মাস পেয়েছে। সুতরাং যারা মাস পায়নি তাদের উপর রোযা ফরয হবে না। যাদের আকাশে চাঁদই নেই তারা তো মাস পায়নি। আমরা কীভাবে তাদেরকে রোযা রাখার আদেশ করব?

শায়খ উছাইমীনের উদ্দেশ্য এই যে, যদি মাসের সূচনায় ভিন্নতার

কোনো ইতিবার না থাকে তাহলে তো মাসের সূচনার ভিত্তিতেই রোযার আদেশ করা সম্ভব হত। অর্থাৎ এভাবে যে, যখন রমযান আসে তো তোমরা এর রোযা রাখ। এমনটা কেন বলা হল যে, তোমাদের মধ্যে যে রমযান পাবে সে যেন এর রোযা রাখে। চাঁদের ভিন্নতা ইতিবার না করলে সাধারণ অবস্থায় কারো কি রমযান না পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে, যে কারণে শুধু রমযান যারা পাবে তাদেরই রোযা রাখার আদেশ করা হল?

আমার কাছে শায়খ উছাইমীনের এ ব্যাখ্যাও ইজতিহাদী। এ কারণে একেও সরাসরি আয়াতের অর্থ সাব্যস্ত করা যায় না। সুতরাং তার আলোচনাও কতয়ী নয়, যন্নী। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ব্যাখ্যা ড. মাহবুবুর রহমান সাহেব ও তার সঙ্গীদের ব্যাখ্যা থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট।

হেলাল কি শুধু কয়েক মিনিটের নতুন চাঁদের নাম

ড. মাহবুবুর রহমান সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াত দ্বারাও দলীল দিয়েছেন। তিনি লেখেন,

‘‘অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

অর্থ : ‘‘হে রাসূল সা. মানুষ আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এগুলো মানুষের জন্য সময় নির্ধারক।’’ [২:১৮৯]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আয়াতে الأهلة শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ একেবারে (কয়েক মিনিটের) নূতন চাঁদ। প্রতি চান্দ্রমাসে চাঁদ একদিনই নূতন থাকে। পূর্ববর্তী চন্দ্রমাস শেষ হওয়ার পরে, আবার নতুন করে পৃথিবীর আকাশে সর্বপ্রথম যে চাঁদ দেখা যায়, ঐ চাঁদই হচ্ছে নতুন চাঁদ [তাফসিরে কাবীর ২য় খন্ড পৃঃ-২৫৫-২৫৬; তাফসিরে বায়যাবী] এবং প্রতি মাসে চাঁদ একদিনই নতুন থাকে। পরবর্তী দিনগুলোর চাঁদ কখনোই নতুন নয়। আরো লক্ষ্যণীয় যে,

অত্র আয়াতের মধ্যে للناس *শব্দের শুরুতে* ال *টি জাতিবোধক। সমগ্র মানব জাতির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।''* (পৃষ্ঠা : ৭)

এ কথা তো সঠিক যে, الناس শব্দে আলিফ-লাম 'ইসতিগরাকে'র জন্য। এ কারণে এতে প্রত্যেক অঞ্চলের প্রত্যেক মুকাল্লাফ ইনসান শামিল। আর নতুন চাঁদ প্রত্যেকের জন্যই মীকাত (সময় নির্ধারক) কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কয়জনের দেখা দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হবে, এক অঞ্চলের দেখা অন্যসব অঞ্চলের জন্য অবশ্য-পালনীয় কি না- এ বিষয়ে আয়াত নীরব। অন্য দলীল থেকে এর সমাধান নিতে হবে। অন্য দলীল প্রমাণাদি থেকে এর সমাধান তালাশ করতে গেলে এ বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে সামনে আসবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, সকলেই কুরআনে কারীমের নির্দেশনা অনুযায়ী হিলালকেই মীকাত হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং হিলালের ভিত্তিতেই রোযা-ঈদ পালন করতেন। অথচ এরপরও এমন একটি ঘটনা আজ পর্যন্ত পেশ করা সম্ভব হয়নি যাতে তাঁরা অন্য অঞ্চলে তাঁদের পূর্বে নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে কি না তা জানার জন্যে চেষ্টা তদবীর করেছেন। কিংবা পরবর্তীদের জন্য এমন কোনো নির্দেশনা দিয়ে গেছেন!!

এখন যদি পুরো পৃথিবীর যেখানে সর্বপ্রথম নতুন চাঁদ দেখা গেল সেটাই হিলাল হয় আর অন্য উদয়স্থল-ওয়ালাদের প্রথম চাঁদ হিলাল না হয় তাহলে তো একথা বলতে হবে যে, -নাউযুবিল্লাহ- ইসলামের অনুসরণীয় তিন যুগের মানুষেরা হিলাল বা নতুন চাঁদকে মীকাত নির্ধারণ করে রোযা-ঈদ পালন করা থেকে মাহরূম থেকেছেন!!!

একটু চিন্তা করুন, যদি কেউ কোনো আয়াতের তাফসীর এমনভাবে করে যার দ্বারা ঐ সকল মনীষী-যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সত্যের মাপকাঠি বানিয়েছেন তাঁদের আমলই আয়াতের বিপরীত হওয়া আবশ্যক হয়, তখন কি সেই তাফসীরকে সহীহ বলার বা মানার কোনো সুযোগ থাকে?! এজন্য يسئلونك عن الأهلة এই আয়াতের মর্মকে

এই অর্থের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যে, এর দ্বারা পুরো পৃথিবীর প্রথম নতুন চাঁদই একমাত্র উদ্দেশ্য, গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা এর দ্বারা সালাফে সালিহীন-এর কর্মপন্থা আয়াতের অধীনে থাকছে না, আর সে কথা কল্পনা করাও তো মহা অপরাধ।

'হিলাল' অর্থ নতুন চাঁদ। আর চাঁদ শুধু এক দিনই নতুন থাকে (অথচ তিনি ইতিপূর্বে লিখেছেন যে, কয়েক মিনিটের নতুন চাঁদ হচ্ছে হেলাল)- এ কথা বলে এ আয়াতের মাধ্যমে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাক রদ করা ঠিক নয়। কারণ প্রথমত আলাদা উদয়স্থলের অধিবাসীদের যখন চাঁদ দৃষ্টিগোচর হবে তখন তাদের জন্য তা নতুন চাঁদই হবে। আর এমনিতেও আরবী ভাষায় শুধু প্রথম দিনের নয়, দ্বিতীয় দিনের চাঁদকেও হেলাল বলে। এ আমার নিজের কথা নয়, স্বয়ং পুস্তিকায় তাফসীরে কাবীরের যে বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, প্রথম দিনের চাঁদের নামই হেলাল, ওখানেই এ কথা আছে, ড. মাহবুবুর রহমানের কথা ওখানে নেই।

তাফসীরে কাবীরের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন-

"الأهلة جمع هلال، وهو أول حال القمر حين يراه الناس، يقال له : هلال، ليلتين من أول الشهر ثم يكون قمرا بعد ذلك."

অর্থাৎ চাঁদের প্রথম অবস্থায়, যখন তা লোকে দেখে, হেলাল বলে। মাসের শুরুতে দুই রাত পর্যন্ত এর নাম হেলাল। এরপর 'কমর।' (তাফসীরে কাবীর, ফখরুদ্দীন রাযী ২/২৮১; সূরাতুল বাকারার ১৮৯ নং আয়াতের আলোচনায়)

আরবী অভিধান-গ্রন্থসমূহেও আছে যে, এক মত অনুসারে 'হেলাল' যদিও প্রথম রাতের চাঁদকে বলে, কিন্তু যেমনটা ইমাম আবু ইসহাক বলেছেন, অধিকাংশ (ভাষাবিদদের) কাছে দ্বিতীয় রাতের চাঁদকেও 'হেলাল' বলে।

(والذي عندي وما عليه الأكثر أن يسمى هلالا ابن ليلتين، فإنه في الثالثة يتبين ضوؤه)

দ্র. লিসানুল আরব ১১/৭০৩; তাজুল আরূস ৩১/১৪৪; আলমিসবাহুল মুনীর, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইয়ূমী (৭৭০ হি.) পৃ. ৩২৯ (هلل)

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেল। এজন্য এ পুস্তিকার উপর আরো পর্যালোচনা কঠিন। সামনের সাধারণ পর্যালোচনা অংশ অবশ্যই পাঠ করুন। তবে দু-একটি কথা এখানে আরো নিবেদন করছি :

১. পৃষ্ঠা ১১তে تراءى الناس الهلال -এর তরজমা করা হয়েছে, 'কিছু সংখ্যক মানুষ নতুন চাঁদ দেখল।' এ তরজমা ভুল। এ তো رآى -এর তরজমা। হাদীসের শব্দ تراءى الناس অর্থাৎ লোকেরা সম্মিলিতভাবে চাঁদ দেখার চেষ্টা করল। (চাঁদ দেখার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল)।

পুস্তিকায় যেহেতু হাদীসের প্রথম শব্দের তরজমা ভুল করা হয়েছে এজন্য সামনের অংশে কথা পুরা করার জন্য নিজের পক্ষ হতে সংযোজন করতে হয়েছে।

২. পৃষ্ঠা ২০-এ এ পুস্তিকার দাবির উপর হাদীস-

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

-এর দ্বারা দলীল দেওয়া হয়েছে আর পৃষ্ঠা ১৩তে বলা হয়েছে-

"দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার সহীহ মুসলিম শরীফে। মুসলিম শরীফের যে পৃষ্ঠায় হাদীসটির বর্ণনা রয়েছে সে পৃষ্ঠায়ই হাদীসটির অর্থ করা হয়েছে এভাবে-

قوله صلى الله عليه وسلم :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، المراد رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل انسان، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح، هذا في الصوم، أما الفطر، فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء.

এবং চাঁদ দেখার প্রমাণ সাপেক্ষে তোমরা রোযা ছাড়, ঈদ কর।" এর

অর্থ হলো কিছু মুসলমানের দেখার মাধ্যমে উদয় প্রমাণিত হওয়া। এ শর্ত করা যাবে না যে প্রত্যেক মানুষেরই চাঁদ দেখতে হবে। বরং যে কোন দেশের যে কোন দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দেখাই সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। বরং সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে রোযার ক্ষেত্রে একজন সৎ ব্যক্তির দেখাই সকলের আমলের জন্য যথেষ্ট। আর অধিকাংশ ফকিহগণের মতে শাওয়ালের নুতন চাঁদ প্রমাণের জন্য একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না। এ ক্ষেত্রে তারা দুজনের কথা বলেছেন। (মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, পৃঃ-৩৪৭, শরহে নাবাবী) (ড. মাহবুবের পুস্তিকা পৃ. ১৩-১৪)

এক তো এখানে নববী রাহ.-এর ইবারতের তরজমাতেও কিছু সমস্যা করা হয়েছে। কিন্তু বড় কথা এই যে, এ বর্ণনায় নববীর বিষয়বস্তু, কতজন লোকের চাঁদ দেখার দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হবে। এখানে এ আলোচনা নেই যে, চাঁদ প্রমাণিত হলে এর হুকুম গোটা বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য হবে, না বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ এটা আলাদা মাসআলা। এ সম্পর্কে নববী রাহ. সামনের পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন। ওখানে তিনি লিখেছেন-

باب بيان أن لكل بلد رؤيته، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنه، فيه حديث كريب عن ابن عباس، وهو ظاهر الدلالة للترجمة، والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قَرُب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وقيل : إن اتفق المطلع لزمهم، وقيل : إن اتفق الإقليم وإلا فلا، وقال بعض أصحابنا : تعم الرؤية في موضع جميعَ أهل الأرض، فعلى هذا نقول : إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب، لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا، وإنما رده، لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد.

(শরহে সহীহ মুসলিম, নববী ১/৩৪৮)

এখানে নববী রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতার আলোচনা করেছেন এবং পরিষ্কার বলেছেন যে, এক অঞ্চলের লোকের চাঁদ দেখার হুকুম অন্য সকলের উপর প্রযোজ্য হয় না।

চিন্তা করুন, তাঁর এ স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও একথা বলা যে, নববী রাহ.-এর কাছে صوموا لرؤيته অর্থ হচ্ছে, একজনের চাঁদ দেখা গোটা বিশ্বের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয়, বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া আর কী হতে

পারে?

এ ধরনের অপ্রাসঙ্গিক বরাত দলীল হিসেবে উপস্থাপনের নযীর এ পুস্তিকায় কম নয়, কিন্তু কত লেখা যায়।

৩. একটি বড় আপত্তিকর কাজ এ পুস্তিকায় এই করা হয়েছে যে, বিভিন্ন কিতাবের বরাত অসম্পূর্ণ উল্লেখ করে দাবি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। যদি পুরো বরাত উল্লেখ করা হত তাহলে বিপক্ষ মতটির উল্লেখ ও তার সমর্থন এ কিতাবগুলো থেকেই প্রমাণিত হতে পারত। তাবয়ীনুল হাকায়েক, যায়লায়ী; ফিকহুস সুন্নাহ, সাইয়েদ সাবেক; মাআরিফুস সুনান; ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহর বরাত নকল করার ক্ষেত্রে এমনটিই হয়েছে; বরং পৃষ্ঠা ১৮ তে ফিকহুস সুন্নাহর উদ্ধৃতিতে তো স্পষ্ট বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আর কিছু কিছু কিতাবের উদ্ধৃতির তরজমাও ভুল করা হয়েছে। যেমন ২১ পৃষ্ঠায় মাআরিফুস সুনানের যে অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি নকল করা হয়েছে তার তরজমাও সহীহ করা হয়নি।

আমি শুধু ফিকহুস সুন্নাহ ও ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহর বরাত সম্পর্কে কিছু আরজ করছি।

ড. মাহবুব ফিকহুস সুন্নাহর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন- ...অতএব উম্মতের মধ্য থেকে যে কেউ যে কোনো স্থান থেকে চাঁদ দেখুক উক্ত দেখাই সকল উম্মতের জন্য দলিল হবে। এমত পোষণ করেছেন হযরত ইকরামা, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম এবং ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। হানাফী ফকীহগণের এটাই বিশুদ্ধমত। (আল-ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড : ১, পৃ : ৩০৭)

ড. মাহবুবের পুস্তিকায় (পৃ. ১৮) ফিকহুস সুন্নাহকে 'আল-ফিকহুস সুন্নাহ' কীভাবে লিখলেন তা তিনিই ভালো জানেন। কিন্তু সাইয়েদ সাবেকের পুরো বক্তব্যকেই যে তিনি পাল্টে দিলেন এর হিসাব নিবে কে?!

ফিকহুস সুন্নাহয় সাইয়েদ সাবেক রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাক উল্লেখ করার পর লেখেন-

وذهب عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم، وإسحاق، والصحيح عند الأحناف، والمختار عند الشافعية أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم.

لما رواه كريب قال : قدمت الشام ... رواه أحمد ومسلم والترمذي.

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم.

অর্থ : ইকরিমা, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, সালিম ও ইসহাকের মাযহাব এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য অন্যদের চাঁদ দেখা তাদের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। হানাফীদের কাছে এটিই সহীহ কওল। শাফেয়ীদের মুখতার মাসলাকও এটিই।

তাদের দলীল কুরাইবের বর্ণনা ..., যা আহমাদ, মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস সহীহ। (হাসান, সহীহ, গরীব) এবং আহলে ইলমের কাছে এ হাদীস অনুসারেই আমল যে, প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। (ফিকহুস সুন্নাহ, সাইয়েদ সাবিক, সিয়াম অধ্যায়)

পাঠকবৃন্দ দেখুন, 'ফিকহুস সুন্নাহ'র বরাত উল্লেখের ক্ষেত্রে কী মারাত্মক গরমিল করা হয়েছে যে, বক্তব্যই পবিরর্তন হয়ে গেছে। যেখানে সাইয়েদ সাবিক রাহ., ইকরিমা, কাসিম, সালিম ও ইসহাকের মাসলাক এই বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছে প্রত্যেকের অঞ্চলে নিজ নিজ চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য সেখানে ড. মাহবুব তাদের ঐ লোকদের মধ্যে শামিল করছেন যাদের কাছে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়।

তেমনি সাইয়েদ সাবিক রাহ. বলছেন যে, হানাফীদের সহীহ মাসলাক ও শাফেয়ীদের মুখতার মাসলাক এ-ই যে, প্রত্যেক অঞ্চলে

নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসরণীয় সেখানে ড. মাহবুব হানাফীদের সহীহ মাসলাক বলছেন উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য না হওয়াকে!

আমার জানা নেই, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে এ ধরনের বিকৃতি কেন করা হল এবং এর প্রয়োজনই বা কেন হল?!

এরপর ''ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহ''-এর বরাতের অবস্থা দেখুন :

২৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে :

''উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও পীর আল্লামা রশীদ আহমদ গাংগুহী রাহ-এর ভাষ্য নিম্নরূপ-

جواب : اختلاف مطالع صوم اور افطار میں تو ظاہر روایت میں معتبر نہیں مشرق کی رویت مغرب والوں پر ثابت ہو جاوے گی اگر حجت شرعیہ سے ثابت ہوئے مگر ...

এখানে 'ফতোয়া রশীদিয়্যাহ'র বরাত অসম্পূর্ণ নকল করা হয়েছে। উর্দুতে তো যা হোক '...' চিহ্ন ব্যবহার করে কিছু ইশারাও করা হয়েছে, কিন্তু এখানে এ ইশারা এজন্য যথেষ্ট নয় যে, অনুল্লেখিত অংশে এ পুস্তিকার দাবির বিপরীত কথা রয়েছে।

রশীদিয়্যাহ-এর উল্লেখিত ইবারতের পর আছে-

مگر قربانی، اور صلوة عید، ذی الحجہ اور حج میں معتبر ہوگا، كما حققه في رد المحتار.

অর্থ, কিন্তু কুরবানী, ঈদের নামায, যিলহজ্ব ও হজ্বে ধর্তব্য হবে। যেমনটা রদ্দুল মুহতারে আলোচনা করা হয়েছে।

(ফতোয়া রশীদিয়্যাহ ১/১১১ মুদ্রণে, মাকতাবায়ে ফকীহুল উম্মত, দেওবন্দ)

এটা ঠিক যে, এ মতের উপর হাকীমুল উম্মত থানবী রাহ. ''ইমদাদুল

ফাতাওয়া''য় আপত্তি করেছেন এবং উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতেও উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। কিন্তু এ কারণে তো হযরত গংগূহী রাহ.-এর মত বদলে যাবে না। যখন তারা গংগূহী রাহ.-এর ফতোয়া পেশ করছেন তখন তা হুবহু পেশ করাই অপরিহার্য ছিল। এরপর কোনো অংশের সাথে দ্বিমত থাকলে নোট দেওয়া যেত।

৪. ৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি আনা ছাড়া অনেক কিতাবের শুধু খন্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর লেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এগুলোতে পুস্তিকার দাবি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আফসোস এই যে, এ তালিকার অনেক কিতাব শিয়াদের লিখিত। প্রশ্ন এই যে, শাফেয়ী মাযহাবের প্রতি যাদের এত বিদ্বেষ এবং হানাফী মাযহাবের বড় বড় ফকীহগণের মাসলাক (উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হওয়া) যারা উল্লেখই করেননি তারা কেন শিয়াদের কিতাবাদির বরাত দিতে গেলেন। শিয়াদের মারাত্মক পর্যায়ের বিদআতী হওয়ার বিষয়ে তো কিছুমাত্র সংশয়ও নেই। এমনকি তাদের বহু ফের্কা এমন আছে, যারা বিদআতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে করতে কুফরী ও বেদ্বীনী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাহলে শিয়াদের কিতাবের বরাত কেন দেওয়া হল?

৫. আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ তালিকায় ''তাফসীরে মাজেদী''রও বরাত দেওয়া হয়েছে। আমি পাঠকবৃন্দের সামনে তাফসীরে মাজেদীর বক্তব্য তুলে দিচ্ছি। তারা দেখুন, তাফসীরে মাজেদীতে পুস্তিকার দাবির সমর্থন আছে, না স্পষ্ট বিরোধিতা!

সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতের অধীনে মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লেখেন,

"رویت ہلال معتبر کہاں کی ہوگی؟ فقہاء اسکے جواب میں بڑی بڑی موشگافیاں کی ہیں، لیکن صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ اسی شہر یا بستی کی یا قرب وجوار کی بستیوں کی. سینکڑوں ہزاروں میل دورسے رویت ہلال کی خبریں منگانے کا تار، ٹیلیفون، ریڈیو، وغیرہ کے ذریعہ سے انتظام کرنا یا کلکتہ کی رویت کو ۱۹۰۰ میل دور بمبئ پر حجت گردانتا شریعت اسلامی کی اصل روح پر ظلم کرنا ہے اختلاف مطالع ایك صریح مشاہدہ کی چیز ہے اسے کیونکہ جھٹلایا جاسکتا ہے، وحدت

امت یقینا ایك بڑی اہم چیز ہے لیکن اس کے لئے یہ زبردستی کی
کوششیں کرنا طبعی کو غیر طبعی کی حد تك پہنچا دیتا ہے"

কোথাকার চাঁদ দেখা গ্রহণীয় হবে-ফকীহগণ এর উত্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু সহজ ও স্পষ্ট কথা এই যে, ঐ শহর বা জনপদের কিংবা নিকটবর্তী জনপদের (চাঁদ দেখা গ্রহণীয়।) হাজার হাজার মাইল দূর থেকে চাঁদ দেখার খবর সংগ্রহের জন্য টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদির দ্বারা ব্যবস্থা করা বা কলকাতার চাঁদ দেখা ১৯০০ মাইল দূরে বোম্বাইয়ে দলীল মনে করা বস্ত্তত শরীয়তে ইসলামীর প্রকৃত রূহের উপর অত্যাচার করা।

উদয়স্থলের ভিন্নতা এক স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ বিষয়। একে কীভাবে অস্বীকার করা যায়? উম্মাহর ঐক্য নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এর জন্য এই জবরদস্তির চেষ্টা তো স্বাভাবিককে অস্বাভাবিকের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া। (তাফসীরে মাজেদী ১/৩৩৯ প্রকাশনায় : মজলিসে নশরিয়াতে কুরআন, নাযেম আবাদ, করাচী)

সামনে মাওলানা দরিয়াবাদী রাহ. এ বিষয়ে একাধিক বরাত উল্লেখ করেছেন যা আহলে ইলম তাঁর কিতাবে দেখতে পাবেন। উপরোক্ত উদ্ধৃতি তাফসীরে মাজেদীর *'পাক কোম্পানী'* উর্দু বাজার লাহোর প্রকাশিত এডিশনে পৃ ৯০-৯১ তে আছে।

এই হলো মাওলানা দরিয়াবাদী রাহ.-এর বক্তব্য। এখানে শক্তিশালীভাবে তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবকে উপস্থাপন করলেন। অথচ ড. মাহবুব তার নাম পেশ করেছেন উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশকারী হিসেবে!!

৬. বিস্তারিত আলোচনার তো সুযোগ নেই। তবে কিছু কথা ইনশাআল্লাহ 'সাধারণ পর্যালোচনা' অধ্যায়ে আসবে। এখানে শুধু আরেকটি কথা উল্লেখ করছি যা দিয়ে ড. মাহবুবুর রহমান তাঁর পুস্তিকা সমাপ্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

''আসুন আমরা হকের পক্ষে কথা বলি:

আলেম সমাজ ও আম জনতাকে আহবান জানাচ্ছি, আসুন আমরা সকল অসত্যের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসি, সঠিক দ্বীনী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সকল সমস্যার সমাধান করি। আজকের মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষের তৈরি সীমানা উপড়ে ফেলে মরোক্ক থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার, যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করবে এবং ইসলাম অনুযায়ী সমাধান প্রদান করবে, সকল মুসলমানকে একই তারিখে রোযা রাখা এবং ঈদ উদযাপন করার ঘোষণা প্রদান করবে এবং সকল উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করবে। **মূলতঃ একমাত্র ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রের পক্ষেই তা সম্ভব।** *আমিন।'' (পৃষ্ঠা : ৪৮)*

পাঠকবৃন্দ! ডক্টর সাহেবের এ কথা অবশ্যই মনে রাখুন। ইনশাআল্লাহ তা আপনাকে আলোচ্য বিষয়ের ধরন ও স্বরূপ বুঝতে সহায়তা করবে।

হায়! তিনি যদি তার এ কথার আলোকে নিজ পুস্তিকাটি সম্পাদনা করতেন! ▫ (চলবে ইনশাআলস্নাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

অক্টোবর ২০১৪, যিলহজ্ব ১৪৩৫

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন-১৩

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৪) এ কেমন দায়িত্বহীনতা?

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

‘চান্দ্র মাসের সঠিক তারিখ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটি’ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রচারিত, অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম (উজিরপুর, বরিশাল)-এর পুস্তিকাও হস্তগত হয়েছে, যার শিরোনাম- ‘রোজা, ঈদ, কুরবানীসহ চাঁদের তারিখনির্ভর সকল ইবাদত পালনে দেশবাসীর প্রতি জাতীয় হেলাল কমিটির এ কেমন দায়িত্বহীনতা?’

পূর্বোক্ত তিন পুস্তিকায় (শাবান-রমযান ও যিলক্বদ সংখ্যায় যেগুলোর উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।) যা আছে এর অতিরিক্ত কিছু এতে

নেই। তবে গালমন্দের মাত্রা এতে কিছু চড়া। আর আছে এক লক্ষ টাকার একটি চ্যালেঞ্জও। এ কারণে এ পুস্তিকার উপর বিস্তারিত পর্যালোচনার প্রয়োজন মনে করিনি।

হ্যাঁ, একটি বিষয় এতে অতিরিক্ত আছে। তা এই যে, একটি ভিত্তিহীন কথাকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আর একটি সহীহ হাদীসে নিজের পক্ষ হতে একটি কথা সংযোজন করে নিজ দাবির পক্ষে প্রমাণ সরবরাহের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভিত্তিহীন কথাকে হাদীস বানানো

পুস্তিকার ৩য় পৃষ্ঠায় সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াত উল্লেখ করে লেখা হয়েছে, 'এ আয়াত প্রমাণ করছে, দেশ-মহাদেশের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র মানবজাতির জন্য নতুন চাঁদ একক তারিখ নির্ধারণ করবে।'

এখানে 'একক' কথাটি প্রক্ষিপ্ত। লেখক নিজের ঝুলি থেকে তো আয়াতের মধ্যে সংযুক্ত করেছেন এরপর লিখেছেন, 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অনুরূপ আমল করেছেন। যেমন আবু দাউদ শরীফ ৩২০ পৃষ্ঠা, তিরমিযী শরীফ ১৪৮ পৃষ্ঠা, নাসায়ী শরীফ ২৩১ পৃষ্ঠা এবং ইবনু মাজাহ শরীফ ১১৯ পৃষ্ঠা থেকে মিশকাত শরীফের ১২৭ ও ১৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনু উমার রা., ইবনু আববাস রা. এবং আবু উমাইর রা. হতে বর্ণিত ৩ খানা হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণ করে রোযা রেখেছেন, ঈদ করেছেন, ...।'

জনাব রফীকুল ইসলাম সাহেব কি দয়া করে বলবেন, দেশ-মহাদেশের সীমা অতিক্রম করে দূরবর্তী কোন্ এলাকার চাঁদের ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারিখ গণনা করেছেন এবং রোযা ও ঈদ করেছেন?

জনাব রফিকুল ইসলাম সাহেব যে তিনটি হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন তার কোনোটিতেই একথা নেই যে, দূরের অঞ্চল থেকে আসা সংবাদের ভিত্তিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেছেন।

আবু উমায়ের রা.-এর হাদীস তো ঈদ সম্পর্কে, যাতে ৩০ রমযান সন্ধ্যায় সফর থেকে ফেরা কাফেলা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, গতরাতে আমরা চাঁদ দেখেছি। তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা ভাঙ্গার আদেশ করা হয়।

এ কাফেলা কতদূর থেকে এসেছিল তা পাঠকবৃন্দ নিজেরাই বুঝতে পারেন। এ-তো ২০-২৫ মাইল, সর্বোচ্চ ৩০ মাইল ব্যবধানের রাস্তা।

ইবনে ওমর রা. ও ইবনে আববাস রা.-এর হাদীস দু'টি রোযা সম্পর্কে। ইবনে ওমর রা.-এর হাদীস এই যে, লোকেরা চাঁদ দেখার চেষ্টা করল, (কিন্তু দেখতে সক্ষম হল না) আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। তখন তিনি রোযা রাখলেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার আদেশ করলেন। (আবু দাউদ, দারেমী, মিশকাত ১২৭)

এ তো মদীনার ঘটনা। এখানে নিকট-দূরের প্রসঙ্গ কোথায়? আর আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর হাদীস এই যে, এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল এবং বলল যে, আমি (রমযানের) চাঁদ দেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুসলিম পরিচয় সম্পর্কে জেনে আদেশ করলেন, বেলাল! মানুষের মাঝে ঘোষণা কর, তারা যেন আগামীকাল রোযা রাখে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী- মিশকাত ১৭৪)

এ ব্যক্তি যদি আগেই মদীনায় এসে থাকেন তবে তো এটা মদীনার ঘটনা। আর যদি গ্রামে চাঁদ দেখে মদীনায় এসে সংবাদ দিয়ে থাকেন তাহলে তা মদীনার পার্শ্ববর্তী বসতির ঘটনা। সুতরাং এটাও দূরের

ঘটনা নয়।

তো জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম সাহেব যে বিনা দলীলে এ দাবি করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূরের এলাকার (তাও আবার নাকি দেশ-মহাদেশের সীমানা পেরিয়ে) চাঁদ দেখার সংবাদ কবুল করে রোযা রেখেছেন। তার এ দাবি সম্পর্কে কী বলা যায়? এটা হাদীস জাল করার অপরাধে শামিল হচ্ছে না তো? তদ্রূপ এ জাতীয় কর্মকা- দায়িত্বহীনতার মধ্যে পড়ে যায় না তো?

সহীহ হাদীসে সংযোজন

একটি হাদীস আছে

الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون

বর্তমান প্রবন্ধেই (রজব, ১৪৩৫ হি.) এ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে এবং এর মর্ম সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম সাহেব এর তরজমা করেছেন এভাবে : 'রোযা হবে একই দিনে যে দিনে তোমরা সকলেই রোযা রাখবে, ঈদ হবে একই দিনে, যে দিনে তোমরা সকলেই ঈদ করবে, কুরবানী হবে একই দিনে, যে দিনে তোমরা সবাই কুরবানী করবে।'

তরজমার 'একই দিনে' কথাটা হাদীসে নেই। এটা তিনি নিজের থেকে যুক্ত করেছেন। এজাতীয় মারাত্মক ভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে হেফাযত করুন।

বাকি রইল এ হাদীসের মর্ম কী? এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। আরো বিস্তারিত আলোচনা মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফখরুলের পুস্তিকা সম্পর্কে পর্যালোচনার সময় করা হবে ইনশাআল্লাহ।

(৫) সিয়াম ও ঈদ

বিশ্বব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি?

মাওলানা মুহাম্মাদ জসীমুদ্দিন রাহমানী

আলহাদীদ পাবলিকেশন্স, বছিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

(১৪৩৩ হি. মোতাবেক ২০১২ ঈ.)

এ বইয়ের আলাদা কোনো বিশেষত্ব নেই। কারণ, বিভিন্ন আলামত থেকে পরিষ্কার যে, বইটির সিংহভাগই ড. মাহবুবুর রহমান সাহেবের কিতাব থেকে (যা সম্পর্কে গত সংখ্যায় পর্যালোচনা করা হয়েছে) প্রায় হুবহু গৃহীত। এমনকি ভুল-ত্রুটির মধ্যেও লেখক তারই মুকাল্লিদ। ড. মাহবুব সাহেবের পুস্তিকা মুদ্রিত রূপে আসার আগে যখন একটি কম্পোজকৃত ফতোয়া আকারে ছিল সে সময়ের কপিও আমার কাছে এসেছিল। তাতে এমন কিছু ভুলত্রুটি ছিল যা পরে সংশোধন করা হয় বা বাদ দেয়া হয়। কিন্তু 'আলহাদীদে'র বন্ধুদের কাছে যেহেতু পুরনো কপিটিই ছিল তাই তাদের পুস্তিকায় আগের কিছু ভুলত্রুটিও রয়ে গেছে। যেমন, দুই পুস্তিকায় উল্লেখকৃত ফতহুল বারীর ইবারতের তরজমা যদি মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ولكنه مصروف عن ظاهره বাক্যের তরজমা পুরনো কপিতে যেমন ভুল ছিল এখন আলহাদীদ ওয়ালাদের পুস্তিকাতেও তা ভুল আছে। (দ্র. পৃ. ৩৪) অথচ ড. মাহবুব সাহেবের মুদ্রিত বইয়ে এ বাক্যের তরজমা বাদ দেয়া হয়েছে। আলহাদীদ প্রকাশিত পুস্তিকায় যে অতিরিক্ত বস্তুগুলি আছে তাতেও মারাত্মক ভুলত্রুটি বা কূট আলোচনা রয়েছে।

(টীকা : পরে জানা গেছে যে, এ অতিরিক্ত অংশেরও সিংহভাগ অন্য এক তরুণ আলিমের প্রবন্ধ থেকে নেয়া।) যেমন :

১. ৪৭ পৃষ্ঠায় ইবনে কুদামা মাকদিসী হাম্বলী রাহ.-এর গ্রন্থ 'আলমুগনী'-কে মালেকী মাযহাবের মশহূর কিতাব বলা হয়েছে। অথচ তালিবে ইলমরাও জানেন, এটি হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব। যদিও তা 'ফিকহে মুজাররাদ' শ্রেণির নয়, 'ফিকহে মুকারান' শ্রেণির গ্রন্থ।

২. ৩১-৩২ পৃষ্ঠার 'সুনানে আবু দাউদ থেকে রিবয়ী ইবনে হিরাশ রা.- এর হাদীস নকল করা হয়েছে। যাতে আছে

-فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله لأهلا الهلال أمس عشية، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلف في حديثه– وأن يغدوا إلى مصلاهم

হাদীসের মতনে চিমত্মা করলে জানা যাবে যে, এই দুই বেদুঈন ৩০ রমযান (বাস্তবে পয়লা শাওয়াল) সকালে এসেছিল এবং বিগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাক্ষ্য কবুল করে রোযা ভাঙ্গার আদেশ করেন এবং সকাল সকাল ঈদগাহে যেতে বলেন।

বেদুঈনরা সাধারণত মদীনার পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত। একারণে এটি দূরের সাক্ষ্য নয়, নিকটবর্তী এলাকার সাক্ষ্য। কিন্তু আলহাদীদের বন্ধুদের পুস্তিকায় وأن يغدوا -এর তরজমা করা হয়েছে 'পরের দিন সকালেই' অথচ এ তরজমা তখনই সঠিক হত যদি হাদীসে من الغد শব্দও থাকত। কিন্তু হাদীসে শব্দটি নেই; না ঐসব কিতাবে যেগুলোর বরাতে তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, আর না হাদীসের অন্য কোনো কিতাবে। একারণে أن يغدوا -এর অর্থ ঐদিনেরই সকালে (অর্থাৎ সূর্য ঢলার আগে) ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যাওয়া।

সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় যদিও ঐ দুই ব্যক্তির আসার সময়টি

স্পষ্ট উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু মুসনাদে আহমদ খ. ৪ পৃ. ৩১৪ ও খ. ৫ পৃ. ৩৬২-৩৬৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক খ. ৪ পৃ. ১৬৪; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস ১১০৩ (বাবুল ঈদাইন) ; আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী খ. ৪ পৃ. ২৪৮ -এর রেওয়াতেসমূহে স্পষ্ট আছে যে. ঐ বেদুঈন সকালেই এসেছিল, হাদীসের আরবী পাঠ এই-

أصبح الناس لتمام ثلاثين يوما فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية

(মুসনাদে আহমদ খ.৪ পৃ. ৩১৪)

أصبح الناس صياما تمام الثلاثين، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلا الهلال بالأمس

(আলমুনতাকা, ইবনুল জারুদ পৃ. ১৪২, হাদীস ৩৯৬; মুসনাদে আহমদ খ. ৫ পৃ. ৩৬২-৩৬৩)

এ হল বাস্তব অবস্থা, কিন্তু আলহাদীদের বন্ধুরা হাদীসে নিজেদের পক্ষ হতে ‘পরদিন’ শব্দ যোগ করে একে দূর থেকে আসা সাক্ষ্যের ঘটনা বানিয়েছেন এবং নিজেরা এ আবিষ্কারও করেছেন যে, বেদুঈন দু’জন দিনের শেষে এসেছিল। তারা লিখেছেন : এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হল যে, নিজ এলাকায় চাঁদ না দেখার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সিয়াম পালন অব্যাহত রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিনের শেষভাগে অনেক দূর থেকে আসা দু’জন গ্রাম্য লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর আমল করারও নির্দেশ দিয়েছেন। (সিয়াম ও ঈদ, পৃ. ৩২)

মদীনার আশপাশের গ্রামাঞ্চলকে ‘অনেক দূর’ বলা, أصبح শব্দ উপেক্ষা করে নিজেদের পক্ষ হতে ‘দিনের শেষভাগে’ শব্দ বাড়ানো এরপর সরাসরি হাদীসের অনুবাদে ‘পরদিন’ শব্দের সংযোজন এগুলো সম্পর্কে কী মন্তব্য করা উচিত তা তারা নিজেরাই যদি বলে দেন তাহলে ভাল হয়।

পাঠক যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে উপরের ঘটনার প্রেক্ষাপটও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় চাঁদ দেখার জন্য মদীনার আশপাশের বসতিগুলোতে মদীনা থেকে কাউকে পাঠানোর রীতি ছিল না। তেমনি চাঁদ দেখা গেল কি না সে সংবাদ সংগ্রহের জন্যও মদীনার বাইরে লোকজন পাঠানোর নিয়ম ছিল না। মদীনাতে চাঁদ দেখার চেষ্টা করা হত, না দেখা গেলে আগামী দিনকে ত্রিশ তারিখ সাব্যস্ত করে তারাবী, সাহরী ও রোযা জারি থাকত।

একথা আমি বারবার বলেছি যে, সাক্ষ্য এসে গেলে তা কবুল করার নযীর থেকে 'সাক্ষ্য খোঁজ করা' দাবি করা সঠিক নয়। উপরের ঘটনা থেকে এ বাস্তবতাই সামনে আসছে।

৩. ১২ পৃষ্ঠায় চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে একটি মত এই বলা হয়েছে যে, শুধু জোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের ভিত্তিতে চাঁদ হওয়া না হওয়ার ফয়সালা করা।

তাদের উচিত ছিল এই ভিত্তিহীন মতটি উল্লেখ না করা। উল্লেখ করলেও তা খণ্ডন করে দেওয়া। কিন্তু তারা তা করেননি। অথচ এ মতটি অনেকগুলো 'সহীহ সরীহ' হাদীসের বিরোধী এবং খাইরুল কুরূনের ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ ভুল একটি মতামত। আলহাদীদ ওয়ালারা তা গ্রহণ করেননি তবে তা ভুলও বলেননি এবং এই ভুল বক্তব্য কার তা বর্ণনা করতে গিয়ে আশ্চর্য ভুলত্রুটির শিকার হয়েছেন! যেমন এ মতটিকে তাবেয়ী মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে সম্বন্ধ করেছেন। অথচ ইমাম ইবনে আব্দুল বার রাহ. লিখেছেন 'ولا يصح عنه' অর্থাৎ মুতাররিফ থেকে তা প্রমাণিত নয়। (আত তামহীদ খ. ১৪ পৃ. ৩৫২ নাফে' আন ইবনে উমর থেকে বর্ণিত ৪০ নং হাদীসের অধীনে)

দুই নম্বরে একে সম্বন্ধ করেছেন 'ইবনে শুরায়হ'-এর সাথে এবং

দাবি করেছেন যে, তিনি হানাফী ছিলেন। অথচ এ ব্যক্তি ‘ইবনে শুরায়হ’ নন, ‘ইবনে ছুরাইজ’। আরবী উচ্চারণ ‘শীন’ দিয়ে নয়, ‘ছীন’ দিয়ে। আর তিনি হানাফী ছিলেন না বরং পুরোমাত্রায় শাফেয়ী ছিলেন। এরপর তার কথা এই ছিল না যে, সর্বাবস্থায় শুধু হিসাবের ভিত্তিতে চাঁদ হওয়া না হওয়ার ফায়সালা করা হবে। তাঁর বক্তব্য ছিল, কখনো অবস্থা যদি এই হয় যে, মেঘ-ধুলায় আবৃত হওয়ার কারণে চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হিসাবের দিক থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, দিগমেত্ম চাঁদ দর্শনযোগ্য অবস্থায় রয়েছে তাহলে হিসাব জানা ব্যক্তি এর উপর নির্ভর করে রোযা রাখতে পারে। ইবনে ছুরাইজের এ কথাও ভুল। একে তার ‘যাল্লাত’ (ভুলত্রুটির)-এর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। (দ্র. আরিযাতুল আহওয়াযী, আবু বকর ইবনুল আরাবী খ. ৩ পৃ. ২০৭-২০৮ ; আল মুয়াসসির শরহুল মাসাবীহ, ফযলুল্লাহ তূরবিশতী খ. ২ পৃ. ৪৫৯-৪৬০ ; ফতহুল বারী, ইবনে হাজার খ.৪ পৃ.১৪৬-১৪৭, ১৫১-১৫২; শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নববী খ. ৭ পৃ. ৪৩৭-৪৩৮; তরহুত তাছরীব ফী শরহিত তাকরীব, ওলীউদ্দীন ইরাকী খ. ৪ পৃ. ১০৮-১১০

তাহলে জানা গেল যে, ইবনে ছুরাইজ যা বলেছেন তা ভুল, কিন্তু তিনি এত কিছু বলেননি যা আলহাদীদের বন্ধুরা তার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। এরপর তাকে হানাফী বানিয়ে দেওয়া তো স্পষ্ট ভুল। তিনি তো ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের।

এরপর ‘আশশাশী’কে ইবনে ছুরাইজের শাগরিদ বলা হয়েছে। এটাও ভুল। (আবু বকর আল কাফফাল) আশশাশী, ইবনে ছুরাইজের যুগ তো পেয়েছেন, কিন্তু তার শীষ্যত্ব লাভের সুযোগ হয়নি। তার ইরাক পৌঁছার আগেই ইবনে ছুরাইজের ইন্তিকাল হয়ে যায়। (তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ, ইমাম ইবনুস সালাহ খ. ১ পৃ. ২২৮-২২৯)

এই ভুল মতের সম্বন্ধ ইবনে দাকীকুল ঈদের সাথেও করা হয়েছে। অথচ তিনিও আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় শুধু হিসাবের ভিত্তিতে

চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার কথা বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন মেঘাচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে। আর তা-ও ভুল। হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী। পরের আহলে ইলমগণ তাঁর মতটিকে অশুদ্ধ বলেছেন। দেখুন, তাঁর কিতাব ইহকামুল আহকাম পৃ. ৩৯২ হাদীস ১৭৯ ও তরহুত তাছরীব খ. ৪ পৃ. ১১০

৪. ১২ পৃষ্ঠায় রশীদ রেযার কথা এসেছে তো তাকে 'কাহহালা' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে! কোথায় ওমর রেযা কাহহালা, 'মুজামুল মুআললিফীন'-এর গ্রন্থকার আর কোথায় রশীদ রেযা মিসরী 'মাজাল্লাতুল মানার'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং তাফসীরুল মানার-এর লেখক!!

৫. ৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইমাম যায়লায়ী রাহ. ৬ষ্ঠ স্তরের ফকীহ। তাই তিনি মুজতাহিদ ফিদ দ্বীন নন; বরং একজন মুকাল্লিদ। অতএব একজন মুকাল্লিদ হিসেবে নিজ ইমামের সিদ্ধান্তের অনুসরণই তার জন্য যুক্তিযুক্ত।'

ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে ইমাম ফখরুদ্দীন যায়লায়ী রাহ. (৭৪৩ হি.) -এর যে উঁচু মাকাম; হাদীস, ফিকহ ও উসূলে তাঁর যে, গভীর পাণ্ডিত্য সে হিসেবে তিনি অবশ্যই 'আসহাবুত তারজীহ'-এর মধ্যে শামিল। এ তাঁর কিতাব থেকেও বোঝা যায়। তাঁর জীবনী পাঠ করেও বোঝা সম্ভব। কিন্তু এখানে কৌতুকের বিষয় এই যে, এইসকল পুস্তক পুস্তিকার লেখকেরা একদিকে নিজেরা 'নীমমোল্লা' হয়েও আচার আচরণে মুজতাহিদ হওয়ার দাবিদার! বড় বড় আলিমগণ তাদের দৃষ্টিতে গোমরাহ!! ইমামগণের তাকলীদ ও আকাবিরে আহলে হকের অনুসরণ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় অন্যদিকে যায়লায়ীর নামের সূত্রে 'ইমাম' বিশেষণ যুক্ত করেও তাকলীদ করার নসীহত!! এদের তো কর্তব্য ছিল আগে যায়লায়ীর মাকাম উপলব্ধি করা এবং এরও আগে ঐ মত ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে প্রমাণ করা!

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

নভেম্বর ২০১৪, মুহাররম ১৪৩৬

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন-১৪

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পর্যালোচনা)

(৬) একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই স্বওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল

বাক্কাহ ডিটিপি হাউজ, ২৯/৪, কে. এম. দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা

(প্রথম প্রকাশ, রমযান ১৪৩৩ হি. আগস্ট ২০১২ ঈ., দ্বিতীয় সংস্করণ, শা'বান, ১৪৩৪ হি. জুন ২০১৩ ঈ.)

গ্রন্থকার বইয়ের ১৯-২০ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় সংস্করণ অনুযায়ী পৃ. ৪০) 'একই দিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা ফার্জ'

শিরোনামাধীন আলোচনায় পরিষ্কার লিখেছেন-

১। একই দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করা ফার্জ।

২। ভিন্ন ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করলে একটি বা দুটি স্বওম ছুটে যায়।

৩। একই দিনে স্বওম পালন না করলে হারাম দিনে স্বওম পালন হয়ে যায়। অর্থাৎ ঈদের দিন স্বওম পালন করা হয়।

৪। ভিন্ন ভিন্ন দিনে স্বওম বা ঈদ উদযাপন করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়।

৫। ভিন্ন ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করার বিধান একটি বিদআহ।'

এ বিষয়ে আমরা ভাই মুহাম্মাদ ইকবাল সাহেবকে বিনয়ের সাথে বলতে পারি, আপনি আপনার পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছেন, 'আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু মান্য করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 'আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ (হাদীস)...' সূরা নিসা ৪ : ১১৩

এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি নাযিল করেছেন কুরআন এবং হাদিস। তাই আমি এই বইয়ে কুরআন এবং গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হাদিসের উদ্ধৃতি ছাড়া কোনো আলিমের ফাতওয়া নিয়ে আলোচনা করিনি।'

আপনার এই ঘোষিত নীতিমালার আলোকে আমাদের বলুন, আপনার উপরিউক্ত পাঁচটি কথা কোন আয়াতে বা কোন হাদীসে

আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন? আপনি শুধু আয়াত কিংবা হাদীস লিখে দেন। বেশির বেশি তরজমা করতে পারেন। ব্যস্, শুধু আয়াত কিংবা হাদীস শুনেই যেন এই পাঁচটি বিষয় আমরা পেয়ে যাই। আপনি নিজের বুঝ ও নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে উক্ত আয়াত কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা করবেন না। কারণ সেটা তো হবে আপনার ব্যাখ্যা, সেটা 'আল্লাহর নাযিলকৃত' হবে না। তেমনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ আয়াত বা হাদীস থেকে কোনো বিধানও আহরণ করতে পারবেন না। কেননা সেটা তো হবে আপনার ফতোয়া। আর যখন স্বীকৃত ফুকাহা (ফিকহ্বিশারদ আলিমগণ), যারা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে স্বয়ং শরীয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট- তাদের ফতোয়া আপনি উল্লেখ করেননি, তো নিজের ফতোয়াই বা কেন উল্লেখ করবেন?

ভাই ইকবালের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করাকে ফরয বলেছেন, কিন্তু এই ফরয তো আপনারও ছুটে যাচ্ছে। কারণ সকল মুসলমান একই দিনে রোযা আরম্ভ করছে না এবং ঈদও করছে না। আপনি এক অঞ্চলের মুসলমানদের সাথে রোযা শুরু করছেন তো অন্যেদের সাথে করা হচ্ছে না। কারো সাথে ঈদ করছেন তো আপনার ঈদ হয়ে যাচ্ছে অন্য কারো রোযার দিনে! একই দিনে তো আপনারও হচ্ছে না, অন্যদেরও না। তাহলে ফতোয়া অনুযায়ী আমল করার কী উপায় আপনি চিন্তা করেছেন? এ বিষয়ে তো আপনার লেখা বিলকুল খামোশ! আপনি এবং আপনার সমমনা আরো যারা এই ফরযটি পরিত্যাগ করে চলেছেন; এই ফরয তরক করার কারণে আপনাদের প্রতি শরয়ীভাবে কী উপাধি প্রযুক্ত হচ্ছে, তা কি ভেবেছেন?!

আপনি দয়া করে নিমেণ বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করুন:

(ক) বিদআত বলা হয় প্রত্যেক ঐ নতুন জিনিসকে, যাকে শরয়ী দলীল-প্রমাণ ছাড়াই দ্বীনের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখন এটা

তো প্রত্যক্ষ বিষয় যে, প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ দেখা মোতাবেক আমল করাই প্রাচীন ও অনুসৃত ধারা, যা আহদে রিসালাত ও খায়রুল কুরূন তথা নবী-যুগ ও মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্ম থেকে ধারাবাহিক চলে আসছে। অন্যদিকে একই দিন রোযা ও ঈদ করার চিন্তাটিই নতুন, যার বয়স ষাট-সত্তর বছরের বেশি নয়। অতএব বিদআত বলতে হলে একই দিন রোযা ও ঈদ পালনকে জরুরি সাব্যস্ত করা এবং একে দ্বীনী বিধান আখ্যায়িত করাকেই বিদআত বলা উচিত। কিন্তু ইকবাল সাহেব প্রাচীন ও অনুসৃত একটি কর্মকে তো বিদআত বলে দিলেন, অথচ নবোদ্ভাবিত একটি মত বা চিন্তাকে বলছেন ফরয!!

ভাই ইকবাল! আপনার মতো কিছু গবেষক যদিও বলেছেন, পুরনো ও ধারাবাহিক অনুসৃত আমলটি ছিল অপারগতাবশত, কিন্তু এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, প্রাচীন ও অনুসৃত ঐ আমলটি একই দিনে রোযা ও ঈদ করা নয়; বরং তা হচ্ছে প্রত্যেকের নিজ অঞ্চলের দেখা মোতাবিক আমল। তো 'নতুন'কে বাদ দিয়ে প্রাচীন ও অনুসৃত ধারাকে বিদআত বলা কোন যুক্তিতে, কিসের ভিত্তিতে?

থাকলো এ বিষয়টি যে, প্রাচীন ও অনুসৃত আমলটি ওযরবশত ছিল, নাকি এজন্য যে, এটাই শরীয়তের মানশা বা ইচ্ছার অনুকূল-সেটা ভিন্ন কথা। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা আগেও হয়েছে। আর কিছু সামনেও হবে, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আপাতত ভাই মুহাম্মাদ ইকবালের কাছে আমার দরখাস্ত, যেহেতু তিনি প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের নিজ নিজ দেখা মোতাবেক রোযা ও ঈদ পালনকে বিদআত বলছেন, তো দয়া করে তিনি বলে দিন, কে কবে এবং কোথায় এই বিদআত আবিষ্কার করেছেন? কোন সাল থেকে এই বিদআতের সূচনা? ভুল বলারও তো একটা সীমা থাকা উচিত! খোদ যেটা নতুন সেই চিন্তাকে সমর্থন করতে গিয়ে তাকে ফরয বানিয়ে দিচ্ছেন, এদিকে প্রাচীন ও অনুসৃত ধারা অনুযায়ী আমলকারীদের বিদআতে লিপ্ত বলে অপবাদ দিচ্ছেন! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

(খ) তাহলে তো ইকবাল বিন ফাখরুল সাহেব বলতে চান, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং তাদের পরবর্তীগণ সবাই বিদআতের চর্চা করে গেছেন আর সুন্নতের উপর আমল শুরু হয়েছে তাদের সহস্র বছরেরও বেশি সময় পর, এই এখন! সুন্নত ও বিদআতের এক আশ্চর্য ইতিহাস এবং আশ্চর্য মাপকাঠি ইকবাল সাহেবের বদৌলতে আমাদের সামনে এল! অর্থাৎ খাইরুল কুরূন (মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্ম)-এর কর্মধারা, যা স্বয়ং সুন্নত সমর্থিত ও সর্বজনস্বীকৃত সুন্নতের মাপকাঠি সেটা তো বিদআত। আর পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত মতটিই হচ্ছে সুন্নত! তাও আবার সুন্নতের সাধারণ স্তর নয়, একেবারে ফরয পর্যায়ের!! মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্মের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ ও তাদের উত্তরসূরীরা হল বিদআতপন্থী, আর নবী-যুগ থেকে প্রায় দেড় হাজার কাল পরের বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী কিছু লোকজন হল গিয়ে সুন্নতপন্থী!! নাউযুবিল্লাহ।

(গ) আফসোস শুধু একারণে নয় যে, এখানে একটি অনুসৃত ধারাকে বিদআত এবং না-জায়েয বলা হচ্ছে। অথচ একটি নবোদ্ভূত পন্থাকে (যা এখন পর্যন্ত নিছক একটি মতবাদ, যাকে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়নি এবং যেটাকে ফিকহে ইসলামীর আলোকে, শর্তসাপেক্ষে ও উলুল আমর তথা দায়িত্বশীল উলামা ও উমারাদের নির্দেশ মেনে করা হলে বেশির বেশি মুবাহ বলা যেতে পারে) বলা হচ্ছে ফরয। বরং আফসোসের আরো বড় কারণ, এই বিকৃতি সাধন করা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দোহাই দিয়ে এবং তাকে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে সরাসরি 'আল্লাহর নাযিলকৃত' বলে!!

(ঘ) এই আল্লাহর বান্দাদের যদি নিছক তরজমা নির্ভর কিংবা ব্যক্তিগত পড়াশোনা নির্ভর জ্ঞানের ওপর ভরসা করে ইজতিহাদ করতেই হত তাহলে প্রথমে তাদের ভাবা উচিত ছিল, কুরআন-হাদীসের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এবং তার বিধান অনুসারে আমল করার মত মানুষ তো প্রত্যেক যুগেই ছিল। আর এতেও সন্দেহ নেই যে,

মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্মের লোকেরা কুরআন-হাদীস বোঝা ও তার বিধান অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে পরবর্তীদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। এমতাবস্থায় এটা কেমন কথা যে, সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা এবং তা ফরয হওয়াকে আমরা তো সরাসরি রাসূলের নির্দেশ সাব্যস্ত করছি, অথচ গোটা দেড় সহস্রাব্দ কালের মধ্যে কোনো একজন ফকীহের যবানে কিংবা তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ফিকহ-ফতোয়ার হাজারো কিতাবের কোনো একটিতে, কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই! এমনটি কেন হল? কেন হবে? তবে কি পূর্ববর্তীরা কুরআন-হাদীস বুঝতেন না, নাকি তাদের মধ্যে সত্যপ্রকাশের আগ্রহ বা সৎসাহস ছিল না?

ভাই ইকবাল যদি বিষয়টা এভাবে চিন্তা করতেন তাহলে এ বিষয়ে তার ধারণা যে নিছক খেয়ালি মনের ভাবনা, তা সহজেই ধরতে পারতেন।

এবার লক্ষ্য করুন, কোন দলীলের ভিত্তিতে তিনি এই নতুন তরিকা ও নবোদ্ভূত পন্থাকে ফরয সাব্যস্ত করছেন। সুধী পাঠকের হয়ত স্মরণ আছে যে, মুসলমানদের শাসক, উলামায়ে কেরাম এবং সর্বসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারো জন্য রোযা আরম্ভ করা জায়েয নেই। যেমন জায়েয হবে না আগেভাগে নিজে ঈদ করা। উম্মাহর ফকীহগণ এই মাসআলাটি যে হাদীস থেকে বুঝেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে মুহাম্মাদ ইকবাল সাহেব ঐ হাদীসের উপরেই এই নতুন অর্থ চাপিয়ে দিয়েছেন যে, এতে নাকি সকল মুসলমানকে একই দিন রোযা ও ঈদ পালনকে ফরয বলা হয়েছে! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি লিখেছেন,

‘আয়েশাহ রা. থেকে বর্ণিত:

قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس

'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈদুল ফিতর হলো ঐ একদিন যেদিন সকল মানুষ ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করে থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে ঐ একদিন যেদিন সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে'। -তিরমিযী, স্বহীহ, অধ্যায় : ২, কিতাবুস্ স্বওম, অনুচ্ছেদ : ৭৮ (ঈদুল) ফিতর এবং (ঈদুল) আযহা কখন হবে, হাদিস # ৮০২

এই হাদীসে 'يَوْمَ ইয়াওমা' শব্দটি একবচন, যার অর্থ একদিন। আর النَّاسُ আন্নাসু' শব্দটি 'انْسَانٌ ইনসান' শব্দের বহুবচন হওয়ায় সকল মানুষ তথা সকল মুসলিমদের বুঝানো হয়েছে।'

তিনি আরো লিখেছেন,

'অর্থাৎ হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ (মুসলিম) একই দিনে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা (কুরবানীর ঈদ) পালন করবে। যদি ভিন্ন-ভিন্ন দিনে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা পালন করা শরী'আহ'র বিধান হত তাহলে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'يَوْمَ ইয়াওমা' শব্দটি অর্থাৎ একবচন-এর পরিবর্তে 'أَيَّامَ আইয়্যামা' বহুবচন ব্যবহার করতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'يَوْمَ ইয়াওমা' শব্দটি একবচন ব্যবহার করার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সকল মুসলিমকে একই দিনে ঈদ পালন করতে হবে।'

আরো লিখেছেন,

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত,

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، والاضحى يوم تضحون

নিশ্চয়ই নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পালন কর সেদিন হল স্বওম আর যেদিন তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন কর সেদিন হল ফিতর (ঈদুল ফিতর), যেদিন তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন আযহা (ঈদুল আযহা)' -তিরমিযী, স্বহীহ, অধ্যায়ঃ ২, কিতাবুস স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদঃ ১১, যেদিন তোমরা স্বওম পালন কর সেদিন হলো স্বওম আর যেদিন তোমরা ফিতর পালন কর সেদিন হলো ফিতর, যেদিন তোমরা কুরবানী পালন কর সেইদিন আযহা, হাদীস # ৬৯৭, ইবনু মাজাহ, স্বহীহ, অধ্যায়ঃ ৭, কিতাবুস স্বিয়াম, অনুচ্ছেদঃ ৯, ঈদের মাস, হাদিস # ১৬৬০, বায়হাক্বী (সুনানুল কুবরা), স্বহীহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস স্বওম, অনুচ্ছেদঃ ৬৭, হাদীস # ৮৬০৮ (হাদীসটি তিরমিযীর বর্ণনা)।

'এই হাদীসেও পূর্বের হাদীসের মতো 'يَوْمَ ইয়াওমা' একবচন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। আর 'يَوْمَ ইয়াওমা' দিয়ে একদিনকে বুঝানো হয়, যা পূর্বে হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আর হাদীসটিতে আরবী শব্দ 'تصومون তাসুমূনা' তোমরা স্বওম পালন কর, 'تفطرون তুফত্বিরূনা' তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন কর, 'تضحون তুদ্বাহহূনা' তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর। এখানে 'তোমরা' সর্বনামটি উহ্য রয়েছে। এই 'তোমরা' শব্দটি দ্বারা সকল মুসলিমগণকে বুঝানো হয়েছে।'

একটু পরে লিখেছেন,

'অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝাচ্ছেন যে, একই দিনে সকল মুসলিমকে স্বওম ও ঈদ উদ্যাপন করতে হবে। যদি ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করা ইসলামের বিধান হতো তাহলে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'يَوْمَ ইয়াওমা' একবচন শব্দ ব্যবহার না করে 'أَيَّامَ আইয়্যামা' বহুবচন শব্দ ব্যবহার

করতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'يَوْمَ ইয়াওমা' একবচন শব্দ ব্যবহার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, সকল মুসলিমগণকে একই দিনে স্বওম এবং ঈদ পালন করতে হবে।' [স্বওম ও ঈদ মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল : পৃ. ১৩,১৪-১৫, ১৬ প্রথম সংস্করণ এবং পৃ. ১২,১৩-১৪,১৫ দ্বিতীয় সংস্করণ]

ভাই ইকবাল অনেক কষ্ট করেছেন। আরবী ব্যাকরণের বিশ্লেষণ উপস্থিত করে নববী ভাষ্যে অবাঞ্ছিত অর্থ আরোপের বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে কাজ কিছু হয়নি, আর হওয়ার কথাও না। ভাই ইকবাল খেয়ালই করেননি যে, এখানে উভয় হাদীসে 'يَوْمَ ইয়াওমা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মুযাফ' হয়ে 'মা'রেফা' হিসাবে। শব্দটা 'নাকেরাহ' নয় এবং তার সাথে 'واحد বা এক' কথাটিও নেই। সুতরাং এখানে 'يَوْمَ ইয়াওমা'-এর তরজমা 'একদিন' করা মারাত্মক ভুল। যে ভুলের শিকার হয়েছেন ভাই ইকবাল এবং সেই ভুল অর্থ ধরেই ব্যাখ্যা করেছেন হাদীস দু'টির। আর এই ভুলের উপরেই রেখেছেন নবোদ্ভাবিত এই বিধানের ভিত্তি। অথচ আমার ধারণা, আরবী ভাষা এবং হাদীস-ভাষ্য বোঝার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানেন না এমন সাধারণ পাঠকরা পর্যন্ত বুঝতে পারছেন যে, এটি একটি নতুন হাজির করা অর্থ। যা হাদীস ইরশাদ হওয়ার সময়, পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের সাথে একেবারে বেমানান এবং শরীয়ত ও 'মাকাসিদে শরীয়ত' (শরীয়তের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা) এবং শরয়ী বিধি-বিধানের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যার সামান্যতম জানাশোনা আছে, তার কাছে তো একেবারেই পরিষ্কার যে, এই ব্যাখ্যা কেবল নতুন উদ্ভাবিতই নয়; বরং শরীয়তের মেযাজ ও স্বভাব-বিরুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এক ব্যাখ্যা।

তবে হাদীস দু'টির সঠিক অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে জানেন না এমনও কেউ থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে বলবো, নিম্নে উপস্থাপিত পরিষ্কার

এবং সোজা কথাগুলো একটু খেয়াল করুন :

১. উভয় হাদীসের সমস্ত বাক্যই 'খবারিয়্যা' বা সংবাদমূলক। এতে একটি বাক্যও 'ইনশাইয়্যা' আদেশ-নিষেধবাচক নেই। প্রত্যেকটি বাক্য শব্দগতভাবে এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে 'খবারিয়্যা'। এ কারণে প্রথম হাদীসের অর্থ হচ্ছে, 'যেদিন মানুষ রোযা ছাড়ে সেটা ফিতরের দিন এবং যেদিন মানুষ কুরবানী করে সেদিন কুরবানীর দিন'। এর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ যেদিন রোযা না ছাড়বে সেটা রোযা ছাড়ার দিন নয়। অতএব কেউ যেন আগে আগে রোযা ছেড়ে ঈদ করতে আরম্ভ না করে। একইভাবে যেদিন সর্বসাধারণ কুরবানী করছে না সেটা কুরবানীর দিন নয়। তাই কেউ যেন আগেভাগে কুরবানী করতে শুরু না করে এবং ৯ যিলহজ্বকে ১০ যিলহজ্ব ভেবে আরাফার রোযা থেকে বিরত না থাকে। এই অর্থ হাদীসের অন্য রেওয়ায়েত থেকে, এমনকি স্বয়ং আয়েশা রা.-এর বর্ণনার মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই হাদীসের অন্য রেওয়ায়েতটি আসসুনানুল কুবরা বাইহাকীতে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

العرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحى الإمام والفطر يوم يفطر الإمام

অর্থাৎ 'যেদিন ইমাম (মুসলমানদের শাসক) আরাফায় উকুফ করে সেটা আরাফা, যেদিন ইমাম কুরবানী করে সেটা কুরবানী এবং যেদিন ইমাম ফিতর করে (রোযা ছেড়ে ঈদ করে) সেটা ফিতর'। আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৫/১৭৫, باب خطأ الناس يوم عرفة ('মানুষ যদি আরাফার দিন নির্ধারণে ভুল করে' অধ্যায়)।

প্রকাশ থাকে যে, এই রেওয়ায়েতের সনদ তিরমিযীর সনদ থেকে বেশি মানসম্মত। বক্তব্যও পরিষ্কার। অর্থাৎ মুসলমানদের শাসক (বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীল) শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় প্রমাণিত

হওয়ার ভিত্তিতে যেই দিনকে আরাফা এবং ঈদের দিন নির্ধারণ করবেন সেটাই আরাফা এবং ঈদের দিন বলে গণ্য হবে জনসাধারণ সেই মোতাবিক আমল করবে। ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কারো এ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের সুযোগ নেই।

এবার স্বয়ং হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা রা.-এর বক্তব্য শুনুন :

তাবেয়ী ইমাম মাসরূক রাহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি ও তার সাথী আরাফার দিন আয়েশা রা.-এর কাছে গেলেন (ঐ দিনটি এমন ছিল, যা ইয়াওমুন নাহ্র বা কুরবানীর দিন হওয়ারও সন্দেহ ছিল)। আয়েশা রা. খাদেমাকে বললেন, তাদেরকে ছাতুর শরবত পান করাও, আর তা যেন মিষ্টি হয়। আমি যদি রোযাদার না হতাম তাহলে আমিও পান করতাম। মাসরূক ও তার সঙ্গী বললেন, আপনি রোযা রেখেছেন! আজ যদি কুরবানীর দিন হয়ে থাকে?! (মাসরূক একথাও বলেছিলেন যে, আমি তো শুধু এই ভেবে রোযা রাখিনি যে, যদি আজ কুরবানীর দিন হয়?) উম্মুল মুমিনীন বললেন,

إنما النحر إذا نحر الإمام وعُظْم الناس، والفطر اذا أفطر الإمام وعُظْم الناس

অর্থাৎ কুরবানী তো তখন যখন ইমাম (মুসলমানদের শাসক) ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কুরবানী করে থাকে এবং ফিতর (রোযা না রাখা) তো তখন যখন ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিতর করে (রোযা ছাড়ে)

অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে আছে,

إنما الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة الناس

অর্থাৎ কুরবানীর দিন তো সেটি যেদিন ইমাম ও সর্বসাধারণ কুরবানী করে।

অন্য আরেক বর্ণনায় আছে,

إنما يوم النحر يوم ينحر الناس، ويوم الفطر يوم يفطر الناس

অর্থাৎ কুরবানীর দিন তো সেটি, যেদিন লোকেরা কুরবানী করে এবং ফিতরের (রোযা ছেড়ে ঈদ করার) দিন তো সেটা, যেদিন লোকেরা ফিতর করে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৪/১৫৭, হাদীস ৭৩১০; মাসাইলু আহমদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ; আহকামুল ইখতিলাফ ফি রুয়াতি হিলালি যিলহিজ্জাহ, ইবনে রজব, পৃষ্ঠা. ৩৪-৩৫; কিতাবুল আছার, ইমাম আবু হানীফা, রেওয়ায়েত: ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা. ১৭৯, হাদীস ৮১৮; আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৪/২৫২)

ইমাম ইবনে রজব রাহ. লেখেন,

فهذا الأثر صحيح عن عائشة رضى الله عنها، اسناده في غاية الصحة، ولا يعرف لعائشة مخالف من الصحابة.

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রা. থেকে এ বার্ণনা প্রমাণিত। এর সনদ সর্বোচ্চ মানের সহীহ সনদ এবং এ সিদ্ধামেত্ম তাঁর সাথে কোনো সাহাবীর দ্বিমত পাওয়া যায় না। (আহকামুল ইখতিলাফ, ইবনে রজব, পৃষ্ঠা : ৩৬)

পূর্বোলিস্নখিত হাদীসের

(الفطر يوم يفطر الناس... - মানুষ যেদিন রোযা ছাড়ে সেটা ফিতরের দিন...) বর্ণনাকারী আয়েশা রা.-এর এই বক্তব্য থেকে আগের হাদীসের মর্ম একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ হাদীসে বলতে চাওয়া হয়েছে, মুসলমানদের শাসক ও সর্বসাধারণ যেটাকে ঈদের দিন বলে স্থির করবে এবং ঈদ পালন করবে সেটাই ঈদের দিন। কেউ যদি দাবি করে, আমি তো চাঁদ দেখেছি, অতএব কালকে নয় আজকেই ঈদ (অথচ কাযী বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি), কিংবা যদি বলে, গণনার নিয়ম অনুসারে আজ পহেলা শাওয়াল না; বরং ত্রিশ রমযান কিংবা আরাফার রোযার ব্যাপারে যদি

কারো সংশয় সৃষ্টি হয় যে, আজ সম্ভবত আরাফার দিন না; বরং কুরবানীর দিন... এধরনের অজুহাত খাড়া করে যদি কেউ মুসলমানদের শাসক বা সর্বসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের আগে বা পরে রোযা শুরু করে কিংবা ঈদ উদ্যাপন করতে চায়, তো এরকম কিছু করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না। মোটকথা, মুসলমানদের শাসক ও সর্বসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রোযা বা ঈদ করা কোনো যুক্তিতেই বৈধতা পাবে না এটা বলে দেয়াই হাদীসের মাকছাদ।

আয়েশা রা.-এর বক্তব্য থেকে এটাও জানা গেল যে, 'الناس আন্নাস' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের শাসকের আনুগত্যকারী জনগণ এবং এও জানা গেল যে, সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করার সঙ্গে এই হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা যেমনটি আমরা দেখলাম, হাদীসের অর্থ ও মর্মের মাঝে এ বিষয়টি মোটেও অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া এই মাসআলা তো সেই সময় কারো কল্পনাতেও ছিল না যে, এটা আলোচনায় আসার কোনো সম্ভাবনা থাকবে। এমনকি সে সময় যেটা আলোচনায় আসার সম্ভাবনা ছিল, অর্থাৎ এক অঞ্চলের দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য ওয়াজিবুল আমল (অপরিহার্যভাবে গ্রহণীয়) কি ওয়াজিবুল আমল না-তার সঙ্গেও এর হ্যাঁ বা না কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। বরং হাদীসের প্রতিপাদ্য এই যে, নতুন চাঁদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং তা মানা বাধ্যতামূলক। তাতে ব্যক্তিগত মতামত বা সংশয় সন্দেহের কারণে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের অবকাশ নেই।

মাসরূক এবং আয়েশা রা.-এর মধ্যে যে সংলাপ হয়েছে তার প্রেক্ষাপটই বিচার করুন। স্পষ্টতই এটা আরাফার ঘটনা নয় যে, তারা দুজন হজ্বে ছিলেন আর সেখানেই এ আলাপ হল। কেননা হাজ্বীদের জন্য আরাফার রোযা মুসতাহাব নয়। যদি আরাফায় উকুফরত থাকতেন তাহলে তো রোযা নিয়ে পেরেশানির পরিবর্তে আরাফার উকুফ সহীহ হচ্ছে কি হচ্ছে না এ নিয়ে চিন্তিত থাকতেন।

বোঝা গেল, এটা আরাফাহ নয় বরং অন্য কোনো ইসলামী শহরের ঘটনা। খুব সম্ভব এটা মদীনা মুনাওয়ারার ঘটনা। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর অবস্থান তো ওখানেই ছিল। মাসরূক যদিও কুফার বাসিন্দা ছিলেন, কিন্তু তিনি ইলম হাছিলের উদ্দেশ্যে মদীনা সফর করতেন। আর উম্মুল মুমিনীনের সাথে তো এই ক্ষেত্রে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। যাইহোক, এটা মদীনার হোক কিংবা অন্য কোন ইসলামী শহরের- সেখানে চাঁদের সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা না হজ্বের আমীরের হাতে ছিল, আর না সরাসরি দারুল খিলাফতের দায়িত্বশীলের (আমীরুল মুমিনীনের); বরং তা ন্যস্ত ছিল ঐ শহরেরই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের, যেখানে মাসরূক এবং উম্মুল মুমিনীনের মধ্যে এই সংলাপটি হয়েছে। ঐ দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্ত মোতাবিক আমল করার প্রতি জোর দিয়ে উম্মুল মুমিনীন বলেছেন,

إنما النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس والفطر إذا أفطر الامام وعظم الناس

অর্থাৎ 'কুরবানী তো তখন, যখন ইমাম (মুসলমানদের শাসক, কিংবা তার প্রতিনিধি) ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কুরবানী করে, ফিতর)রোযা না রাখা) তো তখন যখন ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রোযা ছাড়ে।'

এজন্য এখানে ইমাম দ্বারা সমগ্র ইসলামী বিশ্বের একমাত্র আমীরুল মুমিনীন উদ্দেশ্য নয় এবং জনসাধারণ দ্বারা সমস্ত মুসলমান উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় মাসরূক ও তার সঙ্গী বলে উঠতেন, আমাদের তো জানা নেই যে, দারুল খেলাফতে আমীরুল মুমিনীন কী ফায়সালা করেছেন, আর অন্যান্য ইসলামী শহরেই বা কবে ঈদ হচ্ছে?

এবার দ্বিতীয় হাদীসটি নিয়ে চিন্তা করুন। তারপর আরো কিছু কথা হবে ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে,

الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون

অর্থাৎ 'রোযা সেদিন, যেদিন তোমরা রোযা রাখছ, ফিতর সেদিন, যেদিন তোমরা রোযা ছাড়ছ এবং কুরবানী সেদিন, যেদিন তোমরা কুরবানী করছ।' এটা হাদীসের শাব্দিক অর্থ, যতক্ষণ হাদীসের পূর্বাপর সামনে না আসবে এবং হাদীসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে না জানা যাবে ততক্ষণ এর অর্থ পুরোপুরি স্পষ্ট হবে না। কারণ লোকজন যেদিন রোযা রাখবে কিংবা ঈদ করবে সেদিন রোযা হওয়া কিংবা ঈদ হওয়া তো দৃশ্যমান ব্যাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের দরকার ছিল না। তাহলে হাদীসের উদ্দেশ্য বা প্রেক্ষাপট কী? ফুকাহায়ে উম্মত হাদীসের অগ্রপশ্চাত দেখে এবং সম্মিলিত ইবাদতের ক্ষেত্রে শরীয়তের মেযাজ (রুচি-প্রকৃতি) ও খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারাকে সামনে রেখে হাদীসের অর্থ বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম এই যে, এ হাদীস থেকে বিশেষত দুটি নির্দেশনা পাওয়া যায় :

১. মুসলমান যখন শরীয়তের নির্দেশ মোতাবিক রোযা, ঈদ এবং কুরবানী সম্পন্ন করবে, তো এর মাধ্যমে তাদের যা দায়িত্ব ছিল তা পুরা হয়ে যাবে। এখন যদি বাস্তব ক্ষেত্রে এমন কোনো ভুল হয়ে থাকে, যেটা মূলত গায়েব না জানার কারণে হয়েছে। তো এজন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে না; বরং ঐ আমল সহীহ এবং আল্লাহর কাছে মকবুল বলে গণ্য হবে।

যেমন, শরীয়তের বিধান হল, ঊনত্রিশের রাতে চাঁদ অনুসন্ধান কর। যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহলে ত্রিশ পূর্ণ কর। এখন এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে, হতে পারে চাঁদ উঠেছিল কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। বাস্তবে যদি এমনটিই ঘটে থাকে তাহলে আমরা যে ত্রিশ শাবান মনে করে রোযা রাখিনি এতে আসলে রমযানের একটি রোযা ছুটে গিয়েছে। একইভাবে ত্রিশ রমযান ভেবে যে রোযাটি রেখেছি সে রোযা হয়েছে মূলত ঈদুল ফিতরের দিন। এমনিভাবে যিলকদকে ত্রিশ ধর্তব্য করায় যিলহজ্ব মূলত শুরু করেছি একদিন পর। ফলে হজ্ব ৯ যিলহজ্বের পরিবর্তে ১০ যিলহজ্বে হয়েছে এবং আরাফার রোযা ৯

তারিখের বদলে কুরবানীর ঈদের দিন হয়েছে।

একইভাবে শরীয়তের আরেকটি বিধান হল, একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতেও রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হয় এবং দু'জন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য পাওয়া গেলে শাওয়াল ও যিলহজের চাঁদ প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিরও বিভ্রম হতে পারে। দু'একজনের ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

এখন যদি সত্যিই কোনো মাসে প্রত্যক্ষ্যকারী দৃষ্টিবিভ্রমের কারণে চাঁদ না থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখেছে মনে করে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় এবং সে বিশ্বস্ত হওয়ায় বিচারক শরীয়তের বিধি মোতাবিক তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেয় (যেহেতু গায়েবের খবর তার নেই) তাহলে বাস্তবতার বিচারে ফল এই দাঁড়াবে যে, আমরা ত্রিশ শা'বানকে পহেলা রমযান বানিয়ে ফেলেছি, অথবা ত্রিশ রমযানকে পহেলা শাওয়াল ভেবে একটি রোযা ছেড়ে দিয়েছি।

বাস্তব ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে। কখনো হয়ও।

বিশেষ করে ঊনত্রিশের দিবাগত রাতে চাঁদ ওঠা সত্ত্বেও দৃষ্টিগোচর না হওয়া এবং সময়মত চাঁদ দেখার সাক্ষ্য না পাওয়ার ঘটনা তো ঘটে থাকেই। সাধ্যমত শরয়ী বিধান অনুসারে আমল করা সত্ত্বেও যেসব ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য। তাই আল্লাহ তাআলা ইখলাছ ও হুকুম মান্য করার কারণে তাদের অজান্তে ঘটে যাওয়া ভুল-ত্রুটি থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে ঐ দিনকেই রোযার দিন বলে ধরে নেন, যেদিন বান্দাগণ তাঁর হুকুম মোতাবিক রোযা রাখা শুরু করেছে এবং ঐ দিনকেই ঈদের দিন গণ্য করেন যেদিন বান্দাগণ ঈদ উদ্যাপন করেছে এবং ঐ দিনকেই কুরবানীর দিন ধর্তব্য করেন, যেদিন বান্দাগণ কুরবানী করেছে। যদিও বাস্তব ঘটনা ভিন্ন কিছু হয়ে থাকে! বাস্তবে যা ঘটেছে তার বিচারে যেটা সঠিক সে অনুযায়ী আমল না হওয়ায় তাদেরকে গোনাহগার বিবেচনা করেন না

এবং সাওয়াব থেকেও বঞ্চিত করেন না। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে :

'রোযা সেদিন, যেদিন তোমরা রোযা রাখছ'। অর্থাৎ বাস্তবে যদিও সেটা ত্রিশ শা'বান অথবা দোসরা রমযান হয়। 'ফিতর সেদিন যেদিন তোমরা রোযা ছাড়ছ'। অর্থাৎ যদিও সেটা বাস্তবে ত্রিশ রমযান কিংবা দোসরা শাওয়াল হয়ে থাকে। 'এবং কুরবানী সেদিন, যেদিন তোমরা কুরবানী করছ'। অর্থাৎ যদিও সেটা বাস্তবে ১০ যিলহজ্বের পরিবর্তে ৯ যিলহজ্ব কিংবা এগারো যিলহজ্ব হয়ে থাকে। এগারো যিলহজ্ব হয়ে যাওয়ায় তাকে বলা হবে না যে, প্রথম দিন কুরবানী করার ফযীলত তার হাসিল হয়নি কিংবা তার ঈদের নামায কাযা হয়ে গেছে।

হাদীসের এই অর্থ হাদীসের পূর্বাপর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক' ৭৪/১৫৫, 'আসসুনানুল কুবরা' বাইহাকী ৪/৪১১, 'মুসনাদুল বাযযার' ১৫/২৯৮ এ সকল কিতাবে এই হাদীসের সম্পূর্ণ ভাষ্য আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

"إذا رأيتم الهلال فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون".

অর্থাৎ 'যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখ তখন রোযা রাখ, তারপর যখন নতুন চাঁদ দেখ তখন রোযা ছাড়। আর যদি চাঁদ তোমাদের থেকে আড়াল হয়ে যায় তাহলে ত্রিশ পূর্ণ কর। যেদিন তোমরা রোযা রাখছ সেদিনই তোমাদের রোযা, যেদিন তোমরা রোযা ছাড়ছ সেদিনই তোমাদের ফিতর এবং যেদিন তোমরা কুরবানী করছো সেদিনই তোমাদের কুরবানী'।

চাঁদ আড়াল হয়ে যাওয়ায় ত্রিশ পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। এতে মনে সন্দেহ জাগে, তাহলে আমাদের রোযা ও ঈদের না জানি কী দশা

হয়! হয়ত ঊনত্রিশের রাতেই চাঁদ উঠে গেছে, অথচ আমরা খোঁজ পাইনি। তাই পহেলা রমযানকে ত্রিশ শা'বান ভেবে আমরা একটা রোযা ছেড়ে দিয়েছি। আবার পহেলা শাওয়ালকে ত্রিশ রমযান মনে করে ঈদের দিন রোযা রেখে ফেলেছি ... এই সংশয়-সন্দেহ দূর করার জন্যই চাঁদ দৃষ্টির আড়ালে থাকা অবস্থায় ত্রিশ পূর্ণ করতে বলার পাশাপাশি এই সান্তবনাও দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যেদিন রোযা শুরু করেছ কিংবা যেদিন ঈদ করেছ-যদি সেটা বাস্তব অবস্থার বিপরীতও হয় তবু আল্লাহর কাছে তা সঠিক দিবস বলেই গণ্য হবে। অতএব তোমরা যথাযথ সাওয়াব পাবে এবং তোমাদের কোনো গোনাহ হবে না।

সুতরাং হাদীসের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় তো এই জানা গেল যে, আমরা শরীয়তের নির্দেশনার নিরীখে চাঁদ দেখা কিংবা দেখার সাক্ষ্য অনুসারে আমল করতে আদিষ্ট। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার পর যদি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের এ ক্ষেত্রে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে সে কারণে তারা যেমন গোনাহগার হবেন না তেমনি তাদের আনুগত্যকারী সর্বসাধারণ। এ কারণে তাদের আমল বাতিলও গণ্য হবে না।

২. আলোচ্য হাদীসে বিদ্যমান দ্বিতীয় নির্দেশনাটি তা-ই, যা প্রথম হাদীসে পরিষ্কারভাবে এসেছে।

অর্থাৎ রমযান ও ঈদুল ফিতরের চাঁদ এবং হজ্ব ও কুরবানীর চাঁদ বিষয়ে সিদ্ধান্তদানকারী দায়িত্বশীল হলেন মুসলমানদের শাসক বা তার প্রতিনিধি।

তিনি এবং তার আনুগত্যকারী মুসলিম সর্বসাধারণ যেই দিনকে রোযা, ঈদুল ফিতর, আরাফা এবং কুরবানীর দিন হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন, তা আল্লাহর কাছেও তেমনি। আর তাই কারো ব্যক্তিগত মতামত কিংবা সংশয়-সন্দেহের কারণে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে

রোযা, ঈদ, উকুফে আরাফা কিংবা কুরবানী করা ঠিক নয়। কারণ রোযার সূচনা সেটা নয়, যাকে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মনে করছে; বরং তার সূচনা হল সেটা, যাকে মুসলমানদের শাসক শরীয়তের আইন অনুযায়ী নির্ধারণ করেছেন। আর সর্বসাধারণ যাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এমনিভাবে ঈদের দিন সেটা নয়, যাকে ব্যক্তি বিশেষ ঈদ বলে ভাবছে; বরং সেটা, যা নির্ধারণ করেছে মুসলমানদের দায়িত্বশীল আর যাকে মেনে নিয়েছে মুসলিম সর্বসাধারণ ...।

হাদীসে বিবৃত প্রথম নির্দেশনার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম বাইহাকীর মতো বহু মুহাদ্দিস এই হাদীসের শিরোনাম করেছেন, 'চাঁদের সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে যদি মুসলমানদের ভুল হয়ে যায় তবে তার কী হুকুম' ... এজাতীয়।

যেমন আবু দাউদে আছে,

باب إذا أخطأ القوم الهلال

বাইহাকীতে শিরোনাম করা হয়েছে,

باب القوم يخطئون في رؤية الهلال

শরহুস্ সুন্নাহ বাগাভীতে,

إذا أخطأ القوم الهلال

আর হাদীসে বিধৃত দ্বিতীয় নির্দেশনার উল্লেখ করেছেন ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীস বর্ণনার মুহূর্তেই, এক বা একাধিক আহলে ইলমের বরাতে। তিনি লিখেছেন,

وفسَّر بعض اهل العلم هذا الحديث، فقال : إنما معنى هذا : الصوم والفطر مع الجماعة

وعُظْمِ الناس

অর্থাৎ রোযা ও ঈদ আলজামাআহ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাথে হবে।

(জামে তিরমিযী, ৮০৬ নং হাদীসের অধীনে)

'আলজামাআহ' দ্বারা উদ্দেশ্য, শাসক বা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের আনুগত্যকারী জনতা।

এই ব্যাখ্যাকেই ইমাম আবুল হাসান সিন্ধি রাহ. সুনানে ইবনে মাজাহ'র টীকায় ঐ হাদীসের অধীনে আরো স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন। যা পাঠকবর্গ ইতোপূর্বে (রজব '৩৫ হিজরী সংখ্যায়) পড়েছেন। সেখানে শায়খ আলবানী রাহ.-এর বরাতে এ কথাও আলোচিত হয়েছে যে, এই হাদীসের সরল ব্যাখ্যা সেটাই, যা আবুল হাসান সিন্ধি সুনানে ইবনে মাজাহ'র টীকায় উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হল, রোযা, ঈদুল ফিতর এবং আযহার মতো সম্মিলিত ইবাদতসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির হাতে নয়; বরং ইমাম ও আলজামাআহ তথা শাসক ও সর্বসাধারণের হাতে। ব্যক্তির কর্তব্য, এদের অনুগত থাকা।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এই হাদীস তো সাড়ে চৌদ্দশ' বছর ধরেই বিদ্যমান রয়েছে। মুহাদ্দিসীন তা বর্ণনা করেছেন, ফুকাহা তার ব্যাখ্যা করেছেন, তা থেকে বিধান আহরণ করেছেন এবং প্রত্যেক কালের উলুল আমর (দায়িত্বশীল উলামা ও উমারা) ও উম্মাহর বুযুর্গ ব্যক্তিগণ ঐ সব বিধানকে বাস্তবে রূপদান করেছেন। কিন্তু এ রকম অর্থ কারো কল্পনার ত্রিসীমানাতেও আসেনি, যা এখন বলা হচ্ছে।

ফুকাহায়ে উম্মত, মুফাসসিরীনে কেরাম এবং শারেহীনে হাদীস তথা হাদীসের ভাষ্যকারদের মাঝে এই হাদীস প্রথম থেকেই ব্যাপকভাবে

পরিচিত ও প্রচলিত। এমন নয় যে, এটা এখনকার উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত। এটা যদি পরবর্তীকালের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তা নবীর হাদীসই বা হয় কী করে? এখন কথা হল, কোনো ফকীহ, কোনো মুফাসসির, কোনো মুহাদ্দিস কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমে দ্বীন কি এই হাদীসের ঐ অর্থ বয়ান করেছেন, পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু কিছু ব্যক্তি এখন যে অর্থ দাঁড় করাচ্ছেন?

ফুকাহায়ে কেরাম, মুফাসসিরীন এবং মুহাদ্দিসীনের মধ্যে যারাই এই হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের কেউ-ই এ অর্থ করেননি যে, এখানে সারা বিশ্বে একই দিন রোযা ও ঈদ পালন করতে বলা হয়েছে। এমনকি এতটুকুও বলেননি যে, এ থেকে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া প্রমাণিত হয়!

আমি এখানে হাদীস, তাফসীর এবং ফিকহ-ফতোয়ার কিছু কিতাবের শুধু নাম উদ্ধৃত করছি। আগ্রহী পাঠক চাইলে তার শরণ নিতে পারেন।

১ - কিতাবুল উম্ম, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী রাহ. (১৫০ হি.-২০৪ হি.) ১/১৬৯

২ - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩১৮

৩ - জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৯৭

৪ - আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ১/২৬৯

৫ - মা'আলিমুস্ সুনান, খাত্তাবী ২/৮২

৬ - শরহুস সুন্নাহ, বাগাভী ৪/১৪৫-১৪৭

৭ - আস্সুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৪/২৫১-২৫২

৮ - মা'রিফাতুস্ সুনানি ওয়াল আছার, বাইহাকী ৫/১১৪

৯ - আত-তামহীদ, ইবনে আব্দুল বার ১৪/৩৫৬

১০ - আরেযাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী, আবু বকর ইবনুল আরাবী ৩/২২২

১১ - আলজামে লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী ১২/১১

১২ - জামেউল উসূল, ইবনুল আছীর

৬/২৭৭, কিতাবুস সওম (في الصوم والفطر بالجتهاد)

১৩ - আউনুল মা'বুদ, শরহু সুনানি আবি দাউদ, শামছুল হক আযিমাবাদী ৬/৩১৬

১৪ - তুহফাতুল আহওয়াযি, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ৩/৩১২

১৫ - সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম, আমীরে ইয়ামানী ২/১৯৪

১৬ - শরহু সুনানে ইবনে মাজাহ, আবুল হাসান সিন্ধি ২/৩০৬

১৭ - শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নববী ৭/৪৪৩-৪৪৫

১৮ - ফয়যুল ক্বাদীর, আব্দুর রঊফ মুনাভী ৪/৪৪১

১৯ - ইকদুল জীদ ফি আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী পৃ. ৩৩

২০ - মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৫/১০৩-১১১

২১ - ফাতাওয়াস্ সুবিক ১/২১৫

২২ - আলমুগনী, ইবনে কুদামা ৩/১৩-১৪

২৩ - তাবয়ীনুল হাকাইক শরহু কানযিদ্ দাকাইক ১/৩১৮, ২/৯২

২৪ - ফাতহুল ক্বাদীর শরহুল হিদায়া, কিতাবুল হজ্ব : আরাফা ২/৩২২

২৫ - দুরারুল হুককাম শরহু গুরারিল আহকাম ১/২৬৩

২৬ - বাযলুল মাজহুদ ফি শারহি সুনানি আবী দাউদ ৮/৪৫০

২৭ - মিরকাতুল মাফাতীহ ৪/২৪২

২৮ - নাইলুল আওতার ৩/৩৮০

২৯ - আলবায়ান ফী মাযাহিবিল ইমামিশ শাফিঈ, আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া আল ইমরানী ২/৬৫০

৩০ - তাহযীবুস সুনান, ইবনুল কায়্যিম ৩/২১৩

এখানে আমি উদাহরণস্বরূপ হাদীস, তাফসীর এবং ফিকহ-ফতোয়ার মাত্র ত্রিশটি কিতাবের নাম উদ্ধৃত করেছি। এগুলোর কোনোটিতেই ওই অর্থের কোনো নাম-নিশানাও নেই যা দাবি করা হচ্ছে। বরং কোনো কোনোটিতে হাদীসের পাঠের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিভিন্ন মাসআলা আহরণ করা হয়েছে। আর অধিকাংশ কিতাবেই হাদীসটির এ অর্থই বিবৃত হয়েছে যে, রোযা ও ঈদ এবং কুরবানী ও হজ্বের তারিখ বিষয়ক সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের হাতে। যদি তারা শরীয়তের আইন মোতাবিক সিদ্ধান্ত দেয়ার পরও তাদের অজ্ঞাতসারে কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্ত অনুসারে মুসলমানগণ যেদিন রোযা ও ঈদ এবং হজ্ব ও কুরবানী করবেন সেটাই আল্লাহর কাছে ঐসব আমলের সঠিক সময় বলে গণ্য হবে। অতএব কারো

জন্য এটা বৈধ নয় যে, রোযা ও ঈদ এবং হজ্ব ও কুরবানীর ক্ষেত্রে সে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল (উলামা ও উমারা)-দের থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে। যেমনটি এই প্রবন্ধেরই দশম কিস্তিতে (রজব ১৪৩৫ হি. সংখ্যায়) আরবের আকাবির ও মনীষী পর্যায়ের আলেমদের বরাতে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। তারা সবাই তাদের এ ফতোয়ার পক্ষে আলোচ্য হাদীসকেই প্রমাণ পেশ করেছেন।

যাইহোক, এই হচ্ছে হাদীসের সহজাত অর্থ, যা উম্মাহর ফকীহগণ ও মুহাদ্দিস আলিমগণ বুঝেছেন। এখন লক্ষ্য করুন, ভাই ইকবাল হাদীসটির নতুন কী অর্থ আবিষ্কার করেছেন। প্রথম হাদীসের অর্থ তিনি লিখেছেন,

'ঈদুল ফিতর হলো ঐ একদিন, যেদিন সকল মানুষ ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করে থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে ঐ একদিন, যেদিন সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে।'

এই তরজমায় 'দিন' এর সাথে 'এক' শব্দটি যোগ করা ভুল। যদি ইচ্ছাকৃত করা হয়ে থাকে তাহলে তো ভয়াবহ! হাদীসে يوم ইয়াওমা (দিন)-এর সাথে সরাসরি যেমন واحد ওয়াহেদ (এক) শব্দ নেই, তেমনি শব্দটি এখানে يومٌ বা يوماً (ইয়াওমুন বা ইয়াওমান) তথা তানবীন সহকারে নেই। তানবীন সহকারে থাকলে তার অর্থ 'একদিন' করা সহীহ হত।

এখানে বরং يومَ ইয়াওমা' শব্দটি مضاف (মুযাফ) হয়েছে। তাই এর অর্থ হবে 'দিন', 'একদিন' নয়। আর এ কথা বয়ান করাও হাদীসের উদ্দেশ্য না যে, ঈদ একদিন হবে নাকি একাধিক দিন। বরং উদ্দেশ্য এটা বলে দেয়া যে, কোন্ দিনটি ঈদের দিন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে- এক বা একাধিক ব্যক্তির মতামত হিসেবে যাকে ঈদের দিন বলে দাবি করা হচ্ছে সেটা, নাকি যেদিনটিকে ঈদের দিন বলে ফয়সালা

করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীল আর তাকে মেনে নিয়েছে মুসলিম সর্বসাধারণ।

দ্বিতীয় হাদীসের তরজমা তিনি লিখেছেন, 'যেদিন তোমরা স্বওম (রোজা) পালন কর সেদিন হল স্বওম (রোজা), আর যেদিন তোমরা ফিতর পালন কর সেদিন হল ফিতর, যেদিন তোমরা কুরবানী পালন কর সেদিন আযহা'।

হাদীসের ভাষ্যে এখানেও প্রত্যেকবার 'يومَ ইয়াওমা' শব্দটি আছে, যা 'মুযাফ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য এখানেও একদিন বা দুইদিন এসব কিছু বয়ান করা উদ্দেশ্য না। তরজমায় তো এখানে 'একদিন'-এর ব্যাপারটি তিনিও লেখেননি, কিন্তু ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনাতে গিয়ে 'একদিন' কথাটি লিখেছেন, যা গলদ।

কারণ আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এতে যেমন 'একদিন' অর্থ করা শুদ্ধ হয় না, তেমনি 'দুই বা তিন দিন'-এর অর্থও করা যায় না। উদ্দেশ্য বরং এটা বলে দেয়া যে, রোযা ও ঈদের দিন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে কোন দিন? শরীয়তের আইন মোতাবিক বিচারক যেইদিনের ফয়সালা করেছেন সেদিনটি, নাকি আমাদের জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বাস্তব ক্ষেত্রে যেদিন আসলে প্রথম রমযান বা পহেলা শাওয়াল- কোনটি? সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীলগণ যে দিনের ফয়সালা করেছেন সেদিন, নাকি তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারীরা যেদিন বলে দাবি করছে সে দিন?

হাদীস বলছে, তোমরা গায়েবের খোঁজ জানতে আদিষ্ট নও। সুতরাং শরীয়তের আইন মোতাবিক যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটার অনুসরণ কর এবং ইমাম ও জামাআহ'র সঙ্গে থাক। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

একটি সহজ-সাধারণ কথা

যেমনটি আমি বলে এসেছি, সাধারণ বোধ-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও বুঝতে পারে যে, এ দুই হাদীসের এ অর্থ দাবি করা যে, এখানে সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একই দিনে রোযা, ঈদ ও কুরবানী করতে বলা হয়েছে এবং তা তাদের উপর ফরয করা হয়েছে - এ রকম অর্থ হাদীসের শব্দ ও পূর্বাপর মোটেও সমর্থন করে না। ঠিক তেমনি তা হাদীস ইরশাদ হওয়ার সময়, পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের সাথেও একদমই খাপ খায় না। কে না জানে, সেই যুগে এবং তার পরবর্তী এক হাজার বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত বর্তমান দ্রুততম আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল কল্পনারও অতীত। ফলে তাৎক্ষণিক কিংবা স্বল্পসময়ের মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সংবাদ প্রেরণ ছিল অসম্ভব। আর এটাও জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না যে, তার সময় থেকে বারোশ'-তেরোশ' বছর পর কী পরিস্থিতি তৈরি হবে সেটা তিনি জানবেন।

অতএব প্রথম কথা, যেই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা ঐ সময় অসম্ভব এমনকি কল্পনারও অগম্য -তার নির্দেশ তিনি কীভাবে দেবেন?

যদি মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভবিষ্যতের এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন বিধায় তিনি এ রকম বলেছেন তাহলে তো এমন হওয়া দরকার ছিল যে, সাহাবায়ে কেরামের কাছে এই নির্দেশ অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমানত রেখে যেতেন। তাদেরকে এর উপর আমল করতে বলতেন না। কারণ যদি তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী তোমাদের সকল মুসলিমকে একই দিন রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে তাহলে তো তারা জিজ্ঞাসা করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কীভাবে সম্ভব? আপনি আমাদেরকে এর রাসত্মা বাতলে দিন!

আমরা কী করে জানব, মক্কা, নজদ, বাহরাইন এবং ইয়ামান ও

অন্যান্য জায়গায় আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা কবে নতুন চাঁদ দেখেছে এবং কোন দিন রোযা শুরু করেছে এবং কোন দিন ঈদ করেছে?! আর তারাই বা কীভাবে জানবে যে, আমরা কবে চাঁদ দেখেছি এবং কবে রোযা শুরু করেছি অথবা ঈদ করছি?!

যেহেতু এসব হাদীসে এ ধরনের কোনো প্রশ্ন কিংবা তার জওয়াব দেখতে পাওয়া যায় না, সেহেতু পরিষ্কার বোঝা যায়, এই হাদীসগুলোতে এরকম কোনো কথা বলাই হয়নি যে, সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একই দিন রোযা ও ঈদ এবং কুরবানী পালন করতে হবে। অন্যথায় এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠত এবং তার সমাধানও হাদীসে উল্লেখ থাকত।

তারপরও যদি কেউ হঠকারিতাবশত দাবি করে, হোক চাই না হোক এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সারা দুনিয়ার সকল মুসলমানকে একই দিনে রোযা, ঈদ ও কুরবানী করতে হবে; তাহলে আমাদের প্রশ্ন, এই ফরযের উপর তিনি নিজে আমল করেননি কেন? পরবর্তী হাজার বছর ধরে, এমনকি এখন পর্যন্ত এই ফরযের উপর আমল হচ্ছে না কেন?

এটা তাহলে কেমন কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা বিষয় হাদীসে ফরয করে দিলেন অথচ তিনি নিজে তার উপর আমল করলেন না এবং সেই ফরয আদায়ের কোনো পদ্ধতিও বলে গেলেন না?! তিনিও না, তার খোলাফায়ে রাশেদীনও না! মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম তিন প্রজন্মেও এর উপর আমল হলো না, তার পরবর্তী কোনো কালেও না!!

এ রকম হাস্যকর কথা কারো চিন্তায় কীভাবে আসে আর তিনিই বা কীভাবে লেখেন!

যদি কেউ আরো বেশি হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে বলে, তিনি এটা ফরয করেছেন বটে, কিন্তু অপারগতার কারণে ঐ ফরযের উপর

আমল করতে পারেননি। এখন যেহেতু এই ফরয পালন করতে কোন অপারগতা নেই; বরং তা খুবই সম্ভব, অতএব করা উচিত ...। এ রকম হঠকারীদের প্রথমত আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং শরীয়তের উপর মিথ্যারোপের শাসিত্মর কথা স্মরণ করাতে চাই। দ্বিতীয়ত তাদের দাবীকে ক্ষণিকের জন্য মেনে নিলেও বলব, কুরআনে নির্দেশ তো হল فاتقوا الله ما استطعتم (তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর) [সূরা তাগাবুন : ৬৪ : ১৬] এই আয়াতের বিধান অনুযায়ী মাসআলা হল, যেই নির্দেশকে পুরাপুরি ও পূর্ণাঙ্গ উপায়ে মান্য করা সম্ভব না তাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ না দিয়ে যতটুকু সম্ভব আমল করতে হবে। যেমন দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা না থাকলে এই নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, নামায ছেড়ে দেবে কিংবা শুয়ে শুয়ে পড়বে; বরং বসে পড়ার সাধ্য থাকলে বসেই পড়বে।

এই শরীয়ত স্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী যদি বাস্তবেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়ার মুসলমানদের একই দিনে রোযা ও ঈদ করার হুকুম দিয়ে থাকেন তাহলে এ সম্পর্কিত বিধান এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিও উম্মতকে বলে দিতেন এবং তাঁর কালে বিদ্যমান উপায়-উপকরণ অনুপাতে যতটুকু করা সম্ভব ছিল সেটুকু আমল করতেন। কিন্তু কোথায় সেই বিধান আর কোথায় সেই কর্মপদ্ধতির বয়ান! কোথায় সেই মোতাবিক সামান্য থেকে সামান্য পর্যায়ে আমলের শুধু একটি উদাহরণ?! আর কোথায় তাঁর উম্মতের মধ্যে পনের শতকের প্রথম সময় পর্যন্তও এর কেবল আলোচনাটুকু? কিছুই নেই!

শেষ পর্যন্ত তাহলে একই দিনে রোযা ও ঈদ ফরয হওয়ার মানদ- তারা কোন জিনিসকে বলবেন? বিশ্বের সর্বপ্রথম দেখাকে? মক্কার দেখাকে? মদীনার দেখাকে? কোথায় কোন হাদীসে আছে এই মানদ--র উল্লেখ? যদি একই দিন করার কোনো মানদ- না থাকে, এমনি এমনি তা ফরয হয় তাহলে বলব, এটা তো সবারই জানা যে, নবীযুগ থেকে এ পর্যন্ত কখনো পুরো মুসলিম উম্মাহর না একই দিনে

রোযা শুরু হয়েছে, না একই দিনে কখনো ঈদ হয়েছে। অতএব সকলেই এই ফরয পরিত্যাগকারী বলে গণ্য হবে। ভাই ইকবাল কি তাই বলতে চাচ্ছেন?

নবী-যুগ কিংবা মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্মে একই দিনে করার কোনো উদাহরণ উল্লেখ করা থেকে এই বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যে, সে সময় অপারগতার কারণে এটা করা যায়নি- মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ যতটুকু করা সম্ভব ছিল সেটুকুও করেননি তারা।

অপারগতার কারণে যদি একেবারেই আমল সম্ভব না হত তাহলে তো একে ফরযই করা হত না। শুধু ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও যদি ফরয হত তাহলে তারও উল্লেখ থাকত এবং প্রত্যেক পূর্ববর্তী প্রজন্ম পরবর্তীদের অসিয়ত করে যেতেন, 'দেখ! এই যে প্রত্যেক অঞ্চলে নিজ নিজ দেখা মোতাবিক আমল হচ্ছে- এটা ওযরের কারণে। না হয় আসল ফরয তো এই যে, সারা দুনিয়ার সকল মুসলমান একই দিন রোযা ও ঈদ করবে।' কিন্তু কোথায় উম্মাহ্র প্রথম তিন প্রজন্মের মাঝে এই মাসআলার আলোচনা কিংবা পরবর্তী কালসমূহে, আর কোথায় এ ধরনের অসিয়তের শুধু একটিমাত্র নমুনা?

মোটকথা, একই দিনে রোযা ও ঈদ করাকে শরয়ী ফরয সাব্যস্ত করা নিকৃষ্টতম বিদআত। আর এটাকে ঐসকল হাদীসের অর্থ ও মর্ম বলে দাবি করা সেসব হাদীসের স্পষ্ট বিকৃতি এবং এটা হাদীস জাল করারই একটি প্রকার, আমাদের এই বন্ধু নিজের অজান্তেই যে অপরাধে জড়িয়ে পড়েছেন!

আল্লাহ তাআলাই সকলকে রক্ষা করার মালিক।

আজকের মত আলোচনা এ পর্যন্তই। তবে ভাই ইকবালের সাথে আমাদের আরো কিছু কথা হবে সামনে ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

ডিসেম্বর ২০১৪, সফর ১৪৩৬

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন-১৫

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পর্যালোচনা)

‘স্বওম ও ঈদ’-এর লেখক

মুহাম্মাদ ইকবালের কাছে কিছু প্রশ্ন (২)

১। তার ঐ মতে হাদীসের অর্থ, সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের জন্য একই দিনে রোযা ও ঈদ এবং কুরবানী করা ফরয। এদিকে আমরা দেখছি যে, তিনি নিজেই এই ফরয তরক করছেন। তো এই ফরয তরক করার ক্ষেত্রে তার শরীয়তসম্মত ওযর কী? আর যদি তিনি দাবী করেন, তিনি এই ফরয আদায় করছেন, অথচ বাস্তবে তিনি নিজ দেশের আগে করছেন- তবুও সকলের সাথে করা হচ্ছে না। আর যদি নিজ দেশের সঙ্গে করেন তবু সবার সাথে করতে

পারছেন না। এরপরও যদি তার ফরয আদায় হচ্ছে বলা হয় তাহলে তো সব মানুষের ফরযই আদায় হচ্ছে! তো এটা কেমন 'একসাথে করা' যে একসঙ্গে না করেও তা করা হয়ে যাচ্ছে?! শেষ পর্যন্ত এই ঐক্যের শরয়ী মানদ- কী? দয়া করে তিনি তার বিধি মোতাবিক জবাবে শুধু 'মা আনযালাল্লাহ' (কুরআন অথবা হাদীস) উল্লেখ করুন।

২। বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বওলী হাদীস (যা তিনি বলেছেন) যখন ফে'লী হাদীস (যা তিনি করেছেন) -এর বিপরীত হয় তখন ক্বওলী হাদীসই গ্রহণযোগ্য হয়। আর ফে'লী হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস হয়ে যায়।'

প্রশ্ন হল, এই যে 'শরয়ী হুকুমটি'(?) তিনি বয়ান করলেন এটা কুরআন মাজীদের কোন আয়াতের তরজমা কিংবা কোন সহীহ হাদীসে এর উল্লেখ আছে? নিজের পক্ষ থেকে একটি নীতি খাড়া করলেন আর তার ভিত্তিতে বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এই বিধানকে অস্বীকার করে বসলেন যে, রমযানের চাঁদ এক সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

যে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে রোযা রাখ এবং রোযা ছাড়, সেখানে এই কথার উল্লেখ নেই যে, এক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। উপরন্তু বহু ফে'লী হাদীস দ্বারা রমযানের চাঁদের ব্যাপারে এক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণীয় হওয়া প্রমাণিত। এইসব হাদীস ঐ ক্বওলী হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং এখানে এমন বিধান পাওয়া যাচ্ছে, যে বিষয়ে ঐ ক্বওলী হাদীস নীরব। অতএব এখানে বিরোধ বা বৈপরিত্য দাঁড় করানোই ভুল।

৩। বইয়ের ১৬-২১ পৃষ্ঠায় কুরাইব রাহ.-এর বর্ণিত ঐ হাদীসের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে কুরাইব আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-কে বলছেন, আপনি কি মুয়াবিয়া ও তার লোকদের দেখাকে

যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি উত্তর দিলেন,

لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

'না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটিই আদেশ করেছেন'। এই হাদীস দূরদূরান্তের অঞ্চলের দেখা ধর্তব্য না হওয়ার দলিল। কিন্তু ইকবাল সাহেব এখানে এই বাহানা বের করেছেন যে, কুরাইব একা হওয়ায় ইবনে আববাস তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি। হাদীসে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দেওয়ার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করতে বলা হয়েছে, যা এখানে পাওয়া যায়নি। তার দাবী হল, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটিই আদেশ করেছেন' বলে এই হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অথচ প্রথম কথা তো রমযান প্রমাণিত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট, স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে আববাসের বর্ণিত হাদীস দ্বারা এই বিধান সাব্যস্ত। দ্বিতীয়ত, কুরাইব এখানে কেবল নিজে দেখেছেন এই খবর দেননি বরং শামে ব্যাপকভাবে সকলের দেখা এবং রমযান প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীন হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর ফায়সালা ও সেই মোতাবেক সেখানে আমল করা হচ্ছে মর্মে সংবাদ দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্ত পালনীয় হওয়ার জন্য তা কেবল একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পৌঁছিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। ইকবাল সাহেব এ ক্ষেত্রেও যে একাধিক ব্যাক্তির শর্ত আরোপ করছেন এটা কিন্তু কোনো আয়াত কিংবা হাদীস দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না। তৃতীয়ত, খোদ হাদীসের মূল পাঠ নিয়ে চিন্তা করুন, তাতেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

দেখুন, এখানে কুরাইব এ প্রশ্ন করেননি যে, আপনি কি আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না? যদি এমন প্রশ্ন করতেন আর এক ব্যক্তির সাক্ষ্য ইবনে আববাস গ্রহণ করবেন না এমন হত তাহলে তিনি বলতেন, তুমি একা আর আমাদের তো দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

যেহেতু কুরাইবের প্রশ্ন এটা ছিল না তাই এমন উত্তরও আসেনি। তার প্রশ্ন তো বরং ছিল, 'মুয়াবিয়া ও তার লোকজনের দেখাকে যথেষ্ট মনে করবেন না?' এর উত্তর যা হওয়ার ছিল সে রকমই এসেছে। অর্থাৎ না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এ আদেশই করেছেন।

রইলো এ প্রশ্ন যে, এই আদেশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন কোন হাদীসে? এর প্রথম উত্তর তো এই যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা সাহাবীর এরকম বর্ণনা, যদিও তাতে সরাসরি তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়নি তথাপি এটি হাদীসেরই এক প্রকার, যা আপন স্থানে দলিলের মর্যাদা রাখে। তবে যেহেতু ইবনে আববাস রা. স্পষ্ট করে ঐ নববী ভাষ্যের উল্লেখ করেননি, তাই আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না যে, সেটা কোন ভাষ্য যার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। তবে কুরাইব নিজে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে এই হাদীসও রেওয়ায়েত করেছেন,

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته، فإن غم علينا أن نكمل ثلاثين.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ করেছেন চাঁদ দেখে রোযা রাখতে এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়তে। আর যদি চাঁদ দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে যায় তাহলে ত্রিশ পূর্ণ করতে।' (আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী খ. ৪ পৃ. ২৪৭ এটি কুরাইবের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে আবী হারমালার বর্ণনা, কুরাইব থেকে শামবাসীর দেখা সম্পর্কিত হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবী হারমালাই বর্ণনা করেছেন।) এই বক্তব্য আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে কুরাইবসহ তার আরো অনেক শাগরেদ মারফুআন (সরাসরি রাসূলুল্লাহর হাদীস হিসেবে) বর্ণনা করেছেন। ইবনে দাকীকুল 'ঈদসহ বহু ফকীহ ও মুহাদ্দিসের বক্তব্য এই যে, খুব সম্ভব আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের আদেশ বলে এই হাদীসের দিকেই ইশারা করেছেন এবং তার মতে হাদীসের অর্থ এটাই যে, দূরবর্তী কোনো অঞ্চলের দেখা অন্য এলাকার জন্য যথেষ্ট নয়।

যাইহোক, আমি বলতে চাচ্ছিলাম, 'দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে রোযা রাখো' এই হাদীস আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে আদৌ বর্ণিত নয়। তা সত্ত্বেও (কুরাইব ও তাঁর মধ্যকার আলাপে) তাঁর কথাকে সাধারণ ও পূর্বাপর সমর্থিত অর্থে না নিয়ে কেন এই হাদীসের সাথে জুড়ে দেয়া হবে? বিশেষত যখন তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন রমযানের চাঁদ বিষয়ে শুধু একজন বেদুঈনের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা সম্পর্কিত হাদীস। আর স্বভাবতই, এই হাদীস অনুযায়ীই তাঁর আমল ও ফতোয়া।

অতএব যেদিক থেকেই চিন্তা করা হোক ইমাম নববী রাহ. ও ইমাম ইবনুত তুরকুমানী রাহ.-এর এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. মদীনায় অবস্থানকালে শামবাসীর দেখাকে গ্রহণ না করার কারণ এটা নয় যে, সাক্ষী এখানে একজন; বরং তা এজন্য যে, দূরবর্তী অঞ্চলের দেখা তার কাছে গ্রহণীয় নয়। (শরহে মুসলিম নববী খ. ৭ পৃ. ১৯৭; আল জাউহারুন্ নাকী আলাল বাইহাকী খ. ৪ পৃ. ২৫১)

ভাই ইকবালের কাছে প্রশ্ন, হাদীসে কুরাইবের এই স্পষ্ট অর্থ বাদ দিয়ে ঐ দূরবর্তী ব্যাখ্যার পিছনে পড়ার কী দরকার ছিল?

৪। বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় যারা নিজ অঞ্চলের দেখা মোতাবিক আমল করে তাদের উপর এ আপত্তি তোলা হয়েছে যে, আপনারা আরাফার রোযা সৌদিয়ার চাঁদ দেখা অনুসারে কেন রাখেন, যদি আরাফার রোযা ওখানকার দেখা অনুসারে রাখতে পারেন তাহলে ওখানের দেখা অনুসারে কুরবানী এবং রোযা ও ঈদ কেন করতে পারবেন না?

প্রশ্ন হল, আপনি কার কাছে শুনেছেন যে, আরাফার রোযা

আমরা সৌদিয়ার দেখা অনুযায়ী রাখছি? আমরা তো আরাফার রোযা নিজেদের দেখা অনুযায়ী যেদিন ৯ যিলহজ হয় সেদিন রাখছি! তবে যেহেতু যিলহজের প্রথম নয় দিনের প্রত্যেক দিনেই নফল রোযা রাখা যায়, সেজন্য কেউ কেউ নয় তারিখের সাথে আট তারিখের রোযাও রাখেন। কেউ আরো বেশি রাখেন। কিন্তু এই মাযহাবের লোকেরা এখানের ৯ যিলহজকে এখানকার মানুষের জন্য পুরোপুরি সঠিক এবং উপযুক্ত মনে করে। আমার জানা নেই, কোত্থেকে আপনার এই ভুল ধারণা জন্মালো যে, ৯ যিলহজের রোযা আমরা সৌদিয়ার দেখা অনুসরণ করে রাখছি!

ভাই ইকবাল! আপনি নিজের ফতোয়া তো বই আকারে আমাদের মাঝে বিলি করছেন, কিন্তু মনীষী আলিমদের কোনো ফতোয়া আপনি একদমই উল্লেখ করছেন না। তারপরও যদি মন চায় তাহলে আলকাউসার রজব ১৪৩৫ হিজরী সংখ্যায় শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ উসাইমীন-এর ফতোয়া এক নযর দেখতে পারেন। তিনি ঢাকায় অবস্থানকারী সউদী নাগরিকদের এ ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের ইয়াওমে আরাফা হল সেটি, যখন এখানে ৯ যিলহজ হবে। শায়খ উসাইমীনের ফতোয়ার চেয়ে আপনার ফতোয়া অগ্রগণ্য হবে কী কারণে বলুন তো?

৫। জনাব ইকবাল তার বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন যে, সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াত অনুযায়ী সকল মতবিরোধ মিটাতে হবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ব্যাখ্যার আলোকে, কোনো আলিমের ফতোয়ার আলোকে নয়। প্রশ্ন হল, আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? তাঁদের ব্যাখ্যা আমরা কোথায় পাবো?

৬। ভূমিকার শেষে তিনি লিখেছেন, ‘তাই কোন ভাইয়ের যদি মনে হয় যে, আমার উদ্ধৃতির কোন ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে তাহলে অনুগ্রহ করে দলিলভিত্তিক শোধরিয়ে দিবেন’।

প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন, '... তাহলে দয়া করে কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে শোধরিয়ে দিবেন।'

এখানে প্রথম প্রশ্ন হল, তার ভূমিকার আলোচনা অনুযায়ী তার বইতে তো কুরআন-সুন্নাহর বাইরে কোনো কিছু থাকারই কথা নয়। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আয়াত তো তিনি আল্লাহ্ ও রাসূলের ব্যাখ্যা থেকেই নিবেন। যদি তাই হয় তাহলে এতে কোনোরকম ভুল-বিচ্যুতি পাওয়াই তো অসম্ভব! আর যদি তিনি নিজের বুঝ ও মতামতের ভিত্তিতে সে সবের ব্যাখ্যা করে থাকেন তাহলে তার ভূমিকায় উল্লিখিত নীতিমালার বরখেলাফ তিনি কেন করলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, নতুন সংস্করণে ভাষা পরিবর্তন করে কুরআন-হাদীসের জায়গায় 'দলিল' শব্দ ব্যবহারের রহস্য কী, তিনি তা বলবেন কি?

৭। সর্বশেষ প্রশ্নের সম্পর্ক ঐ আলোচনার সাথে যার শিরোনাম: চর্মচোখে বা প্রযুক্তি দিয়ে চাঁদ দেখা উভয় মাধ্যমই শারী'আহ্'তে বৈধ। (প্রথম সংস্করণ পৃ.৯, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ.৭) প্রথম সংস্করণে বলা হয়েছিল, দূরবীন কিংবা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা খালি চোখে দেখার মতই, অর্থাৎ এর মাধ্যমেও চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হবে। এই বক্তব্য সঠিক ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে কথাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবের প্রসঙ্গটি যোগ করা হয়েছে। পরিষ্কার করে কিছু লেখেননি কিন্তু পূর্বাপর দেখে বুঝা যায়, তিনি এটাই বলতে চান যে, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব দ্বারা আকাশে চাঁদের উপস্থিতির কথা জানাই নতুন চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেন জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবের মাধ্যমে চাঁদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানা চাক্ষুষ দেখারই বিকল্প! জানা কথা, এই দাবী সুন্নাতে নববী ও সালাফের ইজমার (সম্মিলিত সিদ্ধান্তের) পরিপন্থী এবং হাদীসে রোযাকে যে চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে- হিসাবের সাহায্যে চাঁদের উপস্থিতি জানাকে সেই দেখার অন্তর্ভুক্ত করা হাদীসের সরাসরি বিকৃতি।

এখানে এ বিষয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এতটুকু বলতে চাচ্ছি যে, গ্রন্থকার ইজমা পরিপন্থী এই মতবাদকে প্রমাণ করার জন্য অদ্ভুত-উদ্ভট আলোচনার অবতারণা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

'এখানে আরবী শব্দ 'رأيتم রআইতুম' শব্দটির মাসদার (মূলশব্দ) ' رؤية রুইয়াতুন' যার অর্থ দেখা। এই ' رؤية রুইয়াতুন' (দেখা) দিয়ে অনেকেই বুঝেছেন সরাসরি চর্মচোখে দেখা, আসলে তাদের দাবী মোটেই সঠিক নয়। কারণ, রুইয়াতুন শব্দটি দ্বারা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমেও দেখতে বলা হয়েছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا...

'কাফিররা কি দেখে না যে, আকাশ এবং পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। অতপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম...।'-সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৩০

এই আয়াতে 'ير ইয়ারা' শব্দটিও 'رؤية রুইয়াতুন' মাসদার থেকে এসেছে, যার অর্থ দেখা। কিন্তু এখানে আল্লাহ 'ير ইয়ারা' শব্দটি দিয়ে সরাসরি চক্ষু দিয়ে দেখতে বলেননি। কারণ শুধুমাত্র চর্মচোখ দিয়ে আকাশ এবং পৃথিবী মিশে ছিল তা দেখা সম্ভব নয়। আর এই দেখাটা আল্লাহ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে দেখতে বলেছেন। বিজ্ঞানের বিগ ব্যাংগ আবিষ্কারের আগে কেউ আকাশ এবং পৃথিবী যে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল তার প্রমাণ পায়নি। বিজ্ঞানের বিগ ব্যাংগ আবিষ্কারের পরে মানুষ তা জানতে পেরেছে। এতএব রুইয়াতুন শব্দটি দ্বারা শুধুমাত্র চর্মচোখ দিয়ে দেখতে হবে তা সঠিক নয় বরং দেখা শুধু চোখ দিয়েও হতে পারে আবার প্রযুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে।' ('স্বওম ও ঈদ' পৃ. ৭, ২য় সংস্করণ) সামনে গিয়ে ৯ নং

পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

‘অতএব, প্রযুক্তির মাধ্যমেও নতুন চাঁদের হিসেব করা শরী‘আতে বৈধ।’

‘প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখা’ বলতে তিনি এটা বুঝাননি যে, দূরবীন এবং টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যাবে। এমনটি তিনি প্রথম সংস্করণে বলেছিলেন এবং তা সঠিক ছিল। কারণ তা চোখে দেখারই একটি প্রকার। কিন্তু প্রযুক্তিগত মাধ্যম বলে এখানে তার উদ্দেশ্য, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব। অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের সাহায্যে চাঁদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানাটাও চাঁদ দেখারই শামিল। আমার জানা নেই, হিসাব কবে থেকে প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত হল এবং হিসাবের মাধ্যমে কোনো বস্তুর জ্ঞান লাভ করা সেই বস্তুকে দেখার সমার্থক হল কী করে? রুইয়াত শব্দ কখনো কখনো ‘জানা’র অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এটা ঠিক। কিন্তু এ কারণে এটা বৈধ হয় কীভাবে যে, যে স্থানে রুইয়াত -এর অর্থ ‘দেখা’ সেখানে আপনি তাকে ‘জানা’ অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করবেন? যেমন সালাতের এক অর্থ নামায। এক অর্থ দরূদ। এখন যদি কেউ বলে, أقيموا الصلاة -এর অর্থ এটা নয় যে, নামায কায়েম করো; বরং এর অর্থ হল, দরূদ কায়েম করো। অতএব দৈনিক দরূদের মজলিস কায়েম করতে থাকো, নামায পড়ার দরকার নেই...। যদি কেউ এরকম বলে তাকে আপনি কী বলবেন? কোনো শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হলে সেক্ষেত্রে করণীয় হল, শব্দটি যেখানে যেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে সেই অর্থই উদ্দেশ্য নেওয়া। একটির জায়গায় অন্যটি গ্রহণ করা বিকৃতিরই নামান্তর।

হাদীসে যে ইরশাদ হয়েছে,

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

এখানে রুইয়াতের অর্থ চাঁদকে দেখা। হিসাবের সাহায্যে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা উদ্দেশ্য নয়। যদি অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা

উদ্দেশ্য হত

فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين –

এর কোনো অর্থ থাকত না। কারণ চাঁদ দৃষ্টি থেকে আড়াল হতে পারে, কিন্তু তার অস্তিত্ব হিসাবভিত্তিক জ্ঞানের অগোচর থাকতে পারে না। অতএব হাদীসের পূর্বাপর এখানে রুইয়াতের অর্থ নির্ধারণ করে দিচ্ছে। উপরন্তু এই অর্থ সালাফের ইজমা এবং ধারাবাহিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমেও প্রমাণিত। আর যেমনটি আহলে ইলম জানেন, আরবী ভাষার ব্যাকরণের দিক থেকে এখানে 'জানা' অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না। অতএব ভাই ইকবালের এই লেকচার একবারেই অপ্রাসঙ্গিক। হায়! যদি তিনি একটি মুতাওয়াতির সুন্নত, যার অর্থও মুতাওয়াতির- তার বিকৃতি সাধনে না জড়াতেন!

কথা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, এই বিকৃতির সমর্থনে ইকবাল সাহেব যে সূরা আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং তাকে কতিপয় বিজ্ঞানীর দয়া-দক্ষিণার উপর ছেড়ে দিয়েছেন- এটা করে তিনি গুরুতর ভুল করেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি,

(ক) যদ্দুর আমরা শুনেছি, বিগ ব্যাংগ দর্শন বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯২৯ সালের আগে সম্ভবত এর কোনো আলোচনাই ছিল না। অথচ আপনি কিনা বলছেন, বিগ ব্যাংগ আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ জানতে পেরেছে, আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। যদি তাই হবে, তাহলে সূরা আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াত (আপনি যার গলদ ব্যবহার করেছেন) -এর ব্যাখ্যায় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের লোকজন থেকে এ বর্ণনা কীভাবে পাওয়া গেল যে, আসমান ও যমীন প্রথমে পরস্পর মিলিত ছিল। তারপর আল্লাহ তাআলা দুটোকে পৃথক করে দিয়েছেন। তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে কাবীর ইত্যাদিতে এই আয়াতের তাফসীর একটু দেখুন।

ইমাম আবু জাফর তবারী (৮৩৯-৯২৩ খৃ.) সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. (৬১৯-৬৮৭ খৃ.), তাবেয়ী হাসান বসরী (৬৪২-৭২৮ খৃ.) এবং তাবেয়ী কাতাদাহ (৬৮০-৭৩৬ খৃ.) থেকে পৃথক পৃথক বর্ণনায় উদ্ধৃত করেছেন, এঁরা সবাই বলেছেন, আসমান ও যমীন মিলিত ছিল। আল্লাহ তাআলা একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। (তাফসীরে তবারী ২১:৩০-এর অধীনে খ.১৬, পৃ. ২৫৫-২৫৭)।

সন্দেহ নেই, আয়াতে কারীমার এই অর্থ চূড়ান্ত নির্ধারিত নয়। এর অন্য ব্যাখ্যাও আছে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর ঐ মহান ব্যক্তিদের থেকে এ বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া সত্ত্বেও ইকবাল সাহেবের এটা বলা কী করে ঠিক হয় যে, বিগ ব্যাংগ দর্শনের বদৌলতেই মানুষ একথা জানতে পেরেছে, আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল।

(খ) আল্লাহ তাআলার ইরশাদ:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا...

-এর অর্থকে যে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের বিগ ব্যাংগ দর্শনের দয়া-দক্ষিণার উপর ছেড়ে দিলেন এবং আপনার বইয়ের নবম পৃষ্ঠায় বললেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে কাফিরদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে এই বাস্তবতায় উপনীত হতে বলেছেন (যে, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত ছিল), তো প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সময়ের কাফিরদের জন্য এটা সাধ্যাতীত বিষয়ের নির্দেশ দেওয়ার মতো নয় কি? আর এই দর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত যেহেতু আপনার দাবি অনুযায়ী এই আয়াতের মর্মই অজানা ছিল, তো এতে করে কুরআনের উপর কি এক ধরনের আপত্তি তোলা হয় না? খোদার বান্দা! একটু দেখে তো নিতেন যে, আহলে ঈমান এই

আয়াত থেকে কী বুঝেছেন এবং কী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যে সব আয়াতে কাফিরদের সম্বোধন করা হয়েছে সেসব আয়াত বুঝা ও তা

থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কি শুধু কাফিরদের কাজ?!

(গ) ভাই ইকবালের বর্ণনাভঙ্গি থেকে মনে হয়, বিগ ব্যাংগ দর্শনের আবিষ্কারের ফলে আল্লাহ তাআলার ঐ নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়েছে যা তিনি আরবের উম্মী কাফিরদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন। ভাই ইকবাল কি একটুও চিন্তা করেছেন, এই দর্শনকে যা কুরআন সুন্নাহয় উল্লেখিত আসমান যমীনের সৃষ্টির বিবরণের সাথে অসামঞ্জস্যশীল, এবং যার আবিষ্কারকগণও স্রষ্টাকে অস্বীকার করে সেই দর্শনকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বাস্তবায়ন বলা কি উচিত?

(ঘ) যতদূর আমরা জেনেছি, কুরআন ও সুন্নাহয় যেই সপ্ত আকাশ

سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا '' -এর উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞানীরা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা হয়ত তা অবিশ্বাস করেন কিংবা এ বিষয়ে নীরব। এমতাবস্থায় তাদের আবিষ্কৃত এই দর্শনের উপর ভরসা করে কুরআনে উল্লিখিত আসমান ও যমীনের পরস্পর মিলিত থাকার বিষয়কে ব্যাখ্যা করা; বরং তাকে সরাসরি এই দর্শনের প্রয়োগ সাব্যস্ত করা কীভাবে সঙ্গত হয়? তদুপরি এটা তো যদ্দুর জানতে পারলাম এখন পর্যন্ত একটা Theory মাত্র, প্রতিষ্ঠিত সত্য (Law) -এর মর্যাদা তা এখনো লাভ করেনি। তা সত্ত্বেও এর উপর এই পরিমাণ ভরসা ও নির্ভরতা!!

(ঙ) ভাই মুহাম্মাদ ইকবাল! 'মা আনযালাল্লাহ' (আল্লাহর নাযিলকৃত ওহী) কে 'রিজালুল্লাহ'র শরণাপন্ন না হয়ে নিজে নিজে পড়া বা বুঝার চেষ্টা করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যার শুরু আত্মপ্রবঞ্চনা আর শেষ হল বিচ্ছিন্নতা। আর বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের ফলও 'বিচ্ছিন্নতা'। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এবং আমাদের সবাইকে সব ধরনের বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

জানুয়ারি ২০১৫, রবিউল আউয়াল ১৪৩৬

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন-১৬

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

অন্যান্য বই

শা‘বান ও রমযান ১৪৩৫ হি. সংখ্যা থেকে নিয়ে গত সংখ্যা (মুহাররম ১৪ ৩৬ হি.) পর্যন্ত মোট পাঁচটি বইয়ের উপর পর্যালোচনা হয়েছে। যেমনটি আমি বলে এসেছি, আলোচ্য মত ও চিন্তাধারার সমর্থনে অনেকেই বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। আলেম-গরআলেম সকলেই এ নিয়ে যারপরনাই কসরত করেছেন। যেসব পুস্তিকা ও প্রবন্ধ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জনের মাধ্যমে আমার কাছে এসেছে তার সংখ্যাও অনেক। প্রতিটির উপর পর্যালোচনার মত পর্যাপ্ত সুযোগ যেমন নেই, তেমনি তার বিশেষ দরকারও নেই। এখন পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তার আলোকে ঐ সব পুস্তিকা ও প্রবন্ধের যাবতীয় আপত্তিকর বিষয় ইনশাআল্লাহ বিজ্ঞ পাঠক নিরসন করতে পারবেন।

মুহাম্মাদ এনামুল হক আল মাদানীর পুস্তিকা

বেশ কয়েকজন বন্ধু বললেন, গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক জনাব মুহাম্মাদ এনামুল হক আল মাদানীর বইয়ের উপরও পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। তার বইয়ের নাম 'কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে সলেহীনদের বিশ্লেষণের আলোকে পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ঈদুল ফিতর আরাফা ঈদুল আযহা আশুরা পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন'। আমি বললাম, ভাই! তার বই সম্পর্কে তো তাদেরই পন্থী আলেম শায়খ মুস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল কাসেমী জবাব লিখেয়েছেন। যার নাম 'পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ' যা তাওহীদ পাবলিকেশন্স বংশাল থেকে যিলকদ ১৪৩০ হিজরীতে ছেপেছে। আগ্রহী পাঠক তা সংগ্রহ করে পড়ে দেখতে পারেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এনাম সাহেবের এখানে এই বিষয়ের অন্যান্য পুস্তিকার চেয়ে অতিরিক্ত বা আলাদা কিছু নেই। অতিরিক্ত কিছু থাকলে সেটা হল ভুল ব্যাখ্যা ও অসংলগ্ন কথাবার্তা কিংবা বলি, বক্তব্য বোঝার দুর্বলতা। উদাহরণস্বরূপ এখানে শুধু বইয়ের ৩০-৩১ পৃষ্ঠা থেকে মাত্র তিনটি উদ্ধৃতি সম্পর্কে কিছু আরয করছি:

১। শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আলউসাইমীন রাহ.-এর বই-পুস্তক এবং ফতোয়াসমূহে এই বিষয়টি খুবই সুস্পষ্টভাবে বারবার লেখা হয়েছে যে, তিনি দলীলের আলোকে উদয়স্থলের ভিন্নতাকে ফিকহী বিধানের ক্ষেত্রেও ধর্তব্য মনে করতেন। কিন্তু এনাম সাহেব শায়খ উসাইমীনের নামে অবলীলায় লিখে দিচ্ছেন:

'শাহরি রামাযান' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, ''আর যখন রামাযান মাসের আগমন শরয়ীভাবে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হল তখন সেক্ষেত্রে চাঁদ উদয়ের বিভিন্নতা বা চাঁদের বিভিন্ন স্থানের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালন করার হুকুম চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। চাঁদ উদয়ের বিভিন্ন মঞ্জিলের সাথে নয়''। অথচ শায়খ উসাইমীন রাহ. এমনটা বলেননি। তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হল, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দেয়ার ভিত্তিতে নতুন চাঁদ দেখা যদি প্রমাণিত হয়ে যায় তখন চাঁদের মঞ্জিলসমূহের (তিথিসমূহের) গণনার নিরিখে একথা বলা যে, এখন পর্যন্ত চাঁদের জন্মই হয়নি কিংবা এখন পর্যন্ত তা দৃষ্টিগোচর হওয়ার অবস্থায় পৌঁছেনি, অতএব চাঁদ দেখতে পাওয়ার দাবি ভুল ... শায়খ বলছেন, এইসব আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। শরীয়ত চাঁদের বিধান চাঁদ দেখা ও দেখার সাক্ষ্য পাওয়ার সাথে যুক্ত করেছে, চাঁদের মঞ্জিলসমূহের (তিথিসমূহের) হিসাব বা গণনার সাথে নয়। শায়খের শব্দগুলো লক্ষ্য করুন:

وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الهلال، لا بمنازله، فقال صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. متفق عليه

(মাজালিসে শাহরি রামাযান, পৃ. ৩৮, তৃতীয় মজলিস)

তো কোথায় মানাযিলুল কামার (চাঁদের বিভিন্ন মঞ্জিল) আর কোথায় মাতালিউল হিলাল (নতুন চাঁদের বিভিন্ন উদয়স্থল)! এনাম সাহেব চাঁদের মঞ্জিল ও নতুন চাঁদের উদয়স্থল- এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারেননি। আর সেজন্যই শায়খের বক্তব্যে উল্লিখিত 'মঞ্জিল'কে 'মাতলা' ধরে নিয়ে সমস্ত বিষয়টাই গুলিয়ে ফেলেছেন। জানি না শায়খের বক্তব্যের এই বিকৃতি সাধনের কী দরকার ছিল?

২। ৩০ নম্বর পৃষ্ঠায় এনাম সাহেব এও লিখেছেন,

''পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় চাঁদ উদিত হওয়ার কারণে তারিখের রদবদল হবে না। বরং তা নতুন চাঁদের প্রথম তারিখ হিসাবে গণ্য হবে। তাই তাঁর আদর্শ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।'' (ইরয়ায়ূল গালীল, ৯০২ পৃষ্ঠা)

'ইরয়ায়ূল গালীল' টা কোন কিতাব এবং কার লিখিত, তা আমাদের জানা নেই। সম্ভবত কারুরই জানা নেই। লেখকের সঙ্গে একসূত্রে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, এটা শায়খ আলবানীর কিতাব। শুনে বিস্মিত হলাম। শায়খ আলবানীর কিতাবের নাম إرواء الغليل 'ইরওয়াউল গালীল'। 'ইরয়ায়ূল গালীল' নয়। তাছাড়া এটি মোট আট খন্ডের কিতাব। সূচীপত্রের জন্য আলাদা এক খন্ড। আর নবম ও দশম খন্ড منار السبيل 'মানারুস সাবীল'-এর জন্য, ইরওয়াউল গালীলে যেই কিতাবের (মানারুস সাবীলের) হাদীসসমূহের তাখরীজ করা হয়েছে। শায়খ আলবানী রাহ.-এর এই কিতাবের প্রত্যেক খন্ডে পৃষ্ঠা সংখ্যা সাড়ে চারশ'র কম। তাহলে এখানে ৯০২ নম্বর পৃষ্ঠা কোত্থেকে এল এবং কোন খন্ডে?

বস্তুত এ ধরনের কথা শায়খ আলবানীর কিতাব 'ইরওয়াউল গালীলে' কখনোই নেই। লেখক এ ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করলে বলব, আলবানীর আরবী ভাষ্য উদ্ধৃত করুন। ইনশাআল্লাহ তিনি এই কিতাবে এ ধরনের বক্তব্য দেখাতে পারবেন না। প্রশ্ন হল, এমন অমূলক উদ্ধৃতির ফায়েদা কী এবং এর দরকারই বা হল কেন?

৩। একই পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখেছেন, ''উম্মতের অধিকাংশ ফকীহ'র মত হল, পৃথিবীর কোন দেশের নতুন চাঁদ দর্শন সমস্ত ইসলামী বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। এ জন্য কোন দেশ বা শহরে চাঁদের প্রথম তারিখ হলে, অন্য দেশে যদি তার পরের দিন চাঁদ দেখা যায়- তাহলে শেষোক্ত দেশবাসী প্রথম সিয়ামটির কাযা আদায় করবে। এই মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ একমত।'' (ইমাম মুনযিরী, মুখতাসার সুনানু আবূ দাউদ ৩/২২০ পৃষ্ঠা)

এই উদ্ধৃতিও ভুল। ইমাম মুনযিরীর মুখতাসারু সুনানি আবী দাউদে ৩য় খন্ডের ২২০ নম্বর পৃষ্ঠায় কিংবা অন্য কোথাও এই কথার উল্লেখ নেই। মুনযিরী রাহ. ও তার কিতাবের সঙ্গে এই ভুল উদ্ধৃতি জুড়ে দেওয়ার মতলব তাহলে কী?

যে বইয়ের এক পৃষ্ঠাতেই এত পরিমাণ ভুল কথাবার্তা সেই বই নিয়েও পর্যালোচনা করার দরকার আছে কি?

যাই হোক, আমি পর্যালোচনার এই ধারাকে আপাতত সমাপ্ত করতে চাচ্ছি। এখন শুধু এনাম সাহেবের মিতা আরেক ভদ্রমহোদয় জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হকের বই নিয়ে কিছু কথা বলে বিদায় নিতে চাচ্ছি।

এক মুরুব্বি বললেন, মাওলানা আতাউল্লাহ ডায়রভী -এর বই, -জনাব কামাল আহমাদ যার অনুবাদ করেছেন- তার উপরও পর্যালোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি মূল উর্দূ বইটি হসত্মগত না হচ্ছে ততক্ষণ শুধু তরজমার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা উচিত নয়।

অনূদিত বইটি আমি মোটামুটি নেড়েচেড়ে দেখেছি। লক্ষ্য করলাম, এর মৌলিক কথাবার্তার জবাব আমাদের প্রবন্ধে এসে গেছে। ভুল-বিচ্যুতি বলুন কিংবা ভুল বর্ণনা- সেটা এখানেও আছে। যেমন এক জায়গায় লেখা হয়েছে, হেদায়া ইত্যাদির আসল রচয়িতাগণ একথাই বলেছেন যে, ''সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়''।

(ইসলামে নতুন চাঁদের বিধান ও এ সম্পর্কিত বিতর্ক নিরসন।) অনুবাদ: কামাল আহমদ, যশোর, পৃ. ১৩৬

অথচ হেদায়ায় 'সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত' শিরোনামে তো দূরের কথা, এই মাসআলারই কোনো উলেস্নখ সেখানে নেই। যাই হোক, আতাউল্লাহ ডায়রভীর মূল উর্দূ রিসালা এবং পাকিস্তানে তার জবাবে যেসব রিসালা লেখা হয়েছে সেগুলো যেহেতু সরাসরি আমাদের হাতে নেই তাই কেবল তরজমার ভিত্তিতে তার উপর পর্যালোচনা পেশ করা সঙ্গত মনে হয় না। এমনিতেও এত বিশদ আলোচনার পর আলহামদুলিল্লাহ, পৃথক কোন পর্যালোচনার প্রয়োজনও নেই। তবে

যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হকের বইয়ে আশ্চর্য রকমের সব নিত্য-নতুন বিকৃতি ও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব কথাবার্তা রয়েছে, যা কারো কারো জন্য বিভ্রান্তি কিংবা ভোগান্তির কারণ হতে পারে; তাই এর উপর আমিও পর্যালোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি।

আরো একটি বইয়ের উপর পর্যালোচনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি সেটিও ছাপতে চাচ্ছি না। কেননা নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, এ বইয়ের লেখক বেচারা মসজিদে নামাযের জামাতে, এমনকি জুমাতেও উপস্থিত হন না। কারণ ইমামতির উপযুক্ত ইমাম তিনি কোনো মসজিদেই খুঁজে পান না!!

আর প্রকাশ্য যে, এমন 'খারেজী' মনমানসিকতার কোনো লোকের বই নিয়ে আলোচনার কোনো মানে নেই। কেননা যিনি জুমা ও জামাতে হাজির হওয়া থেকে বিরত থাকেন তিনি কোন্ ঈদগাহে নামাজ পড়বেন? নামাজের বিষয়ে যার এই মতি সে লোক একই দিনে রোযা ও ঈদ পালনের দাওয়াতে কি ন্যায়নিষ্ঠ হবে? এমনিতে তার পুস্তকটি তো ধোকা ও জালিয়াতি এবং মূর্খতা ও জাহেলিয়াতে ভরপুর। তবু আমি সংক্ষিপ্ত একটি পর্যালোচনা লিখেছিলাম। কিন্তু তার সম্পর্কে ঐ তথ্য পাওয়ার পর আমি পর্যালোচনাটি আর ছাপা সমীচীন মনে করিনি।

মোটকথা, এখন শুধু ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হকের বই 'চান্দ্রমাস' নিয়ে আলোচনা হবে, ইনশাআল্লাহ। এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবন্ধের এই পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে। 1

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

মার্চ ২০১৫, জুমাদাল উলা ১৪৩৬

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন-১৭

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

'চান্দ্রমাস': একটি পর্যালোচনা

বিশ্বব্যাপী একই দিনে/বারে ও তারিখে রোযা/ঈদ পালন করতে হবে

(কোরআন,সুন্নাহ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে মুসলিম বিশ্বের জন্য একটা জরুরী পরামর্শ ও যুগান্তকারী সংস্কার)

লেখক : ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মাদ এনামুল হক

নবম সংস্করণ,পরিবর্ধিত,পরিমার্জিত ও পরিশীলিত

যিলহজ ১৪৩১ হি.,ডিসেম্বর ২০১০ ঈ.,মাস্ পাবলিশার্স (৩/বি,কলাবাগান,ঢাকা)

জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মাদ এনামুল হকের এই বইয়ে বর্তমান সংস্করণ অনুযায়ী পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে দুইশ' চল্লিশ। পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে আমাদের হাতে আসা বই-পুস্তকের মধ্যে কলেবরের দিক থেকে এটিই বৃহৎ। কিন্তু এতে পুনরুক্তি ও পৌনঃপুনিকতা এত পরিমাণ যে, তা পাঠকের জন্য খুবই বিরক্তিকর। ভুল ব্যাখ্যা, অসংলগ্ন কথা এবং স্ববিরোধী বক্তব্যের দিক থেকে এই বই এক কথায় অসাধারণ, যাকে বলে বেনযীর! এর উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা লিখতে শুরু করেছিলাম। একশ' পৃষ্ঠার মতো লেখা হয়েও গিয়েছিল। পরে দেখলাম, এত দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে লিখতে থাকলে প্রায় তিনশ' পৃষ্ঠা লেগে যাবে। যা একটি মাসিক পত্রিকায় তো বটেই, এমনকি কোনো বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। তাই দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে পাঠকবৃন্দের জন্য এখন একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরছি নীচের লাইনগুলোতে:

যেমনটি আমি এইমাত্র বললাম, এই বইয়ের ভুল ও বিচ্যুতি এবং অপব্যাখ্যা ও অবান্তর দাবি এবং নিজের কথার মধ্যেই বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতার তালিকা অনেক লম্বা। সেজন্য খুব সংক্ষেপে শুধু ছয়টি শিরোনামে কিছু বিষয় উপস্থাপন করছি। শিরোনামগুলো এই:

১. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সংস্কার কর্মের স্বরূপ

২. 'হিলাল'-এর অর্থ বিকৃতি : একসঙ্গে অনেক বিভ্রান্তি

৩. আল-বেরুনী কী বলেছেন?

৪. বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা

৫. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের লেখায় নতুন জিনিস কী?

৬. প্রকাশ্য মিথ্যাচার

১. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ‘সংস্কার’-এর স্বরূপ

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দাবি, এই বই লিখে তিনি এক বিশাল বিপ্লবী কাজ করেছেন। (তার ভাষায় যা হল, যুগান্তকারী সংস্কার) এবং এর মাধ্যমে হাজার বছর বরং তারও বেশি সময় ধরে চলে আসা ভুলের তিনি সংশোধন করেছেন। তার বক্তব্য মতে, তার এই সংস্কার কর্মের ভিত্তি হচ্ছে, সূরা বাকারা ১৮৯ নং আয়াতের প্রথম অংশ:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

-এর তরজমা সংশোধন এবং এতে هلال -এর সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ। তার দাবি, মুফাসসিরগণ এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারেননি এবং যারা কুরআনের তরজমা করেছেন তারাও এর ভুল তরজমাই করে গেছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এসে সেই ভুলের প্রতিকার করেছেন এবং আয়াতের শুদ্ধ তরজমা ও বিশুদ্ধ অর্থ নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তার বক্তব্য, যদি এই সংশোধনকে গ্রহণ করা হয় তাহলে রোযা ও ঈদ-প্রসঙ্গে চলমান সমস্ত বিতর্ক ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটবে! (দেখুন: ‘চান্দ্রমাস,’ সপ্তম সংস্করণ, পৃ. ১৩, ১৫, ৪১, ৫৫ ও ১০৭-১১১ এবং নবম সংস্করণ, পৃ. ২০, ২১, ৪৭, ১১১-১১২ ও ২১৫-২১৯)।

বাস্তবতা হল, এগুলো সবই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ধারণা। বলা যায়, নিজের ব্যাপারে সুধারণা। না হয় কুরআনের অনুবাদকারীগণও ভুল অনুবাদ করেননি এবং তাফসীরকারগণও সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরতে ব্যর্থ হননি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আয়াতের আলোচ্য অংশের ব্যাপারে যা কিছু সহীহ কথা লিখেছেন তা পূর্ববর্তী মুতারজিম ও মুফাসসিরদের লেখাতেও পাওয়া যাবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা তিনি তো তাদেরই কিছু কিতাবের অনুবাদ দেখে তা লিখেছেন। আর যা কিছু তিনি বিকৃত করে নিজের পক্ষ থেকে লিখেছেন- সত্যপন্থী কোনো লেখকের লেখায় তার উপস্থিতি পাওয়া অসম্ভব। তারা তো আয়াতের সঠিক অর্থই লিখবেন। নিজেদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ

অর্থ বিকৃত করবেন না এবং কোনো ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় নেবেন না। অতএব যদি তার এসমস্ত কথাবার্তা তাদের কোনো তরজমা ও তাফসীরে পাওয়া না যায় তাতে তার গৌরববোধের কী আছে? এটা তো বরং তার জন্য লজ্জার বিষয়!

আলোচনার মূলপর্বে যাওয়ার আগে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই, যেমনটি তার বই থেকে প্রতীয়মান হয়; আরবীর ভাষাজ্ঞান তার নেই। ফার্সির তো প্রশ্নই আসে না। উর্দুর জ্ঞানও খুব একটা হওয়ার কথা নয়। কুরআনের তরজমা এবং তাফসীর তো এই তিন ভাষাতেই সবচে' বেশি। বাংলা ও ইংরেজিতে তরজমা হয়ে থাকলেও কয়টা কিতাবেরই বা? যতটুকু যা তরজমা হয়েছে তার মধ্যে কয়টা তার নযরে পড়েছে বা পড়বার সুযোগ হয়েছে? এই যখন অবস্থা তখন কারো জন্য কি এটা শোভন হয় যে, তিনি তরজমা ও তাফসীরকারদের উপর কোনো আপত্তি তুলবেন, আপত্তি তোলার অধিকার আছে কি নেই এবং সেই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত কি না সেটা ভিন্ন আলোচনা। আমার প্রশ্ন, যখন একজন লেখকের জানাই নেই যে, কোন মুফাসসির কী লিখেছেন এবং কোন মুতারজিম কী তরজমা করেছেন তখন এমনতরো কথাবার্তা তার মুখ থেকে কী করে বেরোয়, তার লেখায় কেমন করে আসে, আসতে পারে? লজ্জা ও সৌজন্যবোধের এতটুকুও কি অবশিষ্ট নেই আমাদের সমাজে?

আয়াতের ব্যাখ্যা

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আবিষ্কৃত অর্থ এবং তরজমা ও তাফসীরকারদের উপর তার উত্থাপিত আপত্তিসমূহ উল্লেখের আগে আলকুরআনুল কারীমের অনুবাদ এবং তাফসীর ও ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের সাহায্যে আলোচ্য আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশের তরজমা ও তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করে দেয়া সঙ্গত মনে হয়। যাতে সঠিক কথাটি সামনে এসে যায় প্রথমে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

-সূরা বাকারা ২ : ১৮৯

শব্দ-বিশ্লেষণ

১. يَسْأَلُونَكَ তারা জিজ্ঞেস করে আপনাকে

২. عَنِ সম্পর্কে/বিষয়ে

৩. الْأَهِلَّةِ

الْأَهِلَّةِ শব্দটি হচ্ছে هلال-এর বহুবচন। অমাবস্যা পার হওয়ার পর চাঁদের আলোকিত যে অংশ ধনুকের আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয় তার নাম هلال (হিলাল)। যেহেতু অমাবস্যার সময় চাঁদ পৃথিবী থেকে দেখা যায় না; বরং যখন তা هلال (হিলাল)-এ রূপ নেয় তখনই কেবল দৃষ্টিগোচর হওয়া শুরু হয় এবং সেই সময় থেকেই নতুন ইসলামী মাসের সূচনা হয়- তাই هلال (হিলাল)-এর তরজমা করা হয় 'নতুন চাঁদ' বা নবচন্দ্র। কতক অমুসলিম সম্প্রদায় চান্দ্রমাস আরম্ভ করে অমাবস্যার সময় যখন চাঁদ ও সূর্যের সম্মিলন ঘটে সেই মুহূর্ত থেকে। আর এটা কেবল জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। ঐ অমুসলিম জাতিবর্গ যেহেতু অমাবস্যা থেকেই চান্দ্রমাস আরম্ভ করে সেজন্য তারা অমাবস্যার নাম দিয়েছে 'নিউ মুন'। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই পরিভাষাই প্রচলিত। এই জ্যোতির্শাস্ত্রীয় 'নিউ মুন'-এর বাংলা তরজমা 'নতুন চাঁদ' বা 'নবচন্দ্র' নয়। এর তরজমা হল 'অমাবস্যা'। জ্যোতির্শাস্ত্রীয় 'নিউ মুন'-এর ধাপ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন 'ক্রিসেন্ট মুন'-এর পর্যায় আরম্ভ হয় তখনই কেবল চাঁদকে বলা হয় هلال (হিলাল)। আর এই 'হিলাল'-কেই আল্লাহ তাআলা বানিয়েছেন ميقات বা সময় নিরূপণের মাধ্যম।

আয়াতে أهلة (নবচন্দ্রসমূহ) এই বহুবচন নির্দেশক শব্দ কেন আনা হল

এ বিষয়ে বেশ কয়েকজন মুফাসসির আলোকপাত করেছেন। এ দ্বারা হয়ত চাঁদের বিভিন্ন আকারকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। অথবা এর ব্যাখ্যা, চাঁদ প্রতি ঊনত্রিশ/ত্রিশ তারিখের পর 'হিলাল' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব হিলাল একটি নয়; বরং অনেক।

আবার উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে 'হিলাল' প্রথম রাতেই সব জায়গা থেকে দেখা যায় না। বহু অঞ্চল আছে যেখানে দেখা যায় দ্বিতীয় রাতে। তাদের জন্য 'হিলাল' (নতুন চাঁদ) সেটিই। আরবী ভাষায় শুধু প্রথম রাতের চাঁদকেই নয়; বরং মাসের শুরুর দিকের দুই তিন রাতের চাঁদকেও 'হিলাল' বলা হয়। (লিসানুল আরব ১৫/৮৩-৮৪; তাজুল আরূস ৩১/১৪৪-১৪৫; তাফসীরে কাবীর : ফখরুদ্দীন রাযী ৫/১০৩)।

هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ এখানে هِيَ অর্থাৎ الأهلة দ্বারা যতগুলি পর্যায়ে চাঁদের যত রকম আকার দাঁড়ায় তার সবটাই যে উদ্দেশ্য তাতো স্পষ্ট। কেননা শুধু প্রথম রাতের চাঁদ তো 'মীকাত' (সময় নির্ধারক) হতে পারে না। চাঁদের মীকাত বা সময় নিরূপণের মাধ্যম হওয়ার বিষয়টি বরং 'হিলাল' আকারে তার প্রকাশ পাওয়া থেকে নিয়ে অদৃশ্য হওয়া, অতপর আবার হিলালরূপে আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত যে নানা পর্যায় ও ধারা পরিক্রমা তার সাথে যুক্ত। সূরা ইয়া-সীনে তাই ইরশাদ হয়েছে :

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

'আর চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। অবশেষে তা পুরাতন খেজুর শাখার ন্যায় (সরু, বাঁকা ও নিষ্প্রভ) হয়ে যায়।' -সূরা ইয়া-সীন ৩৬ : ৩৯

সূরা ইউনুসে ইরশাদ করেছেন :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

'তিনিই সেই সত্তা,যিনি সূর্যকে করেছেন জ্যোতি এবং চাঁদকে আলো। আর তাকে বিভক্ত করেছেন বিভিন্ন পরিমিত মনযিলে,যেন তোমরা জানতে পারো বর্ষগণনা এবং (অন্যান্য) হিসাব।'-সূরা ইউনুস ১০: ৫

সুতরাং বর্ষগণনা এবং মাসসমূহের হিসাব সাধারণভাবে বোঝার সম্পর্ক কেবল চাঁদের 'হিলাল' আকৃতির সাথে নয়;বরং তার ক্রমাগত তিথি পরিবর্তন ও রূপ বদলের সাথে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেই সূরা ইউনুসের উপরোক্ত আয়াতের অধীনে লিখেছেন, আর চন্দ্রকে আল্লাহ জ্যোতি দিয়েছেন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, চন্দ্র সূর্য থেকে আলো পায়। এই জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে একটা মাসের সৃষ্টি হয়। তার ব্যাপ্তি এক নবচন্দ্রোদয় দিয়ে শুরু এবং আরেক নবচন্দ্রোদয় দিয়ে শেষ। আর এভাবে বারো মাসে বছর গণনা করতে বলেছেন আল্লাহ। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা :১১৮)

তাই চাঁদের 'হিলাল' আকৃতি থেকে নিয়ে পরবর্তী 'হিলাল' এর রূপ লাভ পর্যন্ত তার এই সবগুলি পর্যায়কে ইঙ্গিত করে আয়াতে أهلة (আহিল্লাতুন) বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। আর তা খুবই স্বাভাবিক। অনেক মুফাসসির এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। (উদাহরণস্বরূপ দেখুন :

ক. রূহুল মাআ'নী,আলুসী (১২৭০ হি.) ২/৭১ তিনি লিখেছেন :

إذ لو كان الهلال على شكل واحد لا يحصل التعدد...، ولو كان الهلال مدورا (في نظرنا كما هو في حالة البدر، فيرى دائما) كالشمس أو ملازما حالة واحدة لم يكد يتيسر التوقيت به.

খ. আল-মুহাররারুল ওয়াজীয, ইবনে আতিয়্যা (৫৪৩ হি.) ২/১৩৪।

গ. তাফসীরে কুরতুবী ৩/২২৯।

ঘ. যাহরাতুত তাফাসীর, আবু যাহরা মিসরী (১৩১৬-১৩৯৪ হি.)

২/৫৭৩)

যাই হোক আয়াতে أهلة (আহিল্লাহ) বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় 'নতুন চাঁদ' বা 'নবচন্দ্র' শব্দ দ্বারাই বহুবচনের অর্থ বুঝে এসে যায়। একারণে সাধারণভাবে يسئلونك عن الأهلة-এর তরজমা করা হয়েছে : 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদ সম্পর্কে'

৪. قل আপনি বলুন/বলে দিন।

৫. هي সর্বনামটির ইঙ্গিত أهلة (নবচন্দ্রসমূহ)-এর দিকে।

৬. مواقيت : ميقات ('মীকাত') শব্দের বহুবচন। এখানে 'মীকাতে'র 'মীম' কে যদি 'মাসদারি' ধরা হয় তাহলে অর্থ হবে ওয়াক্ত বা সময়। তবে সাধারণত কোনো কাজের জন্য নির্ধারিত সময়কেই 'মীকাত' বলা হয় (লিসানুল আরব ১৫/২৫৪-২৫৫ ; তাজুল আরূস খ. ৫ পৃ.১৩২-১৩৩) আর যদি 'মীম' কে ইসমে আলার জন্য ধরা হয় তাহলে 'মীকাতে'র অর্থ হবে সময় নির্ধারণের উপায় বা মাধ্যম। (আত তাফসীরুল মাযহারি খ. ১ পৃ. ২১০)

দু'রকম অর্থেরই অবকাশ আছে আয়াতে। বেশির ভাগ তাফসীরকার ও তরজমাকারীগণ এখানে দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। তবে উভয় অর্থের ফলাফল একই।

৭. للناس মানুষের জন্য। অর্থাৎ মানুষের দ্বীনী ও দুনিয়াবি বিষয়ে যেখানে যেখানে সময় নির্ধারণের দরকার হয় তার জন্য ।

৮. والحج এবং হজ্বের জন্য। 'মানুষের জন্য' কথাটির মধ্যেই হজ্বের প্রসঙ্গও এসে গিয়েছিল। কিন্তু গুরুত্ব বোঝাতে হজ্বের কথা আলাদা করে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এতে নির্দিষ্ট সময় রক্ষার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হজ্বের কাযাও করতে হয় এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই, যা কিনা বছরে একবারমাত্র আসে। আরবী

ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে للناس والحج অংশটি مواقيت -এর ছিফত। অর্থাৎ مواقيت كائنة للناس

সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতের আলোচ্য অংশের পূর্ণ তরজমা দাঁড়ায় এরকম :

'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে নবচন্দ্রসমূহ সম্পর্কে। আপনি বলুন, সেগুলো মানুষের (যাবতীয় কাজকর্মের) জন্য এবং হজ্বের জন্য সময় নিরূপণের মাধ্যম'।

হিলাল কীসের মীকাত?

আয়াতে বলা হয়েছে مواقيت للناس والحج অর্থাৎ, হিলাল মানুষের জন্য এবং হজ্বের জন্য মীকাত। অর্থাৎ মানুষ দ্বীনী ও দুনিয়াবি কাজকর্মে এর মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করে থাকে। বিশেষত হজ্বের সময় নির্ধারণ করে এরই মাধ্যমে। হিলালের মাধ্যমে সময় নিরূপণের অর্থ, হিলাল কেন্দ্রিক চান্দ্রমাসের সাহায্যে সময় নির্ণয়। ইবাদতসমূহ এবং পারস্পরিক লেনদেন ও আদান-প্রদানের সময় জেনে নেয়া। কবে রোযা, কবে ঈদ এবং কবে হজ্ব ও কুরবানী ইত্যাদি। অনুরূপ দুনিয়াবি লেনদেনের ক্ষেত্রে। যেমন অমুকের ধারশোধ করতে হবে কোনদিন, ওয়াদাপূরণের সেই তারিখটি আসছে কবে... এ ধরনের আরো যা। ইমাম ইবনে আবী হাতেম রাহ. (৩২৭ হি.) তাঁর সংকলিত 'তাফসীর'-এ এবং ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহ. (৩১০ হি.) 'জামেউল বয়ানে' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছে যে, তিনি বলেছেন,

سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ يعلمون بها حل دينهم، وعدة نسائهم، ووقت حجهم

অর্থাৎ, মানুষজন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চাঁদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, তখন এই আয়াত নাযিল হল:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ মানুষ এর মাধ্যমে তাদের ঋণ পরিশোধের সময়, মহিলাদের ইদ্দত এবং হজের সময় অবগত হয়ে থাকে। (তাফসীর ইবনে আবী হাতেম ১/৩২২, তাফসীরে তাবারী, ২/২৮২,

(وفي إسناده ضعف يجبره ما يأتي من مرسل ابن جريج وغيره)

বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম কাতাদা রাহ. (১১৮ হি.) বলেন,

سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم جعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله فيها ما تسمعون : قل هي مواقيت للناس. فجعلها لصوم المسلمين وإفطارهم، ولمناسكهم وحجهم، ولعدة نسائهم، ومحل دينهم، في أشياء، والله بما يصلح خلقه.

ইমাম ইবনে জুরাইজ রাহ. বলেন,

قال الناس لم جعلت هذه الأهلة ؟ فنزلت: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لصومهم وإفطارهم، وحجهم ومناسكهم، قال قال ابن عباس : ووقت حجهم، وعدة نسائهم، وحل ديونهم

এই দু'টো বর্ণনার সারকথাও এটাই যে, হিলাল হচ্ছে মানুষের ইবাদত ও লেনদেনের সময় নির্ধারণ ও নিরূপণের মাধ্যম। রোযা, ঈদ, হজ্ব, কুরবানী; ইদ্দত পালন এবং ঋণ পরিশোধ বা কর্জ উসুলের সময় ইত্যাদি।

একই রকম বক্তব্য আরো অনেক তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ থেকে বর্ণিত আছে। (তাফসীরে তাবারী ২/২৮০-২৮৩; তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৩৩৮; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ১/৩২২)।

হিলাল 'মীকাত' হওয়ার কী অর্থ?

হিলাল মীকাত হওয়ার অর্থ খুবই পরিষ্কার। এতে কখনোই কারো

কোনো দ্বিধা বা সংশয় তৈরি হয়নি। অর্থাৎ, হিলাল দেখেই চান্দ্রমাস শুরু হবে এবং পরবর্তী হিলাল দেখার মাধ্যমে আগের মাস সমাপ্ত ও নতুন চান্দ্রমাস আরম্ভ হবে। খায়রুল কুরূন তথা ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের লোকেরা এ অর্থই বুঝেছেন। সব ফকীহ, সকল মুফাস্সির এবং সমস্ত মুহাদ্দিস এটাই বুঝেছেন। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও এ অর্থই বুঝেছেন। আমি শুধু আল-বেরুনী (৪৪০ হি.)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। তিনি তার লিখিত الآثار الباقية عن القرون الخالية গ্রন্থে সন-তারিখের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

ثم تاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، وهو على السنين القمرية برؤية الأهلة، لا الحساب، وعليه يعمل أهل الاسلام بأسرهم.

অর্থাৎ হিজরী তারিখ, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তার ভিত্তি চান্দ্রবর্ষের উপর-চাঁদ দেখার মাধ্যমে, হিসাবের ভিত্তিতে নয়। এবং সমস্ত মুসলমানের আমল এই তরীকা মোতাবিক। -আল আছারুল বাকিয়া পৃ. ৩১

আরেক জায়গায় লিখেছেন,

ويبتدؤن بالشهر من عند رؤية الهلال، وكذلك شرع في الاسلام، كما قال الله تعالى : يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج.

আরবের লোকজন চাঁদ দেখে মাস শুরু করে এবং এই বিধানই দেওয়া হয়েছে ইসলামে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج

-আল আছারুল বাকিয়া পৃ. ৬৪

এক বেদাতী ফের্কা, যারা চাঁদের হিসাব করে রোযা ও ঈদ করত এবং রমযান মাসকে সবসময় ত্রিশ দিন গণনা করত, এদের খণ্ডন করতে

গিয়ে আল-বেরুনী লিখেছেন যে, ইহুদী-খ্রিস্টানরা তো মাসের হিসাব ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে করে থাকে, কিন্তু মুসলমানের জন্য চাঁদ দেখা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। তাদের এ অনুসন্ধান করা জরুরি, চাঁদ আলো গ্রহণ পূর্বক তার কোনো অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কি? আল-বেরুনীর আরবী ভাষ্যের সংশ্লিষ্ট জায়গাটি দেখুন :

... اليهود والنصارى، فإذا لهم جداول وحسبانات يستخرجون بها شهورهم ويعرفون منها صيامهم، والمسلمون مضطرون إلى رؤية الهلال وتفقد ما اكتساه القمر من النور واشترك بين نصفه المرئي ونصفه المستور (الآثار الباقية : ٦٤)

নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বেরুনীর বক্তব্য থেকে যেমন এটা জানা গেল যে, হিজরী তারিখের ভিত্তি হল হিলাল দেখার উপর, তেমনি এ বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কুরআনে কারীমের আলোচ্য আয়াতে الشهور القمرية (চান্দ্রমাসসমূহ) শব্দ ব্যবহার না করে الأهلة শব্দের মাধ্যমে হিলালী মাসসমূহকে মীকাত বানানোর সুনির্দিষ্ট অর্থ এটাই যে, হিলাল দেখে মাস শুরু করা হবে। হিলালের হিসাব বের করে মাস আরম্ভের অর্থ এই আয়াতে কোনোভাবেই খাটে না। মোটকথা, এই আয়াত এ অর্থ বোঝাবার ক্ষেত্রে খুবই পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন যে, চান্দ্রমাস শুরু হবে হিলাল দেখার মাধ্যমে। তারপরও যেহেতু আয়াতে رؤية বা দেখা শব্দটির উল্লেখ নেই তাই আধুনিককালে কারো জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টির কিংবা বিভ্রান্তির শিকার হবার অবকাশ ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলার শোকর, এই রাস্তাও তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে, সহীহ হাদীসে এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েই হিলালের সাথে رؤية বা দেখা শব্দটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। যার ফলে আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فان غم عليكم

فعدوا له ثلاثين يوما

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হিলালকে মানুষের জন্য মীকাত বানিয়েছেন। অতএব তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়ো। আর যদি তা তোমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় তাহলে তাকে ত্রিশ দিন গণনা করো।' -আল-মুসান্নাফ, আব্দুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম (১২৬-২১১ হি.), ৪/১৫৬, হাদীস : ৭৩০৬; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকী : ৪/২০৫;আলমুসতাদরাক, হাকেম আবু আব্দিল্লাহ ১/৪২২, হাদীস : ১৫৭৯

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه، وعبد العزيز بن أبي رواد ثقة عابد مجتهد شريف البيت.

(অর্থাৎ, মুহাদ্দিস হাকেম আবু আব্দিল্লাহ বলেছেন, এই হাদীসের সনদ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম রাহ.-এর মি'য়ার (মানদণ্ড) অনুসারে সহীহ। (আল-মুস্তাদরাক, প্রাগুক্ত)

এই হাদীসটি ইমাম ইবনে খুযাইমা রাহ. (২২৩ হি.-৩১১ হি.) তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে, কিতাবুস্ সওমের পঁচিশতম অনুচ্ছেদে রেওয়ায়েত করেছেন। এই অনুচ্ছেদের শিরোনাম তার ভাষায় :

باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم، إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته ما لم يغم، قال الله عز وجل : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ، الآية

(অর্থাৎ অনুচ্ছেদ : এ বিষয়ক বর্ণনা প্রসঙ্গে যে, আল্লাহ তাআলা হিলালকে মানুষের জন্য মীকাত বানিয়েছেন। তাদের রোযা রাখা এবং রোযা ছাড়ার জন্য। কারণ আল্লাহ তাঁর নবী আলাইহিস সালামের যবানে আদেশ করেছেন হিলাল দেখে রোযা রাখতে এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়তে, যদি না চাঁদ দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় (তখন ত্রিশ পূর্ণ করতে হবে)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ...

(সহীহ ইবনে খুযাইমা ৩/২০১, হাদীস ১৯০৬-এর অনুচ্ছেদের শিরোনাম, যা স্বয়ং ইমাম ইবনে খুযাইমা কর্তৃক নির্ধারিত)

হুবহু এই নির্দেশনাই হযরত তলাক ইবনে আলী রা.-এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হিলালকে মানুষের জন্য মীকাত বানিয়েছেন। তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল দেখে রোযা শেষ করো। যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় তাহলে সংখ্যা পূরণ করো। -মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩, হাদীস ১৬২৯৪

(এই হাদীস সনদের দিক থেকে হাসান এবং মতনের দিক দিয়ে সহীহ লিগাইরিহী, হাশিয়া মুসনাদে আহমাদ : শায়খ শু'আইব ২৬/২২১-২২২, হাশিয়া শরহু মুশকিলিল আছার তাহাবী, শায়খ শু'আইব কৃত ৯/৩৯৪, মুহাম্মাদ ইবনে জাবের আল-ইয়ামামীর জীবনী 'রিজাল' বিষয়ক গ্রন্থে)

এ দুই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াত يسألونك عن الأهلة-এর প্রতি ইঙ্গিত করে হিলালের মাধ্যমে সময় নির্ণয়ের মাপকাঠি এবং তার মীকাত হওয়ার ধরন সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। এবং পরিষ্কার ইরশাদ করেছেন, হিলাল দেখে রোযা রাখতে হবে এবং হিলাল দেখেই রোযা শেষ করতে হবে। এ কারণে এ হাদীসগুলোর মাধ্যমে যেমন এই মাসআলা প্রমাণিত হল যে, রোযা ও ঈদ হিলাল দেখার সাথে

সম্পর্কযুক্ত; হিসাবের মাধ্যমে হিলালের অস্তিত্ব জানার সাথে নয়, তেমনি হাদীসগুলোর মাধ্যমে আয়াত ২:১৮৯-এর ব্যাখ্যাও হয়ে গেল। অর্থাৎ, হিলাল মীকাত হওয়ার অর্থ এই যে, হিলাল দেখে চান্দ্রমাস শুরু করা হবে এবং পরবর্তী হিলাল দেখে তবে পূর্ববর্তী মাস শেষ করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের বয়ান (তাফসীর) শিক্ষা দিয়েছেন এবং যাকে উম্মতের জন্য কুরআন ও হিকমতের শিক্ষক বানিয়েছেন- তাঁর ব্যাখ্যার পর আর কারো জন্য কোনো ধরনের পুনর্বিবেচনা বা নতুন করে মত প্রদান কিংবা সংশোধনী দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

যে বিষয়ে পরিষ্কার এবং অবিচ্ছিন্ন ও মুতাওয়াতির সূত্রসমূহে বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে সেখানে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ থাকে না। যে কারণে এই মাসআলা উম্মতের কাছে সর্বজনস্বীকৃত ও সর্ববাদীসম্মত। কেউ পা ফসকে যদি কোনো বিচ্ছিন্নতার শিকার হয় সেটা ভিন্ন কথা। না হলে যে কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমকে এই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সে উত্তরই দিবেন যে উত্তর দিয়েছেন খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী রা.। مواقيت للناس সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন,

هي مواقيت، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فان غم عليكم فأتموا ثلاثين.

অর্থাৎ হিলাল হচ্ছে মীকাত। তারপর আঙ্গুলের ইশারায় বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনের। যদি হিলাল দেখা যায় রোযা রাখো তারপর আবার হিলাল দেখা গেলে রোযা শেষ করো। যদি হিলাল দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো (তাফসীরে তাবারী ৩/২৮২)

আজকেও যদি কাউকে এই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে তিনি নববী নির্দেশনার আলোকে তা-ই বলবেন, যা বলেছেন

হযরত আলী রা.। 'হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল দেখেই রোযা শেষ করো'- এই নির্দেশনা কেবল এই দুই হাদীসেই নয়; বরং এই দুই সাহাবী ছাড়াও অন্য অনেক সাহাবীর মাধ্যমে অনেকগুলি সনদে বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর সূত্রে এই কথা তার বিপুল সংখ্যক ছাত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং মুসনাদে আহমদ সমেত হাদীসের শতশত গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। উপরিউক্ত দুই সাহাবী ছাড়া আর যাদের সূত্রে এই নির্দেশনা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাদের নামগুলোই শুধু উল্লেখ করা হচ্ছে,

১. আবু হুরায়রা রা.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.

৩. হুযায়ফাতুবনুল ইয়ামান রা.

৪. আবু বাকরা রা.

৫. জাবের রা.

৬. সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা.

৭. আনাস ইবনে মালেক রা.

৮. বারা ইবনে আযেব রা.

৯. রাফে' ইবনে খাদীজ রা.

১০. সামুর রা.

১১. আদী ইবনে হাতেম রা.

১২. আয়েশা রা.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এবং তলাক ইবনে আলীসহ মোট চৌদ্দ সাহাবী হল। উল্লিখিত হাদীসসমূহের (একটি বাদে) সবক'টি কওলী এবং মারফ,'। অর্থাৎ এতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌখিক নির্দেশনা বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল দেখেই রোযা শেষ করো। আর কোনো কোনো হাদীসে ইরশাদ করেছেন, তোমরা হিলাল না দেখে রোযা শুরু করো না এবং হিলাল দেখা ছাড়া রোযা শেষ করো না। যদি হিলাল ঢাকা পড়ে যায় তাহলে ত্রিশ পূর্ণ করো।

সর্বশেষ হাদীস হযরত আয়েশা রা.-এর মারফ,' রেওয়ায়েত, যা ফে'লী। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল বর্ণনা করা হয়েছে। যা তাঁর নির্দেশ ছিল সে মোতাবেকই ছিল তাঁর আমল। হিলাল দেখে রোযা শুরু করা, হিলাল দেখেই রোযা শেষ করা এবং হিলাল ঢাকা পড়ে গেলে ত্রিশ পূর্ণ করা। চাঁদ দেখা বিষয়ক এই সকল হাদীস ছাড়াও চাঁদের সাক্ষ্য দেয়া সম্পর্কিত হাদীস থেকেও এটি প্রমাণিত হয়। কারণ ঐ হাদীসগুলোর অর্থও এটাই যে, হিলাল প্রমাণিত হবে দেখার দ্বারা। নিজে না দেখলেও যদি দেখার সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহলেও হিলাল প্রমাণিত হয়ে যাবে। চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়া সম্পর্কিত হাদীসও বহু সাহাবীর মাধ্যমে বহু সনদে বর্ণিত হয়েছে। শুধু মুয়াত্তা ও পাঁচ কিতাব, যেগুলোর হাদীসের সমষ্টি ইবনুল আছীর-এর 'জামেউল উসূলে' রয়েছে- ওখানেই ছয় সাহাবীর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। -জামেউল উসূল, ৬/২৭১-২৭৫

অতএব রমযানের হিলাল ও শাওয়ালের হিলাল প্রমাণিত হওয়ার জন্যে তা দেখতে পাওয়া যে জরুরি- এটা কেবল এক দুইটি সহীহ হাদীস দ্বারা নয়; বরং বিশের অধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যার মধ্যে অধিকাংশ হাদীসই এমন, যার একাধিক সনদ রয়েছে। আর কোনো কোনোটির তো দশ বা তার চেয়েও বেশি সনদ রয়েছে।

মোটকথা,এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুসৃত ও অবিচ্ছিন্ন বিপুল সংখ্যক সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত ও প্রমাণিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ এবং তাদের কথা ও কাজ দ্বারাও এটাই প্রমাণিত। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনের আমল ও ফতোয়াও ছিল এটিই। এবং পরবর্তীকালের ইমামদের ইজমা ও সম্মিলিত সিদ্ধান্তও ছিল এ মোতাবেক। সংক্ষেপনের স্বার্থে এখানে খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ এবং সাহাবা ও তাবেঈনের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল না। এই মাসআলার মুজমা আলাইহি বা সর্বজনস্বীকৃত হওয়ার বিষয়ে মনীষী ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের ভাষ্য ইনশাআল্লাহ প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হবে।

সারকথা দাঁড়ালো এই যে, কুরআনের তাফসীরের সমস্ত নির্ভরযোগ্য উৎস মোতাবেক يسألونك عن الأهلة শীর্ষক আয়াতের তাফসীর সুনির্ধারিত। আর তা এই যে, হিলালের মীকাত হওয়ার অর্থ, চান্দ্রমাস শুরু হবে হিলাল দেখার মাধ্যমে এবং পরবর্তী হিলাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। পরবর্তী হিলাল দেখার পর কিংবা ত্রিশ দিন পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে পরের মাস আরম্ভ হবে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কী বলেন?

আয়াতে কারীমার এই স্পষ্ট, অনুসৃত এবং সর্বজনস্বীকৃত অর্থের বিপরীতে এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত সংখ্যক হাদীসের মোকাবেলায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কী বলেন তা (‘নাঊযুবিল্লাহ’ সহকারে) একবার দেখুন। তিনি তার বইয়ের প্রশ্নোত্তর অংশে ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন:

‘চাঁদ দেখে চান্দ্রমাস শুরু করার কোন হাদীস নেই। কোরআন আমাদেরকে নতুন চাঁদ দেখে মাস শুরু করতে বলে না, হিসাব করতে বলে। এই জ্ঞান প্রকাশিত অথবা জানার আগে অস্থায়ী ভিত্তিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে

হয়েছে। সেগুলো উপরোক্ত সত্য উদঘাটনের পর এখন আর গ্রহণযোগ্য থাকতে পারে না। (চান্দ্রমাস পৃ. ২১৪)

বুঝুন তাহলে! এরকম ডাহা মিথ্যাচার সম্পর্কেও যদি পর্যালোচনা করতে হয় তাহলে আর কী করার থাকে? এরকম বে-ঈমানী দুঃসাহসকে আপনি কী বলবেন-'কুরআন মাস আরম্ভ করতে বলেছে হিলাল দেখে নয়;বরং চাঁদের হিসাবের ভিত্তিতে'!নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক!!

তাই যদি হবে তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে সালেহীন কেন চাঁদ দেখে মাস শুরু করতেন এবং চাঁদ দেখেই রোযা ও ঈদ করতেন? ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলছেন, এ সবকিছু এই সত্য উদঘাটিত হবার পূর্বেকার কথা। যা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বদৌলতে উম্মত জানতে পেরেছে!! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

যাই হোক আয়াতে কারীমার সঠিক অর্থ ও সহীহ ব্যাখ্য উল্লেখের পর এখন দেখুন,ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আয়াতের কী তরজমা করছেন এবং কী ব্যাখ্যা হাযির করছেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

এপ্রিল ২০১৫, জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৬

চান্দ্রমাস: একটি পর্যালোচনা-২

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

বিগত শাওয়াল ১৪৩৪ হি. থেকে সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন প্রসঙ্গে ধারাবাহিক লেখা সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সামনে পরিবেশিত হচ্ছে। গত সংখ্যায় জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হকের বই 'চান্দ্রমাস'-এর উপর পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাটিও কয়েক কিস্তিতে আসবে। পাঠকদের কাছে দুআর দরখাস্ত, আল্লাহ তাআলা একে উপকারী বানান এবং কবুল ও মনযূর করেন। আমীন।(-মুহাম্মাদ আবদুল মালেক)

চান্দ্রমাস বইয়ের বিকৃতি

গত সংখ্যায় পাঠকগণ আয়াত ২ : ১৮৯-এর তরজমা ও তাফসীর পড়েছেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আয়াতের অনুসৃত ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে 'সঠিক অনুবাদ' শিরোনামের নতুন তরজমা করেছেন এই:

"তারা আপনার কাছে 'নতুন চাঁদসমূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বা জানতে চায়। বলে দিন, এগুলো সময়সমূহ (চান্দ্রমাসসমূহ) আরম্ভ (হিসাব) করার মাধ্যম, পুরো মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য।"

অথবা আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়: তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ (বারটা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এগুলো (বারটা নতুন

চাঁদ) সূচনাকারী বা আরম্ভ করার মাধ্যম (বার মাসসমূহের) পুরো মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য।” (চান্দ্রমাস পৃ. ২১৫-২১৬)

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পুরো বক্তব্য সামনে আসছে। এতে তার গর্ববোধ রয়েছে যে, তিনি أهلة 'আহিল্লাহ' এই বহুবচন শব্দের তরজমা করেছেন বহুনির্দেশক শব্দ 'সমূহ' সহকারে। এমনিভাবে مواقيت (মাওয়াকীত) যেটি বহুবচন, এর তরজমাতেও বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলতে চান, অন্য মুতারজিমগণ এটা করেননি। তিনি আরো বলতে চান যে, কোনো মুফাসসির এই আয়াতের অধীনে বারো চান্দ্রমাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। তিনিই যা সর্বপ্রথম করেছেন।

অথচ সব জায়গায় বহুবচনের তরজমায় বহুর অর্থ প্রকাশের জন্য বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহারের দরকার হয় না। তথাপি কোনো কোনো মুতারজিম উভয় শব্দের তরজমায় বহুনির্দেশক শব্দ উল্লেখ করেছেন আর বারো চান্দ্রমাসের প্রসঙ্গও ধরেছেন মুফাসসিরগণের অনেকে। অতএব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের গর্ব আসলে নিজের ব্যাপারে সুধারণা। এদিকে উনার খবরই নেই যে, তিনি مواقيت (মাওয়াকীত)-এর তরজমা করেছেন একেবারে গলদ। তদুপরি জেনে বুঝে আরবী 'হিলাল', বাংলা 'নতুন চাঁদ' এবং ইংরেজি 'নিউমুন' (যা কেবল আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)- এই সবগুলোকে বিকৃত করে তাতে 'অমাবস্যার' অর্থ চাপিয়ে দিয়েছেন, আর মিথ্যা দাবি করেছেন যে, ইসলামী মাস শুরু হয় অমাবস্যা থেকে! ভুল করছেন নিজে, বিকৃতির আশ্রয় নিচ্ছেন নিজে, কিন্তু দোষারোপ করছেন কুরআনে কারীমের অনুবাদক ও তাফসীরকারদের!!

পাঠকগণ একটু ধৈর্য সহকারে তার কথাগুলো পড়ে নিন। যাতে পর্যালোচনা করা সহজ হয়। তিনি লিখেছেন:

ক). 'পুনশ্চ : মুসলিম উম্মাহর কাছে আমার আকুল আবেদন ও জরুরী পরামর্শ, কালবিলম্ব না করে আসুন আমরা সবাই সূরা বাকারার আয়াত-১৮৯ (অংশ)-এর অনুবাদ সংশোধন বা শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে যুগান্তকারী সংস্কার মেনে চলি। একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দেওয়া এই প্রাকৃতিক বিধানকে মেনে চলি। দুনিয়া ও আখেরাতের কামাইকে আর বিনষ্ট না করি। আমীন।' (চান্দ্রমাস : সপ্তম সংস্করণ, পৃ. ১৩)

আরো লিখেছেন:

খ). 'আল্লাহ নবচন্দ্র দিয়েছেন চান্দ্রমাস গণনা শুরু করার জন্য :

১। সুরা বাকারার ২ : ১৮৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তারা আপনার কাছে নবচন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বা জানতে চায়। বলে দিন, এগুলো (নতুন চাঁদসমূহ) আরম্ভ (হিসাব) করার মাধ্যম। পুরো মানব জাতির জন্য (লিননাছ) এবং হজ্জের জন্য।[1] তাই হিজরী মাস গণনা করতে হয় নতুন চন্দ্র দিয়ে।[2] এটা সারা পৃথিবীর মানুষের (লিননাছ) জন্য আল্লাহর নির্দেশ, কোন গোত্র বা দেশের জন্য নয়। তাই সারা পৃথিবীতে একক চান্দ্রমাস হিসাব করে একক হিজরী বৎসর গণনা করতে হবে। [3]

২। এই আয়াতে 'হেলাল' বা নবচন্দ্র এর বহুবচন 'আহিল্লাতি' শব্দ দিয়ে আল্লাহ ১২ (বার) মাসে বারটা নবচন্দ্রের কথা বলেছেন। অর্থাৎ ১২টা নবচন্দ্র দিয়ে আল্লাহ সারা বিশ্বের মানবজাতিকে ১২টা চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে বলেছেন।

৩। আবার 'মীকাত'-এর বহুবচন 'মাওয়াকীতু' শব্দ দিয়ে আল্লাহ বার মাসের সময়সমূহের শুরুসমূহ নির্ধারণের কথা বলেছেন।[4] উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ বিশ্বব্যাপী তাফসীরকারগণ সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারছেন না কেন তা আমার বোধগম্য নয়।[5] (চান্দ্রমাস : নবম সংস্করণ, পৃ. ২১)

বইয়ের শেষে একই বিষয়ে লম্বা আলোচনা করেছেন। লিখেছেন:

'২০ খানা তাফসীরের ইংরেজি অনুবাদ, না বাংলা অনুবাদ, কোনটা ভুল?' এই শিরোনামের অধীনে একটি ভ‚মিকা টেনে লেখেন:

"সঠিক অনুবাদ : 'তারা আপনার কাছে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বা জানতে চায়। বলে দিন, এগুলো সময়সমূহ (চান্দ্রমাসসমূহ) আরম্ভ (হিসাব) করার মাধ্যম, পুরো মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য।'

অথবা আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় : 'তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ (বারটা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এগুলো (বারটা নতুন চাঁদ) সূচনাকারী বা আরম্ভ করার মাধ্যম (বার মাসসমূহের), পুরো মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য'।

বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থে সুরা আল বাকারার আয়াত ২ : ১৮৯ (অংশ)-এর অনুবাদের ছক...

(এই ছকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে মোট বিশটি তাফসীরগ্রন্থ থেকে আলোচ্য আয়াত-অংশের তরজমা ও সে সম্পর্কে মন্তব্য তুলে ধরেছেন। অতঃপর লিখেছেন:)

উপসংহার:

ইংরেজি ভাষার পাঁচটি অনুবাদে 'আহিল্লাতি' এবং 'মাওয়াকীতু' শব্দদ্বয়ের অর্থ সঠিকভাবে বহুবচন করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষার দ্বিতীয় অনুবাদে 'মাওয়াকীতু' শব্দের অর্থ মৌসুমসমূহ (!) বলা হয়েছে। বাকী বারটা বাংলা অনুবাদে শব্দদ্বয়ের অর্থ কেউই বহুবচনে করেননি। এখন প্রশ্ন হল- কোন তাফসীরটা সঠিক? আবার 'নবচন্দ্রসমূহের' স্থলে কেউ কেউ অর্থ 'নবচন্দ্র' করেছেন আর কেউ কেউ করেছেন শুধুই 'চন্দ্র'। বাকী দুইটা উর্দু অনুবাদের একটায় 'আহিল্লাতি' শব্দের অর্থ 'নবচন্দ্রসমূহ' (চাঁদসমূহ)' করা হয়েছে, অন্যটায় করা হয়েছে 'মাসসমূহ'। এমনকি আয়াতে না থাকলেও অনেকেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি(!) এবং নবচন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির (!!) কথাও বলতে দ্বিধা করেননি। আশা করি শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম অতিসত্ত¡র এর একটা সমাধান দেবেন। সূরা তাওবার ৯ : ৩৬ আয়াতে উল্লিখিত ১২টা মাস আরম্ভ করতে বারটা নবচন্দ্রের কথা বুঝানোর জন্যই যে আল্লাহ ২ : ১৮৯ আয়াতে 'আহিল্লাতি' বা 'নবচন্দ্রসমূহ' কথাটা বলেছেন, তাফসীরকারগণের কেউই তা চিন্তা করেননি।[6] এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এত দীর্ঘ সময় ধরে কী করে সকল জ্ঞানী-গুণী মহলের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেল তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। পাঠক আপনি কী বলেন?

মীকাতের অর্থ অভিধানে স্থান ও সময় দুইটাই বলা হয়েছে। মূলে এর অর্থ হবে আরম্ভ, সূচনা বা Starting of an event, যার জন্য স্থান ও সময় দুটোরই প্রয়োজন হয়।[7] তাই মীকাতের বহুবচন 'মাওয়াকীতু' শব্দ

ব্যবহার করে আল্লাহ বারটা নবচন্দ্র দিয়ে বার মাসের জন্য বারটা সূচনা বা আরম্ভকে বুঝিয়েছেন।" (চান্দ্রমাস, ২১৫-২১৯)

পার্থক্য কোথায়?

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তরজমা এবং অন্যান্যদের কৃত তরজমার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তার কথায় তিনটি জিনিসের আলোচনা এসেছে:

১। الأهلة (আল-আহিল্লাহ) বহুবচনের শব্দ। এর তরজমা হওয়া উচিত নবচন্দ্রসমূহ। কিন্তু বাংলা অনুবাদকগণ শুধু 'নবচন্দ্র' বা 'নতুন চাঁদ' লিখেছেন। 'সমূহ' এই বহুবচন নির্দেশক শব্দটি উল্লেখ করেননি।

২। مواقيت (মাওয়াকীত) শব্দটিও বহুবচন। এর তরজমাতেও বাংলা অনুবাদকারীগণ 'সমূহ' লেখেননি।

৩। এই ব্যাপারটি কোনো মুফাসসিরই বুঝতে পারেননি যে, এখানে الأهلة (আলআহিল্লাহ) বহুবচন আনা হয়েছে এজন্য যে, চান্দ্রমাস মোট বারটি। আর প্রত্যেক মাসে একটি করে নতুন চাঁদ। সর্বমোট বারোটি নতুন চাঁদ। অথচ বাস্তবতা এই যে, বারো চান্দ্রমাসের বারোটি নতুন চাঁদ এটা এমন কোনো রহস্য নয় যে, প্রত্যেক মুফাসসিরকেই এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলতে হবে। এটা খুবই সহজ এবং সাধারণ একটি বিষয়। তাই অনেক মুফাসসির এর উল্লেখ প্রয়োজন মনে করেননি। অথচ তাদের এই উল্লেখ না করার অর্থ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলতে চাচ্ছেন, তারা নাকি বিষয়টা বোঝেননি! আসলে এটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের জ্ঞানের স্বল্পতা বরং তার অপারগতা। তিনি যে বলছেন কোনো মুফাসসিরই এখানে বারো মাসের উল্লেখ করেননি; বাস্তবে কিন্তু বেশ কয়েকজন মুফাসসির বিষয়টি নিয়ে দিব্যি আলোচনা করেছেন।

রইল বহুবচন শব্দের অনুবাদে 'সমূহ' এর উল্লেখ-অনুল্লেখ প্রসঙ্গ। তো এটা কীভাবে অজানা থাকে যে, বহুবচনের অনুবাদে যদি ইসমে জিনস (জাতিবাচক) শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে বহু-এর অর্থ তাতে এমনিতেই আদায় হয়ে যায়। পৃথক বহুবচন-সূচক শব্দের দরকার হয় না। যেমন বলা হল, 'বাগানে ফুল ফুটেছে', এর অর্থ কেউ এটা বোঝে না যে, বাগানে কেবল একটি ফুল ফুটেছে। এখন যদি কেউ নিজের বিজ্ঞতা ফলাতে গিয়ে

বলে, 'বাগানে ফুলসমূহ ফুটেছে' তাহলে এটা কি বিশাল কোনো কৃতিত্ব হয়ে যাবে, যার জন্য অন্যদের অজ্ঞ মনে করা এবং নিজেকে সংস্কারক মনে করা জরুরি হয়ে পড়বে?! যাইহোক, যেসব অনুবাদক এখানে 'সমূহ' লেখেননি তারা কিছুমাত্র ভুল করেননি। কথার আবহ থেকে বহু-এর অর্থ তাদের তরজমায় প্রতিফলিত হয়। তারপরও বাস্তব ঘটনা হল, অনেক অনুবাদক এ জায়গায় 'সমূহ' শব্দ স্পষ্ট করেই লিখেছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবই প্রথম এই কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিচ্ছেন- বিষয়টা সে রকম নয়। কিন্তু আসল রহস্য, যা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মনের মধ্যে রয়েছে এবং যা কিনা তার মতে যুগান্তকারী সংস্কার; অন্যান্য তরজমার সাথে নিজের তরজমার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে সেটার উল্লেখ করেননি। জানা নেই, কেন তিনি এমনটা করলেন। অথচ এই রহস্য উদঘাটিত হওয়া ছাড়া এটা জানাই সম্ভব হবে না যে, তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের খেলাফ কী বলতে চান? ঐ রহস্যের কিনারা করতে চাইলে দেখুন, তার লিখিত 'চান্দ্রমাস' পৃ. ৯৬-৯৭ পর্ব ৫৮ এবং পৃ. ২০৬ ও পৃ. ৫৬-৫৮ পর্ব ৩৩ ইত্যাদি।

সেই রহস্যটি এই যে, বাস্তবে তো হিলালের অর্থ হচ্ছে অমাবস্যা-পরবর্তী ধনুকাকৃতির জ্যোতির্ময় চাঁদ। সমগ্র দুনিয়া এটাই বুঝতো এবং এখনো এটাই বোঝে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলছেন, হিলালের অর্থ হচ্ছে অমাবস্যা। তিনি বলছেন, অমাবস্যা থেকে চান্দ্রমাসের সূচনা হবে। দৃশ্যমান নতুন চাঁদ থেকে নয়!!

পাঠকবৃন্দ হয়ত বলবেন, তিনি তো হিলালের তরজমা 'নবচন্দ্র'ই করেছেন, 'অমাবস্যা' তো করেননি! ঠিক। এজন্যই তো এটা রহস্য। ভাই, নবচন্দ্রের অর্থ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের অভিধানে 'অমাবস্যা'। তো তিনি কথা বলছেন তার অভিধান অনুযায়ী আর মানুষ বুঝছেন বাংলা ভাষার অভিধান অনুযায়ী!!

যাইহোক, আরবী 'হিলাল' এবং বাংলা 'নবচন্দ্র'কে যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বিকৃত করে অমাবস্যা করলেন এটা পরিষ্কার ধোঁকাবাজি। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা আসছে। প্রথমে আমরা এই তিনটি জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে চাই, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যেখানে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন এবং অন্যদের দোষারোপ করেছেন।

প্রথম বিষয়

'আল-আহিল্লা'র অর্থ। যেমনটি আমি বলে এসেছি, আয়াতে কারীমার তরজমায় 'সমূহ' না লেখা হলেও বক্তব্যের আবহ থেকে তাতে বহুবচনের অর্থ বোঝা যায়। অধিকন্তু স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও এক জায়গায় 'সমূহ' ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'এর জবাবে আল্লাহ বলেছেন, এই নবচন্দ্র সারা বিশ্বের মানুষের জন্য মাসসমূহ হিসাব করার মাধ্যম'। (চান্দ্রমাস, পৃ ১১২)

এখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেও কেবল 'নবচন্দ্র' লিখেছেন 'নবচন্দ্রসমূহ' লেখেননি! আরো শুনুন, বইয়ের ১১২ থেকে ১৪১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কুরআনে কারীমের অনেক আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোর তরজমার উপর আমরা সংক্ষিপ্ত নযর বুলিয়েছি। তখন লক্ষ্য করলাম, তিনি বহু আয়াতে বহুবচনের অনুবাদ করেছেন একবচনের মতো করে। বহুবচনসূচক কোনো শব্দ সেখানে ব্যবহার করেননি। না 'সমূহ', না অন্য কিছু!! যেমন,

১। وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ 'স্পষ্ট নিদর্শন' (পৃ. ১১৩)

২। فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 'অন্ধকারের মধ্যে' (পৃ. ১১৫)

৩। خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'আসমান ও যমীন' (পৃ. ১১৬)

৪। فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ 'আসমান ও যমীনে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে' (পৃ. ১১৯)

৫। لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 'জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিদর্শন' (পৃ. ১২১)

৬। عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ 'বছরের গণনা ও হিসাব' (পৃ. ১২২)

৭। خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 'তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন' (পৃ. ১২৬)

৮। لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ '... নিশ্চিত নিদর্শন' (পৃ. ১৩২)

এছাড়াও আরো কয়েকটি আয়াতে বহুবচন শব্দের তরজমা করেছেন

একেবারে একবচনের মতো। কোনোরকম বহুবচন নির্দেশক শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি। অথচ ব্যাকরণের দৃষ্টিতে উল্লিখিত স্থানগুলোতে এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যার তরজমা পরিষ্কার বহুবচনের শব্দে করা উচিত।

প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজে বহুসংখ্যক আয়াতে বর্ণিত বহুবচনের তরজমায় না 'সমূহ' লিখেছেন আর না অন্য কোনো বহুবচনসূচক শব্দ, সে লোক 'আল-আহিল্লা' কিংবা 'মাওয়াকীতু'-এর তরজমায় 'সমূহ' না লেখায় কুরআনের অনুবাদকদের প্রতি এত ক্ষুব্ধ কেন? আর নিজে 'সমূহ' লিখেই বা সংস্কারের দাবি করছেন কীভাবে?

আশা করি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব শুনে অসন্তুষ্ট হবেন না যে, তার এই লেখার আগে শুধু নয়; বরং তার জন্মেরও আগে উর্দু, ফার্সীতে লিখিত তরজমা তো বটেই, স্বয়ং বাংলা ভাষাতেও এমন তরজমায়ে কুরআন রয়েছে যেখানে 'আল-আহিল্লা'-এর অনুবাদে 'সমূহ' বা এ ধরনের কোনো শব্দ আছে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বইয়ের প্রথম প্রকাশ ৪/৫/২০০৬ ঈ. আর তার জন্ম যদ্দূর জানা সম্ভব হয়েছে, ১৯৪০-এর দিকে। এখন লক্ষ্য করুন:

১। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদি (১৬ শা'বান ১৩০৯ হি.-১৩৯৭ হি. মোতাবেক ১৬ মার্চ ১৮৯২ ঈ. - ৬ জানুয়ারি ১৯৭৭ ঈ.) -এর তরজমায়ে কুরআন এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বেরিয়েছে ১৯৯৫-এর অক্টোবরে। তাতে আয়াতের তরজমা লেখা হয়েছে: 'আপনাকে (লোকেরা) নতুন চাঁদগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, তা মানুষের জন্য এবং হজ্জের সময় জ্ঞাপক'। (তাফসীরে মাজেদী শরীফ ১/৩৫৫)

২। জনাব আকরাম খাঁ (১৮৬৮ ঈ.-১৯৬৮ ঈ.)-এর তরজমায়ে কুরআনের ফাতেহা ও বাকারা অংশ প্রথমবার বেরোয় ১৯৩০ সনে। তাতে আয়াতের তরজমা নিম্নরূপ:

'(হে রাসূল!) লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে নূতন চাঁদগুলো সম্বন্ধে, বল এগুলি হইতেছে জনগণের মঙ্গলের জন্য একটা সময় নির্ধারণ- বিশেষ করিয়া হজের জন্য। (২ : ১৮৯) (সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত

তাফসীরসহ, মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ, ১/২৩১)

৩। মাওলানা আলী হাসান রাহ., যার 'মাসলা শিক্ষা' নামক বই ১৯১৪ সনে বের হয়েছে। তিনি এবং মাওলানা আব্দুল হাকীম, যার জন্ম ১৮৮৭ তে এবং মৃত্যু ১৯৫৭ ঈসাব্দীতে। এ দুইজনের যৌথভাবে অনূদিত তরজমাতুল কুরআনের দ্বিতীয় পারা, যেখানে আয়াত ২ : ১৮৯ রয়েছে, যেটি ১৯২২ সনে প্রকাশিত হয়- ওখানে আয়াতের তরজমা লক্ষ্য করুন: 'তাহারা তোমাকে নবচন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, উহা মানুষের জন্য ও হজের সময় নিরূপক'। (কুরআন শরীফ, বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর ১/৭৯)[8]

ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'আহেল্লাত- 'হেলাল'-এর বহুবচন; হেলাল অর্থ দ্বিতীয়ার চন্দ্র অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান নবচন্দ্রকলা'। এই তরজমার একটি কপি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। যা উসমানিয়া বুক ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

৪। শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী (১৬৯৯ ঈ. - ১৭৬৭ ঈ.) তাঁর ফার্সী তরজমায় লিখেছেন,

می پرسند ترا از ماہ ہائےبگو اینہا میعاداند ہمرائے مردماں وبرائے حج.

(ফাতহুর রহমান পৃ. ৪৩ মাতবায়ে মুজতাবাঈ ১৩০৪ হি.)

এখানে 'আহিল্লা' এবং 'মাওয়াকীত' দুটোর তরজমাতেই বহুবচননির্দেশক শব্দ রয়েছে।

৫। 'ফাতহুর রহমান'-এর সঙ্গে একই মলাটে শেখ সাদী (৬৯০ হি.) রাহ. -এর ফার্সী তরজমাও ছাপা হয়েছে। এতেও উভয় শব্দের তরজমায় বহুবচনসূচক শব্দ রয়েছে।

৬। শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রাহ. (১২৮৬ হি. - ১৩৩৯ হি.)-এর তরজমা তো জগদ্বিখ্যাত। 'মাআরিফুল কুরআনে' (মুফতি মুহাম্মাদ শফী রাহ.) আয়াতের নীচে হুবহু এ তরজমাই দেয়া হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে:

تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا، کہدے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے،اور حج کے واسطے

'মাওয়াকীত'-এর তরজমায় বহুবচনের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।

একাধিক ইংরেজি তরজমা থেকে তো স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবই উদ্ধৃত করেছেন যে, সেখানে আলআহিল্লাহ এবং মাওয়াকীত দুটোর তরজমাই পরিষ্কার বহুবচন নির্দেশক শব্দে করা হয়েছে।

তার আগে এতগুলো মানুষ যে কথা লিখে গেছেন, সেটার আবিষ্কারক এবং সংস্কারক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হয়ে গেলেন কী করে?!

দ্বিতীয় বিষয়:

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, অনুবাদকগণ 'মাওয়াকীত'-এর তরজমাও ভুল লিখেছেন। তাতে বহুনির্দেশক শব্দ উল্লেখ করেননি। অথচ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের খবরই নেই যে, 'মীকাত'-এর তরজমা তিনি নিজেই ভুল করে বসে আছেন। অন্য অনুবাদকেরা ঠিক তরজমা লিখেছেন।

চাই স্পষ্ট বহুবচনসূচক শব্দে তরজমা করে থাকুন কিংবা এমন কোনো শব্দে, যাতে পূর্বাপর থেকেই 'বহু'র অর্থ বুঝে এসে যায়।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই শব্দের তরজমায় তো 'সমূহের' পুরো স্ত‚প জমা করে ফেলেছেন, কিন্তু তরজমা করেছেন গলদ। তিনি নিজেই তার বইয়ের ১১১ পৃষ্ঠায় একাধিক অভিধানের উদ্ধৃতিতে এর যে অর্থ লিখেছেন, আয়াতের তরজমায় তার মোটেও ধার ধারেননি!

আর সে কারণেই 'মাওয়াকীত'-এর সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভট এই তরজমা তিনি করেছেন: 'সময়সমূহ (চান্দ্রমাসসমূহ-বারটা) -এর আরম্ভ করার মাধ্যম'।

আমরা ইতঃপূর্বে অভিধানগ্রন্থসমূহের বরাত দিয়ে উল্লেখ করে এসেছি যে,

'মীকাতে'র অর্থ হয়ত সময় কিংবা সময় নির্ণয়ের মাধ্যম। 'মীকাত' যদি সময় অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে সাধারণত তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কোনো কাজের জন্য নির্ধারিত সময়। এছাড়াও 'মীকাত'এর আরো বহু অর্থ রয়েছে। কিন্তু সেগুলো এখানে উদ্দেশ্য নয়। যেমন হাজ্বীদের জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সেইসব স্থান, যেগুলো ইহরাম ব্যতিরেকে অতিক্রম করা জায়েয নেই। একেও 'মীকাত' বলা হয়। বহুবচনে 'মাওয়াকীত'। (প্রকাশ থাকে যে, এই স্থানগুলোকে 'মীকাত' এজন্য বলা হয় না যে, এখান থেকে ইহরাম শুরু করা জরুরি। ইহরাম চাইলে ঘর থেকে বেঁধেও বের হতে পারে। ওগুলোকে বরং 'মীকাত' বলা হয় শেষসীমা হওয়ার বিচারে। কারণ এরপর আর ইহরাম ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। এমনিভাবে 'মীকাত'-এর একটি অর্থ, প্রতিশ্রুত সময়। এদিক থেকে কিয়ামত এবং হাশরের জন্যও 'মীকাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

যাইহোক هي مواقيت للناس والحج -এ মীকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত নির্ধারিত সময় কিংবা সময় নিরূপণের উপকরণ ও মাধ্যম। যদি সময় অর্থে নেয়া হয় তাহলে 'মাওয়াকীত'-এর অর্থ হবে, 'সময়সমূহ' কিংবা 'নির্ধারিত সময়সমূহ'। আর যদি 'সময় নির্ণয়ের মাধ্যম' অর্থ ধরা হয় তাহলে 'মাওয়াকীত'-এর অর্থ হবে, 'সময় নির্ধারণ করার মাধ্যমসমূহ'।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি মীকাতকে সময় অর্থে নিতে চান তাহলে তাকে এর তরজমা করতে হবে, 'সময়সমূহ' কিংবা 'নির্ধারিত সময়সমূহ'। তারপর যদি তার কাছে কোনো প্রমাণ থাকে তাহলে এর ব্যাখ্যা 'বার মাস' দিয়ে করতে চান তো করবেন। কিন্তু কোনো প্রমাণ তো নেই। উল্টো এর পক্ষে প্রমাণ রয়েছে যে, এখানে উদ্দেশ্য, মানুষের ইবাদাত ও লেনদেনের সময়। অন্য প্রমাণাদি ছাড়াও والحج শব্দও এর পক্ষে খুবই স্পষ্ট ও বড় আলামত। যাইহোক 'সময়সমূহ' কিংবা 'নির্ধারিত সময়সমূহ' বলার পর 'মাওয়াকীত'-এর তরজমা পুরা হয়ে গেছে। এখন 'আরম্ভ করার মাধ্যম', 'হিসাব করার মাধ্যম', 'শুরুসমূহ' এসব বলার তো কোন অবকাশ বাকি থাকে না। এই শব্দগুলো আয়াতে বিদ্যমান কোন্ আরবী শব্দের তরজমা? কোনোটারই নয়। এগুলো বরং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পক্ষ থেকে সরাসরি নিজস্ব সংযোজন। আর 'শুরুসমূহ' তো একেবারে অপরিচিত, অপ্রাসঙ্গিক। 'মীকাত'-এর একাধিক অর্থ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ সব অর্থের মধ্যে শুরু এবং সূচনার কোনো নামগন্ধও নেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি জিদ ধরেন

তাহলে আরবী অভিধানমালার একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে হলেও এ অর্থটি উদ্ধৃত করুন! এবং ৬৪ পৃষ্ঠায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজের দাঁড় করানো অর্থের পক্ষে আবেগতাড়িত হয়ে এক দুর্দান্ত কাজ করে ফেলেছেন। সেটা হল مواقيت الصلاة -এর তরজমা করেছেন 'সালাতের আরম্ভসমূহ'। অথচ এর অর্থ হচ্ছে, 'সালাতের নির্ধারিত সময়সমূহ'। বেচারা বোধহয় এটাও চিন্তা করেননি যে, নামাযের সূচনা হয় তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে, কেবল সময় আরম্ভ হওয়ার দ্বারা নয়!

আর যদি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 'মীকাত'-কে 'সময় নির্ধারণের মাধ্যম' অর্থে নিতে চান তাহলে 'মাওয়াকীত'-এর তরজমা হবে 'সময় নির্ধারণের মাধ্যমসমূহ'। এই তরজমাও পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক। এই তরজমা করা হলে 'সময়সমূহ' শব্দের ব্যবহার অপ্রাসঙ্গিক। এখানে এর কোনো অবকাশ নেই। যদি কোনো সুযোগ থাকত তাহলে পরে তার দ্বারা 'বার মাস' উদ্দেশ্য নেয়ার পক্ষে প্রমাণের দরকার হত।

এই হলো সুরতেহাল। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 'মীকাত' এর আলাদা আলাদা দুটো অর্থকে একসাথে করে একটি অর্থ দাঁড় করিয়েছেন এবং তাকেই 'মাওয়াকীত'-এর তরজমা সাব্যস্ত করেছেন। এই প্রক্রিয়া আরবী-বাকরীতির সম্পূর্ণ রুচিবিরুদ্ধ হওয়ায় তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কিন্তু এই অচল ও অবাস্তবকে আঁকড়ে ধরেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সংস্কারের যত গর্ব আর অহংকার!! অথচ ভাষার সঙ্গে যার সামান্য সম্পর্কও আছে তিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তরজমা পড়ে হতবাক হবেন। কে না জানে যে, বহুবচন শব্দের তরজমায় একটাই বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, দু'টো না। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 'মাওয়াকীত' এর তরজমা করতে গিয়ে লিখেছেন:

"আবার 'মীকাত' এর বহুবচন 'মাওয়াকীতু' শব্দ দিয়ে আল্লাহ বার মাসের সময়সমূহের শুরুসমূহ নির্ধারণের কথা বলেছেন। উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ বিশ্বব্যাপী তফসীরকারগণ সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারছেন না কেন তা আমার বোধগম্য নয়;" (চান্দ্রমাস, নবম সংস্করণ পৃ. ২১)

এই যে 'বার মাসের সময়সমূহের শুরুসমূহ' এখানে একটিমাত্র বহুবচন-শব্দের জন্য (মাওয়াকীত) দুই দুই বার 'সমূহ' ব্যবহার কীভাবে সম্ভব হল? যে কেউ বুঝতে পারবেন, এটা এ কারণেই হয়েছে যে, এখানে এক

শব্দের অধীনে দুই শব্দের তরজমা করা হয়েছে। একটি আয়াতে আছে, আরেকটি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজের তরফ থেকে যোগ করেছেন।

আরো মজার বিষয় হল, পৃ.২১ এবং ২১৫-২১৬ তে যে তরজমা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব করেছেন তাতে বহু-নির্দেশক শব্দ নেই। কেবল অতিরিক্ত যোগ করা শব্দে বহু-নির্দেশক রয়েছে। আবারো দেখুন:

"বলে দিন এগুলো সময়সমূহের আরম্ভ করার মাধ্যম।" (পৃ. ২১, ২১৫)

"আপনি বলে দিন এগুলো সূচনাকারী বা আরম্ভ করার মাধ্যম (বার মাসসমূহের)।" (পৃ.২১৬)

উভয় তরজমাতেই 'মীকাত' এর অর্থ গলদ করেছেন। আরবী অভিধানে মীকাতের কোনো অর্থ 'সূচনাকারী' বা 'আরম্ভ করার মাধ্যম' নেই। সুতরাং তরজমা তো ভুল করেছেনই, এদিকে বহু-নিদের্শক শব্দ বসাতে ভুলে গেছেন! সেটা লাগিয়েছেন 'সময়'-এর সাথে, যা তার পক্ষ থেকে যোগ করা। আর সম্ভবত সে কারণেই দ্বিতীয় তরজমায় এটাকে বন্ধনীতে রেখেছেন। কিন্তু যে জিনিস আয়াতে উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নয় তাকে বন্ধনীতেও রাখা যায় না।

এটা ঠিক যে, কখনো কখনো বক্তব্যের মাঝে কোনো কোনো শব্দ অনুক্ত থাকে। কিন্তু উহ্য রাখতে হলে কিছু না কিছু আলামত উপস্থিত থাকা জরুরি। এখানে مواقيت ('মাওয়াকীত') -এর পরে الشهور (মাসসমূহ) উহ্য থাকার পক্ষে কোনো আলামত বা প্রমাণ নেই। এ কারণেই আজ পর্যন্ত কোনো আলেম এমন ব্যাখ্যা করেননি। বরং সাহাবা-তাবেঈন যুগ থেকে সবাই এই অর্থই বুঝে আসছেন যে, হিলালসমূহ অর্থাৎ হিলালী মাসসমূহ মানুষের ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন এবং বিশেষভাবে হজ্বের জন্য মীকাত।

যাই হোক, এই ভুল বরং তামাশা তো হল 'মাওয়াকীত' এর তরজমা প্রসঙ্গে। আরো একটি ভুল তিনি করেছেন, مواقيت ('মাওয়াকীত')-এর পর الشهور (আশশুহুর) শব্দ উহ্য মেনে বক্তব্য শেষ করে দিয়ে। আর সেজন্যই ('মাওয়াকীত')-এর উপর ওয়াকফ করে للناس والحج অংশকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। তরজমা ও তফসীর দু'টোই করেছেন এমনভাবে,

যার দাবি হলো للناس উহ্য মুবতাদার খবর। অথবা هي মুবতাদার দ্বিতীয় খবর। অথচ বাস্তবে للناس তার মা'তুফকে নিয়ে مواقيت এর ছিফত। এবং মাওছুফ-ছিফত মিলে هي মুবতাদার খবর। মূলরূপ এরকম: مواقيت كائنة للناس কুরআনে কারীমের নাহবী তারকীব (ব্যাকরণের সূত্র মেনে বিশ্লেষণ) -এর জন্য ই'রাবুল কুরআনের যেসব পুস্তক লেখা হয়েছে তার মধ্যে থেকে শুধু তিনটি কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। ১. 'ইরাবুল কুরআন' শাস্ত্রের ইমাম ও পণ্ডিত শিহাবুদ্দীন আসসামীন (৭৫৬ হি.) লিখেছেন:

و "للناس" متعلق بمحذوف، لأنه صفة لـ "مواقيت" أي: مواقيت كائنة للناس....

قوله: {والحج} عطف على "الناس"، قالوا: تقديره: ومواقيت الحج، فحذف الثاني اكتفاء بالأول،

ولما كان الحج من أعظم ما تطلب مواقيته وأشهره بالأهلة أفرد بالذكر، وكأنه تخصيص بعد تعميم، إذ قوله "مواقيت للناس" ليس المعنى لذوات الناس، بل لا بد من مضاف أي: مواقيت لمقاصد الناس المحتاج فيها للتأقيت، ففي الحقيقة ليس معطوفا على الناس، بل على المضاف المحذوف الذي ناب "الناس" منابه في الإعراب.

(আদ-দুররুল মাসূন ফি উলূমিল কিতাবিল মাকনুন, শিহাবুদ্দীন আসসামীন, ১/৪৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রকাশকাল, ১৪১৪ হিজরী)

২. "مواقيت" خبر مرفوع، "للناس" جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف، نعت لمواقيت"

('আল-জাদওয়াল ফি ই'রাবিল কুরআন ও ছারফিহি ও বায়ানিহি' মাহমূদ ছাফী (১৯৮৫ ইং.) ১/৩৮৬, দারুর রশীদ দামেস্ক ১৪১৮ হি.)

৩. للناس، الجار والمجرور متعلقان بمحذوف، صفة لمواقيت

('ই'রাবুল কুরআনিল কারীম ওয়া বায়ানুহু' মুহিউদ্দীন আদ-দারবিশ (১৩২৬-১৪০৩ হি.) ১/২৪৮, দারুল ইয়ামামা ও দারু ইবনে কাছীর, বৈরুত, ১৪২৬ হি., নবম মুদ্রণ)।

আরবী ভাষা ও কুরআনে কারীমের ভাষা অলঙ্কার সম্পর্কে যার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের

তাফসীরে সেই 'তারকীব' (বাক্যবিশ্লেষণের ধারা) রক্ষিত হয়নি, যা ইরাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। আর তার তরজমা ও ব্যাখ্যা থেকে যে 'তারকীব' বোঝা যায় তা কুরআনের ভাষা-অলঙ্কারের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবং এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে والحج শব্দটি একদম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। الناس এর উপর তাকে عطف (আতফ) করা অর্থহীন হয়ে পড়ে তখন। عطف (আতফ)-এর প্রাসঙ্গিকতা সৃষ্টির জন্য বক্তব্যের মাঝে একটা কিছু উহ্য মানতে হয়, যা সাধারণ নিয়মে পড়ে না।

যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, তার ব্যাখ্যার দাবি এই যে, ওয়াকফ করা হবে مواقيت-এর উপর। অথচ কুরআনে কারীমের কোনো একটি 'মুতাওয়াতির' কেরাতের বিচারেও এখানে ওয়াকফ হয় না। না ওয়াকফে লাযেম, না ওয়াকফে তাম। কোনো প্রকার ওয়াকফ বা বিরামের সুযোগ নেই এখানে।

যাক, এই ইলমী আলোচনা তো লেখা হল তালিবে ইলম ভাইদের জন্য। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে শুধু এটুকুই বলতে চাই, কোনো আয়াতের এমন কোনো অর্থ যা আজ পর্যন্ত কোনো মুফাসসির, কোনো মুতারজিম এবং কোনো একজন আলেমে দ্বীনের চিন্তায়ও আসেনি এটাই প্রমাণ করে যে, এই অর্থ ভিত্তিহীন। তা যদি কারো চিন্তায় আসে তো এটা তার কোনো বিশেষত্বের সনদ নয়; বরং বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ। তার জন্য আনন্দের নয়, আক্ষেপের কারণ। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হচ্ছেন সেই লোক, যে আসতাগফিরুল্লাহ -এর জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ পড়ে এবং বিকৃতি ও সর্বনাশকে সংশোধন ও সংস্কার মনে করে!! খোদার বান্দা! আল্লাহ তাআলা কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও বিধিবিধান এবং এর আমলি নকশা (বাস্তবরূপ) সবকিছুর হেফাযত ও সংরক্ষণ করেন ইলমের ন্যায়নিষ্ঠ ধারক ও বাহকদের মাধ্যমে। এমন লোকের মাধ্যমে নয়, যাদের কুরআন ও হাদীসের ভাষার 'আলিফ-বা'ও জানা নেই। হাঁ, দ্বীনের সাহায্য যে কারো মাধ্যমেই করিয়ে নেন। এমনকি ফাজের ও পাপাসক্ত ব্যক্তির দ্বারাও। দ্বীনের নুছরত বা সাহায্য আর দ্বীনের ইলম ও বিধানাবলীর সংরক্ষণ দু'টো এক জিনিস নয় যে, একটাকে অপরটার সাথে তুলনা করা হবে। সুতরাং উলামায়ে কেরামের ইজমার পরিপন্থী কোনো কিছু যদি কোনো গবেষকের মনে আসে তাহলে তার জন্য জরুরি, সে এটাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা মনে করবে। তা না করে একে রহমানী ইলহাম (উপর ওয়ালার দান)

মনে করা একটি স্বতন্ত্র গোনাহ।

তৃতীয় বিষয়

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তৃতীয় অভিযোগ এই যে, কোনো মুফাসসির এটা বুঝতেই পারেনি যে, আয়াত ২ : ১৮৯ -এর সাথে সূরা তাওবার ৯ : ৩৬ আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে। অথচ এটা এত স্পষ্ট বিষয় যে, সাধারণভাবে মুফাসসিরগণ তা উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করেননি।

আর ব্যাপারটা এমনও নয় যে, মুফাসসিরদের মধ্যে কেউই এর উল্লেখ করেননি। বরং অনেকেই উল্লেখ করেছেন। আর বুঝেছেন তো সকলেই। এমন সহজ সাধারণ একটা বিষয় কোনো মুফসসির বুঝবেন না তা কী করে হয়? ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হয়ত চাচ্ছেন যে, সবাই ওনার মতো আয়াত ২ : ১৮৯-এর অধীনে বারো মাসের কথা مواقيت ('মাওয়াকীত') শব্দের অর্থ বা মর্ম হিসেবে বলুক। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। কারণ এতো হবে ভুল ব্যাখ্যা। তাই আমার জানা মতে তাদের কেউ এই কাজ করেননি। বাকি, যে প্রসঙ্গে বারো মাসের উল্লেখ এখানে আসতে পারে সেভাবে অনেকে তার উল্লেখ করেছেন।

এখানে একটি প্রাচীন তাফসীরের ভাষ্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে এবং আরো কিছু তাফসীরের শুধু হাওয়ালা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে হচ্ছে। ইমাম আবু জা'ফর ত্বহাবী (২৩৯-৩২১ হি.) -এর প্রসিদ্ধ তাফসীর 'আহকামুল কুরআন'-এর দুই খণ্ড আলহামদুলিল্লাহ ছেপে এসেছে। ঐ তাফসীরে আয়াত ২ : ১৮৫

(فمن شهد منكم الشهر فليصمه)

-এর অধীনে তিনি লিখেছেন:

وكان شهر رمضان الذي ذكره الله عز وجل لنا شهرا معقولا بالأهلة التي جعلها لنا مواقيت بقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} ، فأعلمنا عز وجل أن الأهلة مواقيت لنا لحجنا، ولما سوى ذلك مما نحتاج إلى الأوقات فيه من أمور ديننا من الصيام، والعدد، والإيلاءات، وما

أشبه ذلك، ولما نحتاج إليه من أمور دنيانا في معاملاتنا وحلول آجال ديوننا ولم يبين لنا عز وجل في هذه الآية عدة الشهور التي تعلم بالأهلة، وبينه لنا في سورة براءة بقوله عز وجل: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم} فأخبر عز وجل أن عدة هذه الشهور التي جعلها مواقيت اثنا عشر شهرا

অর্থাৎ রমযানের মাস হিলালের মাধ্যমেই জানা যায়। যাকে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য মীকাত সাব্যস্ত করেছেন তাঁর এই পবিত্র ভাষ্যে:

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

তো আল্লাহ তাআলা আমাদের বলে দিয়েছেন যে, হিলাল হচ্ছে আমাদের হজ্ব এবং অন্যান্য ইবাদত ও লেনদেনের জন্য মীকাত, যে সব ক্ষেত্রে আমাদের সময় রক্ষার দরকার হয়।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঐ মাসগুলোর সংখ্যা বর্ণনা করেননি, যেগুলো জানা যায় হিলালের মাধ্যমে। সেটা বর্ণনা করেছেন সূরা বারাআতে (সূরা তাওবায়) এই বাণীতে:

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا

অর্থাৎ হিলালী মাসসমূহ, যাকে আল্লাহ মীকাত বানিয়েছেন তার সংখ্যা হল বারো...।

(আহকামুল কুরআন, আবু জাফর ত্বহাবী ১/৩৪১, কিতাবুস সিয়াম ওয়াল ই'তিকাফ, মারকাযুল বুহুছিল ইসলামিয়া ইস্তাম্বুল প্রকাশিত, ১৪১৬ হি. মোতাবিক ১৯৯৫ ঈ.)

এত প্রাচীন এবং এত পরিষ্কার ভাষ্য থাকা সত্তে¡ও কি এ কথা বলার অবকাশ আছে যে, আয়াত ২ : ১৮৯ এবং ৯: ৩৬-এর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি কোনো মুফাসসির উল্লেখ করেননি? ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তো কেবল উল্লেখ না করা নয়; তিনি বরং বলছেন, কেউ বোঝেইনি! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আয়াত ২ : ১৮৯-এর অধীনে চান্দ্রমাসের প্রসঙ্গ ধরেছেন আরো যেসকল

মুফাসসির তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের শুধু হাওয়ালা দেখুন:

১. ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি (৩৬৪ হি.-৪৫০ হি.), 'আন-নুকাতু ওয়াল উয়ূন' (তাফসীরুল মাওয়ারদি) ১/২৪৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

২. ইমাম আবু আবদিল্লাহ কুরতুবি (৬৭১ হি.) আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, ৩/২২৯ মুআস্সাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

৩. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আলী শাওকানী রাহ. (১১৭৩ হি.-১২৫০ হি.) 'ফাতহুল ক্বদীর আলজামে' বাইনা ফাননাইর রিওয়াতি ওয়াদ দিরায়াতি মিন ইলমিত তাফসীর', ১/২১৭, দারে ইবনে কাছীর দামেস্ক, প্রকাশকাল: ১৪১৪ হি.

৪. আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮ হি.-১৩০৭ হি.) ফাতহুল বায়ান ফী মাকাছিদিল কুরআন ১/৩৮২, আল-মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, বৈরুত, ১৪১২ হি.

আরো দেখুন:

৫. 'আল-মুহাররারুল ওয়াজিয ফী তাফসীরিল কিতাবলি আযীয', আবু মুহাম্মাদ ইবনে আতিয়্যা আন্দালুসি (৫৪১ হি.) ২/১৩৪, দোহা, কাতার, প্রকাশকাল: ১৪০১ হি.

৬. 'তাফসীরে মাজেদী' পৃ. ৯৫, টীকা ৬৮৯, তাজ কোম্পানি।

যাইহোক, এই হচ্ছে সেই তিন জিনিস যার উপর ভিত্তি করে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সমস্ত মুতারজিম ও মুফাসসিরদের ভুল ধরেছেন এবং নিজেকে হাজার বছরের ভুলের সংশোধনকারী দাবি করেছেন। পাঠকবৃন্দ এর হাকীকত ও আসল রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এবার বলুন, এখানে কোন বিষয়টি এমন আছে, যাতে মুতারজিম ও মুফাসসিরগণ ভুল করেছেন এবং সেই ভুলের কারণে হাজার বছর কালব্যাপী বিশৃঙ্খলা চলে আসছে? এবং এখানে কোন বিষয়টা এমন আছে, যাতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এমন কোনো কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়েছেন, যার ফলে ঐ বিশৃঙ্খলার অবসান

ঘটেছে? তাহলে কী দরকার ছিল এত কিছু দাবি করার এবং নিজের বইকে 'যুগান্তকারী সংস্কার' বলার?!

(পরবর্তী শিরোনাম: 'ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কর্তৃক 'হিলাল' এর বিকৃতি সাধন'। চলবে ইনশাআল্লাহ।)

দৃষ্টি আকর্ষণ:

জুমাদাল উলা ১৪৩৬ হি. সংখ্যায় 'চান্দ্রমাস' একটি পর্যালোচনা'-এর প্রকাশিত অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় লক্ষণীয়:

১। প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় (আল কাউসার গত সংখ্যার পৃষ্ঠা ৮) তৃতীয় কলামের প্রথম প্যারা কিছু সংযোজনসহ এভাবে পড়তে হবে:

সুতরাং বর্ষগণনা এবং মাসসমূহের হিসাব সাধারণভাবে বোঝার সম্পর্ক কেবল চাঁদের 'হিলাল' আকৃতির সাথে নয়; বরং তার ক্রমাগত তিথি পরিবর্তন ও রূপ বদলের সাথে। খোদ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ১০ : ৫-এর অধীনে লিখেছেন:

"বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, চন্দ্র সূর্য থেকে আলো পায়। এই জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে একটা মাসের সৃষ্টি হয় যার ব্যাপ্তি এক নবচন্দ্রোদয় দিয়ে শুরু এবং আরেক নবচন্দ্র দিয়ে শেষ।" (চান্দ্রমাস, পৃ.১১৮)

তাই চাঁদের 'হিলাল' আকৃতি থেকে নিয়ে পরবর্তী হিলালের রূপ লাভ পর্যন্ত তার এই সবগুলি পর্যায়কে ইঙ্গিত করে আয়াতে أهلة বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। আরবী ভাষার বাগ্ধারা ও গদ্যরীতি সম্পর্কে যার জানা নেই, তার এখানে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, هلال (হিলাল)-এর অর্থ হল 'নবচন্দ্র'। তো একে বহুবচনরূপে ব্যবহার করে চাঁদের সবগুলি আকৃতির প্রতি ইঙ্গিত কীভাবে হয়? কিন্তু ভাষা সম্পর্কে যার জানাশোনা আছে এবং আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের 'সনআতে তাগলীব' সম্পর্কে যার জানা আছে তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন যে, أهلة-কে বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করে চাঁদের সবগুলি আকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা খুব সহজেই সম্ভব। অনেক মুফাসসির এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

২। ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলামের মাঝামাঝি طَلْق بن علي রা.-এর নাম এসেছে। বাংলায় লেখা হয়েছে: 'তলাক'। এর সঠিক উচ্চরণ হবে 'তাল্ক'।

এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বান্দা হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন দামাত বারাকাতুহুম, জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা- এর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

৩। তিনি ৮ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আয়াত ৩৬ : ৩৯-এ كالعرجون القديم-এর তরজমা সম্পর্কে বলেছেন যে, العرجون-এর তরজমায় 'শাখা' শব্দ খুব একটা উপযোগী নয়। তার কথা ঠিক। কারণ العرجون তো আসলে حامل التمر খেজুরের কাঁদি বহনকারী দণ্ডের নাম। 'শাখা' বললে চিন্তা যায় 'ডালে'র দিকে। কিন্তু আমরা অবশ্য লিখেছি 'খেজুরশাখা' খেজুর গাছের শাখা নয়। এতে হয়ত কাছাকাছি অর্থ আদায় হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে আরো ফিকির এবং মশওয়ারা করা যেতে পারে।

এই দুইটি পরামর্শের জন্য বান্দা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁকে জাযায়ে খায়ের নসীব করুন। আমীন। (আবদুল মালেক)

---

[1] সপ্তম সংস্করণে তরজমা ছিল এ রকম: 'সূরা বাকারার ২ : ১৮৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, '(তারা) আপনার কাছে নবচন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বা জানতে চায়। বলে দিন, এগুলো (নতুন চাঁদসমূহ) সময়সমূহ (চান্দ্রমাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম, পুরো মানবজাতির জন্য (লিননাছ) এবং হজ্জের জন্য' (চান্দ্রমাস, সপ্তম সংস্করণ পৃ. ১৫)

তরজমায় পার্থক্য কেন করলেন কিছু বলেননি। আগে 'নির্ধারণ'-এর পরে বন্ধনীতে 'গণনা বা হিসাব' লিখেছিলেন আর এখন 'আরম্ভ'-এর

পরে শুধু 'হিসাব' লিখেছেন! প্রশ্ন হল গণনা বা হিসাব- এটা 'নির্ধারণ' অথবা 'আরম্ভ'-এর অনুবাদ নাকি ব্যাখ্যা?

দুটো তরজমাতেই مواقيت (মাওয়াকীত)-এর অর্থ ভুল লিখেছেন। একটু পরেই যার বিস্তারিত আলোচনা আসছে। আবার مواقيت দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন 'বারো চান্দ্রমাস'। এটাও ভুল। পাঠকগণ ইতঃপূর্বে সঠিক ব্যাখ্যা পড়ে এসেছেন। কিছু বিস্তারিত সামনেও আসছে। (আবদুল মালেক)

[2] সপ্তম সংস্করণে ছিল : 'তাই হিজরী মাস গণনা করতে হয় নতুন চন্দ্রোদয় দেখে' (পৃ. ১৫) 'উদয়' এবং 'দেখা'র বিষয়টি নবম সংস্করণে ফেলে দিয়েছেন কেন?

প্রশ্ন হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে উদয় এবং দেখার বিষয়টি নবম সংস্করণে বাদ দিলেন তাতে কথার কী সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেল? আগে তো বক্তব্য পরিষ্কার ছিল, এখন অস্পষ্ট হয়ে গেল! আসল কথা হল, আগে তার হুঁশ ছিল না যে, এই শব্দগুলো তার সংস্কার (মূলত বিকৃতি)-এর দাবিকে অপাঙক্তেয় করে ফেলে। পরে যখন খবর হল তখন ব্যস সেগুলো ফেলে দিলেন! (আবদুল মালেক)।

[3] আয়াতে কোথায় আছে হিসাবের কথা? কোথায় বা একক হিজরী বৎসরের কথা? হিলাল পুরো মানবজাতির জন্য মীকাত, কিন্তু তা 'একক' এ কথা কুরআনে কোথায়?! যখন একক চান্দ্রক্যালেন্ডার নয় শুধু, আগাম তৈরি করা ক্যালেন্ডারের চিন্তাও ছিল না তখন কি হিলাল মীকাত ছিল না? হিলালের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করা হত না? (আবদুল মালেক)।

[4] 'মাওয়াকীত'-এর তরজমায় 'আরম্ভ' এবং 'বারো মাস' এগুলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পকেট থেকে যোগ করা। 'মাওয়াকীত'-এর অর্থের মধ্যে এগুলো অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি নিজেই তার বইয়ের ১১১ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন অভিধানের বরাতে مواقيت (মাওয়াকীত)-এর অর্থ

লিখেছেন। সেখানেও এ জিনিসগুলো নেই। (আবদুল মালেক)

[5] এটা 'বোধগম্য' হওয়ার কথাও না। মুফাসসিরগণ তো সঠিক ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আসলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবেরই নিজের বোধ-বুদ্ধির চিকিৎসা নেওয়া উচিত (আবদুল মালেক)।

[6] এ রকম নয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! একটু ধৈর্য ধরুন! (আবদুল মালেক)।

[7] আপনার বক্তব্যমতেই যখন অভিধানগুলোতে 'মীকাত'-এর অর্থ লেখা হয়েছে সময় এবং স্থান; আর এখানে সময় অর্থই উদ্দেশ্য, তখন আপনি 'সূচনা' এবং 'আরম্ভ'-এর অর্থ নিজের তরফ থেকে কেন এবং কীভাবে আবিষ্কার করলেন? শব্দ এবং পরিভাষার ক্ষেত্রে কি নিজস্ব মতামত চলে? শব্দকে ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত, অনুসৃত ও স্বীকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে যেমনখুশী অর্থ তাতে চাপিয়ে দেওয়াই তো সবরকম বিকৃতির গোড়া। (আবদুল মালেক)

[8] সদরুদ্দীন আহমদ চিশতি বিপথগামী চিন্তা-বিশ্বাসের লোক। তাফসীর লিখেছেন- সেটাও বাতেনী। কিন্তু আয়াত ২ : ১৮৯-এর তরজমা (তাফসীর নয়) তিনিও সঠিক লিখেছেন। লিখেছেন: 'তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে নূতন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে। বলিয়া দাও এইগুলো ইনসানের জন্য এবং হজের জন্য ওয়াক্ত করা হইয়াছে' ('কোরআন দর্শন' সদরুদ্দীন আহমদ চিশতি ২ : ১৮৯) তো এখানেও 'সমূহ' রয়েছে। এটা ছাপা হয়েছে ২০০০ সালে।

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

মে ২০১৫, রজব ১৪৩৬

চান্দ্রমাস: একটি পর্যালোচনা-৩ : আল-বেরুনী কী বলেছেন?

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

ইচ্ছা ছিল, এ সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কর্তৃক হেলালের বিকৃতি বিষয়ে লিখব। পরে মনে হলো, প্রথমে হিলাল ও অমাবস্যা বিষয়ে আল-বেরুনীর বক্তব্য তুলে ধরি। কারণ শুনেছি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে চান্দ্রমাস অমাবস্যা থেকে শুরু হওয়ার কথা বলেন- তার সুযোগ নিয়েছেন তিনি আল-বেরুনীর নামে পাওয়া একটি ভুল তথ্য থেকে। তাই এ সংখ্যায় আল-বেরুনী কী বলেছেন এ বিষয়ে লেখা হল।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অন্য অনেক বিষয়ের মতো অমাবস্যার ব্যাপারেও বিপরীতমুখী কথা বলেছেন। তবে বেশিরভাগ এটাই বলেছেন যে, 'ইসলামে এবং বিজ্ঞানের কাছে অমাবস্যার কোনো স্থান নেই।'!!

অমাবস্যা একটি বাস্তবতা। ইসলাম কখনো কোনো বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করে না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানও তাই। অতএব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এই কথা সত্যিই বড় আশ্চর্যের যে, ইসলামে এবং বিজ্ঞানে অমাবস্যার কোনো স্থান নেই।

শুনেছি, একজনের সাথে আলাপকালে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার এই বক্তব্য নিয়ে গর্ব করছিলেন এবং নিজেই এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছিলেন যে, (বিখ্যাত মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী) আল-বেরুনী একথা লিখেছেন, এটা নাকি তাকে এক মুফতী সাহেব বলেছেন। তিনি হলেন জনাব এ কে এম নেছার আহমদ খান লক্ষীপুরী।

যাইহোক তার সাথে যোগাযোগ করা হল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল: আল-বেরুনীর কোনো গ্রন্থ জনাবের কাছে আছে কি না? বললেন, না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার ঠিকানা দিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মাদ এনামুল হক! প্রশ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে বললেন,হাঁ,আল-বেরুনীর একটি ভাষ্য আমার কাছে লেখা আছে। ইনশাআল্লাহ বাড়িতে গিয়ে লিখিয়ে দেব। যে ভাষ্যটি তিনি লেখালেন তা নিম্নরূপ: বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুবাদকৃত এগারশত শতাব্দী আল-বেরুনী গ্রন্থে ৮৯ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ আছে যে, চান্দ্রমাসের হিসাব গণনা অমাবস্যা হতে আরম্ভ হয়ে থাকে' (চন্দ্রকলা)।

'চন্দ্রকলা' কার লিখিত? তিনি ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত বই থেকে আল-বেরুনীর বক্তব্য সরাসরি উদ্ধৃত করছেন নাকি অন্য কারো মারফতে? মুহতারাম নেছার আহমদ সাহেব এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি! যাইহোক, নেছার সাহেবের শোকর আদায় করা হল।

এখানে অবাক করা বিষয় হল, এনাম সাহেব তো বলছিলেন, অমাবস্যার কোনো স্থানই নেই। ইসলামেও না, বিজ্ঞানেও না। এখন আল-বেরুনীর নামে বলা উক্তিতে এর অস্তিত্বই শুধু প্রমাণিত হচ্ছে না; বরং এত বেশি গুরুত্ব যে, চান্দ্রমাস শুরুই করা হবে অমাবস্যা থেকে! নাউযু বিল্লাহিল আযীম।

যাইহোক, এটা তো পরিষ্কার যে, আল-বেরুনীর এরকম কোনো গ্রন্থ নেই। উদ্ধৃতিতে অবশ্যই কোনো ত্রুটি থাকবে। আর অমাবস্যার বিষয়টি যে কেবল একের পর এক অনুবাদ নির্ভরতার ফল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অনুসন্ধানের পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে: জনাব এম আকবর আলী মরহুমের লেখাঙআল-বেরুনী'।১ এটা তার মুসলিম বিজ্ঞানী সিরিজের চতুর্থ বই। এই বইয়ে জনাব আকবর আলী সাহেব আল-বেরুনীর জীবনচরিত এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী বিষয়ে নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা লিখেছেন। স্বভাবতই এতে আল-বেরুনীর গ্রন্থ 'আত-তাফহীম লি আওয়া-ইলি সিনাআতিত্ তানজীম' সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। যা বইটির ৭৯-৯৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত।

আকবর আলী সাহেব 'কিতাবুত্ তাফহীম'-এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'আত-তাফহীম'-এর ইংরেজী অনুবাদক প্রফেসর র্যামসে রাইট (Ramsay Wright)-

এর বক্তব্য তুলে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : 'অনুবাদক র‌্যামসে রাইট-এর মতে গ্রন্থখানি যদিও জ্যোতিষ সম্বন্ধে উপদেশাবলী সম্বলিত তবুও একে একাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক বলে অভিহিত করা যেতে পারে।' (আল-বেরুনী পৃ. ৭৯)

খানিক পরে আকবর আলী সাহেব 'কিতাবুত তাফহীম'-এর কিছু কিছু আলোচনা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সেসবের সারসংক্ষেপ আল-বেরুনী রাহ.-এর 'আত-তাফহীম' থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তার সামনে ছিল প্রফেসর র‌্যামসে রাইটের অনূদিত বই। যদিও এই অনুবাদের সাথে আরবী মূল পাঠও সংযুক্ত আছে। কিন্তু উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আকবর আলী সাহেবের ভরসা ছিল র‌্যামসে রাইটের ইংরেজি অনুবাদের উপর।

মরহুম আকবর আলী সাহেব আত-তাফহীমের উদ্ধৃতিতে তার বইয়ের ৮৮-৯১ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মাসের নামসমূহের তালিকা দিয়েছেন। এ তালিকার প্রথম ছকটি ইসলামোত্তর আরবী মাসের নাম বর্ণনার জন্য। বারো মাসের নাম উল্লেখ শেষে নীচে নোট দেয়া হয়েছে : 'অমাবস্যা থেকে মাস শুরু হয়। ৩৫৪ দিনে বৎসর। মলমাস জুড়ে দেওয়া হয় না।' ('আল-বেরুনী', এম. আকবর আলীকৃত, পৃ. ৮৯, প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চতুর্থ প্রকাশ, রমযান ১৪০২ হি. মোতাবেক জুন ১৯৮২ খৃ.)।

এই হল ঘটনা। 'এগারো শত শতাব্দী' নামে আল-বেরুনীর কোনো গ্রন্থ নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশনও তা অনুবাদ করায়নি। 'আল-বেরুনী' নামে আল-বেরুনীর জীবনী বিষয়ে লেখা বইটি এম আকবর আলী সাহেবের রচনা। যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে মাত্র। আর 'এগারো শত শতাব্দী'র রহস্য হচ্ছে, যেমনটি একটু আগেই বলা হয়েছে- আল-বেরুনীর গ্রন্থ 'আত-তাফহীম লি আওয়া-ইলি সিনাআতিত্ তানজীম', যা ৪২০ হি: মোতাবিক ১০২৯ খৃষ্টাব্দে রচিত- এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে আত-তাফহীমের ইংরেজি অনুবাদক র‌্যামসে রাইট তার অনূদিত বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, এই গ্রন্থটিকে বিজ্ঞান বিষয়ে এগারো শত শতাব্দীর প্রথম পুস্তক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এখন দেখুন 'চন্দ্রকলা'-এর লেখক অথবা যার বরাতে তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তিনি কথা কোত্থেকে কোথায় নিয়ে গেছেন?!

এ পর্যন্ত তো ছিল তার মামলা। কিন্তু আসল বিপদ যেটা তৈরি হয়েছে সেটা

আকবর আলী মরহুমের অসতর্কতার কারণে। তিনি আল-বেরুনীর ভাষ্যে رؤية الأهلة (নতুন চাঁদের দর্শন) শব্দবন্ধের প্রতি লক্ষ করেননি। ইংরেজি অনুবাদে 'নিউমুন' শব্দ দেখে তিনি একে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় 'নিউমুন' মনে করে অমাবস্যার কথা লিখে দিয়েছেন। ব্যস, এই বিচ্যুতিকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এখন নিজের জন্য رأس المال (মূলধন) গণ্য করছেন।

পাঠকগণ আল-বেরুনীর মূল ভাষ্য লক্ষ্য করুন : আল্লামা আবুর রায়হান মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-বেরুনী (৩৬২ হি. -৪৪০ হি. মোতাবেক ৯৭৩ খৃ.-১০৪৮ খৃ.) নিজেই 'কিতাবুত্ তাফহীম'টি রচনা করেছেন দুই ভাষায়; আরবীতে এবং ফারসীতে। প্রথমে ফারসী বক্তব্য দেখুন। মুহাররম থেকে যিলহজ্ব এই বারোটি ইসলামী মাসের নাম তালিকার প্রথম ছকে উল্লেখ করেছেন। ছকের শুরুতে লিখেছেন,

ماه ہائے عرب اندر اسلام قمری اند واین تقدیر میانہ است

এখানে তিনি বলেছেন, ইসলামী আরবী মাসসমূহ চন্দ্রনির্ভর। এরপর ছকের শেষে লিখেছেন :

بدیدار ماہ نو بکار دارند، واندر آں ہیچ کبیسہ ونسیئ بکار نیست، وعدد روزگار سال سیصد وپنجاه وچہار روزاست

অর্থাৎ 'এগুলোর সম্পর্ক নতুন চাঁদ দেখার সাথে। এতে কোন কবিসা (মলমাস/অধিমাস) নেই। বছরে সর্বমোট দিন সংখ্যা তিনশ' চুয়ান্ন।' (আত-তাফহীম লি-আওয়া-ইলি সিনাআতিত-তানজীম' আবু রায়হান বেরুনী, মুদ্রণ ১৩১৬ হি.)

এখন দেখুন আরবী ভাষ্য। ছকের শুরুতে লিখেছেন,

"شهور العرب في الإسلام، وهي قمرية، بالتقدير "

বলছেন,ইসলাম-উত্তর আরবের মাসসমূহ চন্দ্রনির্ভর। আর ছকের শেষে লিখেছেন,

"يستعمل برؤية الهلال ولا يستعمل فيها شيء من النسيئ، وعدد أيامها 354 يوما "

(এই মাসসমূহ)-এর ব্যবহার চাঁদ দেখার মাধ্যমে। এতে মলমাসের নিয়ম মোটেও নেই। এর সর্বমোট দিন তিনশ' চুয়ান্ন'। (আত-তাফহীম লি-আওয়াইলি সিনাআতিত্ তানজীম, (লন্ডন, ১৯৩৪ খৃ.) পৃ. ১৬৬)২

প্রফেসর র‌্যামসে রাইট এই বক্তব্য-ভাষ্যের অনুবাদ করেছেন, They work entirely by the new Moon : do not intercalate and have 354 days in the year.3

এই অনুবাদে এম. আকবর আলী সাহেব 'নিউমুন' শব্দ দেখে এই শব্দের প্রচলিত অর্থ বাদ দিয়ে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় 'নিউমুন'-এর দিকে চলে গিয়েছেন। আর সেটারই তরজমা করেছেন 'অমাবস্যা'। (এই ক্ষেত্রে অনুবাদক র‌্যামসেরও ত্রুটি আছে। একে তো তিনি 'ক্রিসেন্টমুন'-এর জায়গায় 'নিউমুন' লিখেছেন; অথচ প্রথম শব্দটিই পরিষ্কার এবং যথার্থ ছিল। তার ওপর رؤية বা 'দেখা' কথাটি একদমই গায়েব করে দিয়েছেন)। আল-বেরুনীর লেখায় 'হিলাল'-এর কথা রয়েছে, অমাবস্যা নয় এবং তিনি رؤية বা দেখা শব্দটি স্পষ্ট করেই লিখেছেন : يستعمل برؤية الهلال। র‌্যামসে যদি তার অনুবাদে 'দেখা' কথাটি ফেলে না দিতেন তাহলে আকবর আলী সাহেব শুধু 'নিউমুন'-এর ধাঁধার কারণে বিভ্রমে পড়তেন না।

তালিকার দ্বিতীয় ছকে আল-বেরুনী ইসলাম-পূর্ব আরবদের মাঝে প্রচলিত মাসমূহের নাম লিখেছেন। সেখানে নোট দিয়েছেন, (ফারসী) تازیان آنرا نسیئ همی کردند بنوبت ودیدار ازماه همی داشتند زیرانکه شمار نمی دانستند

আরবী ভাষায় : " كانت منسأة لنوبة في الشهور برؤية الأهلة، إذ لم يكونوا يعرفون حسابا."

এখানে তিনি বলছেন, এরা মলমাস ধরতো। কিন্তু আবার নতুন চাঁদও দেখতো কেননা এরা হিসাব গণনা জানতো না। র‌্যামসে রাইট এ বাক্যের অনুবাদ করেছেন : : They practised intercalation, Judging when necessary by The position of The Moon. They were ignorant of calculation.

এই অনুবাদে একদিকে তো 'হিলাল' এবং 'দেখ' ড়দু'টোরই রফাদফা করে ছেড়েছেন। আবার এ জায়গায় নিজের তরফ হতে 'পজিশন'-এর ব্যাপার জুড়ে

দিয়েছেন। যে কারণে বক্তব্যের শুরু ও শেষে স্ববিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছে।

মোটকথা, এম. আকবর আলী সাহেব যেহেতু মূল আরবী এবং ফারসী আত-তাফহীম থেকে সাহায্য নিতে পারেননি, সেজন্য র‌্যামসের অস্পষ্ট এবং ত্রুটিযুক্ত তরজমার কারণে তিনি লিখে দিয়েছেন যে, অমাবস্যা থেকে মাস শুরু হয়'!! তিনি চিন্তাই করেননি যে, আল- বেরুনী কীভাবে এই গলদ কথা লিখতে পারেন। আল-বেরুনীর আসল ভাষ্য পড়ে নেয়ার পর আশা করি ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক প্রকৃত সত্যকে মেনে নিবেন এবং আল-বেরুনীর দিকে সম্পৃক্ত করে না-হক কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন।

আল-বেরুনীর আরো কিছু ভাষ্য:

হিলাল এবং অমাবস্যা- দু'টো আলাদা জিনিস। ইসলামী মাস আরম্ভ হয় হিলাল দেখে; অমাবস্যার সময় থেকে নয়। কিংবা গণনার মাধ্যমে চাঁদের অবস্থান জানার মাধ্যমেও নয়। এবিষয়ে পাঠক ইতোমধ্যে আল-বেরুনীর বেশ কিছু বক্তব্য-ভাষ্য পড়ে ফেলেছেন। এখানে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আরো কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

১.'আত-তাফহীমে'র এক জায়গায় আল-বেরুনী চাঁদের সবগুলি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন,

" القمر يستهل بالعشيات في أول الشهر، ويرى هلالا ضئيلا في المغرب، ولا يزال يزداد بعده عن الشمس..."

অর্থাৎ মাসের শুরুতে চাঁদ সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে দৃশ্যমান হয় এবং প্রথমে তা শীর্ণকায় হিলালের আকারে দেখা যায়। এরপর তা সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে এবং তার আলো বৃদ্ধি পেতে থাকে...।

আল-বেরুনী তাঁর আলোচনা অব্যাহত রেখে চাঁদের অন্যান্য পর্যায়গুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন,

" إلى أن يعود إلى صورة الهلال الأول الدقيق في جهة المشرق بالغداوات، والنور منه في جميع الأحوال في الجانب الذي يلي الشمس، ثم يستتر بعد ذلك بشعاع الشمس، فيسمى مدة استتاره سرارا لذلك، ومحاقا لمحاق الضوء فيه إلى أن يعود إلى صورة الهلال في المغرب بالعشي. ويجتمع مع الشمس في وسط هذه المدة، يسمى ذلك اجتماعا مطلقا."

অর্থাৎ চাঁদ (তিথির পর তিথি অতিক্রম করতে করতে) অবশেষে পূর্ব দিকে ভোরবেলায় আগের সেই চিকন হিলালের আকৃতিতে ফিরে আসে। সর্বাবস্থায় চাঁদের ঐ অংশই আলোকিত থাকে, যেটা সূর্যের সামনে থাকে। এরপর চাঁদ সূর্যের আলোকরশ্মির মাঝে প্রবেশ করে (অর্থাৎ সূর্যের আলো যখন চাঁদের ঐ পৃষ্ঠে পড়ে যা সূর্যের দিকে থাকে এবং অপর পৃষ্ঠ যাতে তখন কোন আলো পড়ে না সেটা থাকে পৃথিবীর দিকে। ফলে তা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।)। তার এই আড়ালে থাকার সময়কে তাই 'সিরার' বলা হয়। (কারণ সিরার অর্থ লুকায়িত থাকা) এবং এই সময় চাঁদের আলো সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় একে 'মিহাক' বলা হয় (কেননা মিহাক অর্থ, কোনো কিছু ক্ষয় হয়ে যাওয়া অথবা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়া। امحق القمر বলা হয় যখন চাঁদ আলোহীন হয়ে যায়)। অতপর চাঁদ আবার পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যায় হেলালের আকারে ফিরে আসে। (উল্লেখ্য,) মিহাকের সময়ের মাঝামাঝিতে এসে সূর্যের সাথে চাঁদের সম্মিলন ঘটে, যাকে বলা হয় ইজতিমা (conjunction)। (আত-তাফহীম পৃ. ৬৫)

বোঝা গেল, আল-বেরুনী অমাবস্যাকে অস্বীকার করেন না। তিনি অমবস্যার দুটি আরবী নাম বলেছেন। একটি সিরার। অপরটি হল মিহাক। তিনি আরো বলেছেন যে, অমাবস্যা চলাকালে সূর্য ও চন্দ্রের মিলন ঘটে। যেখান থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের চান্দ্রমাস গণনা আরম্ভ করে। হিলাল অমাবস্যা থেকে আলাদা জিনিস। হিলাল তো অমাবস্যার স্তর পার হয়ে আসার পর 'ক্রিসেন্ট' (ধনুক)-এর আকৃতিতে সূর্য ও শীর্ণকায় অবস্থায় সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিমাকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। ইসলামের অনুসারীরা এই হিলাল থেকেই নিজেদের চান্দ্রমাস গণনা আরম্ভ করে।

আল-বেরুনী বলেন,

ড়.২ (... ، ولكنها (أي شهور اليهود مع شهور العرب) [1] لا تتلازم في الأسامي فإنها غير مكبوسة وشهور اليهود مكبوسة، وكذلك شهور الهند مع شهور العرب، ولا تزال تتقدم أوائلها، لأنها محبوسة من اجتماع النيرين، شهور الهند تلازم شهور اليهود....)

অর্থাৎ ইহুদীদের মাস মুসলমানদের মাসের সাথে নামে নামে মিল থাকে না। কারণ মুসলমানরা মলমাস গণনা করে না। কিন্তু ইহুদীরা গোনে। হিন্দুদের মাসের অবস্থাও মুসলমানদের মাসের সাথে এমনই; (অর্থাৎ নামে নামে মিল থাকে না, তাছাড়া) তাদের মাসের সূচনা হয় আগে। কারণ তাদের মাস গণনা আরম্ভ হয় ইজতিমা (অমাবস্যার মধ্যে চাঁদ ও সূর্য একই রেখায় এসে যাওয়ার সময়, যাকে ইংরেজিতে বলে conjunction) থেকে। (আত-তাফহীম পৃ. ১৬৮)। অন্যদিকে

ইসলামী মাসসমূহ সম্পর্কে আল-বেরুনীর বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে পড়ে এসেছি যে-

৩. হিজরী তারিখের ভিত্তি চান্দ্রবর্ষের উপর। হিলাল (নতুন চাঁদ) দেখার উপর তা নির্ভরশীল। হিসাব গণনার উপরে নয়। সমস্ত মুসলমানের আমল এই তরিকা মোতাবেকই। ('আলআছারুল বাকিয়া আনিল কুরুনিল খালিয়া' আল-বেরুনী পৃ. ৩১) আল-বেরুনীর এই বক্তব্যও গত হয়েছে-

৪. 'আরবগণ হিলাল দেখে মাস আরম্ভ করে। ইসলামে এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ (আল-আছারুল বাকিয়া পৃ. ৬৪)।

তাঁর এই বক্তব্যও গিয়েছে যে, ইহুদী-খ্রিস্টানরা তো পূর্ব-প্রস্তুতকৃত ক্যালেন্ডার দিয়ে মাসের হিসাব বের করে এবং এর মাধ্যমেই তাদের রোযার সময় অবগত হয়ে থাকে। অন্যদিকে-

৫. 'মুসলমান হিলাল দেখতে বাধ্য এবং এ অনুসন্ধানও তাদের জন্য অপরিহার্য যে, চাঁদ আলো গ্রহণপূর্বক তার কোনো অংশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর্যায়ে এসেছে কি?' (আল-আছারুল বাকিয়া পৃ. ৬৪)।

আল-বেরুনী রাহ.-এর এসব বক্তব্য থেকে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল, হিলাল আর অমাবস্যা এক জিনিস নয়। তিনি এও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, অমাবস্যার মাঝখানে সংঘঠিত conjunction থেকে চান্দ্রমাস শুরু করে হিন্দুরা। আর হিসাবের মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতকৃত ক্যালেন্ডার দিয়ে রোযার তারিখ ঠিক করে ইহুদী-খৃস্টানরা। এদের সকলের বিপরীতে মুসলিম উম্মাহ কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক হিলাল দেখে চান্দ্রমাস শুরু করে।

আল-বেরুনী রাহ.-এর কিতাব 'তাহকীকু মা লিল হিন্দি মিন মাকুলাতিন মাকবূলাহ ফিল আকালি আও মারযূলাহ'-এর ইংরেজি অনুবাদ 'আল-বেরুনী ইজ ইন্ডিয়া' নামে এবং বাংলা অনুবাদ 'আল-বেরুনীর ভারততত্ত্ব' নামে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অনুবাদের সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক সময় অনেককে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। বিশেষত পাঠকের মধ্যেও যদি সাধারণ জ্ঞানের অভাব, তথ্যের স্বল্পতা, সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের সাথে অপরিচিতি এবং কোনো মতের ব্যাপারে

বিশেষ পক্ষপাতিত্বসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তার মাঝেও আগে থেকেই হাযির থাকে তাহলে তো কথাই নেই!

'আল-বেরুনীর ভারততত্ত্ব' পঁয়ত্রিশতম পরিচ্ছেদের (পৃ ২০৯) প্রথম বাক্যটি এই : 'প্রাকৃতিক মাস হচ্ছে চন্দ্রের এক সংযোগ (অমাবস্যা) থেকে অন্য সংযোগ পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ'।

কেউ যদি কেবল এই একটি বাক্য পড়ে, সামনের কথাগুলো আর না পড়ে, মূল আরবী কিতাব খুলে না দেখে এবং আল-বেরুনীর অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন না করে তাহলে খুবই সম্ভব যে, সে এই একটি বাক্যের সূত্র ধরে ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের মত এটাই বুঝতে শুরু করবে যে, আল-বেরুনীর দৃষ্টিতে চান্দ্রমাস এক অমাবস্যা থেকে আরম্ভ হয় এবং আরেক অমাবস্যায় গিয়ে সমাপ্ত হয়। কিন্তু অসম্পূর্ণ অধ্যয়ন এবং বোঝার অসম্পূর্ণতার কোনো চিকিৎসা আমাদের কাছে নেই! এখানে তো উল্লেখিত বাক্য দিয়ে আল-বেরুনীর কথা আরম্ভ হয়েছে, সামনে গিয়ে তিনি এই বক্তব্যের বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি বলেন-

৬. " كذلك نور القمر في جرمه على هذا النهج إذا بدا من المحاق هلالا ثم قمرا ثم بدرا، وتراجع منه كذلك إلى السرار الذي هو كالعدم بالإضافة إلى الحس"

এতে তিনি চাঁদের অমাবস্যা থেকে হিলালের আকারে আত্মপ্রকাশ করাকে সূচনা সাব্যস্ত করেছেন। অতপর পুনরায় অমাবস্যার মাঝে অন্তরীণ হওয়াকে সমাপ্তি বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। (দেখুন, 'তাহকীকুল মা লিল হিন্দ' আল-বেরুনী : পৃ. ২৯১, পরিচ্ছেদ : ৩৫, দাইরাতুল মাআরিফিল উছমানিয়া, হায়দারাবাদ, হিন্দুস্তান থেকে প্রকাশিত ১৩৭৭ হি. মোতাবিক ১৯৫৮ খৃ.)।

৭. "ثم كان الشهر بنور القمر ناشيا وبالغا النهاية، ثم منحطا وممحقا، وعلى عدة الأيام مشتملا."

এতে বলেছেন, মাসের শুরু হয় চাঁদের রোশনি থেকে। এভাবে একসময় তা পূর্ণিমার আকারে রোশনির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারপর আবার হ্রাস পেতে পেতে অমাবস্যায় উপনীত হয়। (আল-কানূনুল মাসউদী, আল-বেরুনী ১/৬৭ পৃ. পঞ্চম অধ্যায়, হায়দারাবাদ প্রকাশিত ১৩৭৩ হি. মোতাবিক ১৯৫৪ খৃ.)

৮. " كما أن الشهر هو من أي شكل فرض للنور في القمر إلى مثله قدرا ووضعا، والمبدأ المتفق عليه من الهلال الغربي، لأنه كالوجود بعد العدم، وخروج المولود من الظلم."

তিনি বলছেন, চাঁদের আলোকিত অবয়বসমূহের মধ্য হতে কোনো একটি অবয়ব থেকে আরম্ভ করে সেই অবয়বে পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত সময়কে মাস গণনা করা যেতে পারে। কিন্তু যেই সূচনার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে সেটা হল পশ্চিম আকাশের হিলাল। কেননা তা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর আবার অস্তিত্ব লাভেরই মত এবং অন্ধকার থেকে নবজাতকের বেরিয়ে আসার মত। (আল-কানুনুল মাসউদী, আল-বেরুনী ১/৬৮)।

আল্লামা আবু রায়হান মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-বেরুনী তাঁর এই অতি মূল্যবান গ্রন্থ আল-কানূনুল মাসউদীর অষ্টম প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দর্শনযোগ্য নতুন চাঁদের অবস্থান ও স্থান সনাক্ত করার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এ থেকে কারো এই ভুলবোঝার সম্ভাবনা ছিল যে, তিনি বোধহয় হিলাল দেখার পরিবর্তে হিসাবের আলোকে কেবল দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাকে ভিত্তি বলে গণ্য করতে চাচ্ছেন। অতএব তিনি এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে একটি নোট সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যাতে এরকম কোনো ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়। তিনি লিখেছেন,

৯. "الفصل الثاني في سمت الهلال أحكام الشهور في الإسلام من الحج والصيام راجعة إلى رؤية الهلال، فهي إذن من أجل ما يصرف إليه الإهتمام، وهي وإن فرضت برؤية العيان دون الحساب الذي ماله إلى الاعتبار والامتحان، فشتان بين من يحوم في طلبه حول موضعه وبين من يجيل بصره في آفاق السماء ويطلبه في الظلام..."

এতে বলেছেন, ‘ইসলামে মাসসমূহের বিধান হজ ও সিয়াম যেহেতু হিলাল দেখার সাথে সম্পৃক্ত তাই হিলালের দিক নির্ধারণের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এসমস্ত ইবাদত যদিও হিলালকে চোখে দেখার ভিত্তিতে ফরয করা হয়েছে, হিসাবের ভিত্তিতে নয়, তথাপি হিলাল দেখার সুবিধার জন্য তার সম্ভাব্য অবস্থান ও স্থান সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার। একজন নির্ধারিত স্থানের আশেপাশে হিলাল তালাশ করছে আরেকজন আন্দাযে চারদিকে কেবল দেখে বেড়াচ্ছে- দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে...’।

সামনে এ বিষয়ের মূলনীতি উল্লেখের পর লিখছেন,

১০. "و إذا نصب على الهلال كما وصفنا ثم نظر الناظر إليه من طرفه الأسفل إلى ما يسامته من السماء لم يخف فيه الهلال الممكن الرؤية، و إذا أدركه منه نفر انعقد برؤيتهم أحكام الشريعة."

এ বক্তব্যের সারমর্ম হল, যদি উপরিউক্ত পন্থায় হিলাল তালাশ করা হয় তাহলে

দর্শনযোগ্য হিলাল ইনশাআল্লাহ এতে দৃষ্টির অগোচর থাকবে না। এখন এ অবস্থায় যদি কিছু মানুষ হিলাল পেয়ে যায় তাহলে তাদের দেখার ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (আল-কানূনুল মাসউদী ১/৯৬৪)।

মুহতারাম ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হক সাহেব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীনকালের মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানের প্রতি ইঙ্গিত করে তাদের নামের সংক্ষিপ্ত সূচী দিয়েছেন। যা তার বইয়ের পৃ. ৭৭, পর্ব ৪৮-এ রয়েছে। ঐ সূচীতে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে আল-বেরুনী রাহ.-এর নাম উল্লেখ করেছেন। আল-বেরুনী রাহ. জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহ এবং ফিকহ শাস্ত্রেও প্রাজ্ঞ ছিলেন। সেজন্য আমরা আশা করছি, তাঁর কথাগুলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গুরুত্বের সাথে পড়বেন এবং তাঁর কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সকল কল্যাণ কাজের তাওফীক দান করুন এবং সবরকম অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

(পরবর্তী শিরোনাম: ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কর্তৃক 'হিলাল' এর বিকৃতি সাধন ও তার খণ্ডন। যা ইনশাআল্লাহ যিলহজ্ব ১৪৩৬ হিজরী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।)

---

[1] قال الراقم : المراد بالعرب في كلامه هنا الأمة المسلمة، كما هو مصرح في عبارته هذه في "التفهيم" الفارسي له، فانتبه. انتهى قول الراقم

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

অক্টোবর ২০১৫, যিলহজ্ব ১৪৩৬

‘চান্দ্রমাস’ : একটি পর্যালোচনা-৪

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হিলালের বিকৃতি এবং একসাথে বহু বিভ্রান্তি

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এই দাবীর স্বরূপ তো প্রত্যক্ষ করেছেন যে, আয়াত ২ : ১৮৯-এর তরজমা ও তাফসীর (মাআযাল্লাহ) মুতারজিম ও মুফাস্সিরগণ বোঝেননি কিংবা পেশ করতে পারেননি; কেবল ইঞ্জিনিয়ার সাহেবই তা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন এবং পেশ করতে সমর্থ হয়েছেন!

পাঠকগণ দেখেছেন, এটা তার নিছক দাবী, বাস্তবতার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এবং এই বিষয়টিও পাঠকবর্গ লক্ষ্য করেছেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে সংস্কারের স্বপ্ন দেখছিলেন, তথা আয়াত ২ : ১৮৯-এর তরজমা কিনা তিনিই শুধরে দিয়েছেন এ শুধু তার আত্মতৃপ্তি। তার এই স্বপ্ন পৃথিবীর সবচে’ ব্যর্থ ও অবাস্তব স্বপ্নগুলোর একটি। হাকীকত হল, তরজমার যেটুকু তিনি সঠিক লিখেছেন তা পূর্ববর্তীদের লেখাতেও আছে। আর যা কিছু ভুল কথা লিখেছেন সেটা তার নিজের আবিষ্কৃত। তো নতুন ভুলের সূচনা করার নাম যদি হয় সংস্কার তাহলে নিঃসন্দেহে, তিনি একটি সংস্কার কর্মই আঞ্জাম দিয়েছেন বটে। এ নিয়ে যদি তিনি আনন্দিত হতে চান তবে সেটা

তার মর্জি। (দেখুন, আলকাউসার, যুমাদাল উলা ও যুমাদাল উখরা সংখ্যা ১৪৩৬ হিজরী)

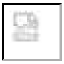
এমনিভাবে আলকাউসার রজব ১৪৩৬ হিজরী সংখ্যায় পাঠকবর্গ এও পড়েছেন যে, অন্যায়ভাবে আল-বেরুনীর নাম ব্যবহার করে যেই দাবী করা হয়েছিল যে, আরবী চান্দ্রমাস অমাবস্যা থেকে শুরু হয়, তা কতটা অবাস্তব। আল-বেরুনী তার অনেক কিতাবে অনেকবার বলেছেন, ইসলামী চান্দ্রমাস অমাবস্যা শেষ হওয়ার পর দর্শনযোগ্য 'হিলাল' (Crescent moon) থেকে শুরু হয়। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, এটাই কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা এবং মুসলমানগণ এ হিসেবেই আমল করেন।

এখন যে কথাটি পেশ করা উদ্দেশ্য, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তরজমা করতে ভুল করেছেন কিংবা জেনে-বুঝে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন শুধু তাই নয়; বরং তিনি আয়াতের উদ্দেশ্য এবং অনুসৃত তাফসীরকেই পাল্টে ফেলেছেন। আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তাআলা হিলালকে মীকাত বানিয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 'হিলালের' অর্থই বদলে দিয়েছেন। যাতে আয়াতের অর্থ এবং তার সাথে সর্ম্পকিত বিধানসমূহ পরিবর্তনে আলাদা কসরত করতে না হয়। তো 'হিলাল'-এর অর্থ পরিবর্তন- এটা এমন এক ভয়াবহ গোমরাহী, যা তার নিজের মধ্যে একসাথে বহু বিকৃতি এবং বহুসংখ্যক বিভ্রান্তিকে ধারণ করে আছে।

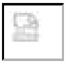
'হিলাল'-এর অর্থ হল অমাবস্যা শেষ হওয়ার পর উজ্জ্বল ধনুকের আকৃতিতে প্রকাশ পাওয়া চাঁদ। যা দেখে ইসলামী মাস আরম্ভ হয় । কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একে বিকৃত করে 'হিলাল'-এর অর্থ বানিয়েছেন 'অমাবস্যা' বা 'অমাবস্যার চাঁদ'। এ হচ্ছে সকালকে সন্ধ্যা এবং দিনকে রাত বানানোর মতো ব্যাপার।

চাঁদের ক্রমাগত তিথি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মাসে চাঁদ বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় অতিক্রম করতে থাকে। চাঁদের যেই পৃষ্ঠ

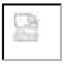
পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে, তার আলোকিত অংশ বাড়তে-কমতে থাকে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে চাঁদের আকারের যে পরিবর্তন হয় তাকে ইংরেজীতে বলা হয় Phases of the moon আর বাংলায় চাঁদের কলা। চাঁদের কলাসমূহের কয়েকটি এই:

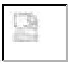
১)  الهلال বহুবচন أهلة । অর্থাৎ দর্শনযোগ্য চিকন চাঁদ বা বাঁকা চাঁদ।

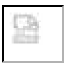
অমাবস্যা শেষ হওয়ার পর চাঁদ যখন পৃথিবী থেকে দর্শনযোগ্য হয়। তখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশে চাঁদের যেই চিকন অংশ উজ্জ্বল ধনুকাকৃতিতে দেখা যায় তাকে ‘হিলাল’ বলা হয়। ইংরেজীতে এর নাম Crescent moon|

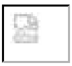
২)  التربيع الأول First Quarter বাংলায় অর্ধচন্দ্র।

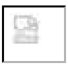
৩)  المحدودب المتزايد Waxing Gibbous বাংলায় অর্ধাধিক।

৪)  البدر Full moon বাংলায় পূর্ণিমা।

৫)  المحدودب المتناقص Waning Gibbous

৬)  التربيع الأخير Last Quarter

৭)  الهلال الزائل Waning crescent

৮)  المحاق Interlunar period বাংলায় অমাবস্যা। [1]

কুরআন ‘হিলাল’কে (১ নং কলা) মিকাত বানিয়েছে অর্থাৎ ইসলামী

মাস গণনা হিলালের মাধ্যমে শুরু করার শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন, ইসলামী মাস ‘হিলাল’ থেকে নয়, অমাবস্যা (৮ নং কলা) থেকে শুরু হবে। যে কেউ-ই বুঝতে সক্ষম যে, এ কথা কুরআন-বিরুদ্ধ। কুরআন তো ‘হিলাল’কে মিকাত বানিয়েছে, ‘মিহাক’ বা অমাবস্যাকে নয়। এ জন্যই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কৌশলে হিলালের অর্থই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। বলেছেন, ‘হিলালে’র অর্থ দর্শনযোগ্য চিকন চাঁদ নয়, এর অর্থ হল অমাবস্যা!!

চাঁদের অর্থ বিকৃতি সাধনে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই ছুতা পেয়ে গেলেন যে, কুরআন ও হাদীসের অনেক ইংরেজী অনুবাদে ‘হিলালে’র অর্থ ‘নিউমুন’ বলা হয়েছে। আর তিনি কোন ইংরেজী থেকে বাংলা অভিধানে ‘নিউমুনে’র অর্থ পেয়ে গেলেন অমাবস্যা। ব্যস, দু’টিকে মিলিয়ে তিনি এই আজগবি দাবী করে বসলেন, ‘হিলালে’র অর্থ হল অমাবস্যা।

অথচ ইংরেজীতে ‘নিউমুনে’র সাধারণ ব্যবহার হল দর্শনযোগ্য চিকন চাঁদ বা Crescent moon -এর অর্থে। এটাই ‘নিউমুনে’র আভিধানিক অর্থ। এটাই তার পুরাতন ও মূল অর্থ। তবে এস্ট্রোনমির পরিভাষায় চাঁদের সংযোগ অবস্থা বা Conjunction কে ‘নিউমুন’ বলা হয় । অমাবস্যার সময় চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী যখন একই রেখায় অবস্থান করে এবং চাঁদ উভয়ের মাঝে থাকে, তখন চাঁদের আলোকিত অংশ সূর্যের দিকে থাকে এবং অন্ধকার অংশ পৃথিবীর দিকে থাকে। চাঁদের এই সংযোগ অবস্থাকে আরবীতে বলে ইকতিরান বা ইজতিমা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চান্দ্রমাসের শুরু যেহেতু ইকতিরান বা সংযোগ অবস্থাকে সাব্যস্ত করেন, তাই একে তারা ‘নিউমুন’ বলেন। বুঝা গেল, এটা এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন যা আভিধানিক ও প্রচলিত নিউমুন থেকে ভিন্ন। [2]

নিউমুন -এর মূল ও অনুসৃত অর্থ, যা শত শত বছর ধরে চলে আসছে, তা হচ্ছে এই শব্দের আভিধানিক অর্থ। তবে যেহেতু আজকাল মানুষের মধ্যে নিউমুন শব্দটি এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন

অর্থে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে। এজন্য এখন 'হিলাল' -এর তরজমায় 'নিউমুনে'র চেয়ে 'ক্রিসেন্টমুন' শব্দটি বলাই অধিক শ্রেয়।

যাহোক, ইংরেজী কুরআন তরজমাগুলোতে সাধারণত 'আল আহিল্লাহ' الْأَهِلَّةِ এর অর্থ 'নিউমুনস' লেখা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হলো আভিধানিক এবং প্রচলিত অর্থ। তথা 'ক্রিসেন্টমুন'। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক দ্ব্যর্থবোধক শব্দের সুযোগ নিয়ে মানুষকে এ ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, কুরআনে আল্লাহ তাআলা অমাবস্যার মুহূর্তে শুরু হওয়া নতুন চাঁদ থেকে চান্দ্রমাসের সূচনা করতে আদেশ করেছেন, যা শুধুই হিসাবের মাধ্যমে জানা সম্ভব।

এই অপকর্মকাণ্ডের জন্য তিনি কোন ধরনের ভূমিকা কিংবা কোনোরকম কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। উপরন্তু তিনি বাংলা 'নতুন চাঁদ' ও 'নবচন্দ্র' শব্দদু'টিকে তার বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় সরাসরি অমাবস্যার অর্থে ব্যবহার করেছেন। কখনো বা আরো বেশি দুঃসাহস দেখিয়ে বলেছেন, কুরআন চান্দ্রমাস শুরু করতে বলেছে অমাবস্যা থেকে!! আর কখনো একটু-আধটু ভয় জেগেছে, তাই 'নতুন চাঁদ' ও ' নবচন্দ্রকে' নিজের উদ্ভাবিত অমাবস্যার অর্থে ব্যবহার করে বলেছেন, কুরআন নতুন চাঁদ থেকে চান্দ্রমাস শুরু করতে বলেছে!! তার মনের মধ্যে রয়েছে অমাবস্যার অর্থ। অথচ পাঠকবর্গ ভাবছেন, প্রথম রাতের চাঁদ!!

সারা পৃথিবীতে রোযা ও ঈদ একই দিনে করানোর সার্থে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তো এমনিতেই বহু বিকৃতি ও মিথ্যাকথনের আশ্রয় নিয়েছেন। তার মধ্যে এক নিঃশ্বাসে একই সাথে যে তিনটি বিকৃতি সাধন করেছেন, সেগুলো এই:

১. হিলাল

চাঁদের প্রসঙ্গে এর একমাত্র অর্থ, ক্রিসেন্টমুন। উদ্দেশ্য, অমাবস্যা

শেষ হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে দর্শনযোগ্য চিকন চাঁদ। একে বিকৃত করে তিনি বানিয়েছেন অমাবস্যার চাঁদ!!

২. নিউমুন

আয়াত ২ : ১৮৯-এর তরজমায় ইংরেজী অনুবাদকগণ এই শব্দকে আভিধানিক এবং প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ক্রিসেন্টমুন, চান রাতের চাঁদ। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একে এস্ট্রোনমিক্যাল 'নিউমুনে' পরিণত করেছেন!!

৩. নতুন চাঁদ, নবচন্দ্র

বাংলা ভাষায় এই দুই শব্দের অর্থ একটাই। তথা অমাবস্যা-পরবর্তী প্রথম রাতের চাঁদ। কিন্তু একেও তিনি অমাবস্যা বানিয়ে ফেলেছেন!!

বিকৃতির উপর ভর করে তিনি খুবই নির্লজ্জভাবে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর কালাম সম্বন্ধে পুরো বইয়ে বারবার এই মিথ্যা বলে গিয়েছেন যে, কুরআন হিসাবের মাধ্যমে, অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া নতুন চাঁদ থেকে চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে বলেছে! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এবার এই ভয়ঙ্কর বিকৃতির শিকার তার কিছু বক্তব্য, (লা হাওলা পাঠ করে) দেখুন:

১. বইয়ের পর্ব ৪৪ এ 'বাংলাদেশের চান্দ্রমাস গণনা ভুল হয়' শিরোনামের অধীনে চান্দ্রমাসের হিসাবের একটি নকশা দিয়েছেন। ওখানে অমাবস্যার সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছেন যে, প্রকৃত চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখ এটিই।

এরপর অমাবস্যার পরবর্তী দিনকে সৌদী আরবের প্রথম তারিখ এবং তারপরবর্তী দিনকে বাংলাদেশের প্রথম তারিখ দেখিয়েছেন। এরপর নোট লিখেছেন,

"অমাবস্যার মাঝখানে শুরু হওয়া নতুন চাঁদ ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পৃথিবী থেকে ১২ ঘণ্টা পরে ছাড়া খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়, বিধায় আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী (২ : ১৮৯) হিসাবের মাধ্যমে নতুন চাঁদ দিয়ে মাস শুরু করতে হবে। তাহলেই কেবল মাসের ১৪/১৫ তারিখে পূর্ণিমা পাওয়া যাবে এবং ২৯/৩০ তারিখে অমাবস্যা হবে।" (চান্দ্রমাস, পৃ. ৭১, নবম সংস্করণ)

আরেক জায়গায় লিখেছেন,

নতুন চাঁদের বয়স ১২ ঘণ্টার বেশি না হলে কখনো খালি চোখে দেখা যাবে না। তাই আল্লাহর হুকুম মোতাবেক হিসাবের মাধ্যমেই নবজাতক চন্দ্র দিয়ে চান্দ্রমাস শুরু করতে হবে। (চান্দ্রমাস, পৃ. ৬৩)

২. পর্ব নম্বর ৫৮ তে 'খালি চোখে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে হবে না কেন? শিরোনামে লিখেছেন,

"১৭। খালি চোখে দেখা আরবদের নতুন চাঁদ আর তৃতীয় বৎসরের অতিরিক্ত মাস গণনা, এর কোনটাই আল্লাহ গ্রহণ করেননি।

১৮। তাই অমাবস্যার মাঝখানে শুরু হওয়া অদেখা ১২ টা নতুন চাঁদ দিয়ে আল্লাহ ১২ টা চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে বলেছেন (২ : ১৮৯) এবং তৃতীয় বৎসরের অতিরিক্ত মাস হিসাব করতে নিষেধ করেছেন (৯ : ৩৬, ৩৭)।

১৯। তাই ১২ টা নতুন চাঁদ দিয়ে হিসাবের মাধ্যমে ১২ টা চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে হবে; খালি চোখে দেখে মাস শুরু করা যাবে না।" (চান্দ্রমাস, পৃ. ৯৭, পর্ব ৫৮)

আরবরা ফিতরি (স্বভাবগত) তরীকা মোতাবিক চান্দ্রমাস আরম্ভ করতো চাঁদ দেখে। তাদের এই তরীকা সঠিক ছিলো। ইসলাম তা গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মোতাবিক আমল করেছেন এবং উম্মতকে আমল করতে আদেশ

করেছেন। এই বিষয়ে সহীহ এবং মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত) হাদীসসমূহ আমরা পড়েছি।

হজ্বের সম্পর্ক যিলহজ্ব মাসের সঙ্গে। যা কিনা হিলালের উপর নির্ভরশীল চান্দ্রমাস। সে জন্য হজ্বের মৌসুম যথারীতি পরিবর্তন হতে থাকে। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের মস্তিষ্কে এই কুফুরি চিন্তা সওয়ার হয়েছিলো যে, তারা হজ্বের মৌসুমকে ফিক্সড (নির্ধারিত) করে দিবে। অতএব তারা ইহুদীদের কাছ থেকে نسیء :বিলম্বিতকরণ / মলমাস গণনার ধারা শিখে নেয়। যার একটি তরীকা ছিল এই যে, প্রতি তিন চান্দ্রবৎসর অন্তর অন্তর একটি মাস যোগ করে দেয়া হতো। এর ফলে হজ্বের মৌসুম তো ফিক্সড / সুর্নিধারিত হয়ে যেতো, কিন্তু স্বভাবতই এর দ্বারা হজ্বের প্রকৃত তারিখ পাল্টে যেতো। সূরা তাওবায় ৯ : ৩৬-৩৭ মাস বিলম্বিত করণকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যে কারণে ইসলামী পর্বগুলোতে এর কোন অস্তিত্ব বা কোনোরূপ প্রভাব নেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব (আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ বিবেক এবং সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত নছীব করেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে আরবের মুশরিকদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তো আরবের মুশরিকদের তরীকা (হিলাল দেখে মাস আরম্ভ) গ্রহণ করেননি অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মত তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে' তাবেয়ীন- এঁরা কিনা ঐ তরীকাই অবলম্বন করলেন। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যেই তরীকা বাতিল করে হিসাবের সাহায্যে অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া অদেখা চাঁদ থেকে মাস শুরু করতে হুকুম করেছেন; এঁরা আল্লাহর নিদের্শিত সেই পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ কর্তৃক পরিত্যক্ত পন্থাই গ্রহণ করেছেন!!

এই হল আমাদের টি এন্ড টি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সেই সংস্কার, যা নিয়ে তিনি গর্বিত। এবং যেই কীর্তির জন্য তিনি জাফরী সাহেব এবং আল-মারূফ সাহেবের স্তুতি বাক্যও পেয়ে যান (?!) ইন্না লিল্লাহি ওয়া

ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

জানি না, মানুষ কোন কিছু না পড়ে তার উপর প্রশংসাবাণী কীভাবে লেখে?! [3]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত ২ : ১৮৯-এর ব্যাখ্যা তো করেছেন 'চাঁদ দেখা' দিয়ে। আর তাঁর কৃত ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার শেখানো বয়ান (১৯ : ৭৫)। অথচ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব শুধু 'দেখা' কে 'হিসাব' দিয়ে পরিবর্তন করে দিচ্ছেন তাই নয়; বরং 'হিলালকেই' 'মিহাকে' (অমবস্যায়) পর্যবসিত করেছেন (?!) আয়াত ২ : ১৮৯-এর এই ভয়ানক বিকৃতি পর্যন্তই তিনি থেমে থাকেননি; বরং আরো বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি এই আয়াতের বিকৃতি সাধন করেছেন। সম্ভব হলে সামনে এ বিষয়েও কিছু কথা পেশ করা হবে।

আরো শুনুন তিনি কী বলেছেন,

৩. 'আরব দেশে রাসূল (সা.) এর জন্মের পূর্ব হতেই খালি চোখে দেখা নতুন চাঁদ দিয়ে চান্দ্রমাস আরম্ভ করা হতো। রাসূল (সা.) সেটাকে অনুসরণ করেছেন মাত্র। কিন্তু কোন হাদীস দিয়ে সেটাকে সমর্থন দিয়ে যাননি। কারণ কোরআন তা বলে না। অতএব, হিসাবের মাধ্যমে অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া নতুন চাঁদ দিয়েই চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে হবে। তাহলেই কেবল 'একক প্রকৃত বিশ্বহিজরী ক্যালেন্ডার' পাওয়া যাবে।' (চান্দ্রমাস পৃ. ২০৬, প্রশ্ন : ৬০-এর উত্তর প্রসঙ্গে আলোচনায়, নবম সংস্করণ)

চিন্তা করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল তো হাদীসই। যদি তিনি একটি তরীকা মোতাবিক আমল করে থাকেন তবে এটাই সেই তরীকার সমর্থন। আর যখন তিনি কোনো একটি তরীকা অনুযায়ী আমল করেছেন তখন এটা অসম্ভব যে সেই তরীকা কুরআনের পরিপন্থী হবে। যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব স্বীকার করছেন

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে চান্দ্রমাস শুরু করতেন সেহেতু তার একথা বলার অধিকার নেই যে, (তিনি এটা তাঁর হাদীস দ্বারা সমর্থন করেননি। কেননা রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল অবশ্য-অনুসরণীয় হাদীস। তাঁর হাদীস কেবল তার বাণী-কথনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। এমনিভাবে তার একথা বলারও অধিকার নেই যে,) 'কুরআন এরকম বলে না। কুরআন অমাবস্যা থেকে চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে বলে'। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ তো কুরআনের শিক্ষা এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা এবং করানো। কুরআন পরিপন্থী আমল করা কিংবা কুরআনের খেলাফ কোনো তরীকা অনুসরণ নয়।

যাই হোক, এই মুহূর্তে আসলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বক্তব্য নিয়ে পর্যালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি দেখাতে চাচ্ছিলাম যে, তিনি পরিষ্কার ভাষায় দাবী করেছেন যে, কুরআন অমাবস্যার চাঁদ থেকে মাস আরম্ভ করতে বলেছে। হিলাল দেখার পরে নয়। তার এই দাবীর মধ্যে একই সাথে অসংখ্য বিভ্রান্তি লুকিয়ে আছে:

প্রথম বিভ্রান্তি: হিলালের বিকৃতি

প্রথম বিভ্রান্তি এই যে, 'হিলাল' যা হলো কুরআন ও সুন্নাহর একটি বিশেষ শব্দ। যার সাথে বহুসংখ্যক বিধান যুক্ত- তিনি এটাকেই বদলে দিয়েছেন। যদ্দরুণ একই সাথে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ তিনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষ্য ও বক্তব্যসমূহ বিকৃতির অপরাধে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। যে এই বিকৃতি মেনে নেবে, সে এক নিঃশ্বাসে এই সমস্ত শরয়ী বিধানকে বদলে ফেলবে, যা হিলালের সাথে সম্পৃক্ত। এসকল বিধানকে তখন হিলালের পরিবর্তে মিহাক (অমাবস্যা) -এর সাথে যুক্ত করে দেবে।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান।

তৃতীয় বিভ্রান্তি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন না বোঝার কিংবা কুরআনের বিরুদ্ধাচরণের অপবাদ।

চতুর্থ বিভ্রান্তি: হাদীস ও সুন্নাহ -এর বিরুদ্ধাচরণ

পঞ্চম বিভ্রান্তি: সাহাবায়ে কেরামসহ পুরো উম্মতের 'ইজমা' এবং সাবিলুল মু'মিনীন তথা মু'মিনদের সর্বস্বীকৃত পন্থার বিরুদ্ধাচরণ।

ষষ্ঠ বিভ্রান্তি: কুরআনে উপর এই অপবাদ আরোপ যে, কুরআন জ্যোতির্শাস্ত্রীয় গণনার মাধ্যমে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জানতে বলেছে এবং এ উদ্দেশ্যে ২ : ১৮৯, ১০ : ৫, ১৭ : ১২, ৫৫ : ৫, মোট চারটি আয়াতের অর্থগত বিকৃতি সাধন!!

বিকৃতির রাস্তা কীভাবে বের করলেন?

এই ভয়ানক বিকৃতি করবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চতুরতার সাথে বেশ কয়েকটি রাস্তা আবিষ্কার করেছেন। যেমন তিনি দেখলেন যে, কুরআনের ইংরেজী তরজমাসমূহে সাধারণভাবে الأهلة (আল আহিল্লাহ)-এর তরজমা করা হয়েছে, 'নিউমুনস'। আর নিউমুন এর অর্থ হল, নতুন চাঁদ। এবার ধরুন বাংলা একাডেমীর অভিধান (ইংরেজী-বাংলা) তিনি দেখেছেন। সেখানে তিনি পেয়ে গেলেন, নিউমুন: অমাবস্যা।

ব্যস, এ থেকেই তিনি বুঝে ফেললেন, তার কেল্লা ফতে। এবং এখন তার জন্য বৈধ হয়ে গেলো এই দাবী করে বসা যে, কুরআন অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া নতুন চাঁদ থেকে মাস আরম্ভ করতে বলেছে। কেননা, একে তো هلال (হিলাল)-এর অর্থ হল নিউমুন। আর নিউমুন অর্থ অমাবস্যা। দ্বিতীয়ত বাংলা কুরআন তরজমা ও হাদীসের তরজমার কিতাবগুলোতে 'হিলাল'-এর অর্থ লেখা হয়েছে, 'নতুন চাঁদ'। আর তার বক্তব্য অনুযায়ী, চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার পর্যায়ে আসতে আসতে পুরানো হয়ে যায়। অথচ কুরআন তো মাস

আরম্ভ করতে বলেছে নতুন চাঁদ দিয়ে। অতএব অমাবস্যার সময়কার অদেখা চাঁদ থেকেই মাস শুরু করতে হবে। কারণ নতুন চাঁদ তো সেটাই!

শরীয়তের সর্ববাদীসম্মত বিধানের বিপরীতে এ ধরনের ওয়াসওয়াসা যদি বাস্তবেই কারো মনে এসে থাকে তাহলে তার উচিত ছিলো আউযুবিল্লাহ এবং লা হাওলা পড়ে মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলা। এবং এ কথা বিশ্বাস করা, কুরআন যে নতুন চাঁদ দিয়ে মাস আরম্ভ করতে বলেছে এটা আমার চেয়ে ঐ সকল মুতারজিমীনই ভালো বুঝবেন যাদের তরজমার উপর ভিত্তি করে আমি কথা বলছি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাদের আমলটা কী? আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অতঃপর সাহাবায়ে কেরামসহ গোটা উম্মত এখন পর্যন্ত চাঁদ দেখেই চান্দ্রমাস শুরু করেছেন ও করছেন; এতএব বোঝা গেল, দেখতে পাওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষার কারণে চাঁদ পুরানো হয়ে যায় না। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজের ওয়াসওয়াসার প্রতিকারের পরিবর্তে খোদ ওয়াসওয়াসাকেই এলহাম মনে করছেন এবং সেটাকে উম্মতের সামনে পেশ করছেন আমলের উদ্দেশ্যে!!

এই জনাবেরা যদি বুঝতেন, কুরআন মজীদের শব্দ 'নিউমুন'ও নয়, 'নতুন চাঁদ'ও নয়। কুরআনের শব্দ হলো 'হিলাল'! সুতরাং আপনাকে এখানে দেখতে হবে هلال -এর অর্থ কী।

হিলাল শব্দের ধাতুউৎপন্ন অর্থের মাঝে দু'টি জিনিস পরিলক্ষিত হয়: ক) প্রকাশ। খ) আওয়াজ।

(ه ل ل) এই ধাতুমূল থেকে নিষ্পন্ন সমস্ত শব্দ ও তার প্রয়োগ-ক্ষেত্রের উল্লেখ আরবী বৃহৎ অভিধানগুলোতে বিশদাকারে বিদ্যমান। সেগুলো খোলামাত্রই এই দুইটা জিনিস সামনে এসে যায়।

আরবরা যেহেতু প্রথম থেকেই অমাবস্যার পর দৃশ্যমান ক্রিসেন্টমুন (ধনুকাকৃতির চাঁদ) দেখে মাস আরম্ভ করতো, সেহেতু তারা তা

পরস্পরে দেখা ও দেখানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিতো। যে কারণে আওয়াজ উচুঁ হতো। 'ঐ যে চাঁদ, আরেকটু উপরে, একটু ডানে...'। এখনও আমরা চাঁদ দেখতে কালে এরকম আওয়াজ হয়।

তৃতীয় যে জিনিসটি 'হিলালে'র অর্থের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি মিশে আছে তা হল তার ধনুকের অবয়ব বা বক্রাকৃতি, ক্রিসেন্ট। যেহেতু অমাবস্যা-পরবর্তী চাঁদ যখন আলো ছড়াতে শুরু করে তখন তা ধনুকের আকৃতিই প্রতিবিম্বিত করে তাই আরবীতে ( ) এই চিহ্নের নাম দেওয়া হয়েছে, 'হিলালাইন' অর্থাৎ দুই হিলাল। এবং এরই ভিত্তিতে 'হিলাল'-কে বিভিন্ন জায়গায় আলামত বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো মুসলিম দেশের পতাকায় 'হিলাল'-এর যে চিহ্ন আঁকা রয়েছে সেটা উজ্জ্বল ধনুকেরই আকৃতি, অন্ধকার চাঁদের ছবি নয়।

মোটকথা 'হিলাল'-এর ধাতু নির্দেশিত মূল অর্থ এবং তার প্রয়োগক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, অমাবস্যার চাঁদকে হিলাল বলার কোনোরকম অবকাশ নেই। এতে না 'প্রকাশ' আছে আর না তা দেখার মতো অবস্থা আছে যে, দেখতে ও দেখাতে গিয়ে আওয়াজ হবে। আর না এতে আছে ক্রিসেন্ট রূপ।

সারকথা এই যে, কোনো একটি শব্দের অর্থ যত উপায়ে নির্ধারণ করা সম্ভব সব উপায়ে ও সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে কেবল মাত্র এই জ্বলজ্যান্ত বাস্তবতাই পরিদৃষ্ট হয় যে, অমাবস্যার পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর চাঁদের যে উজ্জ্বল ধনুকাকার দর্শনযোগ্য হয় এবং মানুষ ২৯-এর দিবাগত রাতে যা দেখার চেষ্টা করে থাকে, কখনো দেখতে পায় কখনো বা পরবর্তী রাতে দেখে- আরবীতে এরই নাম 'হিলাল'। যেহেতু মুসলমানদের এবং তারও আগে আরবদের কাছে নতুন চান্দ্রমাস এই হিলাল দিয়েই আরম্ভ হতো এজন্য হিলালের অর্থই হয়ে গিয়েছে উদূর্তে 'নয়া চাঁদ', ফারসীতে 'মাহে নও' বাংলায় 'নতুন চাঁদ' বা 'নবচন্দ্র' এবং ইংরেজীতে 'নিউমুন'। (অথার্ৎ هلال কে এসকল ভাষায় নতুন চাঁদ বলার কারণ, তা দিয়ে

নতুন মাস আরম্ভ হচ্ছে, এই হিসেবে। এ কারণে নয় যে তা বয়সে সদ্যজাত। দ্বিতীয় অর্থটাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আবিষ্কার এবং তার উপরই তার সংস্কারকর্মের ভিত্তি। উল্লিখিত ভাষাসমূহে হিলালকে নতুন চাঁদ বলার এই প্রেক্ষাপটটি যদি তিনি বুঝতেন এবং গ্রহণ করতেন তাহলে অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া চাঁদের সদ্যোজাত অদেখা আকারটিকে নতুন চাঁদ বলার জন্য গোঁ ধরতেন না এবং হিলালকে তা দিয়ে ব্যাখ্যার জন্য উঠে পড়ে লাগতেন না)।

না হয় এই শব্দগুলোর (নয়া চাঁদ, মাহে নও, নতুন চাঁদ, নিউমুন) সরাসরি আরবী প্রতিশব্দ তো হলো القمر الجديد (আল-কামারুল জাদীদ), هلال (হিলাল) নয়।

তো বিভিন্ন ভাষায় 'হিলাল'-এর এই অর্থ (নতুন চাঁদ) প্রচলনের বাস্তবতা ও তার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় না নিয়ে এই অর্থ (নতুন চাঁদ) টিকেই هلال (হিলাল)-এর বিকৃতি সাধনের জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। যদি তিনি এই বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপট থেকে চক্ষু বন্ধও করেন তথাপি এ থেকে কীভাবে চোখ বন্ধ করে থাকবেন যে, কুরআন ও হাদীসের শব্দ হলো أهلة (আহিল্লাহ) এবং هلال (হিলাল)। قمر جديد (কামারুন জাদীদ) বা أقمار جديدة (আকমারুন জাদীদাহ) নয় যে আপনি ব্যস جديد (নতুন) শব্দ দিয়েই আয়াতের নববী অর্থ (নবী যে অর্থ বুঝেছেন) এবং হিলালের অনুসৃত অর্থ বদলে দেওয়ার চক্করে পড়ে যাবেন। কুরআনের শব্দ তো হলো هلال (হিলাল)। আপনাকে এর যা অর্থ সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি তাফসীরে কুরআনের সমস্ত নির্ভরযোগ্য উৎস থেকেও আপনি দৃষ্টি সরিয়ে নেন, কেবল هلال (হিলাল)-এর অর্থ নিয়েই চিন্তা করেন তাহলেও ইনশাআল্লাহ, এই বিকৃতি থেকে আপনার বাঁচবার তাওফিক হয়ে যাবে।

আল্লাহর বান্দা চিন্তা করে না, رؤية الهلال (চাঁদ দেখা) এই যে আরবী কথাটা এবংصوموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته(হিলাল দেখে রোযা ও ঈদ করা) হাদীস, সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তের এই যে ধারাবাহিক

অনুসৃত ভাষা- এখানেই তো এ বিষয়টি পরিষ্কার রয়েছে যে, 'হিলাল' অমাবস্যার সময়কালীন চাঁদ নয়; রবং অমাবস্যার পর্যায় অতিক্রম করার পর দর্শনযোগ্য চাঁদ। অমাবস্যার চাঁদ তো অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেটা দেখা, বা না দেখার প্রশ্ন আসে না। এবং সেটা দেখার সাক্ষ্য দেওয়ারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অতএব 'হিলাল' দৃষ্টিগোচর হওয়া বা না হওয়ার মধ্যেই এ ব্যাপারটি রয়েছে যে, হিলাল হচ্ছে অমাবস্যাপরবর্তী দৃশ্যমান চাঁদ। অমাবস্যার ভিতরের চাঁদ নয়। হিলালের এই অনুসৃত এবং সর্ববাদীসম্মত অর্থের স্বপক্ষে আরবী ভাষার অভিধান (আরবী - আরবী, আরবী - অনারবী, অনারবী - আরবী), কুরআন, হাদীস এবং ফিকহের শব্দাভিধান, সেই সাথে তাফসীরগ্রন্থ এবং হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং অন্যান্য দ্বীনী কিতাবাদির শত শত সূত্রে প্রাচীন ও আধুনিক শত শত নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এত সুস্পষ্ট একটি জিনিসের জন্য উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাওয়া ভালো মনে হয় না। তারপরও নমুনাস্বরূপ বিশ-পঁচিশটি কিতাবের হাওয়ালা উল্লেখ করছি।

১. 'কিতাবুল আইন'

আল-খলীল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহীদী (১০০ হিজরী- ১৭০ হিজরী) খ. ৪, পৃ. ৩২০-৩২১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন।

ইমাম খলীল বলেন, الهلال غرة القمر حين يهله الناس في غرة الشهر অথার্ৎ হিলাল হচ্ছে চাঁদের শুভ্রঅংশ, মাসের প্রারম্ভে মানুষ যা দেখে। ইমাম খলীলের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখা যেতে পারে তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস (খ. ১৩, পৃ. ২২২, মাদ্দা غ ر ر)

সামনে আমি শুধু উদ্ধৃতি উল্লেখ করবো। ভাষ্য উদ্ধৃত করবো না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আরবী ভাষার প্রত্যেক ইমামে লোগাত (ভাষা বিশেষজ্ঞ) এই অভিন্ন কথাটিই বলেছেন। কেউ আরেকটু

বিস্তারিত বলেছেন। আরবী ভাষায় 'হিলাল'-এর ক্ষেত্রে 'প্রকাশ'-এর অর্থ এতই ব্যাপক প্রচলিত যে, أهل الهلال এবং استهل الهلال -এর অর্থই হল অমুক হিলাল দেখেছে। এমনিভাবে هل الهلال এর অর্থ, হিলাল আত্মপ্রকাশ করেছে।

সামনে যেসব গ্রন্থের নাম আসছে সেখানে এ দু'টি এবং এ ছাড়াও বহু ব্যবহার উল্লেখ করে এ কথাই বলা হয়েছে যে, 'হিলাল' হচ্ছে মাসের শুরুতে দর্শনযোগ্য চাঁদ। এবং এই সমস্ত অভিধানে, এমনিভাবে অন্যান্য সকল অভিধানে অমাবস্যার জন্য আলাদা শব্দ লেখা হয়েছে। যেমন, মিহাক, সিরার ইত্যাদি। অতএব পুনরুক্তি থেকে বাঁচার জন্য শুধু কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করে দেয়া হচ্ছে। যার ইচ্ছা দেখতে পারেন।

২. 'কিতাবুল আলফায'

ইবনুস সিককীত ইয়াকূব ইবনে ইছহাক (১৮৬ হিজরী- ২৪৪ হিজরী) পৃ. ২৮৭-২৮৯ বাবু আসমায়িল কামারি ওয়া ছিফাতিহী।

৩. 'আদাবুল কাতিব'

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা (২১৩ হিজরী- ২৭৬ হিজরী) পৃ. ৬৯-৭১, (বাবু মা'রিফাতি মা ফিস্ সামাই ওয়ান্ নুজূমি ওয়াল আযমান ওয়ার রিয়াহ)। দারুল ফিক্র বৈরুত, ১৩৮২ হি. মোতাবিক ১৯৬৩ খৃ.।

৪. 'মাআনিল কুরআনি ওয়া ই'রাবুহু'

আবু ইসহাক আয্-যাজজায ইবরাহীম ইবনুস-সারি। (২৪১ হিজরী - ৩১১ হিজরী), খ. ১, পৃ. ২৫৮।

এ অভিধানগুলোসহ অন্যান্য বহু সংখ্যক অভিধানে এটাও লিখেছে যে, চান রাত বা প্রথম রাতের চাঁদের নাম হল হিলাল। কিংবা প্রথম

রাতের উদিত চাঁদের নাম হিলাল। দ্বিতীয়ার চাঁদকেও হিলাল বলা হয়। এক ব্যবহারে, তৃতীয়ার চাঁদকেও বলা হয়েছে- হিলাল...।

এইসব বক্তব্যের দাবীও এটিই যে, হিলাল হচ্ছে অমাবস্যা শেষ হবার পর প্রকাশ পাওয়া চাঁদ। কেননা অমাবস্যার চাঁদ দৃশ্যমান হয় না তদুপরি অমাবস্যা চলাকালে Conjunction থেকে কিংবা Conjunction -এর অব্যবহিত পর থেকেই যেই জ্যোতির্শাস্ত্রীয় নিউমুন -এর সূচনা হয়- তার কোন সুনির্দিষ্ট সময় নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো সময় তার সূচনা হতে পারে। ভোর চারটায়, পাঁচটায়, সকাল দশটায়, দুপুর বারোটায়; বিকেল তিনটায়, অথবা রাত দুইটায়... একেক মাসে একেক সময় তার সূচনা হয়। সেজন্য “হিলাল হচ্ছে প্রথম রাতের চাঁদ”। এই বক্তব্যের মাঝে এ কথাও বিদ্যমান রয়েছে যে, অমাবস্যা বা জ্যোতির্শাস্ত্রীয় নিউমুনের নাম ‘হিলাল’ নয়। এটা তো দিন-রাতের যে কোন সময় আরম্ভ হতে পারে। পক্ষান্তরে হিলাল -এর সময় সুনির্দিষ্ট। অমাবস্যার শেষে সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে তা দৃষ্টিগোচর হয়। [4]

৫. ‘জামহারাতুল্লুগাহ’:

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে দুরায়দ আল-আযদি (২২৩ হিজরী- ৩২১ হিজরী), খ.১ পৃ.১২১, ১৬০, ১৬৯, ৩৭২; খ.২, পৃ. ৭৯২; খ. ৩, পৃ. ১৩০৯। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, ডক্টর রমযী মুনীর বা‘লাবাক্কী, দারুল ইলম, লিলমালায়ীন, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৯৮৭ খৃ.

৬. ‘আয্-যাহির ফি মা‘আনী কালিমাতিন নাস’

আবু বকর আল-আনবারী মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (২৭১ হিজরী- ৩২৮ হিজরী) খ.১, পৃ. ৪৬৮

৭. ‘তাহযীবুল্লুগাহ’

আবু মনসূর আল-আযহারী মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনুল আযহার আল-হারাবী (২৮২ হিজরী- ৩৭০ হিজরী) খ. ৫, পৃ. ২৩৯-২৪৩, দারু ইহয়াউত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল: ১৪২১ হি.

৮.'আস-সিহাহ'

আবু নসর আল-জাওহারী ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩ হিজরী) খ. ৫, পৃ. ১৮৫১, তাহকীক : আহমদ আব্দুল গফুর আত্তার, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৯৯ হি. (পুণ:মুদ্রণ ১৪০২ হি.) সায়্যেদ হাসান আব্বাসের স্যেজন্যে।

৯. 'আল মুহকাম ওয়াল-মুহীতুল আযম'

ইবনে সীদাহ আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল (৩৯৮ হিজরী- ৪৫৮ হিজরী) খ. ৪, পৃ. ১০০-১০৩, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা আব্দুল হামীদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ: ১৪২১ হি.

১০. 'আল-মুখাসসিস'

ইবনে সীদাহ (প্রাগুক্ত), খ. ২ পৃ. ৩৭৬-৩৮০ (ছিফাতুল কামারি ওয়া আসমাউহু) এবং খ. ৫ পৃ. ২১১ (বাবুত-তারিখ), দারু ইহয়াউত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল: ১৪১৭ হি.।

আল- মুখাসসিসের এই সব আলোচনার জন্য আল-মুখাসসিসের উন্নত ও মানসম্মত পরিমার্জিত ও সংক্ষেপিত গ্রন্থ 'আল ইফসাহ ফি ফিকহিল লুগাহ' পৃ. ৪৫৯-৪৬১ দেখা যেতে পারে। যা আব্দুল ফাত্তাহ আছ-ছঈদী (১৩১০ হিজরী -১৩৯১ হিজরী) এবং হুসাইন ইউসুফ মূসার প্রস্তুতকৃত। এর একটি ফটো সংস্করণ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত থেকে ১৪০৭ হিজরীতে ছেপেছে।

১১. ‘মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন’

আর-রাগেব আল আস্পাহানী আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুফায্যাল (৫০২ হিজরী) পৃ. ৮৪৩ (ه ل ل), দারুল কলম দামেস্ক, এবং আদ-দারুশ শামিয়্যা, বৈরুত, প্রকাশকাল, ১৪১২ হিজরী

১২. ‘আসাসুল বালাগাহ’

মাহমূদ ইবনে উমর জারুল্লাহ আয্যামাখশারী (৪৬৭ হিজরী- ৫৩৮ হিজরী) পৃ. ৫৮৩, ৫২২, ২৯৩।

১৩. ‘আল ফায়েক্ব ফী গারীবিল হাদীস’

জারুল্লাহ আয্যামাখশারী (পূর্বোক্ত) খ. ৪, পৃ. ১১০-১১১, দারুল ফিক্র, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪১৪ হিজরী।

১৪. ‘মাশারিকুল আনওয়ার আলা সিহাহিল আছার’

আবুল ফযল কাযী ইয়ায ইবনে মূসা আসসাবতী (৪৮৬ হিজরী- ৫৪৪ হিজরী) খ. ২, পৃ. ৩৩৭ (حرف الهاء مع اللام), দারুল ফিক্র, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪১৮ হিজরী।

১৫. ‘আন নিহায়া ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আছর’

মাজদুদ্দীন ইবনুল আছীর আল-জাযারী আবুস সাআদাত আল মুবারাক (৫৪৪ হিজরী- ৬০৬ হিজরী) খ. ২, পৃ. ৯১০-৯১১, দারুল মারেফা, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২৭ হিজরী।

১৬. ‘আত-তাফসীরুল কাবীর’

ফখরুদ্দীন আর-রাযী মুহাম্মাদ ইবনে উমর (৫৪৪ হিজরী-৬০৬ হিজরী) খ. ৫, পৃ. ১০২-১০৬, আয়াত ২ : ১৮৯-এর তাফসীরের অধীনে। দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪২৫

হিজরী।

১৭. 'আল-উবাবুয-যাখির ওয়াল লুবাবুল ফাখির'

রযিউদ্দীন আছ-ছগানী আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল-লাহোরী (৫৭৭ হিজরী-৬৫০ হিজরী) এতে লিখেছে: الشكس - بالفتح- قبل الهلال بيوم أو بيومين وهوالمحاق অর্থাৎ شكس (শাকাস)-এর অর্থ হল মিহাক; অমাবস্যা, হিলালের এক দুই দিন পূর্বে, (হরফুস্-সীন, পৃ. ২২২)

দারুশ-শুউনিল আম্মাহ আস-সাকাফিয়্যাতুল আম্মাহ, বাগদাদ, ইরাক থেকে এই বিশাল গ্রন্থটি ছেপেছে। এই ভাষ্যটুকু হরফুস-সীন খণ্ডে এসেছে। যা ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ হাসান আলে ইয়াসীনের তাহকীকে ছেপেছে। এখানে আরবী ভাষার বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম রযিউদ্দীন ছগানী বলেছেন যে, অমাবস্যা হয় 'হিলাল' -এর পূর্বে (হিলাল তার পরে), অমাবস্যার মধ্যে নয়।

১৮. 'লিসানুল আরব'

ইবনে মনযূর আল-ইফরিকী জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররাম (৬৩০ হিজরী-৭১১ হিজরী) খ.১৫, পৃ. ৮৩-৮৫, দারে ছাদের, বৈরুত।

১৯. 'আদ-দুররুল মাছূন ফী উলূমিল কিতাবিল মাকনূন'

শিহাবুদ্দীন আস-সামীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইউসুফ (৭৫৬ হিজরী) খ.১, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯, (আয়াত: ২ : ১৮৯-এর অধীনে), ভূমিকা: ডক্টর আহমাদ মুহাম্মাদ, উসুলুদ্দীন ফ্যাকাল্টি, জামেয়া আল-আযহার। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথমপ্রকাশ: ১৪১৪ হিজরী।

২০. 'আল মিছবাহুল মুনীর ফী গারীবিশ শারহিল কাবীর'

আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আল ফাহয়ূমী আবুল আব্বাস (মৃত্যু ৭৭০ হিজরী -এর দিকে) পৃ. ৪০১, দারুল হাদীস, কায়রো, ১৪২৯ হিজরী।

২১. 'আল কামুসুল মুহীত ওয়াল কাবুসুল ওয়াসীত'

মাজদুদ্দীন আল-ফায়রুযাবাদী মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব (৭২৯ হিজরী- ৮১৭ হিজরী) খ. ৪, পৃ. ৭০, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও টীকা: শায়খ নাছর আল হোরীনী। এর সঙ্গে 'আলকামুস' -এর বিশাল ভাষ্যগ্রন্থ 'তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস'ও দেখুন। যা ভাষা বিশারদ, মুহাদ্দিস ও ফকীহ মুরতাযা (মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ হুসাইনী) যাবিদী (১১৪৫ হিজরী- ১২০৫ হিজরী) সংকলিত, কুয়েতের আলমাজলিসুল ওয়াতানী যা অনেকগুলি বিরাট ভলিউমে প্রকাশ করেছে। 'হিলাল' -এর উল্লেখ এই সংস্করণে ৩১ তম খণ্ডে (পৃ. ১৪৪-১৫৬) এবং 'মিহাক' (অমাবস্যা)-এর উল্লেখ খ. ২৬ পৃ. ৩৭৮ এবং 'সারার' ('মিহাক' -এর আরেকটি প্রতিশব্দ)-এর উল্লেখ খ. ১২, পৃ. ১৬-১৭

২২. 'বাছাইরু যাউয়িত তাময়ীয ফি লাতাইফিল কিতাবিল আযীয'

মাজদুদ্দীন আল-ফায়রুযাবাদী (প্রাগুক্ত) খ. ৫, পৃ. ৩৩১-৩৩২, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, বৈরুত। এই গ্রন্থে 'হিলাল' -এর হাকীকত এবং এর নামকরণের সাথে সম্পর্কিত ঐ তিনটি বিষয় (প্রকাশ, আওয়াজ, ধনুকাকৃতি) একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩. 'গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান'

নিযামুদ্দীন আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ নিশাপুরী, (মৃত্যু ৮৫০ হিজরীর পর) খ.১, পৃ. ৫২৫, মাকতাবা দারুল বায, মক্কা মুকাররমা, ১৪১৬ হিজরী, তার ভাষ্যটি এই:

وتسمى القطعة المرئية الصغيرة أول ما يبدو إلى ليلتين هلالا، ويجمع على أهلة، لأنه يتعدد اعتبارا.

অর্থাৎ (অমাবস্যার পরে) চাঁদ প্রথম প্রথম যখন প্রকাশ পায় তখন তার যে ছোট্ট অংশটি নযরে পড়ে তার নাম হিলাল। প্রথম দুই রাতে একে ‘হিলাল’ই বলা হয়।

২৪. ‘আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব’

আবু হাফস উমর ইবনে আলী সিরাজ উদ্দীন দামেশকী (রচনাকাল: ৮৮০ হিজরী) (আয়াত ২ : ১৮৯ -এর অধীনে)

ব্যস, এই মুহূর্তে শত শত উদ্ধৃতির মধ্য থেকে নমুনাস্বরূপ কেবল এই চব্বিশটি উদ্ধৃতিই উল্লেখ করলাম। অতিরিক্ত একটি উদ্ধৃতি শুধু উল্লেখ করি: খ্রিস্টান গবেষক পণ্ডিত লুয়াইস মালুফ (১২৮৪ হিজরী- ১৩৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ- ১৯৪৬ খিস্টাব্দ)-এর কৃত আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ, যার প্রথম সংস্করণ ১৯০৮ খিস্টাব্দে ছেপেছে এবং এখন পর্যন্ত এর অনেক সংস্করণ বেরিয়েছে; এতে ‘হিলাল’-এর আলোচনা শেষ করা হয়েছে এ কথা দিয়ে:

والهلال عند أهل الهيئة: ما يرى من القمر أول ليلة.

অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে হিলাল হচ্ছে চাঁদের সেই অংশ যা প্রথম রাতে দৃষ্টিগোচর হয়। (আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ, পৃ. ৮৭০, কলাম, ত্ব ৩৫)

বোঝা গেল, আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও ‘হিলাল’কে অমাবস্যার পর প্রকাশ পাওয়া দর্শনযোগ্য চাঁদ -এর অর্থেই ব্যবহার করেন। ইংরেজী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেভাবে ‘নিউমুন’কে এর আভিধানিক অর্থের বাইরে অন্য একটি অর্থের জন্য পরিভাষার রূপ দিয়েছেন, আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ এ ধরনের কাজ করেননি। রবং তাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষাতেও হিলাল হচ্ছে অমাবস্যা-পরবর্তী সাধারণ দৃষ্টিতে

দৃশ্যমান উদিত চাঁদ।

মুহতারাম ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! একটি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং অনুসৃত ও সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্ববাদীসম্মত বিষয়ে এতগুলো রেফারেন্স শুধু আপনার স্বার্থেই দেওয়া হল। সাধারণ পাঠকগণ হয়ত নারায হচ্ছেন যে, প্রবন্ধকার কী তামাশা শুরু করেছেন। জানা এবং স্পষ্ট একটি বিষয়ে এত হাওয়ালা উল্লেখ করার কী প্রয়োজন ছিল? তারপরও আপনার জন্য আমি এরূপটি করলাম। আশা করি, সত্যানুসন্ধানের চেতনা নিয়ে যদি চিন্ত-ভাবনা করেন তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে সত্য উপলব্ধি করার এবং হককে কবুল করার তাওফীক দান করবেন। (হিলালের বিকৃতি বিষয়ের বাকী আলোচনা আগামী সংখ্যায়)

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

---

[1] দেখুন, الموسوعة العربية العالمية (Global Arabic Encyclopedia) খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৩২৬-৩২৭, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রবন্ধ القمر

আরো দেখুন, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২, প্রফেসর এ. এম. এম. আবদুর রহমান (অব.) বি. এস-সি (অনার্স, লন্ডন), এ. আর. সি এস. (লন্ডন) এম. এস-সি (ঢাকা) প্রাক্তন প্রফেসর, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। তিতাস পাবলিকেশন্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[২] "When the moon is between the sun and the earth its sunlit side_the far side_ is turned away from the earth, Astronomers call this darkened phase of the moon a *new moon*." The World book Encyclopedia, Vol- 13, P. 646h, World book- child craft international, Inc, © 1982 USA. & © 2005, Vol- 13, P. 784 .

[3]এমনও হতে পারে যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঐ অভিমতদাতাদের সামনে বইয়ের সেই কপিই কেবল পেশ করেছেন, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো ৬৬। যাতে বিকৃতি ও অসংলগ্ন কথাবার্তা অনেক কম ছিলো। কিন্তু পরবর্তী প্রতিটি সংস্করণে তিনি ঐ অভিমতগুলো ব্যবহার করেছেন!

[4] ইবনুল হুমামের ভাষায়: والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر، عند الصحابة التابعين ومن بعدهم (ফাতহুল কদীর, খ. ২ পৃ. ৩১৩, পরিচ্ছদ: চাঁদ দেখা প্রসঙ্গ।)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

নভেম্বর ২০১৫, মুহাররম ১৪৩৭

‘চান্দ্রমাস’ : একটি পর্যালোচনা- ৫ : হিলালের বিকৃতি এবং একসাথে বহু বিভ্রান্তি

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

[ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হক সাহেবের বইয়ের পর্যালোচনা সংক্ষেপে লেখা সত্ত্বেও দীর্ঘ হয়ে গেল। চুলচেরা বিশ্লেষণসহ এমন দীর্ঘ পর্যালোচনা মাসিক পত্রিকায় মুনাসিব মনে হচ্ছে না। এজন্য ‘হিলালের বিকৃতি’ বিষয়ক আলোচনাতেই এই লেখা সমাপ্ত করতে চাচ্ছি। সুতরাং আগামী ডিসেম্বর সংখ্যায় ইনশাআল্লাহ এ লেখার সর্বশেষ কিস্তি ছাপা হবে।

উত্তম ছবরের পরিচয় দেওয়ার জন্য পাঠকবর্গের শোকরগুযারি করছি। –প্রবন্ধকার]

‘নতুন চাঁদ’ কাকে বলে?

কেউ বলতে পারেন, ইঞ্জিয়ার সাহেব হিলালের বিকৃতি ইচ্ছা করে করেননি, বরং নতুন চাঁদ ও নিউমুন শব্দদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে ধোঁকায় পড়েছেন। তিনি ভেবেছেন, চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করলে চাঁদ তো আর নতুন থাকে না, পুরাতন হয়ে যায়। অথচ শরীয়ত বলেছে, নতুন চাঁদ দিয়ে মাস শুরু করতে। তাই বাধ্য হয়ে

তিনি বলছেন, নতুন চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার আগেই অমাবস্যা থেকে মাস শুরু করতে হবে। কিন্তু এ বাহানা এজন্য চলবে না যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে নতুন চাঁদ শুরুই হয় দর্শনযোগ্য হওয়ার পর। তাই দর্শনযোগ্য হওয়ার অপেক্ষার কারণে তা পুরাতন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া নতুন-এর অর্থ কি এতই সীমিত যে, ব্যস মুহূর্তের মধ্যেই একটা জিনিস পুরনো হয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার বইয়ের এক জায়গায় কী লিখেছেন দেখুন–

“চন্দ্রের বেলায় এই রকম হিসাব মোটেও প্রযোজ্য নয়। কারণ নবচন্দ্র প্রতি মাসে পৃথিবীতে একবারই মাত্র দেখা যাবে। বারবার নবচন্দ্র উদিত হবার কথা যারা বলছেন তারা মহাভুলের মধ্যে অযৌক্তিক বসবাস করছেন।” (চান্দ্রমাস, পৃ.৩১, পর্ব ১৯, ৭ম সংস্করণ)

এই বক্তব্য নবম সংস্করণে এভাবে বদলে দিয়েছেন :

“চন্দ্রের বেলায় এই রকম হিসাব মোটেও প্রযোজ্য নয়। কারণ নবচন্দ্র প্রতি মাসে পৃথিবীতে একবারই মাত্র জ্ঞানের চোখে দেখা যাবে। বারবার নবচন্দ্র উদিত হবার কথা যারা বলছেন তারা মহাভুলের মধ্যে অযৌক্তিক বসবাস করছেন।” (চান্দ্রমাস, পৃ.৩৭, পর্ব ১৯, ৯ম সংস্করণ)

কিন্তু এর বিপরীতে পর্ব: ১১, অনুচ্ছেদ: ৫ -এ লিখেছেন,

“পৃথিবীর যে কোন স্থানে প্রথম যখন নূতন চাঁদ দেখা যাবে তাকেই বলা হবে নবচন্দ্র”। (পৃ.২৪ ৭ম সংস্করণ; পৃ.৩০ ৯ম সংস্করণ)

আবার নবম সংস্করণের ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

“কারণ সেক্ষেত্রে প্রথমটা হবে নবচন্দ্র দর্শন; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টা হবে পুরাতন চন্দ্র দর্শন। পুরাতন চন্দ্র দেখে মাস আরম্ভ এবং রোযা ও ঈদ করা যায় না।” (চান্দ্রমাস, পৃ.১৭২, ৭ম সংস্করণ)

বোঝা গেলো, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এমন কাঁচা লোক নন যে, কেবল ‘নয়া’ এবং ‘নব’ শব্দ থেকে ধোঁকায় পড়বেন। এবং ‘নতুন’ এর তাল সামলাতে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ‘হিলাল’ (ধনুকাকৃতির উজ্জ্বল চাঁদ)-কে ‘মিহাক’ (অন্ধকার চাঁদ) বানিয়ে দেবেন। মূলত তিনি যা করেছেন জেনে বুঝেই করেছেন। না হলে এতটুকু কথা কে না বোঝে যে, নতুন এবং পুরানো একটি আপেক্ষিক বিষয়। যদি হিন্দু এবং ইহুদীরা অমাবস্যার মাঝে সৃষ্ট সূর্য ও চন্দ্রের সম্মিলনের মুহূর্ত থেকে চান্দ্রমাস আরম্ভ করে, তো তাদের নবচন্দ্র তখন থেকে শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু এতে করে কি এটা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের নবচন্দ্রও হতে হবে সেটি। মুসলমানদের নবচন্দ্র তো হলো অমাবস্যা শেষ হওয়ার পর দৃশ্যমান ধনুকাকৃতির চাঁদ। দর্শনযোগ্য হওয়ার অপেক্ষার কারণে এটা কীভাবে পুরানো হয়ে যাবে যে, তার নতুনত্ব ধরে রাখার জন্য কিতাবুল্লাহ, হাদীস ও সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের অকাট্য বিধানকে পরিবর্তন করে হিলালের জায়গায় মিহাককে এবং ‘দেখা’-এর স্থানে গণনাকে ইসলামী চান্দ্রমাসের ভিত্তি সাব্যস্ত করা জরুরি হয়ে পড়বে? বলি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এবং তার সমমনা লোকদের উম্মতে মুসলিমাকে ইহুদী এবং হিন্দুদের অনুগামী বানানোর এত সখ কেন?

‘নিউমুন’ এর কী অর্থ?

এখন দেখার বিষয়, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কি ‘নিউমুন’ শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন? অর্থাৎ ইংরেজি কুরআন তরজমাসমূহে الأهلة (আল-আহিল্লাহ) -এর তরজমায় ‘নিউমুনস’ শব্দ দেখে ‘এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন’ মনে করে বসেছেন?!

এখানেও আমি এ কথাই বলবো, সম্ভাবনা তো আছে, তিনি কোনো ধরনের বিভ্রমের শিকার হয়েছেন, কিন্তু আপনি যখন তার বইয়ের এই বক্তব্যটি পড়বেন তখন কী বলবেন? যেখানে ৭৪ নং প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ তিনি দাঁড় করিয়েছেন, “‘এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন’ এবং ‘ইসলামিক নিউমুন’ এর মধ্যে তফাত কি?”

উত্তর লিখেছেন:

"জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন চাঁদ শুরু হয় চাঁদের অদেখা সময়ের মাঝখানে। আর কিছু ইসলামী বিদ্বান ব্যক্তি কর্তৃক কথিত ইসলামিক নতুন-চাঁদ শুরু হয় চাঁদের অদেখা সময় শেষ হওয়ার পরে। একই মাসে একটা চাঁদের কখনো ২ টা নতুন-চাঁদ থাকতে পারে না। এজন্যই চাঁদের অদেখা সময়টাকে ইংরেজীতে বলা হয় New moon, dark অথবা Black-moon নয়। আরবীতে এই অদেখা সময়ের কোন নাম নেই। আল্লাহ আমাদের জন্য একটা চাঁদ সৃষ্টি করেছেন, যার একটা শুরু ও শেষ আছে এবং যার সাহায্যে আমরা একটা চান্দ্রমাস হিসাব (Calculate) করব। চাঁদ দেখে চান্দ্রমাস শুরু করার কোন হাদীস নেই। কোরআন আমাদেরকে নতুন-চাঁদ দেখে মাস শুরু করতে বলে না, হিসাব করতে বলে। এই জ্ঞান প্রকাশিত অথবা জানার আগে অস্থায়ী ভিত্তিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হয়েছে। সেগুলো উপরোক্ত সত্য উদঘাটনের পর এখন আর গ্রহণযোগ্য থাকতে পারে না।" (চান্দ্রমাস, পৃ. ২১৩-২১৪)

বোঝা গেল 'নিউমুনে'র আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের জানা আছে। আর আভিধানিক অর্থের প্রেক্ষিতেই 'হিলালে'র তরজমা হতে পারে 'নিউমুন'। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গায়ের জোরে এই অর্থটিকে মাত্র কতিপয় ইসলামী বিদ্বানের মত বলে প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছেন। অথচ 'হিলালে'র এই অর্থটি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত অর্থ এবং এটিই তার অনুসৃত ও সর্বজনসম্মত অর্থ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একে এ কথা বলে ছুড়ে ফেলছেন যে, 'এক চাঁদের দুটো নতুন চাঁদ হতে পারে না'। যদি বাস্তবেই এক চাঁদের মধ্যে দুটি পর্যায় নতুন বলে গণ্য হতে না পারে তাহলে ঐ পর্যায়টিই নতুন বলে গণ্য হবে, যাকে শরীয়ত ইসলামী চান্দ্রমাসের সূচনা সাব্যস্ত করেছে। আর সেটা হচ্ছে 'হিলাল'। সেক্ষেত্রে 'মিহাক' (অমাবস্যা)-এর পর্যায়টি হল পুরানো মাসের অংশ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ইসলামী চান্দ্রমাসের পরিবর্তে

ইহুদি এবং হিন্দুদের চান্দ্রমাসকে গ্রহণ করতে চান। সেজন্য ‘মিহাক’ তথা (অমাবস্যা)-কে নতুন চাঁদ বলতে গোঁ ধরেছেন। এই হলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দর্শন। অর্থাৎ ‘দু’টি নতুন চাঁদ হতে পারে না’। তাহলে কী করা যাবে? তাহলে উম্মতে মুসলিমা যাকে নতুন চাঁদ বলে সেটাকে বাদ দিতে হবে। আর ইয়াহুদী ও হিন্দুদেরটা গ্রহণ করতে হবে! তার ধর্ম-জ্ঞান ও ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধের জন্য সত্যিই তাকে মাশাআল্লাহ দিতে হয়।

আর এও বড় আশ্চর্য হঠকারী ব্যাপার যে, আরবীতে নাকি অমাবস্যার কোন নাম নেই। অথচ আরবীতে অমাবস্যার অনেকগুলো নাম রয়েছে। প্রসিদ্ধ নাম ‘মিহাক’ এবং ‘সারার’ বা ‘ইস্তিসরার’। একটি বিখ্যাত উক্তি আছে:

دروغ گورا حافظہ نباشد

একদিকে কুরআনে কারিমের শব্দ أهلة (আহিল্লাহ, যা هلال-এর বহুবচন)-কে বানিয়ে দিচ্ছেন অমাবস্যার চাঁদ। অন্যদিকে বলছেন, অমাবস্যার কোনো আরবী নাম নেই!

আসলে অমাবস্যার আরবী নাম তো আছে, কিন্তু সেটা ‘হিলাল’ নয়; ‘মিহাক’, ‘সারার’, ‘ইস্তিসরার’, ‘দাআদি’, ‘আদ-দা‘জা’, ‘আদ-দাহমা’ ইত্যাদি। পুরো অমাবস্যার কিংবা তার একেকটি রাতেরও পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। আর খাছ জ্যোতির্শাস্ত্রীয় নিউমুন (Conjunction)-এর জন্য আরবীতে ‘ইকতিরান’ ও ‘ইজতিমা’ শব্দাবলী কয়েক শতাব্দী ধরে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। আল-বেরুনীও তার গ্রন্থসমূহে এই শব্দই ব্যবহার করেছেন।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার উত্থাপিত প্রশ্ন-৭৪ -এর উত্তর দিতে গিয়ে আরো যা লিখেছেন তা এতটাই নির্জলা মিথ্যা এবং তা এত ভয়ানক স্পর্ধায় ভরা, যার পর্যালোচনা করার মত ভাষা আমার নাই। এর ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করে কিছু কথা ইতোপূর্বে লেখা হয়েছে। এখন শুধু কামনা, আল্লাহ তাআলা তাকে আকলে সালীম (সুস্থ

বিবেক) ও সিরাতে মুস্তাকীমের নিআমত দান করুন এবং আমাদের সবাইকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল রাখুন। আমীন।

প্রাসঙ্গিক কথা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, এই সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব أهلة (আহিল্লাহ)-এর তরজমায় 'নিউমুনস' শব্দ দেখে ধোঁকায় পড়েছেন এবং একে 'এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন' ধারণা করে বসেছেন। যদি এই সম্ভাবনাটিকে মেনেও নেয়া হয়, তবুও এই অযুহাতে তিনি ক্ষমা পেতে পারেন না। কারণ যদি তিনি আরবী অভিধানসমূহ (আরবী-আরবী) দেখতে অপারগ হয়ে থাকেন, তথাপি তিনি কি অন্যান্য ভাষার অভিধানসমূহে 'হিলাল' এবং 'নিউমুন'-এর অর্থ অনুসন্ধান করতে পারতেন না? কুরআনের ইংরেজী অনুবাদকারীদের তাফসীর সংক্রান্ত টীকাগুলোতে নজর বুলাতে পারতেন না? যে দেখি, 'নিউমুন' দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন তারা? যে লোক দশ-বিশটা ইংরেজী অভিধানও ঘাটতে পারে না, কুরআনের বিশ-ত্রিশটি ইংরেজি অনুবাদ দেখে নেওয়ার মত অবসরও যার নেই, তাজদীদ ও সংস্কারের ময়দানে অবর্তীণ হওয়ার কী দরকার ছিল তার?

তার বইয়ের ১১১ নং পৃষ্ঠায় 'অভিধান কী বলে?' শিরোনামে যে দু'চারটি অভিধানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যদি শুধু সেগুলোতে উদ্ধৃত তথ্য-উপাত্তগুলোই হুবহু বুঝে নিতেন এবং তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতেন তবুও ভুল করা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকতো না।

বইয়ের ২১৬-২১৯ পৃষ্ঠায় আয়াত ২ : ১৮৯ -এর তরজমাসমূহের যে তালিকা পেশ করা হয়েছে, যদি তাতে উল্লিখিত ইংরেজী তরজমাসমূহের টীকাগুলো দেখে নিতেন এবং অন্যান্য আরো কিছু নির্ভরযোগ্য তরজমাসমূহেও দৃষ্টি দিতেন– যদি এরূপ করতেন তাহলে তো কোনো অবস্থাতেই ভুল বুঝার সুযোগ থাকতো না। তবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ইচ্ছা থাকলে সেটার প্রতিকার তো কারো হাতে নেই।

অভিধানে হিলালের অর্থ

প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উল্লিখিত অভিধানগুলো থেকে ‘হিলাল’-এর অর্থ উদ্ধৃত করছি :

১. ডিকশনারি অফ ইসলাম :

আমরা এ অভিধানের ১৮৮৫ সালের মুদ্রিত কপি দেখেছি। সেখানে লেখা আছে:

“HILAL (هلال) The new moon, A Term used for the first three days of the month”

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব The new moon লিখে বাকীটা ফেলে দিয়েছেন!! তা ফেলে দিন, তবে থমাস পেট্রিক (Thomas Patrick) ‘হিলাল’-কে ‘এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন’ বলেননি যা তার বক্তব্যে স্পষ্ট। বরং দর্শনযোগ্য নতুন চাঁদই বলেছেন। *(Dictionary of Islam by Thomas Patrick (1838-1911) page: 175, W.H. ALLEN & Co. LONDON, 1885)*

২. এ ডিকশনারি এন্ড গ্লোসারি অফ দ্যা কোরান :

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই অভিধানের যে সংস্করণের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তা আমরা দেখেছি। (একাডেমি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ.) তাতে পুরো বক্তব্য এভাবে আছে :

“هلّ To appear. أهلة plur. of هلال. . A New moon, or according to some the moon during the first and last two or three nights; at other times the moon is called قمر”.

(A Dictionary and glossary of the Koran, by john penrice (1818-1892), page 154 © Academic publisher, 1987.)

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই পুরো বক্তব্য থেকে শুধু A New moon -কে গ্রহণ করেছেন। অথচ এ বক্তব্যে একেতো ‘দৃশ্যমান হওয়া’ (To appear) শব্দটি স্পষ্টভাবে রয়েছে। আবার পূর্বাপরের ইঙ্গিত থেকেও এ কথা সুস্পষ্ট যে, এখানে ‘এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনে’র নাম-নিশানও নেই।

৩. আল মাওরিদ :

এটি ইংরেজী-আরবী অভিধান। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এখান থেকে ‘হিলাল’-এর অর্থ উদ্ধৃত করেছেন: Crescent । আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজী-আরবী অভিধানে তিনি ‘হিলাল’ শব্দ কী করে পেলেন? ড. মুনীর বা‘লাবাক্কী তার আল-মাওরিদ অভিধানে Crescent -এর আরবী লিখেছেন هلال :

Crescent : هلال

New moon : (١) هلال (٢) اليوم الأول من الشهر العبري

(Al-Mawrid, by Munir Ba’albaki, ©1998, Dar el-ilm lilmalayin, Beirut, Lebanon)

বুঝা গেল, ইংরেজী ‘নিউমুন’ শব্দের দু’টি অর্থ রয়েছে। এক. هلال অর্থাৎ দৃশ্যমান উজ্জ্বল ক্রিসেন্ট মুন। দুই. হিব্রু মাসের প্রথম দিন। কিন্তু আরবী ‘হিলাল’ -এর অর্থ শুধু একটিই। আর তা হল ‘ক্রিসেন্ট মুন’। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মাওরিদের হাওয়ালা তো দিচ্ছেন, কিন্তু প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, মুসলমানদেরও ইহুদীদের মত হিব্রু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চান্দ্রমাস Conjunction থেকে শুরু করতে হবে! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

যাহোক, দেখাতে চাচ্ছিলাম, ‘নিউমুন’ শব্দ থেকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন– বিষয়টি তেমন নয়। তিনি যেসকল অভিধানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে স্পষ্ট করেই লেখা আছে যে,

‘হিলাল’ ও ‘এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন’ এক নয়।

৪. The School Dictionary (English-Arabic) by : Elias A. Elias & Ed. E. Elias মাওরিদের ন্যায় এখানেও তিনি ইংরেজী-আরবী অভিধান থেকে هلال -এর অর্থ উদ্ধৃত করেছেন।

هلال: crescent, new moon, first moon of the month.

Elias School Dictionary (আরবী-ইংরেজী, ইংরেজী-আরবী)-এর ২০১৫ এর মুদ্রণ আমাদের সামনে রয়েছে। অভিধানটির আরবী-ইংরেজী অংশে هلال -এর অর্থ লেখা হয়েছে,

هلال، غرة القمر: crescent [1] قمر أوائل الشهر ـ
: new moon

এখানে উল্লেখ করা হবি সড়ড়হ থেকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ফায়েদা নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আরবীতে তো লেখা আছে قمر أوائل الشهر অর্থাৎ মাসের প্রথম দিকের (দুই তিন রাতের) দৃশ্যমান চাঁদ।

অভিধানটির ইংরেজী-আরবী অংশে crescent -এর অর্থ লেখা হয়েছে :

هلال * نام، متزائد crescent এবং new moon - এর অর্থ লেখা হয়েছে:

هلال new moon *(Elias School Dictionary, page: 69 (crescent), 196 (new moon) ©Elias Modern Publishing House 2015, Egypt)*

A. Elias -এর আরো কয়েকটি অভিধান রয়েছে, যেমন

৫. (قاموس إلياس العصري (عربي- إنجليزي Elias Modern Dictionary (Arabic-English))) এ থেকেও উদ্ধৃত করছি। তাতে লেখা আছে:

هلَّ، أَهَلَّ: ظهر To appear; come out

هلَّ الشهر: بدأ To begin (with the appearance of the new moon.)

استهلَّ الشهر: ظهر هلاله To begin, (a month, by the appearance of the new moon

هلال: غُرَّةُ القمر Crescent moon: The moon in her first . quarter

هلال: قمر أوائل الشهر New moon

هلال: قمر أواخر الشهر Old moon

(Elias Modern Dictionary (Arabic-English), © 1982, page: 762, Dar Al-jil, Beirut, Lebanon)

এতটুকু স্পষ্ট করার পরও A. Elias -এর অভিধানের উদ্ধৃতি ব্যবহারকারী যদি ‘হিলাল’কে অমাবস্যা বানিয়ে দেয়, তবে কি একেও আমরা ভুল বোঝাবুঝি বলবো?

এখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উদ্ধৃতি দেওয়া অভিধানগুলো থেকেই মূল হাকীকত তুলে ধরা হল। আরো দু’একটি হাওয়ালা পেশ করছি।

৫. এ্যারাবিক-ইংলিশ ডিকশনারি অফ কোরানিক ইউজেস :

এ অভিধানে হিলালের অর্থ দেখুন :

/ه/ل/ل/ h-l-l new moon, (of the moon) to appear for the

first time; (of the month) to start; crescent, crescent-shaped; to come forth; to exalt God, to invoke God's name upon an animal at the moment of slaughter; …

أهلة ahillatun [pl. of n. هلال hilal] new moon, the crescent moons (variously designated by philologists as the moon of either the first, the third or the seventh nights, along with that of the second night and the 26th and 27th nights), stages of the moon (2:189) يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج they ask you [prophet] about the crescent moons -say, 'They show appointed times for people, and for the pilgrimage.''

(Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage, by Elsaid M. badawi; Muhammad Abdel Haleem, © 2008, page 988-989, Brill, Boston)

৬. Al-Mawrid -এর লেখক Dr. Munir Ba'albaki -এর ছেলে Dr. Rohi ba`albaki (আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, লেবানন-এর প্রফেসর) তার আল মাওরিদ-এ মডার্ন এ্যারাবিক-ইংলিশ ডিকশনারি-তে লিখেছেন :

هلال (من القمر) crescent, new moon, half-moon

crescent - এর পর কমা দিয়ে new moon লেখা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, উভয়টিই সমার্থক শব্দ। 'হিলাল' অর্থে 'নিউমুন' হল 'ক্রিসেন্ট'-এর সমার্থক। ড. রূহী বা'লাবাক্কী অভিধানটির ভূমিকায় লিখেছেন, কোন শব্দের কয়েকটি ইংরেজী অর্থের মাঝে যদি কমা (,) হয় তাহলে উদ্দেশ্য, এ শব্দগুলো সমার্থবোধক। আর যদি সেমিকোলন (;) হয় তবে এর উদ্দেশ্য হল, এগুলো পরস্পর কাছাকাছি অর্থের অথবা কিছুটা ভিন্ন, সমার্থক নয়। দেখুন তার বক্তব্য :

"تفصل بين الكلمات الإنكليزية المترادفة فاصلة (،). أما الشولة المنقوطة (؛) فتفصل بين الكلمات الإنكليزية ذات الدلالة المختلفة اختلافاً يسيراً أو بين ظلال المعاني المتقاربة ولكن دون أن تكون مترادفة."

(Al-Mawrid A modern arabic-english dictionary, by Dr. Rohi ba` albaki, page: 12 © 2005 Dar-el ilm*, Lilmalayin, Lebanon)*

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ‘হিলালে’র অর্থগুলোর মধ্যে ড. রূহী ‘ক্রিসেন্ট’ ও ‘নিউমুন’– এ দুয়ের মাঝে কমা (,) ব্যবহার করেছেন, সেমিকোলন (;) ব্যবহার করেননি। সুতরাং বুঝা গেল, এ দুটি শব্দ সমার্থক। সারকথা এই দাঁড়াল যে, ‘হিলালে’র মধ্যে ‘এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন’ -এর অর্থ কল্পনাই করা যায় না। হিলাল হচ্ছে ‘মিহাক’ পরবর্তী ‘ক্রিসেন্টমুন’ কিংবা ‘মিহাকে’র আগের ‘ক্রিসেন্টমুন’। তবে যেই ‘হিলাল’ দিয়ে মাস আরম্ভ হয় তা ‘মিহাকে’র পরের পশ্চিমাকাশের ‘হিলাল’; ‘মিহাকে’র আগের পূর্বাকাশের ‘হিলাল’ নয়।

৭. গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশিত আরবী-বাংলা অভিধানের বক্তব্যও দেখুন :

هلَّ الهلالُ: নতুন চাঁদ উঠল

هلَّ الشهرُ: চান্দ্রমাস শুরু হল

هل: চান্দ্রমাসের আরম্ভ, নতুন চাঁদের উদয়

هلال:

নতুন চাঁদ, মাসের প্রথম দুই রাত কিংবা প্রথম থেকে তৃতীয় বা সপ্তম রাত বা মাসের শেষের দুই রাত অর্থাৎ ছাব্বিশ-সাতাশের তারিখের চাঁদকে هلال বলা হয়, অবশিষ্টাংশ রাতের চাঁদকে قمر বলা হয়।

(আরবী-বাংলা অভিধান, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন-২০০৬, ২য় খ-, পৃষ্ঠা ১০২৭)

৮. আল ফারাইদুদ দুররিয়্যিা (আরবী-ইংরেজি)

هلَّ هلاً: To fall heavily (rain). To appear (new moon). To begin (lunar month). To rejoice …

أهلَّ، إهلالاً، وأُهلَّ To appear (new moon). To raise the voice in saying لبيك (Here I am)

هلال ج أهلة وأهاليل...: New moon, Crescent of the moon. The two first or two last days of a lunar month. Anything crescent- shaped.

(الفرائد الدرية في اللغتين العربية والإنكليزية *Arabic-English dictionary for the use of students. by The Rev. F. J.G. Hava, S.J. page 824, © 1899, Catholic press, Beyrut)*

৯. এ কম্প্রিহেনসিভ পারসিয়ান-ইংলিশ ডিকশনারি :

هلَّ: hall (v.n.), Appearing (the new moon); shouting for joy;

هلَّ هلَّhill, The beginning of a month, the appearance of the new moon. هلال: halal, hilal, The beginning of a shower;

_hilal (v.n. 3 of هلَّ) Agreeing (with one) by The month, or from month to month, or new moon to new moon. The new moon : also the moon on the wane, especially the first and last two or three days (the

moon being called qamar the rest of the month); the point of spear; a two headed hunting spear.

(A Comprehensive Persian- English dictionary by F. Steingass. Ph.D. (1825-1903), page; 1505, Fifth Impression - 1963, Routledge & kegan paul limited, London.)

১০. এ ডিকশনারি অফ মডার্ন রিটেন এ্যারাবিক :

To Appear, come up, show (new moon); to begin, set in (month) … to appear (new moon)

new moon; half moon, crescent; أهالیل ، أهلة .pl: هلال .parenthesis; any crescent shaped object

هلاليٌّ: crescent shaped lunate, sickle-shaped.

(A dictionary of modern written Arabic by hans wehr (1909-1981), Edited by J. Milton cowan (1907-1993), page: 1030, 3rd printing, Macdonald & Evans limited, London.)

১১. অরটাবেট’স এ্যারাবিক-ইংলিশ ডিকশনারি :

هلّ، يَهُلُّ، هلاّ : To rain heavily, Appear (new moon); begin with the new moon (lunar month). Rejoice; shout, cry out....

To appear (new moon); look at the new moon.:أهلّ . praise god

...

New moon; the first or last quarter of the :هلال ج أهلة وأهاليل

moon. crescent. [parenthesis]

[*Wortabet's Arabic-English dictionary, by William Thomson wortabet with the collaboration of Rev. john wortabet. M.D. and Professor Harvey porter. phd., librairie du liban, Beirut.(1984)]*

উদাহরণস্বরূপ শুধু বারোটি অভিধানের উদ্ধৃতি পেশ করা হল। বিষয়টি এমনিতেও স্পষ্ট ছিল, তারপরও ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের খাতিরে উদ্ধৃতিগুলো পেশ করা হল। মোটকথা 'হিলালে'র অর্থের মধ্যে এমন কোনো ধোঁয়াটে বা ধূম্রাচ্ছন্ন ভাব নেই যে, কেউ তাকে চিনতে পারবে না। 'হিলাল' বাঁকা ও চিকন তো বটে কিন্তু সুস্পষ্ট ও প্রকাশিত। নতুবা পৃথিবী থেকে তা কীভাবে দেখা যাবে? এটা বড়ই মূর্খতা যে, কেউ 'মিহাক' (অমাবস্যা) এবং 'হিলাল' (দৃশ্যমান ধনুকাকৃতির উজ্জ্বল চাঁদ) -এর মাঝেও পার্থক্য করতে পারবে না!

ইংরেজী অভিধানে 'নিউমুন' -এর অর্থ

এবার 'নিউমুন' এর অর্থ দেখুন:

১) শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি :

New:

new moon:

(a) The moon when it appears as a slender crescent shortly after its conjunction with the sun.

(b) The time when this occurs; Astronomy: The Time at which the moon is in conjunction with the sun.

(c) The ancient Hebrew festival celebrated at the time of the new moon.

(Shorter Oxford English Dictionary, Vol. 2, page: 1914, Fifth Edition, 2002©, Oxford university press)

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ‘নিউমুনে’র প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ, দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির চাঁদ। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় সম্মিলনের অবস্থা (Conjunction)-কে ‘নিউমুন’ বলা হয়।

২) দ্যা অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি :

new moon:

1. The moon when first seen as a slender crescent shortly after its conjunction with the sun.

2. The time when the new moon appears; also Astron. (Astronomy) The Time at which the moon is in conjunction with the sun.

b. The festival celebrated by the ancient Hebrews at the time of the new moon.

(The Oxford English Dictionary, Vol. 7, page: 119, OXFORD at the clarendon press, printed in the great Britain at the university press oxford, First Published 1933, reprinted 1961)

তের খণ্ডের এই বিশাল অভিধানে ধনুকের আকৃতিতে প্রথম দৃষ্টিগোচর হওয়া চাঁদকেই ‘নিউমুনে’র মূল অর্থ বলা হয়েছে। আর কনজাঙ্কশান বা সম্মিলন অবস্থাকে ‘নিউমুনে’র এস্ট্রোনমিক্যাল পারিভাষিক অর্থ হিসাবে দেখানো হয়েছে। সুতরাং ২ : ১৮৯ আয়াতে الأهلة এর তরজমায় ‘নিউমুনস’কে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কিসের ভিত্তিতে এস্ট্রোনমির পারিভাষিক অর্থের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন?

সামনে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কিছু ইংরেজি অভিধান থেকে ‘নিউমুনে’র অর্থ লক্ষ্য করুন। সবাই এ শব্দের মূল অর্থটিই লিখেছেন, অর্থাৎ দৃশ্যমান ধনুকাকৃতির প্রথম চাঁদ। শাস্ত্রের বিশেষ পারিভাষিক অর্থকে তারা উল্লেখই করেননি।

৩) ক্যামব্রিজ এ্যাডভান্সড লার্নার’স ডিকশনারি :

new moon:

the moon when it is shaped like a Crescent, or a time when it is shaped like this: it was dark now and the silver of a new moon could be seen overhead. ◯ the team discovered that the planet is 0.02º c warmer at full moon then at new moon.

(Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, page: 957, 3rd Edition, © Cambridge University press 2008)

৪) অক্সফোর্ড ইংলিশ রেফারেন্স ডিকশনারি :

new:

new moon 1. the moon when first seen as a crescent after conjunction with the sun.

2. the time of its appearance

(Oxford English Reference Dictionary, Edited by judy pearsall and Bill Trumble, page: 976, © Oxford university press 1995, Oxford, Newyork)

৫) নিউ অক্সফোর্ড এ্যাডভান্সড লার্নার’স ডিকশনারি :

new moon 1. the moon when it looks like a thin curved shape (= a crescent)

2. the time of the month when the moon has this shape.

(New Oxford Advanced Learner’s Dictionary by A.S. Hornby (1898-1978) page 1025 7th Edition 2005, © Oxford university press 2005)

৬) কলিন্স কোবিল্ড এ্যাডভান্সড লার্নার’স ইংলিশ ডিকশনারি :

new moon : A new moon is the moon when it first appears as a thin curved shape at the start of its four-week cycle.

The new moon is also the time of the month when the moon appears in this way.

(Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary, page: 961, 5th Edition 2006, Harper Collins Publishers, Glasgow Great Britain.)

৭) লংম্যান ডিকশনারি অফ কনটেম্পোরারি ইংলিশ :

new moon: 1. the moon when it first appears in the sky as a thin Crescent.

2. the time of the month at which the moon is first seen.

(Longman dictionary of contemporary English, page:1105, 4th Edition with writing assistant 2005, pearson education limited, England.)

৮) চ্যাম্বার'স কম্প্যাক্ট ডিকশনারি :

new moon: 1. the moon when it is visible as a narrow waxing crescent.

2. the time when the moon becomes visible in this form.

(Chambers Compact Dictionary, page: 526, © chambers harrap publishers Ltd. 2005)

আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন, এ সব অভিধানে 'নিউমুনে'র অর্থ শুধুই দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির চাঁদকে বলা হয়েছে। সম্মিলন অবস্থার

(Conjunction) অর্থ লেখাই হয়নি। কারণ তা বিশেষ একটি শাস্ত্রীয় পরিভাষা। সাধারণ অভিধানে এ ধরনের অর্থ উল্লেখ করা জরুরি নয়।

কিছু কিছু অভিধানে যদিও উভয় অর্থ লেখা হয়েছে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়নি যে, এটি হল আভিধানিক এবং প্রচলিত অর্থ আর এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পারিভাষিক অর্থ। এটা হচ্ছে অভিধানগুলোর দুর্বলতা। এ ধরনের তিনটি অভিধানের উদ্ধৃতি দেখুন:

৯) দ্যা ওয়ার্ল্ড বুক ডিকশনারি :

New moon: 1. the moon when seen as a thin crescent with the hollow side on the left.

2. the moon when its dark side is towards the earth, appearing almost invisible: At times of new moon the moon is between us and the sun.

(The World Book Dictionary, v. 02, page: 1400, 1980 Edition, World Book Childcraft International Inc, printed in USA)

১০) দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবস্টার নিউ এনসাইক্লোপেডিক ডিকশনারি :

New moon: 1. the period of time when the moon is in a direct line between the sun and the earth so that its illuminated side is not visible from the earth; the moon shortly after the phase when it is visible as a crescent.

(The International Webster new Encyclopedic Dictionary of the English Language & library of useful knowledge, page: 640, © 1971, Tabor house, Newyork)

১১) দ্যা রেন্ডম হাউজ ডিকশনারি :

New moon: 1. the moon either when in conjunction with the sun or soon after, being either invisible or visible only as a slender crescent.

2. the phase of the moon at this time.

(The Random House Dictionary of the English Language, page: 963, © 1983, Editor in chief: jess stein, random house, Newyork)

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহ, ইসলামী ফিকহ ও শরীয়তের শব্দ হচ্ছে 'হিলাল' এবং এর অর্থ একেবারেই পরিষ্কার। 'মিহাক' শেষ হওয়ার পর পৃথিবী থেকে দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির নতুন চাঁদ।

যারা 'হিলালে'র তরজমা 'নিউমুন' করেছেন, স্পষ্টতই এ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থে 'নিউমুন'। একে 'এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন' বানিয়ে দেওয়া পরিষ্কার জালিয়াতি। অভিধানে হিলাল এবং নিউমুন শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে এমন কোনো শক-সন্দেহ নেই যে, তাতে কেউ ধোঁকায় পড়বেন। যেমনটি পাঠক অভিধানের বেশ কিছু উদ্ধৃতিতে দেখেছেন। উদ্ধৃতি তো রয়েছে প্রচুর, শুধু উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পেশ করা হল।

ইংরেজী অনুবাদকগণকেই জিজ্ঞাসা করুন

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেই কুরআনের কয়েকটি অনুবাদ থেকে ২ : ১৮৯ আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদেরকে এবং অন্য আরো অনুবাদককে এ কথা জিজ্ঞেস করতে পারতেন, 'হিলালে'র অনুবাদে 'নিউমুন' লিখে আপনারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন? (যদি বাস্তবেই তার কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে থাকে)। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চান্দ্রমাসের ২১৬ পৃষ্ঠার তালিকায় সর্বপ্রথম আল্লামা ইউসুফ আলীর অনুবাদ উল্লেখ করেছেন। সামনে গিয়ে ৫ম

নম্বরে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনুবাদ উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেননি যে, উভয় তরজমা এক ও অভিন্ন এবং একই ব্যক্তির অনুবাদ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে কপি থেকে প্রথম উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন, তাতে অনুবাদকের নাম এভাবে A. Yusuf Ali লেখা হয়েছে। তিনি A. কে আল্লামা বানিয়ে দিয়েছেন। অথচ A. এখানে আব্দুল্লাহ এর সংক্ষেপিত রূপ। অনুবাদের ঐ কপির শেষে অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী আরবীতে লেখা আছে। সেখানে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে,

المترجم في سطور

ترجمة عبد الله يوسف علي

যা হোক, বলতে চাচ্ছিলাম, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনুবাদটি শুধু অনুবাদ নয়। তার নাম তো হল, ‘দ্যা হলি কুরআন ট্র্যান্সলেশন এন্ড কমেন্ট্রি’। তো ২ : ১৮৯ আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশের তরজমা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনুবাদে এভাবে আছে :

“They ask thee concerning the new Moons. Say, they are but signs to mark fixed periods of time in (the affairs of) men, and for pilgrimage.”

পরে তিনি ‘নিউমুন’ শব্দের উপর ২০২ নং টীকা লিখেছেন:

...

As a measure of time, where the lunar calendar is used, the new moon is one great sign, for which people watch with eagerness. Muslim festivals, including the pilgrimage, are fixed by the appearance of the new moon.

(The Holy Quran, Translation and commentary, by A. Yusuf Ali (1872-1953) published by American trust

publications for the muslim student's association of the united states & Canada, page: 75. 2nd edition, © june, 1977)

জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী টীকায় কত স্পষ্টভাবে লিখেছেন, ‘নিউমুন’ দেখেই মুসলিমদের হজ্বসহ অন্যান্য সন্দেহপূর্ণ তারিখগুলো নির্দিষ্ট করা হয়। তিনি এও বলেছেন যে, চান্দ্র ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে ‘নিউমুন’ একটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য লোকেরা চাঁদ দেখার প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়।

এই টীকাটি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উল্লিখিত কপিতেই রয়েছে। এমনিভাবে মালিক ফাহাদ কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত সংশোধিত সংস্করণেও রয়েছে– যার উদ্ধৃতি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তালিকার ৫ম নম্বরে প্রদান করেছেন!!

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তালিকার ৬ষ্ঠ নাম্বারে আহমাদ আলী-এর অনুবাদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। আহমাদ আলী ‘নিউমুন’ বলে কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা ২ : ১৮৫ আয়াতের فمن شهد منكم الشهر -এর তরজমা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি এর তরজমায় লিখেছেন:

... so when you see the new moon you should fast the whole month;

(Al-quran A contemporary translation by Ahmed ali, page: 33, Oxford university press, Bombay KalcattaMmadras, © 1987)

আয়াতের এ অনুবাদ প্রচলিত শাব্দিক অনুবাদ থেকে কিছুটা ভিন্ন, কিন্তু অশুদ্ধ নয়। আরবী ভাষায় الشهر কে هلال এর অর্থে ব্যবহার করা হয়। এখানে আমরা শুধু এটুকু দেখাতে চেয়েছি যে, অনুবাদক জনাব আহমাদ আলী ‘নিউমুন’ দ্বারা দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির নতুন চাঁদই বুঝিয়েছেন। অমাবস্যার চাঁদ নয়।

আর এ কথা শুধু আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী ও আহমাদ আলীর বেলাতে নয় বরং যারাই আরবী 'হিলাল' শব্দের অনুবাদ 'নিউমুন' করেছেন, তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল এটাই। এখানে 'নিউমুন' বলে 'এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন' উদ্দেশ্য নেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না!

পাঠকগণ নিজেরাও কুরআনে কারীমের ইংরেজী অনুবাদ দেখতে পারেন যেগুলোতেهلال - এর অনুবাদ 'নিউমুন' শব্দের মাধ্যমে করা হয়েছে এবং টীকা, ব্যাখ্যায় (অথবা ২ : ১৮৫-এর অনুবাদের মাধ্যমে) পরিষ্কার ভাষায় নিউমুন দেখার কথাও বলে দেয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, 'নিউমুন' দিয়ে যদি অমাবস্যার চাঁদই উদ্দেশ্য হত তাহলে দেখার কথা কেন লিখবেন? উদাহরণ স্বরূপ দেখুন:

১. তফসীরে মাজেদী :

Tafsir ul Qur'an translation and commentary of the holy Qur'an, by maulana Abdul Majid Daryabadi, First Edition: 1991, published by Darul ishaat, Urdu bazar Karachi-1, Pakistan.

২. তফসীরে মারেফুল কুরআন :

Ma'ariful Qur'an A comprehensive commentary on the holy Qur'an, by Maulana Mufti Muhammad Shafi, Translated by Muhammad Shamim, Revised by Maulana Muhammad Taqi Usmani, © 1998 Maktaba-e- Darul-Uloom,Karachi

৩. তাফসীরে উসমানী :

The Noble Qur'an, Tafseer-e-Usmani, English Translated by: Ashfaq Ahmad, 1st Edition-1992, Idara Ishaat-e-Diniyat (p) Ltd., Delhi

৪. ট্র্যান্সলেশন অফ দ্যা মিনিং অফ দ্যা নোবেল কুরান :

Whoever of you sights (the crescent on the first night of) the month (of Ramadan i.e, is present at his home), he must observe saum (fasts) the month. (2: 185, page: 37)

(Translation of the meaning of the Noble Quran in the English Language, by Muhammad Taqi-ud-din al-hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan, © 1419 h, King Fahad Complex for the printing of the Holy Quran, Madinah, K.S.A)

৫. দ্যা কুরান ইন্টারন্যাশনাল ট্র্যান্সলেশন :

So whoever sights (the new moon of) the month, let him fast it.. (2: 185, page : 46-47)

(The Quran Saheeh International Translation, Edited by A.B. Al-Mehri, © 2010, Maktabah Booksellers and publishers, Birmingham, United Kingdom)

যেহেতু 'নিউমুন' জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় সম্মিলন অবস্থা (Conjunction) ও চাঁদের জন্ম বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং আজকাল এই পরিভাষা সাধারণ মানুষের নিকটও পরিচিত, তাই এ ক্ষেত্রে যেন কোনো বেখবর লোক ধোঁকায় পতিত না হয় কিংবা আমানত ও দিয়ানতের দৈন্যের ফলে অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ না পায়, সেজন্য অনেক ইংরেজী অনুবাদকগণ 'হিলাল' (هلال)-এর তরজমা 'নিউমুনে'র স্থলে 'ক্রিসেন্ট' অথবা 'ক্রিসেন্ট মুন' শব্দের মাধ্যমে করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ জামিয়া আল-আযহারের রচনা ও অনুবাদ বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত ড. মুহাম্মদ মুহাম্মদ আল-খাতিব-এর অনুবাদ 'মাআনিল কুরআনিল কারীমে' ২ : ১৮৯ নং আয়াতের তরজমা

এভাবে লেখা হয়েছে:

They ask you of the Crescent moons. Say: they are times fixed for mankind and for pilgrimage ... (2 : 189, page : 37)

(The Bounteous Koran, by Dr. M.M. Khatib, Authorised by Al Azhar, 1984, First published 1986, Macmillan press, London)

আরো দেখুন:

১. দ্যা কুরান, এ নিউ ট্র্যান্সলেশন :

(The Quran, A new translation by M.A.S. Abdel Haleem, © M.A.S. Abdel Haleem 2004, 2005, Oxford University Press)

২. টুওয়ার্ডস আন্ডার্স্টেন্ডিং দ্যা ইভার গ্লোরিয়াজ কুরান:

(Towards Understanding The Ever-Glorious Quran, by Muhammad Mahmud Ghali, Ph.D, Revised by: Ali Ali Ahmad Shaban Ph.D, Ahmad Shafiq Al-Khatib Ph.D, Aelfwine Acelas Mischler M. A., Third Edition 2003, Dar An-nashr for Universities- Egypt.)

৩. দ্যা নোবেল কুরান :

(The Noble Quran, A new Rendering of its Meaning in English by Abdalhaqq and Aisha Bewley, © 1432Ah /2011Ce Abdalhaqq and Aisha Bewley, Diwan press, Norwich, England.)

৪. দ্যা কুরান, ট্রান্সলেশন টু ইংলিশ :

(The Quran, translated to English by Talal Itani, © 2009-2012 Talal A. Itani, Published by Clear Quran, Dallas, Beirut)

মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানীর ইংরেজী অনুবাদ

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমও কুরআনুল কারীমের ইংরেজী তরজমা করেছেন। যা 'দ্যা মিনিংস অফ দ্যা নোবেল কুরআন' (The Meanings of the Noble Qur'an with explanatory notes) নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে هلال এর তরজমা 'নিউমুন' শব্দের মাধ্যমে করা হয়েছে। জানা কথা যে, তিনিসহ সকল ইংরেজী অনুবাদক এর দ্বারা অমাবস্যার পর দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির নতুন চাঁদকেই বুঝিয়েছেন। তারপরও সংশয়বাদীদের সংশয় নিরসনের জন্য বর্তমান যুগের সর্বজনমান্য এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কাছে এ বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এ শব্দ দ্বারা আপনার কী বুঝানো উদ্দেশ্য? আমাদের এখানে তো অনেকে 'হিলাল'কে 'এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন' বানিয়ে ফেলছেন?

তিনি উত্তরে লিখেছেন,"যেসকল ইংরেজী অনুবাদক هلال -এর অনুবাদ 'নিউমুন' করেছেন, তারা আভিধানিক অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন, ঐ অর্থ নয় যা 'অমাবস্যা'র অবস্থাকে বুঝায়। তাই এর দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষার 'নিউমুন' বুঝা– যা অমাবস্যার মধ্যে হয়ে থাকে– কোনোভাবেই ঠিক নয়। 'হিলাল' শব্দের ধাতুমূলের মধ্যেই প্রকাশিত হওয়ার অর্থ রয়েছে। ফলে কোনভাবেই একে 'অমাবস্যার অবস্থা' বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর এই তরজমা থেকে 'এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনে'র মাধ্যমে চান্দ্রমাস শুরু করার প্রমাণ পেশ করা বিলকুল গলদ।

আমিও ইংরেজী তরজমাতে 'নিউমুন' শব্দটি আভিধানিক অর্থ হিসেবেই উল্লেখ করেছি, আর যেহেতু এটাকে ভুল ব্যবহার করা

হচ্ছে, তাই ইনশাআল্লাহ সামনে এর স্থলে ক্রিসেন্টমুন লিখে দেয়া হবে। (২২/০১/১৪৩৬ হি.-তে লেখা হযরতের চিঠিটি লেখকের কাছে সংরক্ষিত আছে।)

‘হিলালে’র অর্থ বর্ণনা এবং ‘হিলালে’র অর্থ বিকৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য এ পরিমাণ আলোচনাও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। আল্লাহ তাআলা একে কবুল করুন এবং সংশয় সৃষ্টিকারীদের অপচেষ্টাকে দূরীভূত করুন। আমীন।

যেমনটা পূর্বেও বলেছিলাম, এসব আলোচনা শুধু সংশয় নিরসনের জন্যই পেশ করা হল। নতুবা যেমনটি বেশ কয়েকবার ইঙ্গিত করেছি যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেও ‘হিলালে’র আভিধানিক ও শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ভালোভাবেই জানেন। এ বিষয়ে তার কয়েকটি সুস্পষ্ট বক্তব্য পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে, আর কিছু সামনে আসছে। এখানে শুধু একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি :

তিনি তার বইয়ের ৫ম অধ্যায়ে লিখেছেন:

“নবচন্দ্র কখনো হ্রাস পায় না, আর বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে সেটা আর নবচন্দ্র থাকে না। তাই নবচন্দ্র হ্রাস-বৃদ্ধি হবার প্রশ্ন আসে না।” (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা: ২১৫)

যদি ‘হিলাল’ ও ‘নবচন্দ্র’ তার কাছে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে থাকে তাহলে হ্রাস-বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তিনি কেন ওঠালেন?

যদি ‘হিলাল’ (নবচন্দ্র) অমাবস্যার পরের ধনুকাকৃতির উজ্জ্বল চাঁদ না হয় তাহলে তিনি কী করে বললেন যে, বৃদ্ধি পেলে তা আর নবচন্দ্র থাকে না। অমাবস্যার চাঁদ কি বৃদ্ধি পেতে পারে? তা তো অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকে? অন্ধকার যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আরো অন্ধকার হবে। আর নবচন্দ্রের মধ্যে আলো না থাকলে তিনি কীভাবে বললেন, তা কখনো হ্রাস পায় না? বেচারা গায়ের জোরে যতই বলতে চাচ্ছেন যে, ‘হিলাল’ মানে হচ্ছে অমাবস্যার চাঁদ কিন্তু বিভিন্ন

জায়গায় কলম থেকে তার মনের সুপ্ত কথাটাই বেরিয়ে আসছে।

নবচন্দ্র বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথেই তা পুরাতন হয়ে যায়– এই দর্শন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ব্যক্তিগত দর্শন। তিনি তো একবার এ কথাও বলেছিলেন, অমাবস্যার চাঁদই নতুন চাঁদ। দর্শনযোগ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলে তা পুরাতন হয়ে যাবে। এখন বলছেন, আলো বৃদ্ধি পেলে পুরাতন হবে। তিনি তার বইয়ের ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যারা সর্বপ্রথম নবচন্দ্র দর্শন করেন সেটাই নবচন্দ্রের দর্শন। পরে যারা দেখবেন সেটা পুরাতন চন্দ্র দর্শন হবে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এই বইয়ের একটি পুরাতন সংস্করণ ৩০-৪-২০০৭ ইং তারিখে দেয়া তার স্বাক্ষরসহ আমাদের কাছে আছে। ঐ সংস্করণের ভূমিকাতেও তিনি এ কথা বলেছেন যে, "প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে বিষয়টাকে একেক আলেম একেকভাবে বুঝেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং একেকভাবে অনুসরণ করতে বলেছেন। ফলে মুসলিম উম্মাহ তথা পুরা মানবজাতির মধ্যে যুগ যুগ ধরে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে আছে, আর মুসলিম ধর্ম পালনে অহেতুক বিড়ম্বনা ভোগ করতে হচ্ছে। মানবসৃষ্ট এই সমস্যার সহজ সমাধান একান্ত জরুরী বিধায় এই পুস্তকখানা লেখার কাজে হাত দিতে হলো।" (পৃষ্ঠা ৮)

বইটির ঐ সংস্করণের পরিশিষ্টের প্রথম অধ্যায়ে ২ : ১৮৯ নং আয়াতের অনুবাদ ও তফসীর এভাবে লিখেছেন:

"আয়াতের অর্থ: লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে নবচন্দ্র সম্পর্কে। বলে দিন, ইহা (নবচন্দ্র) সময় নির্ধারণ করার মাধ্যম, মানবজাতির জন্য (লিন্নাছ) এবং হজ্জের জন্য।

ব্যাখ্যাসহ মন্তব্য:

এই আয়াতে আল্লাহ চন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের কথা বলেছেন। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারে নূতন চন্দ্রোদয়, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি বা এর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এর জবাবে

আল্লাহ বলছেন, এই চাঁদ সারা বিশ্বের মানুষের জন্য মাস গণনা করার মাধ্যম। নূতন চন্দ্রোদয় দিয়ে মাস আরম্ভ হবে[2] এবং এর বৃদ্ধি ও হ্রাস দিয়ে মাস শেষ হবে[3]। ফলে পরবর্তী মাস আরম্ভ হবে আরেক নূতন চন্দ্রোদয় দিয়ে। এ ভাবে জিলহজ্জের চান্দ্রমাস আরম্ভ হবে আরেক নূতন চন্দ্রোদয় দিয়ে। এ ভাবে জিলহজ্জের চান্দ্রমাস আরম্ভ হলে হজ্জের দিন তারিখ নির্ধারণ করা যাবে। এই চান্দ্রমাস কোন দেশ বা এলাকার ভিত্তিতে হবে না। সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ। তাই বিশ্বের যে কোন স্থানেই নূতন চন্দ্রোদয় হলে সারা পৃথিবীতে চান্দ্রমাস আরম্ভ হয়ে যাবে।[4]

অথচ এই সহজ বিষয়টা সঠিক ব্যাখ্যার অভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে আছে, যা অনতিবিলম্বে দূর করা দরকার[5]। তাহলে সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একই সাথে বা দিনে (একই সময়ে নয়) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালিত হবে।” (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা ৩১-৩২, ৩০-৪-২০০৭ ইং তারিখের স্বাক্ষরসহ প্রচারিত কম্পোজ সংস্করণ। যার ব্যপারে তিনি লিখেছিলেন, বইখানা আগামী ১৫-৬-০৭ তারিখের মধ্যে প্রেসে যাবে।)

পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অনেক কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। আমার প্রশ্ন হল, আপনি ঐ কম্পোজ কপিতে যা কিছু লিখেছেন তাও ভুলসংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিদ্যমান বিভেদ ও অনৈক্য দূর করার উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন। তাহলে সেটা আবার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হল কেন?

আয়াতের অনুবাদে আপনি ‘হিলাল’ ও ‘মাওয়াকিত’ কোনো শব্দের অনুবাদেই ‘সমূহ’ লিখেননি। ‘মাওয়াকিত’-এর অর্থ ‘সূচনাকারী’ অথবা ‘আরম্ভকারী’ কিছুই বলেননি। ‘হিলাল’কে অমাবস্যাও বললেন না। তারপরও সে সময় আপনার দৃষ্টিতে এ আয়াতের

মাধ্যমে আপনার দাবী (বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করতে হবে) প্রমাণিত হয়েছিল। তাহলে পরে তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার প্রয়োজন পড়ল কেন?

স্বাভাবিক নিয়ম তো হল, কোনো কিতাবের পরবর্তী সংস্করণ পূর্বের চেয়েও বেশি নির্ভুল ও অধিকতর ভালো হয়। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো– তার বইয়ের প্রত্যেক পরবর্তী সংস্করণ পূর্ববর্তী সংস্করণের চেয়ে ভুল-ত্রুটি ও বিকৃতির দিক দিয়ে শুধু অগ্রসরই হচ্ছে!

পূর্ববর্তী ঐ সংস্করণের বক্তব্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, প্রথম থেকেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল যে, 'হিলাল' অমাবস্যার চাঁদ নয় বরং অমাবস্যার পরের দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির উজ্জ্বল চাঁদের নাম হচ্ছে 'হিলাল'। এর বিপরীতে তিনি যা কিছু লিখছেন সবই নিজের মনের বিরুদ্ধে লিখছেন।

তারপরও বাস্তবেই যদি কোনো বিভ্রমের শিকার তিনি হয়ে থাকেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আল-বেরূনীর বক্তব্য, হিলালের বিকৃতির পর্যালোচনায় উল্লিখিত সুস্পষ্ট তথ্য-উপাত্তগুলো এবং স্বয়ং তার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত বক্তব্যগুলো যদি চিন্তা ও ফিকিরের সাথে পড়েন, ইনশাআল্লাহ বিভ্রম দূর হয়ে যাবে।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

নোট : প্রবন্ধের এই কিস্তিতে অনেক ইংরেজী অভিধানের উদ্ধৃতি এসেছে। বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে এই উদ্ধৃতিগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছে আমার ছাত্র সায়ীদুল হক ইবনে মোছাদ্দেক হোসাইন।

এগুলোর মর্ম উদ্ধার এবং উপযুক্ত স্থানে এগুলোর ব্যবহার করতে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তাছাড়া এই প্রবন্ধে বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন দেশ বিদেশের অনেকে। সকলের নাম নিতে গেলে পত্রিকার পাতায় আরো দুই তিন পৃষ্ঠা দরকার। আল্লাহ তাআলা সকলকে এবং সকলের খেদমতকে কবুল করুন। অন্য কোনো প্রসঙ্গে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত শুকরিয়া আদায় করব।

جزاهم الله تعالى خيرا وشكر سعيهم في الدنيا والآخرة.

---

[১]ড় এটা কিন‘ এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন নয়, বরং ক্রিসেন্ট নিউমুন । আরবীতে স্পষ্টই বলেছেন তিনি أوائل الشهر قمرড়ড় যা ক্রিসেন্ট মুনের জন্যই প্রযোজ্য, এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনের জন্য কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয় । (আবদুল মালেক)

২ অর্থাৎ নবচন্দ্রের উদয় দেখে । ঐ সংস্করণের শুরুতে ১০ম পৃষ্ঠায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব লিখেছেন: “তাই হিজরী মাস গণনা করতে হয় চন্দ্রোদয় দেখে ।” এ বক্তব্য ৭ম সংস্করণেও হুবহু এভাবেই রয়েছে । দেখুন, পৃষ্ঠা ১৫, পর্ব ১ ।

[3] ড়ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যাকে ‘বৃদ্ধি ও হ্রাস’ বলছেন, সাধারণ প্রচলনে তাকে হ্রাস ও বৃদ্ধি বলা হয় । অন্যরা প্রচলিত এই বর্ণনারীতি গ্রহণ করেছেন । পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সকলের উপর বিরক্ত হয়েছেন, কেন তারা হ্রাস-বৃদ্ধি লেখেন? অথচ তিনি নিজেই একটু আগে লিখে এসেছেন চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি ।

[4] ড়ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! এটা আপনার দাবী । আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু

নেই। হিলাল সকল মানুষের জন্যই মিকাত। কিন‘ সকলে তার থেকে মিকাতের ফায়েদা এভাবে অর্জন করতে হবে যে, প্রত্যেক এলাকার মানুষ প্রথম দর্শনের অপেক্ষায় থাকবে এবং ঐ প্রথম দর্শন থেকে প্রত্যেকে তার সময় নির্ধারণ করবে। এটা একটি অতিরিক্ত বিষয় যার ব্যাপারে আয়াতে কারীমা নিশ্চুপ। যখন মানুষের জন্য প্রথম দর্শনের খোঁজ নেওয়া সম্ভব ছিল না তখনও হিলাল মিকাত ছিল। সকলেই এর দ্বারা মিকাতের ফায়েদা অর্জন করত। আয়াতেরللناسড় -এর মধ্যে ঐ যামানার লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এজন্য للناس শব্দের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে বারবার একই দিনে রোযা ও ঈদের কথা প্রমাণ করতে চা”ছন তা কোনোভাবেই এ আয়াত দিয়ে প্রমাণ হওয়ার নয়।

[৫]ড় কিন‘ আপনার ‘সঠিক ব্যাখ্যা’র বিরোধিতা আপনিই তোড় পরবর্তী সংস্করণে করেছেন!

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

ডিসেম্বর ২০১৫, সফর ১৪৩৭

‘চান্দ্রমাস’ : একটি পর্যালোচনা- ৬ : শেষ কিছু নিবেদন

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

যেমনটি আমি বলে এসেছি, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হকের এই বইয়ের পর্যালোচনাটি সংক্ষেপে লেখা সত্ত্বেও দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে। সামনের আলোচনার শুধু শিরোনামগুলো দেখে নিতে অনুরোধ করছি-

১. ‘চান্দ্রমাস’ বইয়ে নতুন জিনিস কী?

২. বইয়ের মাঝে বিদ্যমান বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা।

৩. ২ : ১৮৯ ছাড়াও অন্যান্য বহু আয়াতের বিকৃতি।

৪. কিছু জলজ্যান্ত মিথ্যা।

৫. চাঁদ দেখা বিষয়ক হাদীসসমূহের বিকৃতি ও তার অবমাননা।

৬. হাস্যকর, বায়বীয় কথাবার্তার কিছু নমুনা (মাত্র পনেরটি উদাহরণ)।

৭. জ্যোতির্শাস্ত্রে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পারদর্শিতা।

৮. ‘বে-সনদ আলেমে’র দর্শন।

৯. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দৃষ্টিতে নিজের মর্যাদা।

১০. প্রকৌশলী জনাব শামছুল হক চৌধুরীর বই ‘চান্দ্রমাস বইয়ের বিভ্রান্তি’ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চয়ন।

১১. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সমীপে সবিনয় কিছু নিবেদন।

এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা যদিও এখনো প্রায় একশ’ পৃষ্ঠার বেশি (হাতে লেখা) জমা আছে, যা আলকাউসারে ছাপা হচ্ছে না, তথাপি বিগত জুমাদাল উলা, জুমাদাল উখরা, রজব ও যিলহজ্ব ১৪৩৬ হিজরী সংখ্যা, সেই সাথে গত মুহাররামুল হারাম ১৪৩৭ হিজরী সংখ্যায় প্রকাশিত মোট পাঁচটি কিস্তি আলহামদুলিল্লাহ পর্যালোচনাধীন বইয়ের হাকীকত বুঝতে যথেষ্ট। বিশেষত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি এই পাঁচ কিস্তির আলোচনাগুলো সত্যসন্ধানী মন নিয়ে চিন্তা সহকারে পড়েন তাহলে ইনশাআল্লাহ তিনি তার মৌলিক ভ্রান্তিগুলো বুঝতে পারবেন এবং আশা করা যায়, তিনি সত্যের সন্ধান লাভে সমর্থ হবেন।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে, ‘হিলাল’ এবং বৈজ্ঞানিক ‘নিউমুন’ দু’টোকে গুলিয়ে ফেলেছেন, গত সংখ্যায় সে সম্পর্কে পর্যালোচনা হয়েছে। শুধু এই একটি আলোচনাতেই তার জন্য চিন্তা-ভাবনার এবং শিক্ষাগ্রহণের বহু উপাদান বিদ্যমান রয়েছে, যদি তিনি শিক্ষাগ্রহণ করতে চান। আশ্চর্যের বিষয় হল, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অমুসলিমদের খাতিরে ইসলামী ‘হিলাল’কে বৈজ্ঞানিক ‘নিউমুন’ বানাচ্ছেন। অথচ বহু অমুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরও এই সত্য জানা আছে যে, ইসলামী হিলাল আর বৈজ্ঞানিক ‘নিউমুন’ (এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন) এক নয়। পীর মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশ্বন্দী দামাত বারাকাতুহুম তার এক বক্তৃতায় এ বিষয়ে একটি চমৎকার কাহিনী

শুনিয়েছেন, তিনি বলেন,

"... একদিন আমার স্মরণ হল, ওয়াশিংটনে একটি মহাকাশ যাদুঘর Space Museum রয়েছে। আপনি ঐ Space Museum এ গেলে বিস্ময়কর সব Scientific research (বৈজ্ঞানিক গবেষণা) দেখতে পাবেন। ওখানে আমি যখনই যেতাম, আমার দশ থেকে বারো ঘন্টা সময় ব্যয় হয়ে যেতো। কিন্তু কখনোই আমি তা পুরোপুরি দেখে শেষ করতে পারিনি। সবসময়ই কিছু অংশ দেখে ফিরে আসতাম।

ওখানে আমি একদিন জানতে পারলাম, এখানে এমন একটি বিভাগ (Section) রয়েছে, কর্তৃপক্ষ যেখানে একটি বিশেষ চ্যানেল খুলে রেখেছে। যাতে সর্বক্ষণ সম্প্রচার (Broadcast) করা হচ্ছে, 'মহাকাশে কী ঘটছে'? What's happening in space?

তারা প্রতিনিয়ত এই সংবাদই দিয়ে থাকে। মহাশূন্যে যা কিছু হচ্ছে তার সংবাদ জানাতে হবে, এটাই তাদের কাজ। তখন আমার মনে হল, যেহেতু এরা মহাকাশের খবরাখবর প্রচার করে তাই চাঁদ সম্পর্কিত তথ্যও তাদের কাছে থাকবে। অতএব আমি এদের নম্বর টুকে নিলাম এবং বাসায় এসে আমি তাদের ফোন করলাম। বললাম, জ্বী আমি অমুক এলাকায় থাকি, আমার জানা দরকার, এখানে নতুন চাঁদ কবে দেখা যাবে? তারা উত্তর দিলো, মুসলিমরা যাকে নতুন চাঁদ বলে আমরা তাকে বলি ক্রিসেন্ট (Crescent) আর আমরা যাকে নতুন চাঁদ (New moon) বলি তা সম্পূর্ণ কালো এবং তা দেখাই যায় না। এটা (New moon) আমাদের একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (Scientific Term)। আর মুসলিমদের কাছে যেটা New moon সেটা হচ্ছে Crescent । যাকে বলা হয় হিলাল। এই হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্পর্কে আমরা বলে থাকি, সম্ভাবনা (Chances) রয়েছে, নিশ্চিত কিছু বলতে পারি না। আমি বললাম, কিন্তু আমাকে তো নিশ্চিত করেই বলতে হবে। তখন তারা বলল, যদি আপনাকে চূড়ান্ত কোন তথ্য পেতে হয় তাহলে আপনি আমাদের নৌ বাহিনীর আকাশ-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র Naval observatory)-কে ফোন করুন।

তারা আপনাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারবে। কারণ তাদের কাছে সুপার কম্পিউটার রয়েছে। এ কথা শুনে আমি খুবই অবাক হলাম। কারণ চাঁদের সাথে নৌ বাহিনীর আকাশ পর্যবেক্ষণকেন্দ্র (Naval observatory) এর কী সম্পর্ক?! পরে বুঝতে পারলাম, নৌ বাহিনীতে যারা কাজ করে তাদেরকে সমুদ্রে (Ocean) সফর করতে হয়। আর সমুদ্রে যে সকল High Tide (জোয়ার ভাটা) হয় তার সম্পর্ক চাঁদের সাথে। চাঁদের যখন তের, চৌদ্দ এবং পনেরো তারিখ হয় তখন সমুদ্রে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। যে কারণে সমুদ্রে চলাচলকারীরা এই দিনগুলোতে সমুদ্রভ্রমণ থেকে বিরত থাকে। কেননা High Tide এর সময় ডুবে যাবার আশঙ্কা প্রবল থাকে।

Naval observatory এর লোকদের দাবী, We trace each inch of the trajectory of moon.

আমি সেখানে ফোন করে তাদেরকে বললাম, আমি স্প্রিংফিল্ডে থাকি। আমার জানার বিষয়, চাঁদের ক্রিসেন্ট এখানে কবে দেখা যাবে? ওদিক থেকে এক মহিলা বললেন, আমি আপনাকে কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে জানাচ্ছি। এরপর তিনি আমাকে বললেন, সম্ভাব্য তথ্য (Chances) আছে। নিশ্চিত কোন খবর নেই।

এ পর্যায়ে আমি তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম : কেন, আমরা তো চাঁদে পা রেখেছি (যেহেতু সে সময় আমি ওখানে ছিলাম এবং ওখানকার একজন নাগরিক হিসেবেই কথা বলছিলাম) আর আপনি কিনা বলছেন, ‘আমরা চাঁদের বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না’?! তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার কি বিজ্ঞান বিষয়ে পূর্ব জানাশোনা Scientific background আছে? আমি বললাম, হাঁ আছে। তিনি বললেন, আপনি কি আমার কথাবার্তা বুঝতে পারবেন? আমি বললাম, হাঁ বুঝতে পারব, আপনি বলুন। এবার তিনি খোলাখুলি কথা আরম্ভ করলেন। বললেন,

“আমরা যখন চাঁদের বক্ররেখা Trajectory অনুসন্ধান করি তখন

আমরা তা চাক্ষুস দেখতে পাই না। এমন কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্র নেই, যার সাহায্যে দেখে চাঁদের অবস্থান শনাক্ত করা যায়। বরং আমাদের কাছে একটি গাণিতিক ছক Mathematical Model) তৈরী করা আছে। ঐ ছকে হিসাব (Calculation) কষে আমরা জানাতে পারি, চাঁদ এখন কোথায়? একেবারে সঠিক তথ্যই আমরা পেয়ে যাই।"

আমি তখন বললাম, তাহলে হিসাব-নিকাশ (Calculation) করেই আমাকে বলুন। তিনি বললেন, ব্যাপার হচ্ছে মোট অঙ্ক ও সংখ্যা (Calculation) এর মাঝে ছয় হাজার চলক (Variables) আছে। এবং একটি চলক এর পরিবর্তনের কারণে ফাইনাল রেজাল্ট পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারবো না। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, সম্ভাবনা (Chances) আছে, দেখার পর বোঝা যাবে।

আমি তৎক্ষণাত বললাম, আলহামদুল্লিাহ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ' বছর আগেই বলে দিয়েছেন, হে আমার উম্মত! যখন তোমরা রমযানের রোযা রাখবে তখন,

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

'তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং তা দেখেই রোযা ছাড়ো (ঈদ উদ্যাপন করো)।'

আজ বিজ্ঞানের জগতও এ কথাই মানছে।" (খুতুবাতে ফকীর খ. ২৯, পৃ. ২৬৯-২৭২)

যাইহোক, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বইয়ের পর্যালোচনার যতটুকু অংশ এ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি সত্যান্বেষী হন তাহলে তার চিন্তা-ভাবনা এবং সংশোধনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট, ইনশাআল্লাহ। পর্যালোচনার বাদবাকী অংশ আলকাউসারে ছাপাতে আপারগতা প্রকাশ করছি। তবে যেহেতু মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী জেদ্দার একটি সিদ্ধান্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব না জেনে-বুঝে

বারংবার উল্লেখ করছেন এবং তার মতো একই চিন্তা পোষণকারী আরো কিছু লেখকও এই সিদ্ধান্তটিকে এমনভাবে উল্লেখ করছেন, যেন এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য আপনা আপনি হাছিল হয়ে যাচ্ছে, অথচ বাস্তবে তেমনটি নয়- সেজন্য ইচ্ছে করছে এ বিষয়ে কিছু কথা নগদ বলে দেই। আর প্রবন্ধের সর্বশেষ অধ্যায় (যার গুরুত্বর্পূ পরিচ্ছেদ ও শিরোনামসমূহের বিবরণ এসেছে শাবান-রমযান ১৪৩৫ হিজরী সংখ্যায়) এবং তার পরিশিষ্ট, সেটা ইনশাআল্লাহ দেড়-দুই বছর পরে লেখা হবে। এই বিরতির একটি উদ্দেশ্য এই যে, যা কিছু পাঠকের সামনে এসেছে, সে ব্যাপারে যদি কারো কোনো পরামর্শ বা মতামত থাকে তাহলে সেটা আলকাউসারের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ পেশ করা। তাদের সেসব পরামর্শ বা মতামত জেনে আমি উপকৃত হতে চাই।

এমনিভাবে যেসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের বই-পুস্তক নিয়ে শাবান-রমযান ১৪৩৫ হিজরী সংখ্যা থেকে চলতি সংখ্যা পর্যন্ত পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে- হতে পারে তাদের পক্ষ থেকেও কোনো পরামর্শ বা মতামত আমাদের কাছে আসবে। যা থেকে আমি উপকৃত হতে চাই। আল্লাহ প্রত্যেককে জাযায়ে খায়ের নছীব করুন।

জেদ্দা ফেকাহ একাডেমির সিদ্ধান্ত : কিছু মানুষের ভুল ধারণা এবং প্রকৃত বাস্তবতা

সফর ১৪০৭ হিজরী (মোতাবেক অক্টোবর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ)-তে ওমানে অনুষ্ঠিত সভায় মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী জেদ্দা (বর্তমান নাম মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী আদ-দুয়ালি) দু'টি রেজ্যুলেশন পাস করে। যার আরবী ভাষ্য এই :

أولا: إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.

ثانياً: يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية.

তরজমা :

১. যখন কোনো শহরে (নতুন চাঁদ) 'দেখা' সাব্যস্ত হয়ে যাবে তখন মুসলমানদের জন্য তা মেনে নেওয়া আবশ্যক হবে। উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। কেননা রোযা ও ঈদ পালনের নির্দেশের ক্ষেত্রে সম্বোধন সকলের প্রতি।

২. দেখার উপর নির্ভর করা জরুরি। (দেখা সম্ভব কি সম্ভব নয় তা নির্ণয়ে) জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাব কিংবা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যাতে হাদীসে নববী এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা দু'য়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখা যায়। (মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী সংখ্যা ৩, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৮৫)

মাজমাউল ফিকহের এই রেজ্যুলেশনে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইসলামী চান্দ্রমাস প্রমাণের ভিত্তি চাঁদ দেখার উপর। জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের সাহায্যে গণনা করে মাসের শুরু নির্ধারণ করা জায়েয নেই। তবে হিসাব থেকে এতটুকু সাহায্য নেওয়া যাবে যে, কোন্ রাতে, কোন্ জায়গায়, কতক্ষণের জন্য নতুন চাঁদ দেখতে পাওয়া সম্ভব, আর কোথায় সম্ভব নয়।

অতএব যারা চাঁদ দেখার বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে শরীয়তের এ সুস্পষ্ট, সর্বজনস্বীকৃত ও অবিচ্ছিন্ন বহু সূত্রপরম্পরায় চলে আসা বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে- তাদের এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

মাজমাউল ফিকহের এই রেজ্যুলেশনের প্রথম দফায় একটি মতবিরোধপূর্ণ ফিকহী মাসআলায় একাধিক মতামতের মধ্যে একটিকে অবলম্বন করা হয়েছে। অথার্ৎ চান্দ্রমাসসমূহের সূচনা এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিধানের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য কি ধর্তব্য নয়- এটি একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। মাজমাউল ফিকহ এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাব এখতিয়ার করেছে। এটা হচ্ছে তাদের দিক থেকে একটি মতকে অগ্রাধিকার দান। এতে করে এটা আবশ্যক

হয়ে যায় না যে, তাদের গৃহীত ঐ সিদ্ধান্তের পর এই মাসআলা মুজমা আলাইহি বা সর্বজনমান্য হয়ে গিয়েছে, এখন আর এই মাসআলায় কোনো দেশের আলেম-উলামা ও শাসকশ্রেণীর জন্য অপর মাযহাব অনুযায়ী আমল করার কোনোরকম বৈধতা নেই! বিষয়টি কখনো এমন নয়। এমনিভাবে এই রেজ্যুলেশনের উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে না যে, যে কেউ নিজ দেশের আলেম-উলামা ও শাসকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী এই মোতাবিক আমল করতে শুরু করে দেবে। বরং এ অনুযায়ী আমল করা চাঁদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যিনি দায়িত্বশীল তারই কাজ।

যদি মতভেদপূর্ণ মাসআলায় কোনো ফেকাহ একাডেমির পক্ষ থেকে কোনো একটি মাযহাব অবলম্বন করায় অপরাপর মাযহাব পরিত্যাক্ত হয়ে যেত তাহলে তো রাবেতা আলমে ইসলামীর আল মাজমাউল ফিকহি মক্কা মুকাররমার ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ তারিখের গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সৌদী আরবের হাইয়াতু কিবারিল উলামার (সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ) শা'বান ১৩৯২ হি. সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পর আমলের জন্য কেবল এই মাযহাবটিই চূড়ান্ত হয়ে যেত যে, মাসের সূচনা নির্ধারনের ব্যাপারে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য করা বা না করা যেহেতু একটি মতবিরোধপূর্ণ ও মুজতাহাদ ফীহ মাসআলা, তাই একে প্রত্যেক দেশের আলেমসমাজ ও শাসকশ্রেণীর এখতিয়ারে রাখা হবে- তারা আমলের জন্য যে মত অবলম্বন করবেন ওখানের অধিবাসীদের জন্য সে মোতাবেক আমল করা অপরিহার্য হবে (কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা আলমুকাররামা পৃ. ৮৪-৮৯; আবহাসু হাইআতি কিবারিল উলামা ৩/৩২-৩৪) যদি কোনো ফেকাহ একাডেমির ফায়সালা ইজমার সমতুল্য হত তাহলে উল্লেখিত দুই একাডেমির ফায়সালার পর মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর জন্য দ্বিতীয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই বৈধ হত না।

আর এটাও জানা কথা যে, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী যদিও O.I.C (আল মু'তামারুল ইসলামী বর্তমান নাম মুনাযযমা আত-তায়াউন আল ইসলামী)-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তাই বলে

মাজমাআর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত ও.আই.সির পক্ষ থেকে প্রত্যয়নকৃত হওয়া জরুরি নয়। তাই তাকে সরাসরি ও.আই.সির ফায়সালা বলা যাবে না। এই বাস্তবতা সত্ত্বেও কিছু লোক সমস্ত মানুষকে বোকা বানিয়ে এই ফায়সালাকে সরাসরি ও.আই.সির ফায়সালা এবং একটি সর্ববাদীসম্মত বিধান আকারে পেশ করছে।

সবচে’ বড় কথা, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী উক্ত রেজুলেশনে একটি মতবিরোধপূর্ণ ফিকহি মাসআলায় নিজের পছন্দের কথা ঘোষণা করেছে মাত্র। একে আমলী রূপদানের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি- তার কোন রূপরেখা উপস্থাপন করেনি এবং এ বিষয়েও আলোচনা করেনি যে, হেলাল দেখাই যেহেতু চাঁদ প্রমাণিত হবার ভিত্তি, সেহেতু দেখাকে ভিত্তি ধরে সমগ্র বিশ্বে প্রথম দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করা আসলেই সম্ভব কি সম্ভব নয়?

এটা ছিল তাদের সংক্ষিপ্ত ফায়সালা। একে বাস্তবায়িত করবার জন্য তাদের পক্ষ থেকে কোনো বিস্তারিত রূপরেখা আসেনি। উচিত ছিল, তা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং খোদ এই রেজুলেশন অনুমোদনকারী উলামা ও তাদের দেশের আমল কী, সেটাও দেখা। এই রেজুলেশনের পর তারা নিজ দেশের উলামা ও শাসকদের সঙ্গেই রোযা ও ঈদ করছেন, নাকি তাদের থেকে আলাদা হয়ে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক অতি উৎসাহী ভাই এসকল বাস্তবতাকে আমলে না নিয়ে এই ফায়সালাকে পুঁজি করে রোযা ও ঈদ পালনে স্বয়ং নিজেরাও বিচ্ছিন্নতার পথে হাঁটতে শুরু করেছেন, অন্যদেরকেও বিচ্ছিন্নতার দিকে ডাকছেন। উল্টো তারাই কিনা আবার আলেম-উলামা ও শাসকগোষ্ঠীকে ধর্মের ব্যাপারে শিথিলতা ও ফরয তরকের অপবাদ দিয়ে যাচ্ছেন!!

কথা পরিষ্কার। তা সত্ত্বেও আমরা মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর মহাপরিচালক ও উপ-প্রধানকে এ বিষয়ে পত্র লিখেছি। উভয়েই ভিন্ন

ভিন্ন জবানীতে এ কথাই বলেছেন যে, ঐ ভাইদের কর্মপন্থা ভুল। মহাপরিচালকের চিঠি আরবীতে লেখা। প্রবন্ধটি যখন বই আকারে ছাপা হবে তখন তা পেশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। এখন মাজমার উপ-প্রধান শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের পত্রটি তুলে ধরা হচ্ছে।

হযরতকে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর রেজ্যুলেশন-ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছিল,

"এর উদ্দেশ্য তো এটাই যে, শরীয়তসম্মত পন্থায় হিলাল প্রমাণ ও হিলালের ফায়সালা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হলে সে মোতাবিক আমল করা হবে। কিন্তু এখানে কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছে যে, ও.আই.সির সিদ্ধান্তের পর এখন আর কারো তা অগ্রাহ্য করার অধিকার নেই। এবং সৌদি কিংবা অন্য কোনো দেশে দেখা প্রমাণিত হওয়ার পরও আমরা যে নিজেদের দেখার অপেক্ষায় রোযা ও ঈদ করা থেকে বিরত থাকি- এতে নাকি আমরা গোনাহগার হচ্ছি।

হযরত ওয়ালা মাজমাউল ফিকহের উপ-প্রধান হিসেবে আপনার কাছে বিশেষভাবে এই প্রশ্নটি উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, সত্যিই কি মাজমাউল ফিকহের উক্ত সিদ্ধান্তের এটাই উদ্দেশ্য, যা এরা বলছে? তদ্রূপ মাজমাউল ফিকহের কোনো ফিকহি সিদ্ধান্ত অনুমোদনের অর্থ কি সেটা স্বয়ং সংস্থা (ও.আই.সি)-এরও ফায়সালা? সংস্থার তরফ থেকে কি মাজমার এই ফিকহি সিদ্ধান্ত মোতাবিক এ ব্যাপারে কোনো ফায়সালা করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? "

হযরত উত্তর লিখেছেন:

قرار کا مطلب تو وجوب ہی ہے، لیکن مجمع الفقہ کی قرار مؤتمر کی طرف سے موثق یا واجب العمل نہیں، مسئلہ چونکہ مجتہد فیہا ہے اس لئے قرار کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان ممالک اس پر متفق ہو جائیں تو اچھا ہے، لیکن جب تک یہ نہ ہو ملکوں کے لئے تمام راستے کھلے

ہیں-

والسلام محمد تقی

৮/৯/১৪৩৪ হিজরী

তরজমা : সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য তো এটাই যে, এক জায়গার দেখা সবার জন্যই অবশ্য-পালনীয়। কিন্তু মাজমাউল ফিকহের সকল সিদ্ধান্ত মু'তামার (ও.আই.সি)-এর পক্ষ থেকে প্রত্যয়নকৃত বা অপরিহার্য পালনীয় নয়। মাসআলাটি যেহেতু ইজতিহাদনির্ভর এবং মতবিরোধপূর্ণ তাই এই সিদ্ধান্তের সারকথা হলো, মুসলিম দেশসমূহ যদি এতে একমত হয়ে যায় তো ভালো। কিন্তু যতক্ষণ এটা হচ্ছে না ততক্ষণ রাষ্ট্রগুলোর জন্য সবরকম রাস্তাই খোলা আছে।

ওয়াসসালাম

মুহাম্মাদ তাকী

৮/৯/১৪৩৪ হিজরী

মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর উপ-প্রধান পরিষ্কার বলেছেন, সমস্ত মুসলিম দেশ যদি এ সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করে তাহলে ভালো। অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে এই ঐকমত্য অপরিহার্য নয়। তবে হয়ে গেলে ভালো। আর যে পর্যন্ত তাদের ঐকমত্য হচ্ছে না সে পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোর জন্য সবরকম রাস্তাই খোলা আছে।

অর্থাৎ সেখানকার ওলামা ও শাসকবর্গ পরামর্শের মাধ্যমে চাই নিজেদের দেখা মোতাবিক আমল করুক, চাই শরীয়ত সম্মতভাবে প্রমাণিত হবার পর অন্য কোন দেশের দেখার ফায়সালা মোতাবিক আমল করুক- তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার পথ অবলম্বন করা কোনো অবস্থাতেই যুক্তিযুক্ত নয়, যেমনটি স্বয়ং হযরতের কিতাব ইন'আমুল বারী ৫ খণ্ডের ৪৯৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিতে ১৪৩৫ হি. রজব

সংখ্যায় লেখা হয়েছে।

আশা করি সত্যসন্ধানীদের জন্য এতটুকু বিশ্লেষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা সুস্থ বিবেক এবং সঠিক উপলব্ধি দান করুন। আমীন।

পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার আগে রাবেতা আলমে ইসলামীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আল মাজমাউল ফিকহী আলইসলামী মক্কা মুকাররমা কর্তৃক ১৯-২১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী (মোতাবিক ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর অনুবাদ পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করা সঙ্গত মনে করেছি। এই সভার বিষয়বস্তুই ছিল, চান্দ্রমাসসমূহের সূচনা ও সমাপ্তি প্রসঙ্গে উলামায়ে শরীয়ত এবং জ্যোতির্শাস্ত্রবিদগণ যুগের পরিস্থিতি ও দাবীকে সামনে রেখে সম্মিলিতভাবে চিন্তাভাবনা করে কোনো সমাধানে পৌঁছবেন।

চান্দ্রমাস প্রমাণ ইস্যুতে উলামায়ে শরীয়ত ও জ্যোতির্শাস্ত্রবিদদের বিশ্ব সম্মেলন

এই মহতী সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর আরবী ভাষ্য

<البيان الختامي للمؤتمر العالمي لإثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة والحساب الفلكي>

শিরোনামে বিভিন্ন সাইটে পাওয়া যাবে। এর উর্দূ তরজমা মাসিক আল বালাগে ছেপেছে। যা দ্বীন ইসলাম ডটকমে দেখে নিতে পারেন। উর্দূ অনুবাদের ভ‚মিকা ও পরিশিষ্ট স্বরূপ আমার উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের লিখনী থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও এসেছে, যা অবশ্যই পড়া উচিত।

এখানে আমরা ঐ সিদ্ধান্তবলীর বাংলা তরজমা পেশ করছি-

সিদ্ধান্তনামায় অবতরণিকা হিসেবে হিলাল ভিত্তিক চান্দ্রমাসসমূহের

ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এবং চাঁদ দেখা ও চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে ইসলামী বিশ্বে যে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে সেদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, 'সেজন্য এই মাসআলা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা অতীব জরুরি। যেখানে শরঈ বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তার গণনা এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র, আল্লাহ তাআলা যার অসামান্য উন্নতি দান করেছেন- এরও সাহায্য নেওয়া হবে। যাতে করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনার মাধ্যমে মাসআলার একটি কার্যকর সমাধানে উপনীত হওয়া যায়।'

রাবেতা আলমে ইসলামীর অধীন আল মাজমাউল ফিকহি আল ইসলামী মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে দায়িত্ব পালনের তাগিদে এবং আলোচ্য বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার তীব্র প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে চান্দ্রমাসসমূহ প্রমাণ ইস্যুতে উলামায়ে শরীয়ত এবং জ্যোতির্শাস্ত্র বিশারদদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। যা ১৯-২১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী মোতাবিক ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে অনুষ্ঠিত হয়। সৌদি আরবের ভিতরের ও বাইরের বিভিন্ন শরীয়াবোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাকেন্দ্রের নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ আলেম ও জ্যোতির্শাস্ত্রবিদ এতে অংশগ্রহণ করেন। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয (আল্লাহ তাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথিবীর পবিত্রতম স্থান মক্কা মুকাররমার কাবা শরীফ প্রাঙ্গনে যা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলনে যোগদানকারী সদস্যবৃন্দ সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জেনে, তার সারসংক্ষেপ শুনে এবং তাতে যে সকল প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তার পক্ষে বিপক্ষে মতামত ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে জোর দেন :

১. চান্দ্রমাসের সূচনা ও শেষ নির্ধারণের মাপকাঠি নতুন চাঁদ দেখা।

তা খালি চোখেই হোক কিংবা দূরবীক্ষণযন্ত্র ও অন্যান্য জ্যোতির্শাস্ত্রীয় সরঞ্জামের সাহায্যে হোক। আর হিলাল যদি দেখা না যায় তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা হবে। কারণ, হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘(চাঁদ) দেখে রোযা রাখো এবং তা দেখেই ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করো। (তবে) যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় তাহলে শা‘বানের গণনায় ত্রিশ পূর্ণ করো।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৯)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মাস হয় উনত্রিশ রাতে। অতএব তোমরা রোযা রেখো না যতক্ষণ না (হেলাল) দেখতে পাও। আর যদি মেঘের জন্য হেলাল দেখা না যায় তাহলে ত্রিশ দিন হিসাব করো।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা রোযা রেখো না যতক্ষণ না হিলাল দেখতে পাও। এবং ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করো না যতক্ষণ না তা দেখতে পাও। তবে যদি মেঘের কারণে হিলাল তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে মাস ত্রিশ ধরো।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৬)

এসব হাদীস এবং সাথে আরো বহু হাদীস প্রমাণ করে যে চান্দ্রমাসের সূচনা ও সমাপ্তির ক্ষেত্রে মাপকাঠি হলো হেলাল ‘দেখা’।

২. প্রত্যেক মাসে হিলাল অনুসন্ধান করা ফরযে কিফায়া। কেননা অনেক ফরয পালন এর উপর নির্ভরশীল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও তাকরীর (সম্মতি) থেকে যার সমর্থন পাওয়া যায়। তাই তো আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা‘বান মাসের বিষয় (তার হেলাল কবে দেখা গেছে এবং কতদিন পার

হয়েছে) অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিতেন। এরপর রমযানের চাঁদ দেখে তিনি রোযা রাখতেন। আর যদি মেঘের কারণে হেলাল দেখা না যেত তাহলে ত্রিশ গণনা করে অতপর রোযা রাখতেন।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩২৫)

ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মার বর্ণনায় : শা‘বানের হিলালের হিসাব রাখার ক্ষেত্রে অন্য মাসের চেয়ে বেশি যত্নবান হতেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন (একবার) লোকজন হিলাল (অনুসন্ধান ও তা) দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম, আমি তা দেখেছি। এ কথা শুনে তিনি নিজেও রোযা রাখলেন, অন্যদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৪২)

৩. সাক্ষ্যদাতার মাঝে সাক্ষ্য গৃহীত হবার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যেতে হবে এবং সাক্ষ্যগ্রহণের প্রতিবন্ধক কোনো বিষয় না থাকতে হবে। সাক্ষীর তীক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এবং হিলাল দেখার মুহূর্তে তার দেখার ধরন সম্পর্কেও নিশ্চিত করে জানতে হবে। যেন তার সাক্ষ্যর মধ্যে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ না থাকে।

৪. জ্যোতির্শাস্ত্রীয় গণনা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা। যার নিজস্ব মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর সিদ্ধান্ত ও সমাধান গ্রহণ করা সমীচীন। যেমন চন্দ্র ও সূর্যের সম্মিলনের সময়কাল, চাঁদ সূর্যগোলকের অদৃশ্য হবার আগে অদৃশ্য হল, না পরে এবং সূর্যের সাথে সম্মিলন পরবর্তী রাতে দিগন্তে চাঁদের উচ্চতা হবে কতটুকু, ইত্যাদি। এ কারণেই হিলাল দেখার সাক্ষ্য গৃহীত হবার জন্য জ্যোতির্বিদ্যার স্বীকৃত ও অকাট্য বাস্তবতা যা নির্ভরযোগ্য জ্যোতির্শাস্ত্রসংস্থাসমূহ কর্তৃক জানা যায়- সে অনুসারে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব না হতে হবে। যেমন, (চাঁদ ও সূর্যের) ঠিক সম্মিলনের মুহূর্তে কিংবা সূর্যের অস্তগামী হওয়ার আগে চাঁদের অস্তমিত হওয়ার

অবস্থায় (হেলাল দেখা যাওয়া সম্ভব নয়)।

৫. মুসলিমরা সংখ্যালঘু এমন দেশে কতক অঞ্চলে হিলাল দেখতে পাওয়া দেশের বাদবাকী অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট হবে। তাদের রোযা ও ঈদ পালনে ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে।

৬. যেসব দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুর বসবাস, সেখানে কোনো কারণে হিলাল দেখা সম্ভব না হলে তাদের কর্তব্য হবে, নিকটতম মুসলিম দেশের দেখা অনুসারে আমল করা কিংবা পার্শ্ববর্তী এমন কোনো দেশের দেখাকে গ্রহণ করা, যেখানে মুসলিম জনবসতি রয়েছে এবং চাঁদ প্রমাণিত হবার ঘোষণা এসেছে সেখানকার ইসলামিক সেন্টার বা মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী এজাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে।

৭. যে সকল চান্দ্রমাসের সঙ্গে ইবাদত পালনের সম্পর্ক রয়েছে তার শুরু নির্ধারণ করা একটি শরীয়ত নির্দেশিত কাজ। যে কারণে তা উলামায়ে শরীয়তের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, যাদেরকে নিযুক্ত করেছে কোনো স্বাধীন কর্তৃত্বশীল কর্তৃপক্ষ আর জ্যোতির্শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় সংস্থাসমূহের দায়িত্ব, চাঁদের জন্ম, হিলালের অবস্থান এবং পৃথিবীর গোলার্ধের যে কোনো স্থানে তার দেখতে পাওয়ার পর্যায় ও ধরন- এ সংক্রান্ত বিষয়ে সূ² পরিসংখ্যান ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করা। যা কিনা নিখুঁত ও নির্ভুল সিদ্ধান্তদানের ক্ষেত্রে শরয়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করবে।

৮. মানুষের কল্যাণ সাধন ও তাদের দৈনন্দিন আদান-প্রদানকে সহজ করণের স্বার্থে উন্নত জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাব ও আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণসহ বিজ্ঞানের ইতিবাচক ব্যবহারে শরীয়ত বাধা প্রদান করে না। কেননা বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কৃত বাস্তবতার সাথে ইসলামের অবস্থান সাংঘর্ষিক নয়।

৯. শরয়ী কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যদি মাসের শুরু নির্ধারিত হয়ে যায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রের ওলিউল আমর (শাসক বা তৎকর্তৃক

নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীল) তা গ্রহণ করে নেন, তাহলে মাসের শুরু প্রমাণিত ঘোষণা হবার পর সে বিষয়ে আলোচনা সমালোচনা কিংবা কোনরূপ সংশয়ের সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। কেননা এটি একটি ইজতিহাদী মাসআলা, শাসকের ফায়সালার মাধ্যমে যার বিরোধ-নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

১০. মুসলিম সরকারসমূহকে এ মর্মে উৎসাহিত করা যাচ্ছে যে, তারা দেখার উপকরণাদির প্রতি এবং হিলাল অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ কমিটি গঠনে মনোযোগী হবেন।

এ প্রসঙ্গে কনফারেন্স সেসব ইসলামী রাষ্ট্রের তৎপরতার প্রশংসা করছে, যারা মহাকাশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপনে মনোনিবেশ করেছে। যার শীর্ষে রয়েছে সৌদি আরবের প্রয়াস। 'বাদশাহ আব্দুল আযীয বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শহর' নির্মাণের মধ্য দিয়ে যা প্রতিফলিত।

১১. কনফারেন্স রাবেতায়ে আলমে ইসলামীকে সুপারিশ করছে, উলামায়ে শরীয়ত ও জ্যোতির্শাস্ত্রবিদদের সমন্বয়ে একটি ইলমী বোর্ড গঠনের। যার কাজ হবে, উভয় ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী ও গবেষণাধর্মী যত কাজ হয়েছে, যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, এবং বৈঠক ও সভা সম্মেলনে আরো যে সব প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে, এমনিভাবে বিভিন্ন ফেকাহ একাডেমি বা শীর্ষস্থানীয় আলিমদের বোর্ড অথবা ইসলামী গবেষণাকেন্দ্রসমূহ থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে- সব নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করা। উলামা ও জ্যোতির্বিদদের সম্মিলিত ঐ ইলমী বোর্ডের চেষ্টা থাকবে, চান্দ্রমাসসমূহের সূচনার ক্ষেত্রে ঐক্য সৃষ্টির উপায় অনুসন্ধান করা। এ উদ্দেশ্যে ইসলামের পূণ্যভ,মি ও মুসলিমদের প্রাণকেন্দ্র মক্কা মুকাররমাকে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় দূরবীক্ষণের জন্য এবং হিজরী তারিখের অভিন্ন ক্যালেন্ডার প্রকাশের জন্য মক্কাকে সেন্টার রূপে গ্রহণ করা। উপরন্তু এই বোর্ড ইসলামী বিশ্বের সকল শরীয়া বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ ও সংহতি তৈরী করবে। আর এই বোর্ডের

কেন্দ্রস্থল হবে, ইসলামের হৃৎপিণ্ডসম পূণ্যভূমি মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'।

এই বোর্ড ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের ফেকাহ একডেমি ও ফতোয়া বোর্ড কিংবা এদের অনুমোদিত বিশেষজ্ঞ উলামায়ে শরীয়ত এবং জ্যোতির্শাস্ত্রবিদদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যারা নিজেদের গবেষণার ফলাফল এবং এই সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী রাবেতার আলমাজমাউল ফিকহীতে পেশ করবে।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

রাবেতা আলমে ইসলামীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিশ্বসম্মেলনে পুরো বিশ্বের অনেক উলামায়ে শরীয়ত এবং জ্যোতির্শাস্ত্র বিশারদ অংশ নিয়েছিলেন।

মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী জেদ্দার যে সদস্যগণ ১৯৮৬-এ আম্মানে অনুষ্ঠিত সভায় ছিলেন তাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন- তাদের অনেকেই এ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। পাঠকবৃন্দ এই বিশাল মহতী সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী পাঠ করেছেন। সেখানে আপনারা দেখেছেন উলামায়ে শরীয়ত এবং জ্যোতির্শাস্ত্র বিশারদ এই উভয় দলই বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সামনে নিয়ে এই ফায়সালা করেছেন যে, রোযা ও ঈদসহ অন্যান্য ইসলামী মৌসুমের ভিত্তি চাঁদ দেখার উপর, গণনা-নির্ভর জ্ঞানের উপর নয়। তবে হাঁ, খালি চোখে দেখা জরুরি নয়। দূর্বীক্ষণযন্ত্রের সাহয্যেও যদি দেখা হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটাও 'দেখা' বলে বিবেচিত হবে।

উপরন্তু উলামায়ে কেরাম এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্তও অনুমোদন করেছেন যে, চাঁদ দেখার ফায়সালা জনগণ বা ব্যক্তিবিশেষ করবে না; বরং তা ন্যস্ত থাকবে 'উলুল আমর' (যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ) কর্তৃক নিযুক্ত উলামায়ে কেরামের উপর। আর জ্যোতির্শাস্ত্রবিদগণ শাস্ত্রীয় গণনার মাধ্যমে 'দেখা' প্রসঙ্গে ও 'দেখার'

সাক্ষ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করবেন।

পরিশেষে এই রেজ্যুলেশনে বলা হয়েছে, কনফারেন্স রাবেতা আলমে ইসলামীকে সুপারিশ করেছে মক্কা মুকাররমায় উলামা ও বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে একটি পৃথক বোর্ড গঠনের। যা চান্দ্রমাসসমূহে ঐক্য বজায় রাখার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেবে এবং এ উদ্দেশ্যে জরুরি শরয়ী নীতিমালা ও বাস্তবায়ন-রূপরেখা প্রণয়ন করবে।

অতএব এখন সচেতন ও সমঝদার লোকের কাজ হল, দুআ করা এবং এ ব্যাপারে রাবেতাকে সাহায্য করা। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এর কোনো সর্বসম্মত কর্মসূচী প্রণীত হয়ে কাজ আরম্ভ না হচ্ছে ততক্ষণ নিজ দেশের উলামা ও শাসকবর্গের সাথেই সিয়াম ও ঈদ পালন করা এবং বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে বেঁচে থাকা।[1]

তাওফীক আল্লাহরই হাতে। আমরা তাঁরই কাছে তাওফীক প্রার্থনা করি।

هذا وصلى الله تعالى وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

দারুত তাসনীফ,

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

১৬/০১/১৪৩৭ হিজরী

৩০/১০/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

---

[1] কর্মসূচী প্রণীত হওয়া মাত্রই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, হিলাল দেখাটাই যেহেতু ভিত্তি,

তাই বাস্তবে ‘সারা বিশ্বে একই সাথে করা’ সম্ভব হবে না, তবে বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে সম্ভব হবে। যদি শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে তরীকা মোতাবিক এই পরিসরে একই দিনে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তো তাতে ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা নেই। (আবদুল মালেক)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

জানুয়ারি ২০১৭, রবিউস সানি ১৪৩৮

‘চান্দ্রমাস’ বই : একটি পর্যালোচনা : কী দিতে চান সে নিয়েই বিভ্রান্তি

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

[নোট : সারা বিশ্বে একই তারিখে রোযা ও ঈদ পালনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর একটি দীর্ঘ পর্যালোচনা পাঠকবৃন্দ ইতিপূর্বে মাসিক আলকাউসারে পড়েছেন, যার শিরোনাম ছিল ‘মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন; একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের উপর ছেড়ে দিন’। ঐ প্রবন্ধের শেষ অংশ ছিল ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হক সাহেবের বই ‘চান্দ্রমাস’-এর উপর পর্যালোচনা। সে সময় উক্ত বইয়ের উপর লিখিত পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ রেখেই বিরতি দেয়া হয়েছিল। এখন এ বিষয়টি আবার আলোচনায় আসাতে ঐ বইয়ের উপর লিখিত পর্যালোচনার আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদ ছেপে দেয়া মুনাসেব মনে হল। এরপর ইনশাআল্লাহ প্রবন্ধের সর্বশেষ অধ্যায় ছাপা হবে। আল্লাহ তাআলা এ প্রবন্ধকে আমার ও আমাদের সকলের জন্য উপকারী করুন। আমীন! -মুহাম্মাদ আবদুল মালেক]

গোটা বইয়ে তিনি যা কিছু লিখেছেন তাতে তার মূল দাবি হচ্ছে, সারা বিশ্বে একই তারিখে রোযা শুরু করা ফরয এবং একই তারিখে ঈদ পালন করা ফরয!

দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে যাবার চৌদ্দশ বছর পর যে জিনিসের কল্পনা সবেমাত্র অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাকে শরীয়তে ইসলামীর ফরয কাজ বানিয়ে দেওয়া স্পষ্টতই এর প্রবক্তার সত্যতাশূন্য হওয়া কিংবা সুস্থমস্তিষ্ক বঞ্চিত হওয়ার প্রমাণ। তথাপি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এতেই আনন্দ পান যে, এই ময়দানে তিনি অবতীর্ণ হবেন এবং দ্বৈততা ও স্ববিরোধিতার শিকার হতে থাকবেন! তিনি বড্ড পেরেশান, এই ডিম্বাকৃতির পৃথিবীময় একই তারিখে রোযা ও ঈদ পালনকে ফরয বলবার যে নতুন শরীয়ত উদ্ভাবিত হয়েছে, তার পক্ষে যুক্তি প্রমাণটা কোত্থেকে হাজির করবেন, আর এই একসঙ্গে শুরু ও একত্র পালনের ভিত্তি ধরবেন কোন জিনিসকে...?! ভালো হতো যদি তিনি নিজেই এই অস্থিরতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের একটা কিছু মীমাংসা করে নিতেন এবং নির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত একটি মতের উপর থিতু হয়ে পাঠকদেরকে কিছু উপহার দিতেন। কিন্তু তা হয়নি। যা ঘটেছে তা রবং এর উল্টো! বইয়ের সর্বত্র স্ববিরোধী কথাবার্তা লিখে শুধু নিজের দ্বিধাদ্বন্দ্বেরই ঘোষণা দিয়ে গেছেন। শেষফল- শূন্য!

কিসের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে একই সঙ্গে রোযা ও ঈদ পালন করা যাবে, এ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদের কতগুলি পরামর্শ দিয়েছেন- একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন :

১. সর্বপ্রথম ‘দেখা’ ধর্তব্য হবে

একাধিকবার তিনি বলেছেন, পৃথিবীর যে অঞ্চলে সর্বপ্রথম চাঁদ দৃষ্টিগোচর হবে তাকেই ভিত্তি ধরতে হবে। সর্বপ্রথম দেখাকে ভিত্তি মেনে সারা বিশ্বে একই তারিখে রোযা শুরু করা এবং ঈদ পালন করা জরুরি। তিনি লিখেছেন,

‘পৃথিবীর যে কোনো স্থানে প্রথম যখন নতুন চাঁদ দেখা যাবে তাকেই বলা হবে নবচন্দ্র’।

‘তাই একই পৃথিবীতে একই মাসে একাধিক নতুন চন্দ্রোদয় হতে পারে না। অতএব, প্রথম চন্দ্রোদয় দিয়েই মাসের প্রথম দিন শুরু হবে; আর ২৪ ঘণ্টা পরে ২য় দিন আরম্ভ হবে।’

‘এভাবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সারা পৃথিবীর মানুষ নতুন চন্দ্র দিয়ে রোযা আরম্ভ করবে এবং ঈদ উদ্যাপন করবে।’ (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৩০, প্যারা : ৫, ৮, ৯)

একই কথা পৃষ্ঠা ৩২-৩৩, পর্ব ১৪-এ লিখেছেন। আরো দেখুন, পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫, পর্ব : ১৬; পৃষ্ঠা : ৩৬, প্যারা : ৯; পৃষ্ঠা : ৮৮, প্যারা : ১০, ১১, ১৬; পৃষ্ঠা : ১১২, ৪৪/১২-১৩ এবং পৃষ্ঠা : ১৭৫, প্যারা : ২। পৃষ্ঠা : ৪৪/১৩, পৃষ্ঠা : ১১২ এবং ১৭৫ পৃষ্ঠায় এই বিধানকে আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া বিধান বলে উল্লেখ করেছেন। আর পৃষ্ঠা ৩২-৩৩সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বলেছেন, চার মাযহাব কিংবা তাদের অধিকাংশের এবং ও. আই. সির ফেকাহ একাডেমির সিদ্ধান্তও এটাই।

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এখানে কয়টা কথা ঠিক আর কয়টা কথা বাস্তবতার খেলাফ; নিছক গায়ের জোরে বলা আর কি! আমি এখন শুধু তার বক্তব্যের স্ববিরোধিতার দিকটাই দেখাতে চাইছি। ভুল-ভালের বিচার তোলা রইল।

যাইহোক, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের প্রথম পরামর্শ দাঁড়ালো এই যে, সর্বপ্রথম দেখার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্ববাসীর আমল করা অপরিহার্য। দ্বিতীয় পরামর্শটি হল :

২. সৌদির দেখার অনুসরণ করা হোক

এক জায়গায় লিখেছেন, ‘সৌদি আরব যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত সেহেতু ধারণা করা যায় যে, তারা প্রথম নবচন্দ্রের খবর নিয়েই রোযা/ঈদ পালন করছেন। সেক্ষেত্রে সৌদি আরবকে অনুসরণ করা যায়। তবে বাংলাদেশ যে নিয়মে রোযা/ঈদ পালন করছে তা ঠিক হচ্ছে না। তার চেয়ে সৌদি আরবকে অনুসরণ করা বেশি সমর্থনযোগ্য। তবে বিশ্বে সর্বপ্রথম নতুন চাঁদের শুরুকে অনুসরণ করাই উত্তম কাজ হবে’। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৯৩)

দেখুন, এই বেলায় সর্বপ্রথম দেখার অনুসরণকে বলছেন কেবল ‘উত্তম

কাজ'। একটু আগে এটাকেই কুরআন ও সুন্নাহর রেফারেন্সে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। আর সৌদি আরব কিংবা মধ্যপ্রাচ্যেই প্রথম চাঁদ দেখা যায় এমন ধারণা জ্যোতির্শাস্ত্রের নীতিমালা অনুসারে ভুল এবং জ্যোতির্শাস্ত্রবিদদের স্পষ্ট বক্তব্যেরও পরিপন্থী। স্বয়ং আমার কাছেই আমার প্রশ্নের জবাবে শাস্ত্রজ্ঞদের দেয়া সমাধান উপস্থিত আছে। আর বাস্তব ঘটনার বিচারেও এর অবাস্তব হওয়া খুবই পরিষ্কার। নেটে মুন সাইটিংয়ে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত চন্দ্রগোলকের নকশার কিছু নমুনা যদি আপনি দেখেন, তাহলে লক্ষ্য করবেন যে, সাধারণত প্রথম দেখা প্রসঙ্গে দূর পাশ্চাত্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাস্তবেই চাঁদ দেখার সমীক্ষা নেয়া হলে এমনটাই প্রমাণিত হবে। তবে সেই পর্যালোচনায় যাওয়া এই মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য না। এখন শুধু তার বক্তব্যের স্ব-বিরোধিতার চিত্রটুকু দেখানো উদ্দেশ্য।

তো প্রথম পরামর্শের বরখেলাফ তার দ্বিতীয় পরামর্শ দাঁড়াল এই যে, সৌদির চাঁদ দেখার অনুসরণ করা হবে। এ সম্পর্কে আরেক জায়গায় লিখেছেন, 'এ পর্যায়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর তা হলো রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সৌদি আরবকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। শরিয়ার দৃষ্টিতে এই পরামর্শকে সম্পূর্ণ সঠিক বলা যাবে না। কারণ সৌদি আরবের দেখা নবচন্দ্র বিশ্বের জন্য প্রথম নবচন্দ্র নাও হতে পারে। আবার সেটা প্রথম নবচন্দ্র হতেও পারে, যেহেতু সৌদি আরব সেই এলাকায় অবস্থিত যেই এলাকার কোথাও না কোথাও প্রথম নবচন্দ্র দেখা যাবে। তাই বর্তমানে ২/৩ দিন পরে রোযা/ঈদ করে বাংলাদেশে আমরা যে ভুল করছি সেই ভুলের মাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে সর্বনি¤œ পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হলে সৌদি আরবের অন্ধঅনুকরণ করাটাই ব্যক্তিগত পর্যায়ের জন্য সর্বোত্তম উপায়'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৮৩)

অথচ নিজেই ৩৬ পৃষ্ঠায় পর্ব ১৮-এর শিরোনাম করেছেন, 'সৌদি আরবকে অন্ধঅনুকরণ করা যাবে না তবে...'। 'তবে'র পর বইতেও এরকম কতগুলি ডট রয়েছে।

অন্ধঅনুকরণ তো এমনিতেই খারাপ, তার উপর নিজেই লিখে এসেছেন যে, অন্ধঅনুকরণ করা যাবে না। এখন বলছেন, সৌদি আরবের

অন্ধঅনুকরণই সর্বোত্তম উপায়!!

সম্মানিত পাঠক! খেয়াল রাখুন, এখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সৌদির দেখার অনুসরণ করতে বলছেন। তার আরেকটি পরামর্শ হলো, সৌদির দেখার পরিবর্তে সৌদি আরবের সরকারি ক্যালেন্ডার 'তাকবীমু উম্মিল কুরা' (উম্মুল কুরা পঞ্জিকা)-এর অনুসরণ করা। সেটা ভিন্ন আরেকটি পরামর্শ। তার আলোচনা সামনে আসছে।

(সর্বপ্রথম দেখা এবং সৌদির দেখা) এই দুই পরামর্শে যাইহোক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালনের কথা বলছেন। আর প্রথম পরামর্শে তো পরিষ্কার বলেছেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সর্বপ্রথম দেখা অনুসারে মাস আরম্ভ করা এবং রোযা ও ঈদ করা অপরিহার্য এবং এটাই আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম। কিন্তু বইয়ের অধিকাংশ জায়গায় একে রদ করেছেন এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, কুরআনে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের কথা বলা হয়েছে, 'দেখা'র কথা নয়। আর হাদীসে যদিও 'দেখা'র কথা আছে, কিন্তু এটা সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। এখন যামানা বদলে গেছে। অতএব এখন আর এ অনুযায়ী আমল করা চলবে না। বরং জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের নিরীখে মাস শুরু করতে হবে এবং সে অনুসারেই সকল স্থানে একই তারিখে রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের প্রসঙ্গ তোলা হলে যে কথাটা প্রথমেই চলে আসে তা হলো, জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের বিচারে চান্দ্রমাসের গণনা তো বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং একেক গণনার ভিত্তিতে চান্দ্রমাসের শুরু ও শেষ একেক রকম হবে, তা-ই স্বাভাবিক। প্রশ্ন হল, কোনো জাতি বা সম্প্রদায় যদি (আল্লাহ রক্ষা করেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে নতুন চাঁদ দেখার পরিবর্তে জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালন করতে চায় তাহলে তারা কোন্ ধরনের গণনার অনুসরণ করবে?

এ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উম্মতকে বেশ কয়েকটি উপায় নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি উপায়কে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম বলে উল্লেখ করেছেন। তারপর এই সবগুলো উপায়ের

বিরোধিতা করে একটি নতুন উপায়ও তিনি উদ্ভাবন করেছেন। তারপর নিজেই আবার তার বিরোধিতা করেছেন এবং এখনো করে চলেছেন!! সামনে দেখুন :

৩. এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনের মাধ্যমে মাস শুরু

এ বিষয়ে পাঠক তার বিভিন্ন বক্তব্য পর্যালোচনাসহ পড়ে এসেছেন। সেখানে দেখেছেন, এই ভিত্তিহীন বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য তিনি কত ধরনের বিভ্রান্তি ও ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছেন এবং আয়াত- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ (২ : ১৮৯)-এর অর্থ বিকৃত করে কেমন ধৃষ্টতার সাথে একে তার সংস্কারকর্ম বলে দাবি করেছেন! কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যখন নিজেই তার সংস্কারকর্ম (?!)-এর বিরোধিতা করতে শুরু করেন, তখন কারই বা কী করার থাকে! পাঠক এও দেখছেন, তার বইয়ে তিনি কুরআনের তরজমাকারীদেরকে, তাফসীরকারদেরকে এবং গোটা উম্মতে মুসলিমাকে বারবার দোষারোপ করেছেন যে, তারা يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ-এর অর্থ বোঝেননি। আর কুরআনের তরজমাকারীগণও এর ভুল তরজমা করেছেন। তিনি বারবার গোঁ ধরেছেন যে, আয়াতে হিলাল বা নবচন্দ্র নয়, বরং অমাবস্যাকালীন দর্শনযোগ্য নয়- এমন চাঁদ দিয়েই মাস শুরু করতে বলা হয়েছে। এই মিথ্যা দাবির স্বপক্ষে দ্বিতীয় আরেকটি মিথ্যার অবতারণা করেছেন যে, কুরআন নবচন্দ্রের খোঁজ জানতে বলেছে হিসাবের মাধ্যমে!!

এখন দেখুন, গ্রন্থকার নিজেই দু’টো কথার বিরোধিতা করেছেন। বইয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুর দিকে আয়াত ২ : ১৮৯-এর নিজের বানোয়াট তরজমা লিখে ‘ব্যাখ্যাসহ মন্তব্য’-এর অধীনে লিখেছেন, ‘এর জবাবে আল্লাহ বলেছেন, এই নবচন্দ্র সারা বিশ্বের মানুষের জন্য মাসসমূহ হিসাব করার মাধ্যম। নতুন চন্দ্রোদয় দিয়ে মাস আরম্ভ হবে। আর পরবর্তী মাস আরম্ভ হবে আরেক নতুন চন্দ্রোদয় দিয়ে’। (চান্দ্রমাস, নবম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ১১২, সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৫৫)

আরো লিখেছেন, ‘তাই বিশ্বের যে কোনো স্থানেই নূতন চন্দ্রোদয় হলে সারা পৃথিবীতে চান্দ্রমাস আরম্ভ হয়ে যাবে’। (পৃষ্ঠা : ১১২) এ-ও

লিখেছেন, ‘এই আরম্ভটা পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে নবচন্দ্র দেখার মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে’।

দেখুন, নিজেই কত স্পষ্টভাবে বলছেন যে, আয়াতে নতুন চাঁদের প্রথম দেখার মাধ্যমে মাস শুরুর হুকুম দেয়া হয়েছে। এখন, অমাবস্যার চাঁদ তো দেখতে পাওয়া এমনিতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ভাষ্যমতে অমাবস্যার সময় চন্দ্রোদয় হয়ই না। তাহলে এখানে যে তিনি নতুন চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে মাস আরম্ভের কথা বলছেন নিশ্চয়ই সেটা অমাবস্যার চাঁদ নয়।

আরেক জায়গায় লিখেছেন, ‘পূর্বাকাশে চন্দ্রোদয় এবং পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্ত একই সময় সংঘটিত হলে পূর্ণিমা হয়। আর পশ্চিমাকাশে চন্দ্র-সূর্য একই সাথে অস্ত গেলে অমাবস্যা হয়। তাই প্রথম চন্দ্রোদয় দিয়েই পৃথিবীতে চান্দ্রমাস আরম্ভ হবে। বাকি দিনগুলোতেও চন্দ্রোদয় হবে। তবে তা হবে পুরাতন চন্দ্রোদয়। সূরা ইয়াসীন-এর আয়াত- ৩৯-এর মধ্যে এ বিষয়টা আল্লাহ পরিষ্কার করেই বলে দিয়েছেন। তারপর তো আর না বুঝার কিছু নেই’। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৩৭, পর্ব : ১৯)

এখানেও কুরআনের উদ্ধৃতিতে অমাবস্যার পর নতুন চাঁদের প্রথম উদয়কে ভিত্তি বানানোর কথা বলছেন। এরপর তাহলে কেন এই একগুঁয়েমি যে, কুরআন অমাবস্যার চাঁদ দিয়ে মাস আরম্ভ করতে বলেছে?

তার বক্তব্যের এই স্ববিরোধিতার দিকেই শুধু এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। দীর্ঘ আলোচনা নয়। তো কী দেখলাম? এক জায়গায় তিনি বলছেন একসঙ্গে রোযা ও ঈদ পালনের ভিত্তি হবে সর্বপ্রথম দেখা। আরেক জায়গায় বলছেন, তা করতে হবে এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনের ভিত্তিতে। আবার দু’টোকেই বলেছেন কুরআনের নির্দেশ। দু’টোকেই আয়াত ২ : ১৮৯-এরই ব্যাখ্য ও বিধান বলে উল্লেখ করছেন। তবে নতুন চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে মাস আরম্ভ হবার পক্ষে সূরা ইয়াসীন-এর আয়াত ৩৯-কে বাড়তি হাওয়ালা হিসেবে পেশ করেছেন। ঐ দিকে আবার প্রথম চাঁদ দেখা ছেড়ে সৌদির চাঁদ দেখাকে ভিত্তি বানাতেও বলছেন!

৪. চাঁদের আগে সূর্য অস্তমিত হওয়া

২১ পর্বে লিখেছেন, 'পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জন্য সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের নিখুঁত হিসাব বিজ্ঞানীদের কাছে করা আছে। একইভাবে চন্দ্রোদয় চন্দ্রাস্তের হিসাবও বিজ্ঞানীদের কাছে করা আছে। অতএব প্রতি মাসের শেষে যে কোনো স্থানে সূর্যাস্তের পরে যখন চন্দ্রাস্ত হবে তখনই পৃথিবীতে নবচন্দ্রের শুরু হয়েছে বুঝতে হবে। এর ভিত্তিতে চন্দ্রালোকের ভগ্নাংশের হিসাবসহ বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই করে রেখেছেন'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪০, প্যারা : ৭)

কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার লঙ্ঘন করে, চাঁদ দেখার পরিবর্তে তিনি যে হিসাবের ভিত্তিতে চান্দ্রমাস শুরু করাতে চান, সেই হিসাবের দ্বিতীয় মাপকাঠি তিনি এখানে এই উল্লেখ করলেন যে, প্রত্যেক মাসের শেষে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে চন্দ্রাস্ত যদি সূর্যাস্তের পরে হয় তাহলে তাই হবে চান্দ্রমাসের শুরু।

আমরা বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে চাই, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে এ কথার কী অর্থ? তিনি কি একেই এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন মনে করছেন? যদি তা-ই হয় তাহলে তো জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার দক্ষতার হাল-হাকীকত এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক ছাত্রদেরও জানা আছে যে, জ্যোতির্শাস্ত্রীয় 'নিউমুন'-এর চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। বরং 'নিউমুন'-এর আসল ব্যাপার হল, মিলন বা সংযুক্তি (কনজাঙ্কশন)। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সরল রেখার উপর একত্রিত হওয়া, আর চাঁদ মাঝখানে এসে পড়া। ইতোপূর্বে উদ্ধৃতিসহ এর আলোচনা হয়েছে।

চান্দ্রমাসের শেষের দিকে সূর্যের পরে চাঁদের অস্তমিত হওয়া অর্থাৎ সূর্যাস্তের কালে চাঁদের দিগন্তে বিরাজ করা- এটা কনজাঙ্কশানের আগেও হতে পারে এবং কনজাঙ্কশানের পর চাঁদ 'হিলাল'-এর অবস্থায় পৌঁছার আগেও হতে পারে। আবার দর্শনযোগ্য নতুন চাঁদের রূপ নেয়ার পরও হতে পারে। যদি কনজাঙ্কশানের আগে এমনটা হয় তাহলে জ্যোতির্শাস্ত্রের পরিভাষায় এটা হল পুরানো চাঁদের অংশ। আর কনজাঙ্কশানের পরে যদি হয় তাহলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় যদিও তা নতুন চাঁদ, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দর্শনযোগ্য না হবে ততক্ষণ তা 'হিলাল' নয়, যা দেখে

রোযা ও ঈদ পালন করার বিধান।

এখন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে চান্দ্রমাসের শেষে সূর্যাস্তের সময় চাঁদের দিগন্তে বিরাজ করাকে নবচন্দ্র বা চান্দ্রমাসের সূচনা সাব্যস্ত করছেন, এটা কি এ জন্য যে, তিনি একেই জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ‘নিউমুন’ মনে করছেন? আর তার কাছে তো কুরআনী ‘হিলাল’-এর অর্থ (নাউযুবিল্লাহ) ‘নিউমুন’-ই বটে। যদি তাই ভেবে থাকেন তাহলে তো এটা গলদ, কোনো সন্দেহ নেই। নাকি এজন্য যে, তিনি একে ‘নিউমুন’-এর মোকাবেলায় মাস শুরুর স্বতন্ত্র কোনো মাপকাঠি বিবেচনা করছেন? সে ক্ষেত্রে তার দলীল কী? কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং শরয়ী কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত এমন কোন দলীল কি আছে এর পক্ষে, যার আলোকে ইসলামে একে চান্দ্রমাসের শুরু গণ্য করা যাবে? উত্তর পরিষ্কার। কোনো ধরনের দলীল-প্রমাণ নেই। বরং এমন চিন্তাপোষণ শরয়ী প্রমাণাদির পরিপন্থী এক কর্মপন্থারই অনুসরণ। দলীল দ্বারা যা প্রমাণিত তা হলো, ‘দেখা’ই হবে ভিত্তি; হিসাবসর্বস্ব ‘নিউমুন’ও না, গণনানির্ভর উদয় ও অস্তও নয়। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মত বিচারেও এটা কুরআন বিরোধী প্রতীয়মান হয়। কারণ তার মতে তো নাউযুবিল্লাহ কুরআন জ্যোতির্শাস্ত্রীয় ‘নিউমুন’ (অমাবস্যা)-এর মাধ্যমে মাস আরম্ভ করতে বলেছে (মাসের শেষে সূর্যাস্তের পরে চন্দ্রাস্ত দিয়ে নয়)!!

৫. উত্তর আমেরিকা ফেকাহ কাউন্সিলের ক্যালেন্ডার

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার গ্রন্থের ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায়, ২২ পর্বে ৪-১২ নম্বর প্যারায় উত্তর আমেরিকা ফেকাহ কাউন্সিলের তৈরি করা ক্যালেন্ডার মোতাবিক আমল করতে বলেছেন। এ সম্পর্কে অন্যান্য বক্তব্যের সাথে এ-ও লিখেছেন যে, ‘এই মর্মে রাসূল (সা:) এর হাদীস মোতাবেক চন্দ্রদর্শনকে নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখরেখা বরাবর সূর্যাস্তের পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে নবচন্দ্র শুরু হওয়ার পর হতেই পরবর্তী মাসের পহেলা তারিখ গুনতে হবে। কারণ পরবর্তী দিনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে বা স্থানে অবশ্যই নবচন্দ্র দেখা যাবে’। ‘আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার পরে নবচন্দ্রের শুরু হলে সেই দিনকে ঐ চান্দ্রমাসের শেষ দিন ধরতে হবে এবং পরের দিন হতে নতুন মাসের প্রথম তারিখ আরম্ভ হবে। এক্ষেত্রেও

নবচন্দ্র দর্শনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। আমার প্রস্তাবের ভিত্তিও এটাই’।

‘এই মতকে ভিত্তি ধরে উত্তর আমেরিকার ফেকাহ কাউন্সিল কর্তৃক বিশ্বব্যাপী অনুসরণযোগ্য ‘বিশ্ব ইসলামী ক্যালেন্ডার’ যা একবিংশ পর্বের একাদশ ক্রমিকে উল্লেখ করা আছে, তাকে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা হলে মুসলিম উম্মাহ সারা বিশ্বে একই বারে রোযা/ঈদ পালন করতে পারবে’। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪৩, পর্ব : ২২)

এই ফেকাহ কাউন্সিলের মূল্য বা গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনা ও ফিকহ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানই বা কী- এসব নিয়ে আলোচনা এখন নয়। এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই কাউন্সিলের তৈরি ক্যালেন্ডারের মান সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা ঠিক কি ঠিক না, বা তার মান যাই হোক শরীয়তের দৃষ্টিতে তা গ্রহণীয় কি না- এ বিষয়েও এখন কিছু বলতে চাই না। এখন শুধু এটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, তিনি যে চাঁদ দেখার পরিবর্তে গণনার উপর নির্ভরশীলতাকে কুরআনের হুকুম বলে উল্লেখ করেছেন, সেই গণনার একটি উপায় তিনি এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, উপরিউক্ত কাউন্সিলের অনুসরণ করে নাও, তো ব্যস্ এতেই চলবে!

গণনার মাধ্যমে মাস আরম্ভ করা বিষয়ে এটা তাহলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তৃতীয় পরামর্শ হল।

৬. উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসরণ

১৮ পর্বে লিখেছেন, ‘অতএব সারা বিশ্বে প্রথম চাঁদ দেখার সময় হতে একই বারে রোযা রাখা এবং একইবারে ঈদ পালন করার কোনো বিকল্প নেই। ‘আন্তর্জাতিক চাঁদ দেখা কমিটি’ও এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারে’।

‘এতদসত্ত্বেও সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ যদি খানা-ই-কাবাকেই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হিসেবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে মক্কা শরীফে সূর্যাস্তের পর

চন্দ্রাস্তকে নবচন্দ্রের শুরু ধরে পরের দিন হতে বিশ্বব্যাপী একত্রে চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে চায় তাতে চান্দ্রমাসের হিসাব সঠিকতার আনেকটা কাছাকাছি চলে আসবে। কারণ আমার প্রস্তাবের সাথে উম্মুল কুরা প্রস্তাবের তফাৎ খুবই কম। কিন্তু এই হিসাবের সাথে কোরআন পাকে বর্ণিত হিসাবের কোন পার্থক্য আছে কি না তা দেখতে হবে। তাছাড়া এই হিসাব অনুসরণ করা হলে সাপ্তাহিক দিন ও তারিখ নির্ধারণ নিয়ে বড় রকমের বিশৃঙ্খলাসহ একই বারে সারা বিশ্বে কেয়ামত হওয়ার বিষয়টাও অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। তবে যারা সৌদী আরবকে অনুসরণ করেন তারা অবশ্যই ২/৩ দিন ধরে রোযা-ঈদ পালনকারীদের চেয়ে ভুল কম করেন এবং অধিকতর উত্তম কাজ করেন’।

‘এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বিগত ৭০ বৎসর যাবতই বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার সাদরা দরবার শরীফ এবং পরবর্তীতে শতশত স্থানে এমনকি বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে সৌদী আরবের সাথে রোযা ঈদ পালিত হচ্ছে।’ (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৩৬, প্যারা : ৯-১১)

সম্মানিত পাঠক! একটু লক্ষ্য করুন, এ লোক যখন নিজেই স্বীকার করছেন যে, প্রথম দেখাই হল ভিত্তি, তখন ক্যালেন্ডার অনুসারে আমল করাকে তিনি কীভাবে বৈধতা দেন? তদুপরি উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার সম্পর্কে যে কথা বইয়ের নবম সংস্করণে রয়েছে তা হুবহু আগের সংস্করণ (২০০৮-এর সংস্করণ)-এও ছিল। প্রশ্ন হল, যখন তিনি নিজেই বলছেন যে, এই ক্যালেন্ডারের হিসাবের সাথে কুরআন পাকে বর্ণিত হিসাবের কোনো পার্থক্য আছে কি না দেখতে হবে- তো এটা তিনি নিজেই দেখে নিতেন। এতগুলি বছর পার হয়ে গেলো, অথচ তিনি এখন পর্যন্ত এটা দেখেনইনি। পাঠকদেরকেই বলছেন দেখে নিতে। ওদিকে এ অনুযায়ী আমলেরও অনুমতি দিচ্ছেন। তবে কি শরীয়ত তার দৃষ্টিতে শিশুর খেলনা, তা নিয়ে যেমন ইচ্ছা তামাশা করা যাবে?!

কুরআন হিলালের মাধ্যমে মাস আরম্ভ করতে বলেছে, জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের মাধ্যমে নয়- এ কথা জানে না এমন কে আছে? কুরআনে যখন জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের মাধ্যমে মাস শুরুর প্রসঙ্গই নেই তখন ইবাদাতসমূহের তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই হিসাবের উপর নির্ভরশীল ক্যালেন্ডারের গ্রহণযোগ্যতা যে প্রথম দফাতেই বাদ হয়ে যায়, তা বলে

বোঝানোর দরকার নেই এবং এ নিয়ে কোনো দেন-দরবারেরও প্রয়োজন নেই। তার অবকাশও নেই।

আর যে ব্যক্তির জ্ঞানের স্তর হল, ১০ মুহাররম কেয়ামত কায়েম হওয়ার হাদীসটি যে জাল, এটুকুও তিনি জানেন না এবং যার আকল-বুদ্ধি এই পর্যায়ের যে, তিনি কেয়ামত কায়েম করাকে শরীয়তের হুকুম মনে করছেন, অথচ এটা সরাসরি 'তাকবীনী' মুয়ামালা, যা একান্তই আল্লাহর কাজ। বেচারা এটা বুঝতে অক্ষম যে, শরীয়ত প্রদানকারী তো হলেন আল্লাহ। কিন্তু তার মুকাল্লাফ (পালনে আদিষ্ট) হচ্ছে মানুষ। মানুষের রব নন। এবং এটাও বুঝতে অপারগ যে, আল্লাহ তাআলার তারিখ জানার জন্য মাখলূকের ক্যালেন্ডারের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি এও বুঝতে অপারগ যে, ঊর্ধ্বজগৎ এবং অধঃজগতের সময়সূচী এক হওয়া আবশ্যক না- তো এই যার বুদ্ধির দৌড়, তার কী অধিকার আছে কোনো বিষয়ে কলম ধরার?!

বইয়ের এক জায়গায় তো তার যবান ও কলম থেকে একথাও বেরিয়ে এসেছে :

'আমার প্রস্তাবিত 'বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' অনুসরণ করা হলে কেয়ামতের দিন হবে মুহাররম মাসের ১০ (দশ) তারিখ শুক্রবার। আশুরার এই শুক্রবার দিন আন্তর্জাতিক তারিখ রেখায় সূর্য অস্ত যাওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে কেয়ামত সংঘটিত হবে। এভাবে একই বারে সারা পৃথিবীতে একসাথে কেয়ামত হলে শরীয়তের বিধান লংঘিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৯২)

সম্মানিত পাঠক! এ এমনই এক অর্বাচীনের উক্তি, যার বিষয়ে মন্তব্য করার মতো শব্দ আমার কাছে নেই। আমি শুধু এটুকু বলবো যে, জনাবের তো তাহলে উচিত কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ক্যালেন্ডার তৈরি করে দেয়া! কিন্তু সেই সময়টি তো কারোরই জানা নেই। নিজের কিয়ামত কখন ঘটে যায় সেই খবরই তো কারো জানা নেই। যে মানুষ ১৪৩৮ বর্তমান এই হিজরী বর্ষ পর্যন্ত ক্যালেন্ডারটিও এখনো তৈরি করতে পারেননি, তিনি কি না স্বপ্ন দেখছেন তার ক্যালেন্ডার মোতাবেক কিয়ামত সংঘটিত হবার! কিয়ামত ও শরীয়ত এ দু'য়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি নেই, এটাও মহোদয়ের অজানা। এরপর আমাদের আর কী বলার থাকে?! এবং সিঙ্গা

ফোঁকার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা সিঙ্গায় ফুঁক দেবেন কি সরাসরি আল্লাহর হুকুমে, নাকি ক্যালেন্ডার দেখে এইটুকু এলেমও জনাব রাখেন না। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিজের ব্যাপারে এ এক আশ্চর্য সুধারণা যে, ঐ ফেরেশতা তার চান্দ্র-ক্যালেন্ডার (এখন পর্যন্ত যার কোনো অস্তিত্বই নেই) দেখেই ফুঁক দেবেন সিঙ্গায়! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! ব্যস্ আল্লাহ আমাদেরকে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার তাওফীক দান করুন।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ اَدْهٰى وَ اَمَرُّ

আর এটা কত না হাস্যকর এবং দুঃখজনক কথা যে, কিয়ামতের সূচনা নাকি হবে আইডিএল অনুসারে! এমন গালগল্প আর এমন কল্পনাবিলাস মানুষ কী করে দেখায়! তাও আবার কিয়ামতের মতো বিষয়ে, যা কিনা আল্লাহ তাআলার কুদরতের বিশাল এক নিদর্শন!!

যাই হোক, কথা হচ্ছিল উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার নিয়ে। তো এই ক্যালেন্ডার কেবল দাপ্তরিক কাজকর্মে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। খোদ সৌদিতেই রোযা, হজ্ব, কুরবানী ও অন্যান্য দ্বীনী কর্মকাণ্ডে এই ক্যালেন্ডারের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই ক্যালেন্ডারে প্রত্যেক চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখের নিচে এই সতর্কবাণী লেখা আছে যে,

التقويم اصطلاحي مدني اعتمد في حسابه على إحداثيات المسجد الحرام، ويعتمد في حساب أوائل الأشهر على الرؤية الشرعية للهلال.

অর্থাৎ “এ ক্যালেন্ডারটি আমাদের পারিভাষিক বিষয়। যা ব্যবস্থাপনাগত প্রয়োজন পূরণের জন্য। চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে হিলালের শরীয়তসম্মত ‘দেখা’-এর উপর নির্ভর করতে হবে।”

যে কোনো বছরের উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার হাতে নিন, তাতে আপনি এই পরিষ্কার বিবরণ দেখতে পাবেন। যেহেতু এই ক্যালেন্ডার দাপ্তরিক কাজকর্মের জন্য তাই এর ফর্মুলাও তাদের এখানে পরিবর্তন হতে থাকে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের যদি তা জানা থাকতো তাহলে তিনি অবশ্যই বুঝতে পারতেন যে, ইবাদতের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ক্যালেন্ডার শরীয়তের নীতিমালার আলোকেও সঠিক নয় এবং তার আবিষ্কৃত নিয়ম

অনুসারেও নয়।

উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডারে চান্দ্রমাস সূচনার মাপকাঠিতে কী কী পরিবর্তন এসেছে- সংক্ষেপে তা এখানে উদ্ধৃত করা ভালো মনে হচ্ছে।

১৩৪৬ হিজরী থেকে ১৩৯২ হিজরী (১৯২৭ ঈ. -১৯৭৩ ঈ.) পর্যন্ত মাপকাঠি ছিল এই যে, সূর্যাস্তের সময় দিগন্ত থেকে চাঁদের উচ্চতা নয় ডিগ্রী বা তার চেয়ে বেশি হলে পরবর্তী দিন থেকে চান্দ্রমাস শুরু হবে।

১৩৯৩ হিজরী থেকে ১৪১৯ হিজরী (১৯৭৩ ঈ. -১৯৯৭ ঈ.) পর্যন্ত মানদ-ছিল, গ্রীনিচ মান সময় অনুসারে রাত বারোটা (সৌদির সময় অনুসারে রাত নয়টা)-এর আগে যদি চাঁদের জন্ম হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী দিন হবে চান্দ্রমাসের প্রথম দিন।

১৪১৯ হিজরী থেকে ১৪২২ হিজরী (১৯৯৮ ঈ.-২০০২ ঈ.) পর্যন্ত মাপকাঠি ছিল, মক্কা মুকাররমায় সূর্যাস্তের পর যদি চন্দ্রাস্ত হয় (চাঁদের জন্ম হয়ে থাকুক আর নাই হোক) পরবর্তী দিন চান্দ্রমাসের প্রথম দিন।

১৪২৩ হিজরী (মার্চ ২০০২ ঈ.) থেকে এ নিয়ম চালু রয়েছে যে, যদি সূর্যাস্তের আগেই চাঁদের জন্ম হয়ে গিয়ে থাকে এবং মক্কা মুকারমায় সূর্যাস্তের পর চন্দ্রাস্ত হয় তাহলে পরবর্তী দিন হবে চান্দ্রমাসের প্রথম দিন [1]১।

সামনে এতে আরো কী পরিবর্তন আসে, সেটা তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এখন বিভিন্ন এলাকা থেকে সৌদি সরকারের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে, নবচন্দ্র দেখা যাওয়ার সম্ভাব্য সময়কে মাপকাঠি বানিয়ে উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার তৈরি করা হোক।

যাইহোক, আমি বলতে চাচ্ছিলাম, যেই ক্যালেন্ডারের ভিত্তি কোনো শরয়ী মাপকাঠির উপর নয়, সময় যত গড়াবে তাতে পরিবর্তন আসতেই থাকবে। তো এমন ক্যালেন্ডারকে ইসলামী ইবাদতের মানদ- বানানো কি ঠিক হয়? স্বয়ং এই ক্যালেন্ডার প্রণেতাগণ স্পষ্ট বলেছেন, এই ক্যালেন্ডার দাপ্তরিক ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট। ইসলামী মাস শুরু হবে শরীয়তসম্মত 'দেখা' অনুসারে। সেজন্য সৌদির ওলামা মাশায়েখ এবং

সকল উমারা ও আম-জনতা সেখানকার চাঁদ দেখা কমিটির ফায়সালা অনুযায়ী আমল করে থাকেন।

তো এই ক্যালেন্ডারটি শুধুই দাপ্তরিক কাজের জন্য। তা সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদেরকে এই ক্যালেন্ডার মোতাবেক রোযা ও ঈদ করার দাওয়াত দিচ্ছেন। তবে কি ইবাদত কোনো দাপ্তরিক কিংবা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজ?

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিকে এই দাওয়াত দিচ্ছেন, অন্যদিকে নিজেই আবার লিখে বসে আছেন, 'ক্রমিক ১১-এর চার্ট হতে দেখা যাচ্ছে যে, নবচন্দ্র দর্শনকে নিশ্চিত করার জন্য সৌদী আরবের 'উম্মুল কুরা' (সৌদী সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান) পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় প্রায় প্রতি চান্দ্রমাস আরম্ভ করে একদিন পরে। এটা সমর্থনযোগ্য কাজ হতে পারে না'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪১, প্যারা : ১৬)

যে জিনিস সমর্থনযোগ্য হতে পারে না, সে অনুসারেই তিনি উম্মতকে আমল করতে বলছেন, এই হল তার সংস্কার! হিসাবের মাধ্যমে মাস শুরুর বিষয়ে এটা হলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চতুর্থ পরামর্শ।

৭. বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার

সপ্তম পরামর্শ হল, তার প্রস্তাবিত 'বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারে'র অনুসরণ করা। তিনি লিখেছেন,

'এই পর্বের একাদশ প্যারায় প্রদত্ত চার্ট বা ছক পর্যালোচনা করে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার পরে নবচন্দ্রের শুরুকে ভিত্তি ধরে আমি একটা সার্বজনীন 'বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' টেবিলের ডান পার্শ্বে নবম কলামে প্রস্তাব করেছি। এই প্রস্তাবে বিশ্বব্যাপী নবচন্দ্রের শুরু এবং নবচন্দ্রের দর্শন উভয়েরই মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা ব্যবধানের কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে'।

'এই ক্যালেন্ডার সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। তাতে বিশ্ব

ইসলামী উম্মাহর মধ্যে একাত্মতা ও সাবির্ক সমন্বয় সাধিত হবে। একই সঙ্গে এই ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহ বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে'।

'এই সমন্বিত ও প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডারের মূল ভিত্তি কিন্তু কোরআন, হাদীস এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান, যা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। তাছাড়া সার্বজনীন চিন্তা ও চেতনায় এর মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পরিপূর্ণভাবে সারা বিশ্বে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা লাভের প্রকৃত আলামত অন্তর্নিহিত আছে'।

'অতএব আমরা এই সমন্বিত প্রস্তাবকে 'বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' হিসেবে গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। তাহলে বিভাজন ছেড়ে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যের পথে এগিয়ে যেতে পারবে'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪১-৪২, প্যারা : ১৮, ১৯, ২০, ২২)

উত্তর আমেরিকা ফিকাহ কাউন্সিলের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমলের অনুমতি দেওয়ার পর লিখেছেন, 'তবে আমার প্রস্তাবিত 'বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' বিভিন্ন দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণের কারণে আরও বেশি তথ্যনির্ভর ও যুক্তিসঙ্গত'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪৩, প্যারা : ১৩)

এক জায়গায় এও লিখেছেন, 'অতএব আমার দৃষ্টিতে উপায় একটাই। তা হল, আমার প্রস্তাবিত 'বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার'কে মানবজাতির জন্য আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ গ্রহণ করা এবং বিশ্বব্যাপী অনুসরণ করা'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪৭, পর্ব ২৪, প্যারা : ৮)

তার এই 'বিশ্বহিজরী ক্যালেন্ডারে'র গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু সেটা তার যবানীতেই শুনুন। পর্ব ৩৩, যা নিয়ে তার খুবই গর্ব, সেখানে তিনি অমাবস্যাকে অস্বীকারও করেছেন, আবার অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া প্রথম নবচন্দ্রকে মাসের সূচনাও সাব্যস্ত করেছেন। তারপর লিখেছেন, 'এই বিবেচনায় লেখকের প্রস্তাবিত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারে কদাচিৎ ক্ষেত্রে মাসকে একদিন এগিয়ে আনতে হতে পারে। হিসাবের নিখুঁততার খাতিরে এমন হওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়'।

'কারণ নতুন চাঁদের শুরু দিয়ে মাস আরম্ভ করা হলে ২/১ ক্ষেত্রে চান্দ্রমাস

একদিন আগে শুরু হওয়া বিচিত্র নয়'।

'মূলে সূরা বাকারার আয়াত ২ : ১৮৯-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা এ কথাই ব্যক্ত করেছেন'।

'আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান ও সহীহ বুঝ দান করুন।' (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৫৮, প্যারা : ১৪-১৭)

দেখুন, প্রথমে তো আয়াত বিকৃত করেছিলেনই, তারপর সেই বিকৃত অর্থের উপরও টিকে থাকতে পারলেন না। পুনরায় তাতে বিকৃতি সাধন করে সেটাকেও আল্লাহর কালাম বলে চালিয়ে দিলেন। কী আশ্চর্য দর্শন! হিসাব নিখুঁত হওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই মাস শুরু করে দাও! সাথে আবার এ দাবিও জুড়ে দাও যে, কুরআন এরকমই বলেছে?!

এখানে প্রসঙ্গত বলতে হয়, 'আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা'-এর পরিবর্তে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা' লেখা উচিত ছিল। আর যদি সর্বনামের পরিবর্তে তিনি (পরের বারও) সরাসরি 'আল্লাহ' এই মহান নামটি রাখতে চান তাহলে 'সুবহানাল্লাহি' লিখতে হবে। 'সুবহানাল্লাহু' নয়।

যাই হোক, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 'দেখা'কে বর্জন করে 'হিসাব'-এর পথ ধরেছিলেন। কিন্তু হিসাবের ব্যাপারে তিনি যে পরস্পর বিরোধী প্রস্তাবের অবতারণা করেছেন, তার ধারাবাহিকতা এখনো শেষ হয়নি। সামনে ষষ্ঠ প্রস্তাবটি দেখুন :

৮. প্রকৃত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার

৫৫ পর্বের শেষ প্যারায় তিনি লিখেছেন, 'উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের জবাব দিতে না পারলে কোরআন, সুন্নাহ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী করা 'প্রকৃত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' অনুসরণ করুন এবং বিশৃঙ্খলা বাদ দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাত ঠিক রাখুন'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৮৭)

প্রকৃত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার বলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন পরিষ্কার নয়। যদি তার তৈরীকৃত ক্যালেন্ডার উদ্দেশ্য হয় তাহলে স্পষ্ট করে বললেই ভালো হত। আর যদি অন্য কোনো ক্যালেন্ডার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এটা তার আরেকটি প্রস্তাব বলে গণ্য হবে।

৯. একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার

নবম প্রস্তাবটি এই যে, একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার তৈরি করে তার অনুসরণ করা হবে। তিনি লিখেছেন, ‘অতএব ‘একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার’ গ্রহণ ও অনুসরণ করা মুসলিম উম্মাহর জন্য একান্তভাবেই জরুরী’। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৩৪, পর্ব : ১৫ প্যারা : ৭)

আরো লিখেছেন, ‘একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার না পাওয়া পর্যন্ত এবং OIC -এর সিদ্ধান্তও যদি মানতে না চাই, তবে ভুলের মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ আপাতত সৌদি আরবকে অনুসরণ করতে পারে। বাংলাদেশ তা করছে না কেন?’ (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৮৭, প্যারা : ২৮)

৫৭ পর্বে লিখেছেন,

‘চাঁদের হিসাব ও দেখাকে যুক্ত করে একটা সমন্বিত উপায় উদ্ভাবন করা যায়’ (শিরোনাম)।

‘জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব বলে, নতুন চাঁদের শুরুর (জন্মের) ১২ ঘণ্টা পরে ছাড়া তা দেখা কখনো সম্ভব নয়।’

‘এই অসম্ভব সময়টাকে ৩ ঘণ্টা বাড়িয়ে ১৫ ঘণ্টা ধরলে একটা সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।’

‘নতুন চাঁদ মক্কার আগে শুরু হলে (জন্ম নিলে) IDL পর্যন্ত এর বয়স হবে ১৫ ঘণ্টার বেশী। এমতাবস্থায় পরের দিন হতে নতুন চান্দ্রমাসের শুরু ধরতে হবে।’

‘নতুন চাঁদ মক্কার পরে শুরু হলে (জন্ম নিলে) পরের দিনটাকে পুরাতন মাসের শেষ দিন ধরতে হবে। কারণ এই সময়ের মধ্যে নতুন চাঁদ IDL -এর আগে দেখা যাবে না’।

‘এভাবে হিসাবের মাধ্যমে নতুন চাঁদ দেখাকে সংযুক্ত করলে একটা সমন্বিত সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে’।

‘এর ভিত্তিতে হিসাবের সাহায্যে একটা একক (Unifieb) বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার তৈরী ও অনুসরণ করা যায়’।

‘২০১১ খৃষ্টাব্দে ঈদুল ফিতরের দিন/তারিখ থেকে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয়।’

‘তবে আমি হিসাবকে কোরআনের নির্দেশ মনে করি’।

‘মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের খাতিরে এমন একটা সিদ্ধান্তকে আপাততঃ মেনে নেওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়’।

‘OIC-এর ইসলামী ফিকহ একাডেমি ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে যেই সিদ্ধান্ত দিয়েছে তার সাথে এই সমন্বিত ব্যবস্থার মিল আছে’। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৯৫-৯৬)

‘তবে আমি হিসাবকে কোরআনের নির্দেশ মনে করি’ তার এ কথার মতলব হল, এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনের মাধ্যমে মাস শুরু করাকে তিনি কুরআনের নিদের্শ মনে করেন। যদি নিউমুন দর্শনযোগ্য হবার জন্য পনেরো ঘণ্টা অপেক্ষা করা হয় তাহলে এতে করে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ অবধারিত হয়ে যায়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলছেন, উম্মতের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির খাতিরে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে ‘দেখা’র সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার মানতে তিনি প্রস্তুত আছেন!!

আর তা সম্ভবত এ কারণে যে, এত শোরগোল এবং কথিত সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, একসাথে রোযা ও ঈদ পালনের বাসনাটা পূর্ণ করা, ব্যস। শরীয়তের বিধান পালন বা তার দাওয়াত দেয়া এখানে মূল ব্যাপার নয়। আর তাই যেটাকে কুরআনের নির্দেশ বলে জ্ঞান করছেন তার ব্যত্যয়

করাও বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে অনায়াসে!

আর না হয় এ কারণে যে, তার তো জানাই আছে, তিনি হিসাব এবং অমাবস্যার যে কথা কুরআনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজের বানানো। না কুরআনে এমন নির্দেশ আছে, না শরীয়তের অন্য কোনো উৎসে। অতএব এর ব্যতিক্রম বা বরখেলাফ করা কী এমন ব্যাপার?!

যাই হোক, তিনিই বুঝুন তার হিসাব। আমাদের প্রশ্নটা হল, সেই একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার কোথায়? উপরে উল্লেখ করা কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে, ঐ ক্যালেন্ডার এখনো তৈরী হয়নি। সেটা তৈরী করে তার অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু ৫৮ পর্বে তো বলেছেন, 'এই আয়াত হতেই চন্দ্রের হিসাবে আমরা 'একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' পাব, যা আমি তৈরী করেছি'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা: ৯৭, প্যারা : ১৪)

যদি এটা জনাবের কাছে তৈরী থাকেই তাহলে তো সেটা উম্মতের সামনে আসা চাই। কিন্তু কই সেটা? আপনি তো 'উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডারই ছেপে যাচ্ছেন, 'একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' গেলো কোথায়?

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে প্রশ্ন- কিসের নাম নবচন্দ্রের শুরু?

নবম ও সর্বশেষ সংস্করণের ১৫০-১৫৫ পৃষ্ঠায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব শুধু তিন বছরের (১৪৩১-১৪৩৩ হিজরী) জন্য নিজের প্রস্তাবিত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারের একটি ছক পেশ করেছেন। ১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠায় এই ছকের পর্যালোচনা পেশ করেছেন। সেখানে লিখেছেন, 'তিন ঘণ্টা অন্তর সময়ের হিসাবের মাধ্যমে সূর্যাস্তের পর

চন্দ্রাস্তকে নিধার্রণ করার জন্য পৃথিবীর বিষুবরেখাকে তিন ঘণ্টা অন্তর ৮ (আট) ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে'।

'এই আটভাগে বিষুবরেখা বরাবর প্রতি মাসের শুরুতে সূর্যাস্তের পরেই চন্দ্রাস্তের বিবরণ দেখে নবচন্দ্রের শুরুর তারিখ বের করা হয়েছে। ইংরেজী মাস অনুযায়ী এই বিবরণসমূহ ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে'।

'১৫০-১৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছকের ১ থেকে ৮ কলামসমূহে নবচন্দ্রের আরম্ভের তারিখ বিষুবরেখার আটটি নির্দিষ্ট স্থানে আরবী ও ইংরেজী মাসের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে'।

'বিজ্ঞানীদের মতে নবচন্দ্রের আরম্ভের পর নবচন্দ্র দশর্নের জন্য কমপক্ষে বার ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়'।

'তাই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (IDL) হতে পরবর্তী ৬ (ছয়) ঘণ্টা পর নবচন্দ্রের শুরুর তারিখ নিশ্চিত হওয়ার পরের দিনকে আরবী মাসের শুরু ধরা হয়েছে'।

'এতে করে হাদীসের কথামত নতুন চাঁদ দেখার বিষয়টা নিশ্চিত হয়ে যাবে'।

'IDL -এর পর ৬ (ছয়) ঘণ্টার মধ্যে নবচন্দ্রের আরম্ভকে শরীয়াহর ভিত্তিতে নিশ্চিত বা দৃঢ়করণের খাতিরে আমলে নেওয়া হয়নি'।

সপ্তম সংস্করণে লিখেছিলেন এরকম :

'বিজ্ঞানীদের মতে নবচন্দ্রের জন্মের পর নবচন্দ্র দর্শনের জন্য কমপক্ষে বার ঘণ্টার প্রয়োজন হয়'।

'তাই দিবারম্ভের সূত্ররেখা (IDL) হতে পরবর্তী ৬ (ছয়) ঘণ্টার পর নবচন্দ্রের জন্ম তারিখ নিশ্চিত হওয়ার পরের দিনকে আরবী মাসের শুরু ধরা হয়েছে'। (চান্দ্রমাস, সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৪২)

প্রশ্ন হল, আগে যেটাকে 'নবচন্দ্রের জন্ম' লিখেছিলেন এখন সেটাকে 'নবচন্দ্রের শুরু' বা 'আরম্ভ' কেন লিখছেন? আবার দু'টো কথাই বিজ্ঞানীদের বরাতে? যদি 'জন্ম' শব্দ এ জন্য পরিবর্তন করে থাকেন যে, উল্লেখিত মানদ- (মাসের শেষে সূর্যাস্তের সময় দিগন্তে চাদের উপস্থিতি কিংবা সূর্যাস্তের পর চন্দ্রাস্ত) বিজ্ঞানীদের মতে নবচন্দ্রের জন্ম নয়, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, নবচন্দ্রের জন্ম তবে কিসের নাম, তার মতে? ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বই এ ব্যাপারে একদম খামোশ কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, যদি এটা (সূর্যের পরে চাঁদের অস্তমিত হওয়া) নবচন্দ্রের ‘জন্ম’ নয়; বরং নবচন্দ্রের ‘শুরু’, তাহলে তো বিজ্ঞানীদের রেফারেন্সে জনাবের লেখা উচিত ছিল যে, অমুক অমুক বিজ্ঞানী একে নবচন্দ্রের শুরু আখ্যা দিয়েছেন? কিন্তু এমন কোনো রেফারেন্সের উল্লেখ তো আমরা বইতে পেলাম না!

তৃতীয় প্রশ্ন : সারা বইয়ে কয়েক বার করে লেখা হয়েছে যে, নবচন্দ্রের শুরু হয় অমাবস্যার মাঝখানে। প্রশ্ন হল, অমাবস্যার মাঝখানটা কি সবসময় সূর্যাস্তের কালেই হয়, যে কারণে ঐ মুহূর্তে দিগন্তে চাঁদের উপস্থিতিকে জনাব নবচন্দ্রের শুরু আখ্যায়িত করছেন?!

যদি বিষয়টা এরকম না হয় তাহলে দয়া করে আপনি বিজ্ঞানীদের রেফারেন্সে এই পাঁচটি জিনিসকে স্পষ্ট করুন যে, এর মধ্যে কোনটি বিজ্ঞানীদের মতে নবচন্দ্রের শুরু? এবং বিজ্ঞানীদের মতে যেটা শুরু, আপনার মতে শরীয়তে নবচন্দ্রের শুরু যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে এর পক্ষে আপনি শরয়ী দলীলও পেশ করুন। যেমন :

১. চাঁদ সূর্যের পরে অস্তগমন

২. অমাবস্যার মাঝখান

৩. নবচন্দ্রের জন্ম

৪. অমাবস্যার পর নবচন্দ্রের উদয়

৫. নবচন্দ্রের প্রথম দর্শন

এই পাঁচ জিনিসকে আপনি আপনার বইয়ে নবচন্দ্রের শুরু আখ্যায়িত করেছেন। এখন আপনিই বলুন, এই পাঁচ জিনিসের মধ্যে একটার সাথে আরেকটার কোনো পার্থক্য আছে কি নেই? এও বলুন, সংযোগ/সম্মিলন (কনজাঙ্কশান) এবং নবচন্দ্রের জন্ম দু’টো একই বিষয়, নাকি জন্ম হলো কনজাঙ্কশানের অব্যবহিত পরের সময়ের নাম? জ্যোতির্শাস্ত্রীয় নিউমুন এবং হিলালকে তো আপনি বিকৃত করে এক বানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু গোটা বইয়ে কোনো একজন বিজ্ঞানীর রেফারেন্সে নিউমুনের পারিভাষিক সংজ্ঞা

তো উল্লেখ করলেন না!!

মেহেরবানী করে বলুন, উপরিউক্ত পাঁচ জিনিসের মধ্যে ‘নিউমুন’ এবং ‘নবচন্দ্র’ কোন জিনিসের নাম? যদি সবকটি বিষয়ই নবচন্দ্রের সংজ্ঞায় আসার মতো হয় তাহলে যেসব অঞ্চলে প্রথম রাতের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবই না, তারা যখন দ্বিতীয় রাতে নতুন চাঁদের দেখা পায়; তো তাদের এই চাঁদকে নবচন্দ্র বলতে আপনার এত অসুবিধা হচ্ছে কেন?

চতুর্থ প্রশ্ন হল, যেহেতু আপনার মতে কুরআন অমাবস্যা থেকে মাস শুরু করতে বলেছে তাহলে আপনি নতুন চাঁদ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করার জন্য মাস কেন বিলম্বে শুরু করছেন?

পঞ্চম প্রশ্ন হল, হাদীসে তো রোযা ও ঈদকে হিলাল দেখার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনার সাথে নয়। তাহলে শুধু দেখার সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনা করা হলে হাদীসের উপর আমল হবে কীভাবে?

ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে, আপনার মতে যেহেতু চাঁদ দেখার হাদীসসমূহ কুরআন বিরোধী, আর আপনি নিজেই লিখেছেন, কুরআনের বরখেলাফ হাদীস অনুসারে আমল করা মানে কুরআনেরই বিরুদ্ধাচারণ করা; তাহলে আপনি ‘বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার’-এর নামে উম্মতের সামনে যে কাল্পনিক উপহার নিয়ে হাজির হয়েছেন (কাল্পনিক এজন্য যে, ঐ ক্যালেন্ডারের যেটুকু সামনে এসেছে তা কেবল ১৪২৮ হিজরী থেকে ১৪৩৪ হিজরী পর্যন্ত সময়কালের) যাকে আপনি শ্রেষ্ঠ নিআমত মনে করে গ্রহণ করে নেওয়াকে যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান সাব্যস্ত করেছেন- তাকে চাঁদ দেখার সম্ভাবনার নীতির উপর কেন নির্ভরশীল করলেন?

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার প্রস্তাবিত ‘বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারে’র পর্যালোচনায় আরো যা লিখেছেন, ‘উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আমার প্রস্তাবিত ‘বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারে’র ১৪৩১, ১৪৩২ ও ১৪৩৩ হিজরী মাস আরম্ভের তারিখসমূহ ছকসমূহের কলাম ৯-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে’।

‘উত্তর আমেরিকা ফেকাহ কাউন্সিল’ প্রস্তাবিত ‘বিশ্ব ইসলামী ক্যালেন্ডার’-এর তারিখসমূহ কলাম ১০-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে’।

'সৌদী আরবের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান 'উম্মুল কুরা' কর্তৃক তৈরি হিজরী ক্যালেন্ডারের তারিখসমূহ কলাম ১১-এ দেওয়া হয়েছে'।

'বাংলাদেশে অনুসৃত অথবা সম্ভাব্য হিজরী ক্যালেন্ডারের তারিখসমূহ কলাম- ১২-তে দেওয়া হয়েছে'।

'জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে IDL ও GMT -তে 'চন্দ্রালোকের ভগ্নাংশের হিসাব' অনুযায়ী ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩ হিজরী সনের তারিখসমূহ ১৩ ও ১৪ কলামে দেখানো হয়েছে'।

'৯ থেকে ১৪ নং কলামে প্রদত্ত ৬ খানা ক্যালেন্ডারের মধ্যে ৩ বা তার বেশী তারিখের সমন্বয়ের একটা 'একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' ১৫ নং কলামে দেওয়া হয়েছে। সবাই এটা অনুসরণ করলেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৪৮-১৪৯, প্যারা : ৯-১৪)

এখানে প্রশ্ন হল, বিভিন্ন ক্যালেন্ডারের মধ্য থেকে যদি তিনটার ফলাফল এক হয়ে যায় তাহলে একে স্বতন্ত্র ক্যালেন্ডার গণ্য করে 'একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' নাম দেওয়া- এটা শরীয়তের কোন নির্দেশের ভিত্তিতে কিংবা বিজ্ঞানীদের কোন নীতিমালার আলোকে করা হয়েছে?

এদিকে বিভিন্ন মাধ্যমে শুনতে পেয়েছি যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এখন বলছেন, 'এভাবে কোনো ক্যালেন্ডার হয় না। আমি যদিও লিখেছি, তবে তা ঠিক হয়নি। বইয়ের আরো কোনো সংস্করণ বের হলে সেখানে হয়ত আর থাকবে না এটা'।

অথচ তিনি নিজেই লিখেছেন, 'আমার প্রস্তাবের সাথে অন্যান্য সংগঠনের প্রস্তাবের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত না হলেও পার্থক্য খুবই কম। যৌক্তিক কারণে আমার প্রস্তাব বেশী গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি'।

'পৃথিবীকে ১ ঘণ্টা অন্তর মোট ২৪ ভাগে ভাগ করে প্রতি জায়গায় নবচন্দ্রের শুরুর তথ্য ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেও এ কাজ করা যেতে পারে'।

'জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নেওয়া হিসাব অনুযায়ী আমার প্রস্তাবিত 'বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং অন্যদের তুলনায় বেশী নির্ভুল বলে আমি মনে করি। তবে 'একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' অনুসরণ করাকে আমি আরও বেশী সমর্থন করবো'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৪৯, প্যারা : ১৫-১৭)

সেই যৌক্তিক কারণটি কী, যার জন্য আপনার ক্যালেন্ডার আপনার দৃষ্টিতে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, সেই সাথে অন্যদের তুলনায় বেশি নির্ভুল? তার উল্লেখ করাও তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল!

তাছাড়া আপনার প্রস্তাবিত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আপনি 'একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার'-এর অনুসরণকে কেন আরও বেশি সমর্থন করবেন, অথচ তার তো কোনো যৌক্তিক ভিত্তিই নেই? তবে কি এই তামাশারই নাম শরীয়ত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমন্বয়?

এরপর লিখেছেন :

'অতএব সার্বিক বিবেচনায় আমার প্রস্তাবিত 'বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার' বিশ্বব্যাপী অনুসরণ করে মুসলিম উম্মাহ একই বারে ও তারিখে রোযা-ঈদ পালন করতে পারে। ইসলামী শরীয়াহকে বিশ্বব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটাই হলো সর্বোত্তম প্রস্তাব'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৪৯, প্যারা : ১৮)

খোদার বান্দা! একই পৃষ্ঠায় কি কেউ এতগুলো বিপরীতমূখী কথা বলে? আর একটি কল্পনাসর্বস্ব জিনিসের উপর এত বড় ও দীর্ঘ স্বপ্নের ইমারত দাঁড় করায়?

কোথায় আপনার বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার? ১৪৩৮-১৪৪০ হিজরীও লাগবে না, শুধু ১৪৩৬-১৪৩৮ হিজরীর ক্যালেন্ডারই আমাদের দেখান!

বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার পর্যালোচনা পরিচ্ছেদের সর্বশেষ প্যারা দুটি পড়ন:

'OIC -এর অঙ্গসংগঠন 'ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি' ১৯৮৬ সালেই সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে,

(ক) বিশ্বের কোন দেশে নবচন্দ্র দেখা গেলে সকল মুসলমানকে অবশ্যই তা মেনে চলতে হবে। কারণ চাঁদ দেখার জন্য দেশের সীমানা কোন শর্ত নয়। তাছাড়া রোযা শুরু ও শেষের আদেশ বিশ্বজনীন।

(খ) চাঁদ দেখা জরুরী। তবে হাদীসের সাথে মিল রেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের সহায়তা নেওয়া যাবে’।

‘অতএব চান্দ্রমাসের ক্যালেন্ডারকে একটা সম্ভাব্য প্রস্তাব হিসেবে নেওয়াই উত্তম’। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৪৯, প্যারা : ১৯-২০)

যখন দেখাটাই আবশ্যক তখন অগ্রীম ক্যালেন্ডারের আর কী প্রয়োজন? আর যখন কি না আপনি হিসাবের মাধ্যমে নবচন্দ্র সম্পর্কে অবগত হওয়াকে কুরআনের নির্দেশ বলে মনে করেন, তখন শুধু ফেকাহ একাডেমীর সিদ্ধান্তের কারণে তাকে ‘সম্ভাব্য’ বানিয়ে দেয়ার কী অর্থ?

একটা জিনিসকে আপনি কুরআনের হুকুম মনে করেন, আবার কোন একাডেমীর কথায় আপনি সেটাকে শুধু ‘সম্ভাব্য’ প্রস্তাব বানিয়ে দিবেন- এটা কি কোনো ঈমান হলো?

আপনি অমাবস্যা থেকে চান্দ্রমাস শুরু করাকে কুরআনের হুকুম মনে করতেন। সেটাকে ছেড়ে হিসাবের মাধ্যমে দেখার সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল ক্যালেন্ডারে এলেন, এখন হিসাবের উপর নির্ভরশীল ক্যালেন্ডারকেও আপনি কেবল সম্ভাব্য প্রস্তাব বলছেন। তাহলে কি শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে কুরআনের হুকুম এবং শরীয়তের মাসায়েলের মূল্য এ-ই?

হায়! যদি আপনি আপনার সংস্কার দক্ষতাকে নিজস্ব বিশেষজ্ঞতার গ-ীতে ব্যবহার করতেন। আর কুরআন, হাদীস ও শরীয়তের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লোকদের অনুসরণেই ক্ষান্ত থাকতেন! এতে করে নিয়ম-নীতির লঙ্ঘনও হতো না, আর এই পরিমাণ স্ববিরোধী ও বিপরীতধর্মী কথাবার্তাও বলার দরকার হতো না।

সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন :

জনাবের পুস্তিকার প্রধানতম লক্ষ্য হল, রোযা শুরু ও ঈদ পালনে যা কিছু আগু-পিছু হয় সেটার অবসান ঘটিয়ে তাতে ঐক্য সৃষ্টি করা। কিন্তু ঐক্য সৃষ্টির জন্য আপনি একাই উল্লেখ করেছেন আটটি মানদ-। বলুন, যদি ঐক্য সৃষ্টির মানদ-ই এতগুলো হয় তাহলে ঐক্যের স্বপ্ন দেখা হবে কেমন শরমের কথা?

দ্বিতীয় বড় লক্ষ্য, সংস্কারকর্ম সম্পাদন করা। প্রশ্ন হল, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে স্ববিরোধী কথাবার্তা লিখে যাওয়ার নামই কি সংস্কার?

আপনি লিখেছেন, আপনার প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। অথচ শুধু ১৪৩৩ হিজরীর ক্যালেন্ডারেই আপনার প্রস্তাবিত প্রথম তারিখের সঙ্গে উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার ও উত্তর আমেরিকা ফেকাহ কাউন্সিলের ক্যালেন্ডারের মিল নেই- এরকম ছয়টি মাস রয়েছে। বারো মাসের মধ্যে ছয় মাসেই যদি আপনার সূচনা অন্যদের সূচনা থেকে ভিন্ন হয় তাহলে এ তফাত কি একেবারে কম হলো?

আবার এই ছয় মাসে আপনার প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডারের প্রথম তারিখ আপনার ‘একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার’ থেকে ব্যতিক্রম।

১৪৩০ হিজরীর ক্যালেন্ডারে ছয়টি মাসে ভিন্নতা রয়েছে। ১৪২৯ হিজরীতে পাঁচ মাসে এবং ১৪২৮ হিজরীতেও পাঁচ মাসে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই তিন বছরের ক্যালেন্ডার ‘চান্দ্রমাস’ সপ্তম সংস্করণে দেয়া আছে। অন্যান্য বছরের ক্যালেন্ডারগুলোতেও তারতম্য আছে। তো ক্যালেন্ডার তৈরিই করেছেন ১৪২৮ হিজরী থেকে ১৪৩৪ হিজরী এই মোট সাত বছরের। আর তার মধ্যেই এত ফারাক!!

চান্দ্রমাস সপ্তম সংস্করণের আগের এক সংস্করণ, যা ৩০/৪/২০০৭ খ্রিস্টাব্দে তার দস্তখতসহ মারকাযুদ দাওয়াহতে এসেছিলো, তাতে ১৪২৮ হিজরী-এর ক্যালেন্ডারের প্রথম তারিখসমূহ অনেক মাসের বেলায় সপ্তম সংস্করণ থেকে ভিন্ন। পহেলা সফর সেখানে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ্রি.-এ আর সপ্তম সংস্করণে হল ১৮ তারিখে। পহেলা রমযান ওখানে

১৩/৯/২০০৭ খ্রি.-এ আর এখানে ১২/৯/০৭ তারিখে। পহেলা যিলহজ্ব ওখানে ১১/১২/২০০৭ খ্রি.-এ আর এখানে ১০/১২/০৭ তারিখে, এমনিভাবে পহেলা রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী ওখানে ৯/৩/২০০৮ খ্রি.-এ আর এখানে ৮/৩/০৮ তারিখে। পহেলা যিলহজ্ব ১৪২৯ হিজরী ওখানে ২৯/১১/২০০৮-এ আর এখানে ২৮/১১/০৮ তারিখে।

তাহলে এখানে তো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের হিসাবেই গরমিল হয়ে গেল!! তবে কি এরকম শৃঙ্খলাহীন ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতেই আপনি সারা বিশ্বে একসঙ্গে রোযা ও ঈদ পালনের ব্যবস্থা করবেন? আর এভাবেই কি আপনি আপনার সংস্কার-স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবেন?

ঐক্য সৃষ্টির অন্যান্য মানদণ্ডের কী হবে?

এই কয়েকটি ক্যালেন্ডার তো যাইহোক আপনার প্রস্তাবিত। কিন্তু জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের মাধ্যমে মাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণের জন্য ফর্মুলা এবং ক্যালেন্ডার তো শুধু এ কয়টিই নয়, আরো আছে। স্পষ্ট যে, আপনি যদি প্রমাণ ব্যতিরেকে হিসাবের উপরিউক্ত সুরতগুলোর কোনো একটিকে অবলম্বন করতে পারেন কিংবা হিসাবের উপর নির্ভরশীল কোনো ক্যালেন্ডারও গ্রহণ করতে পারেন, শুধু উত্তম-অনুত্তমের ফারাক, তাহলে অন্যান্য ফর্মুলা ও ক্যালেন্ডারকে আপনি কিসের ভিত্তিতে রদ করবেন?

চিন্তা করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া মাপকাঠি- হিলাল দেখার মাধ্যমে হিলাল শুরু করা/চান্দ্রমাস আরম্ভ করা যদি আপনার পছন্দ না হয়ে থাকে তাহলে আপনি নবচন্দ্রের শুরু বলবেন কোন্ জিনিসকে?

১. Tropical Month -এর শুরুকে?

২. Sidereal Month -এর শুরুকে?

৩. Anomalistie Month -এর শুরুকে?

৪. Nodical Month -এর শুরুকে?

নাকি

৫. Synodie Month -এর শুরুকে?

যদি এর শুরুকে ভিত্তি ধরা হয় তাহলে সেটা কি-

৫/ক. কেন্দ্রীয় সম্মিলন (Geocentric New Moon)-এর বিচারে করবেন? নাকি

৫/খ. উপরিস্থিত সম্মিলন (Topocentic New Moon)-এর বিচারে করবেন?

যদি উপরিস্থিত সম্মিলন-এর বিচারে করেন তাহলে মক্কাকে ভিত্তি ধরবেন নাকি মদীনা অথবা কুদস (যেখানে মসজিদে আকসা অবস্থিত) অথবা চট্রগ্রাম অথবা ঢাকা- কোন জায়গাকে ভিত্তি ধরবেন? নাকি আই. ডি. এল রেখাকে? আর এটাও বলুন, চাঁদের ব্যাপারে আই. ডি. এল রেখাকে কেন ভিত্তি বানাবেন। এ ক্ষেত্রে ড. ইলইয়াসের প্রস্তাবিত আই. এল. ডি. এল (ইন্টারন্যাশনাল লুনার ডেট লাইন)-কে ভিত্তি বানাতে আপনার কী সমস্যা? এগুলো সব বাদ দিয়ে যদি এ বিষয়টাকে ভিত্তি ধরেন যে, মাসের শেষে সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় যদি দিগন্তে চাঁদের উপস্থিতি থাকে তাহলে এটাই নতুন চাঁদের সূচনাকাল; যদি এটাকে ভিত্তি ধরেন তাহলে বলুন, নবচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা কে দিয়েছে? আরো বলুন, যদি এটাই ভিত্তি হয় তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ জায়গার বিচারে সূর্যের পর চাঁদের অস্তমিত হওয়াকে ভিত্তি বানাবেন? মক্কা মুকারমা নাকি অন্য কোন জায়গার, নাকি কোনো রেখার?

এগুলোর মধ্য থেকে যেটাকেই ভিত্তি বানান, চাঁদকে তো হয়ত ভিত্তি ধরা হয়ে যাবে। কিন্তু 'হিলাল'কে তো ভিত্তি ধরা হল না, কুরআন যাকে মীকাত ঘোষণা করেছে। এখন হিলাল (হিলাল দেখা), যা কিনা কুরআনের মানদ- এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, তাকে যদি কেউ উপেক্ষা করে, যেমন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব করছেন তাহলে তিনি বাদবাকি সুরতের মধ্য থেকে কোনো একটিকে কোন্ দলীলের ভিত্তিতে গ্রহণ

করবেন? এবং কোনো ব্যক্তি যদি অন্য আরেকটি সুরতকে অবলম্বন করতে চায় তাহলে তাকেই বা ফেরাবেন কোন্ দলীলের ভিত্তিতে? নববী নির্দেশনা থেকে বিমুখ হবার ফল দিশেহারা হয়ে ঘুরে মরা ছাড়া আর কিছু না!

দ্বিতীয় কথা হল, জনাবের উল্লেখ করা সবগুলো ক্যালেন্ডারই হিসাবের উপর নির্ভরশীল, আর আপনার দাবি- কুরআন (নাউযুবিল্লাহ) হিসাবের মাধ্যমে চান্দ্রমাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করতে বলেছে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বক্তব্য, কুরআনের হুকুম- হিসাবনির্ভর ক্যালেন্ডার যদি অবলম্বন করা হয় তাহলে উম্মতের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রশ্ন হল, এই সবগুলো ক্যালেন্ডারই কি কুরআনী হিসাব মোতাবিক ক্যালেন্ডার, নাকি এর মধ্য থেকে একটি কুরআনী হিসাব মোতাবিক আর বাকিগুলো তা নয়? যদি এই সবগুলো কুরআনী হিসাব মোতাবিক হয় তাহলে শুধু এগুলো কেন, ম্যাকন্যাটন (Macnaughton), জামালুদ্দীন আব্দুর রাযযাক, কাসসুম, ড. ইলিয়াস ও শওকত অওদা এই পাঁচ জ্যোর্তিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞে’র ক্যালেন্ডারও নিশ্চয়ই কুরআনিক হবে? কেননা এগুলোও জ্যোতির্শাস্ত্রীয় হিসাবের উপর নির্ভরশীল। তাহলে আপনার প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডারগুলো এবং এঁদের ক্যালেন্ডারগুলোর কোনো একটি অনুযায়ী যদি আমল করা হয় তাহলে আপনার মতে কুরআনী হিসাবের ক্যালেন্ডার (?) অনুযায়ী আমল হয়ে যাওয়ার কথা। এখন যেহেতু এসকল ক্যালেন্ডারে চান্দ্রমাসের শুরু নির্ধারণে বহু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেহেতু যতক্ষণ অনুসরণের জন্য সারা পৃথিবীতে বরং সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র ক্যালেন্ডারকে গ্রহণ করা না হবে ততক্ষণ ঐক্য সৃষ্টি হবে কীভাবে? সুতরাং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কি এই সকল কুরআনিক ক্যালেন্ডার (?) থেকে কোনো একটি নির্বাচন করে নিদির্ষ্ট করে দিবেন, যাতে করে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? সবই যদি কুরআনী হিসাবের ক্যালেন্ডার হয়, আর তা থেকে কোনো একটিকে তিনি নির্বাচন করতে চান, তো সেজন্য কিছু শরয়ী প্রমাণাদিও উল্লেখ করে দেবেন, মেহেরবানী করে। যেন শরীয়ত রচনার বদনাম থেকে বাঁচা যায়!

আর যদি এগুলোর মধ্য থেকে শুধু একটি কুরআনী হিসাব মোতাবিক হয়, আর বাকীগুলো এমন কোন হিসাব-ফর্মুলার উপর নির্ভরশীল, যা কিনা

কুরআনী হিসাব মোতবিক নয়; তাহলে সেটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বলে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা বলেননি। বরং প্রত্যেকটি অনুযায়ী আমলের অবকাশ আছে উল্লেখ করায় জানা গেল, তার মতে এই সবগুলোই কুরআনী হিসাব মোতাবিক ক্যালেন্ডার। যদি তাই হয় তাহলে ঐক্যের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে কীভাবে? আর যখন ঐক্য হলই না তখন উম্মতের সদস্যদের মধ্যে কারো শুরুতে ফরয রোযা ছুটে যাওয়া এবং কারো কারো শেষে ফরয ছুটে যাওয়া, আর কারো রোযার দিনে ঈদ করা এবং কারো ঈদের দিন পার করে ঈদ করা- এই সমস্ত সমস্যা আপন জায়গায় রয়ে গেল, যেগুলোর সমাধান করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সংস্কার-এর ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাহলে?!

আরো শুনুন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ‘চান্দ্রমাসে’র ইংরেজী অনুবাদও ছেপে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ‘লাস্ট ওয়ার্ডস’ শিরোনামে একটি ছক দেয়া আছে, যা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা কোনো সংস্করণে নেই। সেটা নিম্নরূপ :

এর বংলা তরজমা দাঁড়ায় এরকম :

১. ক্যালেন্ডার : স্থানীয় চাঁদ দেখা ভিত্তিক ক্যালেন্ডার।

ভিত্তি : প্রতি মাসের প্রথম দিন স্থানীয় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

মন্তব্য : গ্রহণযোগ্য নয়। (এটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে)

২. ক্যালেন্ডার : ক. আন্তর্জাতিকভাবে নতুন চাঁদ দেখার ভিত্তিতে তৈরিকৃত ক্যালেন্ডার।

খ. OIC কর্তৃক প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডার।

গ. উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার।

ভিত্তি : জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নবচন্দ্র দর্শনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

মন্তব্য : ভালো (Good) অনুসৃত হওয়ার মত। এটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করবে।

৩. ক্যালেন্ডার : লুনার মান্থ্ বইতে প্রদত্ত আমার তৈরিকৃত ক্যালেন্ডার

ভিত্তি : IDL থেকে ৯ ঘণ্টার ব্যবধানে সূর্যাস্তের পর নবচন্দ্র দর্শনের (সম্ভাবনার) ভিত্তিতে।

মন্তব্য : তুলনামূলক ভাল (Better)

৪ ক্যালেন্ডার : কুরআনে কারীম নির্দেশিত হিসাবনির্ভর ক্যালেন্ডার, যা এখনো প্রস্তুত হয়নি।

ভিত্তি : পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী।

মন্তব্য : সবচে’ ভাল (Best)

(‘লুনার মান্থ্’, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হক, অনুবাদ : যাকির হুসাইন, পৃষ্ঠা : ১৪৮)

এর উপর যতই আশ্চর্য প্রকাশ করা হোক সেটা সামান্য। তার মতে যেটা কুরআনিক ক্যালেন্ডার, তার বিপরীত পদ্ধতিগুলোকে তিনি ‘গুড’ এবং ‘বেটার’ বলছেন। আর কুরআনিক ক্যালেন্ডারের বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তো তিনি উত্তর দিচ্ছেন ‘সেটা এখন পর্যন্ত কেউ তৈরি করেনি’? আপনিও না? ‘জ্বী না’। আপনি ‘চান্দ্রমাস’ বাংলা ও ইংরেজীতে ‘বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার’ এবং ‘একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার’-এর নমুনা পেশ করেছেন। এটাও কি কুরআনিক ক্যালেন্ডার নয়? ‘জ্বী, না’। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আপনি তো এ বইয়ে প্রশ্ন ৫৪ করেছেন এভাবে :

'আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলমানদের চাঁদের হিসাব ভুল হচ্ছে, আর অমুসলমানদের হচ্ছে না। কারণটা একটু খুলে বলবেন কি?' এরপর দীর্ঘ উত্তরের শেষ দিকে লিখেছেন :

'কোরআন-হাদীসের সঠিক মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারলে আমরাও নির্ভুল চান্দ্রপঞ্জিকা বা একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করতে পারতাম। এ ব্যাপারে হাদীসের মর্মার্থকে খণ্ডিতভাবে দেখার কারণে কোরআনের নির্দেশ উপেক্ষিত হয়ে আছে। তা না হলে আমাদের চান্দ্রপঞ্জিকা আর অন্য ধর্মাবলম্বীদের চান্দ্রপঞ্জিকায় কোনো তফাৎ হত না। আমার পুস্তকে দেওয়া বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারই এর একমাত্র সমাধান দিতে পারে। তাই আমাদের তা অনুসরণ করা উচিত'।

(চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৯৮)

আপনার এ কথায় কি পাঠকরা এটাই বুঝবেন না যে, আপনার প্রস্তাবিত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার আপনার দৃষ্টিতে কুরআন ও হাদীসসম্মত ক্যালেন্ডার? অথচ আপনার মনের কথাটা হল, এটা কুরআনিক ক্যালেন্ডার নয়। কুরআনিক ক্যালেন্ডার এখনো তৈরি হয়নি। ইংরেজী পুস্তিকায় আপনি সেদিকে ইঙ্গিত করছেন এবং সাক্ষাতে বা ফোনেও মানুষকে বলছেন!! সম্মানিত পাঠক, আপনারাই ফায়সালা করুন। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের উপর কী পর্যালোচনা পেশ করা যায়?!

দাবি তো ছিল সংস্কারের। কিন্তু যেটাকে বেচারা হক ও হাকীকতের (সত্য ও বাস্তবতার) বিকৃতি করে কুরআনের হুকুম সাব্যস্ত করলো, তার উপর না নিজে আমল করল, না অন্যদেরকে আমলের সুযোগ করে দিল। বরং তার বিপরীত বহু জিনিসকে নিজের সংস্কারধর্মী বই 'চান্দ্রমাসে' উল্লেখ করে গেছেন। এবং রীতিমত সেটাকে 'গুড' ও 'বেটার' বলেও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

যদি এগুলো 'গুড' আর 'বেটার'ই হয় তাহলে কুরআন পরিপন্থী হয় কী করে? আর যদি কুরআন পরিপন্থী হয় তাহলে 'গুড' এবং 'বেটার' হয় কীভাবে?

শত্রুতা হল শুধু নিজ নিজ এলাকার দেখা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ করার

সাথে! এটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেন তা একদম হারাম!! খোদার বান্দা, যাকে আপনি 'গুড' এবং 'বেটার' বলছেন সেটা আপনার দৃষ্টিতে কুরআন পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তাহলে প্রথম সুরতকে অন্তত মুবাহ বলুন। সেটা আপনার দৃষ্টিতে কুরআন পরিপন্থী হওয়ার চেয়ে কি বেশি কিছু যে, তাকে কোনোভাবেই বৈধ বলে স্বীকার করতে পারছেন না!!

যাই হোক, আমি তো তার ইংরেজী বই থেকে ছক উদ্ধৃত করে দেখাতে চাচ্ছিলাম যে, তার সংস্কারের স্বরূপ কী? সার কথা হল, তিনি কুরআনের আয়াতকে বিকৃত করে এক ফরয হুকুম উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু ঐ হুকুম অনুযায়ী আমলের কোনো রাস্তা তিনি দেখাননি। তদুপরি ঐ হুকুমের পরিপন্থী পদ্ধতিগুলোকে 'গুড' এবং 'বেটার' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন!!

এখন জনাবকে বিনয়ের সাথে কে জিজ্ঞেস করবে যে, আমরা তো আপনার বইটি আগ্রহ সহকারে পড়েছিলাম। আপনার দাবি অনুসারে মনে করেছিলাম, আপনি হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা ভুলের সংশোধন করে একটা আসল জিনিস আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম, আপনি আমাদেরকে কুরআন পরিপন্থী পথে পরিচালিত করতে চান!!

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! হাদীস, সুন্নাহ ও আইম্মায়ে দ্বীনের ইজমা এবং উম্মতে মুসলিমার সর্বস্বীকৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কুরআন বোঝার দাবি করা আগাগোড়া মিথ্যা। যার সর্বনি¤œ খেসারত এই যে, বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতার ময়দানে পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকা!!

বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতা এই বইয়ের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য! এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় তারই কিছু নমুনা শুধু তুলে ধরা হল।

---

[1] ১ 'আল-আহিল্লাহ' আদনান আব্দুল মুনয়িম কাযী, পৃষ্ঠা : ২০২,

মাকতাবা কুনুযিল মারিফা জেদ্দা, ‘তাকবীমু উম্মিল কুরা’ যাকি ও ইয়াসির।

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

ফেব্রুয়ারি ২০১৭, জুমাদাল উলা ১৪৩৮

‘চান্দ্রমাস’ বই : একটি পর্যালোচনা : চাঁদ দেখার হাদীসসমূহের বিকৃতি ও অবমাননা

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাঠকবৃন্দ জানেন, এই প্রবন্ধে আরো বার বার পড়ে এসেছেন যে, হিলাল দেখে রোযা রাখা এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়া (ঈদ করা) এবং হিলাল দেখার আগে রোযা শুরু না করা ও হিলাল দেখার আগে রোযা না ছাড়া (ঈদ না করা)-এর বিধান কেবল এক দুইটি হাদীসেই নয়; বরং বিপুল সংখ্যক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিধান ঘোষণা করেছেন। আর সেসব হাদীস সনদের দিক থেকে যেমন মুতাওয়াতির (নিরবচ্ছিন্ন বহু সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত), তেমনি অর্থ ও বক্তব্যের দিক থেকেও মুতাওয়াতির, মুতালাক্কা বিল কবুল (সর্বজনসমাদৃত) ও মুজমা আলাইহি (সর্ববাদী সম্মত)। এবং আমলের দিক থেকেও এটিই মুমিনগণের পালিত অভিন্ন ধারা ও চিরঅনুসৃত পথ।

উম্মতে মুসলিমার এই সর্বসম্মত পথের বাইরে গিয়ে ভিন্নমত অবলম্বন করেছিল শীয়া বাতেনিয়া। শীয়া বাতেনিয়া একটি খোদাদ্রোহী বদদ্বীন ফেরকা, যারা ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার

ব্যাপারে সকল আহলে হক একমত।

শীয়া বাতেনিয়া হিলাল দেখার বিধান পরিত্যাগ করে হিসাবের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালনের পথ এখতিয়ার করেছিলো। আফ্রিকা ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলের নাম হল বারকা। সেখানকার কাযী ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হুবুলি রাহ.। একবার বারকার আমীর (গভর্নর) এসে তাকে বললেন, কাল ঈদ। কাযী বললেন,

حتى نرى الهلال، ولا أُفَطِّرُ الناسَ وأَتَقَلَّدَ إثمَهم.

'না, যতক্ষণ না আমরা হিলাল দেখি। হিলাল দেখা ব্যতিরেকে মানুষকে রোযা ছাড়তে বলতে পারি না। এর গোনাহের দায়ভার আমি নিতে পারি না'। জবাবে আমীর বললেন, খলীফা মনসূরের ফরমান এসেছে যে, কাল ঈদ করতে হবে!! (কারণ এরা হিসাবের সাহায্যে আগেই তারিখ নির্ধারণ করে ফেলতো। চাঁদ দেখার অপেক্ষা করতো না। প্রকাশ থাকে যে, এই মনসূর আবক্ষাসী খলীফা আবু জা'ফর মনসূর নয়। বরং এ হচ্ছে, উবাইদি শাসনের ফাতেমী খলীফা আবু তাহের ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ। যার জন্ম ৩০২ হিজরীতে আর মৃত্যু ৩৪১ হিজরীতে)।

ঘটনাক্রমে সে রাতে চাঁদ দেখা গেল না। কিন্তু এদিকে আমীর তো ঈদের জন্য তৈরি হয়ে ঢোল-তবলা নিয়ে নেমে পড়েছে! কিন্তু কাযী মুহাম্মাদ ইবনে হুবলি রাহ. বললেন, আমি যাব না। নামাযও পড়াব না। আমীর অন্য একজনকে খুতবার যিম্মাদারি দিল এবং পুরো ঘটনা লিখে জানাল। খলীফা কাযীকে তলব করল। এবং বলল, নিজের মত প্রত্যাহার করে নাও, ক্ষমা করে দেব!

কাযী ছিলেন শরীয়তের অনুগত। বাতিলের সামনে নতজানু ছিলেন না। তিনি রাজি হলেন না। অতএব জালেম খলীফা হুকুম দিল, তাকে রোদের মধ্যে ঝুলিয়ে দাও। এবং তাই করা হল। আর এ অবস্থাতেই

তার মৃত্যু উপস্থিত হল। পানি চেয়ে পানিও পেলেন না তিনি। কিন্তু এতেও খলীফার মন ভরল না। তাই শূলিতে চড়িয়ে তার অবশিষ্ট আক্রোশ মিটাল!!

মহান ইসলামী ঐতিহাসিক শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ. (৭৪৮ হি.) এ মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করে লেখেন : فلعنة الله على الظالمين 'জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত'। -সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী, খ. ১৫, পৃ. ৩৭১

আল্লাহ তাআলা ঐ উবাইদী জালেমদের হাত থেকে উম্মতকে রেহাই দিয়েছেন। কিন্তু তাদের জাহেলী প্রথার পুনর্জীবনের পাঁয়তারা চলছে। শুধু এই ঘটনাটি থেকেই পাঠকবর্গ অনুমান করতে পারেন, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হক কি হাজার বছরের ত্রুটির সংশোধন করছেন নাকি সাড়ে চৌদ্দশ বছর ধরে চলে আসা নববী সুন্নতকে ছেড়ে হাজার বছর আগের এক মৃত জাহেলী প্রথাকে পুনর্জীবিত করতে চলেছেন! আয় আল্লাহ! তুমি এই লোককে সত্য সঠিক পথে ফিরাও। আমীন!

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি চাঁদ দেখার পরিবর্তে হিসাবের পক্ষপাতিত্বের এই কাজটি কেবল বুদ্ধি-চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে করতেন কিংবা ঐ বাতেনী সম্প্রদায়ের রেফারেন্সে করতেন তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় ছিল। বিচ্ছিন্নতার এই পথ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আরো অনেকেই অবলম্বন করেছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্বাতন্ত্র্য হল তিনি এই ভ্রান্তিকে প্রমাণিত করবার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর বিকৃতি সাধন করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অনবরত মিথ্যাচার করে গেছেন।

চাঁদ দেখা বিষয়ক হাদীসসমূহ অস্বীকার করার জন্য তিনি নানান বাহানা আবিষ্কার করেছেন। তার সেসমস্ত বাহানার খতিয়ান পেশ করার ইচ্ছা আমার নেই। এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই। আমি শুধু তার ধোঁকাবাজির গোড়ার কয়েকটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

করে সামনে এগোতে চাই। দেখুন-

১. একবার বলেছেন, হিলাল দেখতে বলার উদ্দেশ্য হল, হিসাবের মাধ্যমে বুদ্ধির সাহায্যে হিলাল সম্পর্কে অবগত হয়ে রোযা ও ঈদ কর।

২. কয়েকটি জায়গায় বলেছেন, যেহেতু ঐ যামানায় (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যামানায়) মানুষজন হিসাব জানতো না তাই একটি সাময়িক বিকল্প হিসেবে চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ করতে বলা হয়েছে। এখন যামানা অনেক উন্নত হয়েছে। অতএব এখন দেখা নয়, বরং হিসাবের মাধ্যমে চান্দ্রমাসসমূহের সূচনা মেনে আমল করতে হবে!! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজেই বলেছেন, আমরা উম্মী উম্মত। লিখতেও জানি না, হিসাবও করতে জানি না!!

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথার বিপরীত। যদি হিসাব না জানার কারণে দেখার বিধান দিয়ে থাকেন তাহলে 'হিলাল দেখা দ্বারা' হিসাবের মাধ্যমে হিলাল সম্পর্কে অবগত হওয়া কী করে উদ্দেশ্য হতে পারে? যদি বলেন, আগে উদ্দেশ্য ছিল ওটা, এখন এটা, তাহলে এটা হবে গায়ের জোরে বলা। হাদীসের মর্ম সুনির্ধারিত হয়ে যাবার পর তাকে অপরিচিত অর্থে ব্যবহার করা- এরই নাম হাদীসের বিকৃত সাধন।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে আরেকটি প্রশ্ন হল, আপনি তো বলেছিলেন যে, 'হিলাল' অমাবস্যা পরবর্তী পৃথিবী থেকে দর্শনযোগ্য নতুন চাঁদ নয়; বরং এ হল, অমাবস্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন চাঁদ। তো অন্ধকারাচ্ছন্ন চাঁদ তো সেইকালেও দর্শনযোগ্য ছিল না, বর্তমানকালেও না। যদি 'হিলাল' অমাবস্যার চাঁদই হবে তাহলে আপনার এ কথা কীভাবে সঠিক হয় যে, হিসাব জানতো না বলে তারা হিলাল দেখে রোযা এবং ঈদ করতো!! তবে কি অন্ধকারাচ্ছন্ন

চাঁদ ঐ যামানায় দেখা যেতো, এই যামানায় দেখা যাচ্ছে না, এমন?! যিনি বলেছেন সত্য বলেছেন-

دروغ گو را حافظہ نباشد

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ‘আমরা উম্মী উম্মত, আমরা লিখি না, হিসাবও করি না। অতপর উভয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, মাস ২৯ দিনে হয় কিংবা ৩০ দিনে।’ এই হাদীসে চান্দ্রমাস কখনো উনত্রিশা আর কখনো ত্রিশা হওয়ার হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে। এতে তো এ কথা বলা হয়নি যে, আমাদের হিসাব জানা নেই বিধায় তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়। সহীহ, হাসান তো পরের কথা কোনো যয়ীফ রেওয়ায়েতেও এ ধরনের কোনো হাদীস বর্ণিত নেই। বরং একাধিক সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল দেখে রোযা ও ঈদ করার বিধান এজন্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা হিলালকে মিকাত বানিয়েছেন। এ বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝে নেয়া চাই। কারণ বিচ্ছিন্ন চিন্তা পোষণকারী বহু লোক এই ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়েছে কিংবা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দাবি করেন যে, উক্ত হাদীসে উম্মী হওয়াটাকে হেকমত হিসেবে নয়; বরং ইল্লত বা কারণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে২, আর এই কারণটি এখন আর বিদ্যমান নেই। কেননা তার মতে উম্মতের অধিকাংশ মানুষ এখন হিসাব কিতাবে দক্ষ হয়ে গেছে! অতএব পূর্বোক্ত বিধান পাল্টে যাবে (নাউযুবিল্লাহ)। যদি তিনি এই দাবি করেন তাহলে তার উচিত এখন চান্দ্রমাসকে কখনো উনত্রিশা আর কখনো ত্রিশা গণ্য করার বদলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের আলোকে পৃথিবীকে চাঁদের প্রদক্ষিণ প্রকৃত সময়কালের বিচারে চান্দ্রমাসের হিসাব করা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুসারে সামগ্রিকভাবে এক একটি চান্দ্রমাস হচ্ছে ২৯ দিন বারো ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট, ৩ সেকেন্ড। এটা গড় সময়সীমা। তাফসীল বিবেচনা করা

হলে এ সময়সীমা কখনো বাড়ে, কখনো কমে। তো যাইহোক, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী প্রকৃত সময়কাল যা দাঁড়ায় সেই নিরিখেই তাকে চান্দ্রমাস গণনা করতে হবে। কারণ উম্মীয়তের (নিরক্ষরতার) যামানার বিধান তার মনঃপূত নয়। অথচ তিনি তার বইয়ে বারবার একথাই বলে গেছেন যে, চান্দ্রমাস গণনায় ভগ্নাংশ ধর্তব্য হবে না। বরং কখনো উনত্রিশ কখনো ত্রিশ!!

যেই বিধানের মধ্যে উম্মী হবার কথা উল্লেখ রয়েছে সেটাকে তো আপনিও পাই টু পাই মান্য করেন। আর যেই বিধানের মধ্যে কুরআনের আয়াত ২ : ১৮৯-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এই আয়াত অনুযায়ী আমলের তরীকা বাতানো হয়েছে; যেখানে উম্মী হবার কথা কোনো রেওয়ায়েতেই উল্লেখ নেই- সেটাকে এই বলে অস্বীকার করা হচ্ছে যে, এখন আমরা আর উম্মী নেই। সেয়ানা হয়ে গেছি! আখের তামাশারও তো একটা সীমা থাকা উচিত!

৩. নতুন চাঁদ দেখার হাদীসসমূহের বিকৃতি সাধনের জন্য তৃতীয় যে বাহানাটি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব খাড়া করেছেন তা সত্যিই বড় অদ্ভুত! যদি কোনো প্রকার ধোঁকা-প্রতারণার জন্য মোবারকবাদ দেয়া বৈধ হতো তাহলে এই ক্ষেত্রে তিনি মোবারকবাদ পেতে পারতেন। তার সে বাহানাটি হল তার মতে-

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো হাদীসে বারো চান্দ্রমাসের কথা উল্লেখই করেননি।

২. বারো মাসের শুরু কীভাবে করা হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

৩. বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ বঞ্চিত সেই যমানায় অপারগতা বশত শুধু রোযা রাখার জন্য চাঁদ দেখার বিধান দিয়েছিলেন। চাঁদ দেখে বাদবাকি এগারো মাস তো নয়ই স্বয়ং রমযান মাসও শুরু করতে বলেননি!!

কেননা তার মতে রমযানসহ বারো মাস সূচনার যে তরীকা কুরআন বর্ণনা করেছে তা হল, হিসাবের মাধ্যমে অমাবস্যার মধ্যে শুরু হওয়া এস্ট্রনমিক্যাল নিউমুন দিয়ে মাস আরম্ভ করা (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন, 'এজন্যই বুখারী হাদীস ১৭৬৪ ও হাদীস ১৭৬৫ তে 'রমযান' বলেছে, 'শাহরু রমাযান' (রমযান মাস) বলেনি। কারণ রমযানের মাস তো যতযাই হোক চাঁদ দেখে শুরু করা যায় না। কেননা এতে করে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ অবধারিত হয়ে যায়। চাঁদ দেখে রোযা রেখে ফেলা, এটা তো অপারগতার সময়কার জন্য ছিল, এর বেশি কিছু না। 'রমযানের মাস' তো অমাবস্যার মধ্যে শুরু হওয়া নবচন্দ্র দিয়েই আরম্ভ করতে হবে।৩

পর্যালোচনা

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাজ কোম্পানির অনূদিত বুখারীর হাওয়ালা দেন। সেখানে ১৭৬৪ নম্বর হাদীসটি হল-

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ.

অর্থাৎ যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

আর ১৭৬৫ নম্বর হাদীসটি হচ্ছে-

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

অর্থাৎ 'যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানদের জিঞ্জির পরানো হয়'।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলছেন, এ সকল হাদীসে রমযান বলা হয়েছে। ‘শাহরু রমাযান’ বলা হয়নি।৪ এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রমযান মাস চাঁদ দেখে শুরু করা হবে না; বরং অমাবস্যা থেকে শুরু হবে। সম্মানিত পাঠক! আপনারাই বলুন, উপরিউক্ত হাদীস দুটি থেকে একথা কীভাবে বোঝা যায়? আচ্ছা, ‘রমযান’ এবং ‘শাহরু রমাযান’ এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? তবে কি এ হাদীসগুলোতে ‘রমযান’ কোনো মানুষ কিংবা অন্য কোনো মাখলুকের নাম যে, ‘শাহর’ শব্দের উল্লেখ না থাকলে এর উদ্দেশ্য হবে একটা, আর উল্লেখ থাকলে হবে অন্য কিছু।

তদুপরি উপরিউক্ত হাদীসগুলোতে তো উর্ধ্বজগতের কর্মতৎপরতার উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে মানুষের কর্মকা--র কী সম্পর্ক? মানুষের তো এখান থেকে শুধু রমযানের ফযীলতটুকু জেনে নেয়া কর্তব্য। এরপর এই রমযানে কী কী করতে হবে এবং কীভাবে, সেটা তো এ দুই হাদীসে নেই। সেটার উল্লেখ আছে অন্যান্য বহু হাদীসে। এবং রীতিমত শাহ্র (মাস) শব্দসহ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সেই হাদীসগুলো উল্লেখ করেন না কেন?

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের চাঁদের উল্লেখ করে বলেছেন, যখন হিলাল দেখ তখন রোযা রাখ। এরপর যখন হিলাল দেখ তখন রোযা ছাড়। যদি হিলাল দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় তাহলে তাকে ত্রিশ দিন গণনা করো। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৩০৭, বাবুস সিয়াম, ‘তুরুকু হাদীসি ইবনি উমর ফি তারাইল হিলাল’ মুহাদ্দিস, খতীব বাগদাদী পৃ. ১৭

قال الراقم : والإسناد رجاله ثقات من رجال الصحيحين.

হাসান (বছরী রাহ.) থেকে বর্ণিত,

أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা শাবানের হিলাল ভালভাবে গুণে রাখ রমযান মাস দেখার জন্য। ব্যস, যখন তা দেখে নাও তখন রোযা রাখ। এরপর যখন তা দেখ তখন রোযা ছাড়। যদি তা আড়ালে পড়ে যায় তাহলে (ত্রিশ) সংখ্যা পূর্ণ কর'। -মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, হাদীস ৭৩০৩, বাবুস সিয়াম৫

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

তোমরা একটি বা দুইটি রোযা আগে রেখে রমযান মাসকে অগ্রবর্তী করো না। হাঁ, যদি কেউ কোনো বিশেষ দিনের রোযা রাখছিলো (আর ঘটনাক্রমে সেটা ৩০ শাবানের দিন হয়) তাহলে সে রোযা রাখুক। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৮৪, জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৯৩; আল মুনতাকা, ইবনুল জারুদ, হাদীস ৩৭৮, পৃ. ১৩৮

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি حسن صحيح (অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের সহীহ হাদীস)।

আবু হুরায়রা রা. থেকে এ রেওয়ায়েতও রয়েছে যে,

قَالَ النَّبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بيَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُكُمْ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (রমযান) মাসকে এক বা দুই দিন অগ্রবর্তী করো না। তবে যদি এমন হয় যে, কারো বিশেষ কোনো রোযার মামুল আছে...। হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়ো। যদি হিলাল আড়ালে পড়ে যায় তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। তারপর (ঈদুল) ফিত্র (পালন) করো। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৬৫৪, খ. ২, পৃ. ৮৩৮, জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৯২, কিতাবুস সওম, বাব : ২) ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীস حسن صحيح

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (রমযানের) মাসকে এগিয়ে এনো না। হিলাল দেখে রোযা রাখ এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়। যদি তোমাদের মাঝে এবং হিলাল দেখার মাঝে মেঘ কিংবা ধূলা অন্তরায় হয় তাহলে পূর্ণ ত্রিশ গণনা করো। -সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৯১২, কিতাবুস সওম, বাব : ২৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩৫৯০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৯৮৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩২৭

তাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এ দাবি করা যে, বারো মাসের শুরু কীভাবে করতে হয় এ ব্যাপারে কোনো হাদীস নেই- এই দাবি পুরোপুরিই মিথ্যা। তার কারণ প্রথমত হিলাল দেখে রোযা রাখা এবং হিলাল দেখে ঈদ করা বিষয়ক সমস্ত হাদীসের প্রেক্ষাপট এটাই যে, ইসলামী চান্দ্রমাস হিলাল দেখে শুরু হয় এবং পরবর্তী হিলাল দেখার মাধ্যমে শেষ হয়। এ থেকে এই তত্ত্ব বের করা যে, রোযা এক জিনিস আর রমযান আরেক জিনিস- এটা নিজের নির্বুদ্ধিতারই প্রমাণ দেয়া। নতুবা এটা কি কল্পনা করা সম্ভব যে, রমযান মাস শুরুই হয়নি অথচ

রমযানের ফরয রোযা শুরু হয়ে গিয়েছে! বা শুরু হয়নি! আবার রমযান শেষ হয়নি, কিন্তু রমযানের রোযা শেষ হয়ে গিয়েছে? বা রমযান শেষ কিন্তু রোযা এখনো শেষ হয়নি! এ ধরনের কথা লিখবার সময় মানুষের তার নিজের বিবেকের মর্যাদাটুকু বিস্মৃত না হওয়া কাম্য! দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত ২ : ১৮৯-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা হিলালকে আমাদের জন্য মীকাত বানিয়েছেন। অতএব তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়। তো যখন আয়াত ২ : ১৮৯-এ হিলালী মাসসমূহের ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে তখন হাদীসে তো ঐ ব্যবস্থাকেই আরো স্পষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতে আমাদেরকে হিলাল দেখে মাস আরম্ভ করতে বলা হয়েছে। যে কারণে রমযানের রোযাও আমাদেরকে হিলাল দেখে শুরু করতে হবে এবং শাওয়ালের হিলাল দেখার মাধ্যমে শেষ করতে হবে। বোঝা গেল, হিলাল দেখে রোযা শুরু করা- এটা চান্দ্রমাস আরম্ভের কুরআনী তরীকা অনুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যে, উম্মী হবার অপারগতায় নয়।

তৃতীয়ত, চান্দ্রমাসসমূহ শুরু করার পদ্ধতি আলাদাভাবেও সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الشَّهْرُ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا ثَلَاثِينَ، وَالشَّهْرُ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَة، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ.

মাস এরকম, এরকম এবং এরকম হয় অর্থাৎ ত্রিশা আবার মাস এরকম, এরকম ও এরকম হয়, তৃতীয়বার এক আঙ্গুল বন্ধ করে (অর্থাৎ ঊনত্রিশা)। সুতরাং যদি চাঁদ আড়ালে চলে যায় তাহলে ত্রিশ পূর্ণ করো। -সহীহ ইবনে খুযায়মা, খ. ২, পৃ. ৯২১, হাদীস ১৯০৯, সহীহ ইবনে হিব্বান খ. ৮, পৃ. ২৩৪, হাদীস ৩৪৫১

এখানে রমযানের উল্লেখ নেই। চান্দ্রমাসের স্বভাবধারা বর্ণনা করা

হয়েছে। সেটা কখনো ত্রিশ হয়। কখনো ঊনত্রিশ। সেজন্য ঊনত্রিশের রাতে হিলাল দৃষ্টিগোচর না হলে ত্রিশ পূর্ণ করার বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ হিলাল দৃষ্টিগোচর হলে আগামীকাল হবে নতুন মাসের প্রথম দিন। অর্থাৎ গত মাসটি হবে ২৯ দিনের।

চান্দ্রমাসের এই ইসলামী নিয়ম অনুসারে বারো মাসের নবম মাস রমযানও এই পদ্ধতিতেই শুরু করতে হয়। এ নয় যে, হিলাল দেখা কেবল রোযার জন্য, মাসের জন্য নয়। ইরশাদ হয়েছে-

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ.

অর্থাৎ, মাস ঊনত্রিশ রাত্রির (হিলাল দৃষ্টিগোচর না হলে ত্রিশ রাত্রির) অতএব তোমরা হিলাল না দেখে রোযা রেখো না। হিলাল আড়ালে পড়ে গেলে (আগের মাসের) গণনা ত্রিশ পূর্ণ করো। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৭, কিতাবুস সওম, বাব : ১১

আরো ইরশাদ হয়েছে-

لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ.

অর্থাৎ মাসকে আগেই শুরু করে দিয়ো না। প্রথমে হিলাল দেখে নাও। অথবা পূর্ববর্তী মাসের গণনা (৩০) পূর্ণ করে নাও। তারপর রোযা রাখতে থাক। যে পর্যন্ত না হিলাল দেখ কিংবা রমযানের গণনা (৩০) পূর্ণ কর।' -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩২০; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২১২৬; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৯১১, সহীহ ইবনে হিবক্ষান, হাদীস ৩৪৫৮

চান্দ্রমাস শুরু করার যে তরীকা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে শাবান রমযান এবং শাওয়ালের ক্ষেত্রে ঐ তরীকা অবলম্বনের বিধানই এ হাদীসগুলোতে দেয়া হয়েছে। এটা শুধু রোযার জন্য খাস

কোনো বিধান ছিল, এমন নয়।

বিশেষভাবে শাবানের বিষয়ে হাদীসে এসেছে-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মাসের হিলালের চেয়ে শাবানের হিলালের বেশি খেয়াল রাখতেন (কেননা এর সাথেও রয়েছে রমযানের সম্পর্ক)। এরপর রমযানের হিলাল দেখে রোযা রাখতেন। যদি তা দৃষ্টির আড়ালে পড়ে যেতো তাহলে ত্রিশ দিন গণনা করতেন তারপর রোযা রাখতেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৫১৬১; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩২৫; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৯১০, সহীহ ইবনে হিবক্ষান, হাদীস ৩৪৪৪

যিলহজ্বের ব্যাপারেও হাদীসের ইরশাদ-

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِه وَأَظْفَارِه.

যখন তোমরা যিলহজ্বের হিলাল দেখতে পাও তখন যার কুরবানী করার ইচ্ছা রয়েছে সে নিজের চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৭, কিতাবুল আযাহী, বাব ৭

মুহাররম সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, হাকাম ইবনুল আরাজ আব্দুল্লাহ ইবনে আবক্ষাস রা.-কে আশুরার রোযার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বললেন,

إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا.

যখন মুহাররমের হিলাল দেখ তখন থেকে গুনতে থাক। আর নবম দিন রোযা অবস্থায় ভোর করো।৬ তিনি জিজ্ঞেস করলেন-

هكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ؟

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এভাবেই আশুরার রোযা রাখতেন?

বললেন, نَعَمْ হাঁ। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৩৩

হিলাল (নতুন চাঁদ) দেখার এই ইসলামী নীতিমালা সকল চান্দ্রমাসের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হতো। কাতাদা রাহ. বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিলাল দেখতেন তখন বলতেন-

هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بَالَّذِي خَلَقَكَ.

তারপর বলতেন-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَكَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا، وَكَذَا.

-মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস ৭৩৫৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৫১, কিতাবুল আদব, ما يقول إذا رأى الهلال

তো হিলাল দেখে দুআ পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি অমুক মাস পূর্ণ করে দিয়েছেন আর অমুক মাসের আগমন ঘটিয়েছেন।

মোটকথা হিলাল দেখা ইসলামী চান্দ্রমাসসমূহের কুরআন বর্ণিত এবং শরীয়ত নির্ধারিত নীতি। এটা উম্মী হওয়া বা অন্য কোনো অপারগতার পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক সমাধান ছিল না। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের একথাও গলদ যে, চান্দ্রমাস শুরু করার কোনো ব্যবস্থা হাদীসে নেই। এটাও গলদ যে, হিলাল দেখে মাস শুরুর বিষয়ে কোনো কওলী (বাণী) হাদীস নেই। এটাও গলদ যে, হাদীসে হিলাল সম্পর্কিত বিধানে 'শাহরু রমাযান' বলা হয়নি, শুধু রমযান বলা

হয়েছে। তদ্রূপ এটাও গলদ যে, বছর বারো মাসে হওয়ার বিষয়ে কোনো হাদীস নেই। হাদীস শরীফে স্পষ্ট এসেছে-

السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حُرُم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة، وذوالحجة، والمحرم، ورجب مُضَر الذي بين جمادى وشعبان

অর্থাৎ বছর বার মাসে হয়। তার মধ্যে চারটি মাস মুহতারাম। তিনটি তো ধারাবাহিক; যুলকাদা, যুলহিজ্জা ও মুহাররম। আর একটি মাস পৃথক; রজব। যা জুমাদা ও শাবানের মাঝখানে।

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের এক খুতবায় ইরশাদ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৭, হাদীস ২০৩৮৬; সহীহ বুখারী, হাদীস ৩১৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৭৯)

অতএব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা বানানোর কোনো সুযোগ নেই। তবে মানা না মানা- এটা তাঁর কাজ। আমরা শুধু দুআই করতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনুন।

৪. নতুন চাঁদ দেখার হাদীসসমূহকে অস্বীকারের জন্য আরেকটি বাহানা তিনি অন্য কিছু বিচ্ছিন্ন মত পোষণকারী লোকজন থেকে ধার করেছেন। কিন্তু তাদের উদ্ধৃতি না দিয়েই সারা বইয়ে খুবই উচ্ছ্বাস আর খুবই গর্বের সাথে বারংবার তার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। সেটি এই যে, এই যামানায় যেমন নাকি নামাযের সময় জানার জন্য কাঠি পরিমাপের হাদীসের প্রয়োজন নেই; বরং আমাদের বিজ্ঞানের উপহার ঘড়িই যথেষ্ট তেমনিভাবে এখন বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এই যুগে হিলাল দেখার হাদীসসমূহের প্রয়োজন নেই। এখন হিজরী ক্যালেন্ডারই যথেষ্ট। এটা ওর চেয়েও ভালো এবং উন্নত বিকল্প।

এই অযৌক্তিক যুক্তিবাদিতা সম্পর্কে তো প্রবন্ধের আগামি কিস্তিতে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করা হবে। এই মুহূর্তে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এধরনের বুদ্ধিসর্বস্ব প্রমাণ উপস্থাপন করে যে কোনো ব্যক্তি

শরীয়তের যে কোনো বিধানের ব্যাপারে বলতে পারে যে, এটা এই উৎকর্ষলব্ধ যুগের সঙ্গে মানানসই নয়। এখন এর অমুক ভালো বিকল্প এসে গেছে। যাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলার দেয়া দ্বীন ও শরীয়তের মর্যাদা মাখলূকের তৈরি আইন-কানুনের মতই তারা এ ধরনের কথা খুব সহজেই বলতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনকে চিরন্তন বলে বিশ্বাস করে এবং শরীয়তের নীতিমালাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মোতাবিক চিরন্তন মনে করে, যার দৃষ্টিতে ঈমান সকল কিছুর আগে তার কল্পনার ত্রিসীমানাতেও এ ধরনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা আসতে পারে না।

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

(চলবে ইনশাআল্লাহ)